ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

গবেষক

মোঃ মাহবুবুল আলম

পিএইচ. ডি গবেষক

রেজি. নং-২০/২০১২-২০১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র ------------------------------------viii

ঘোষণা পত্র ------------------------------------ix

কৃতজ্ঞতা স্বীকার --------------------------------x-xi

শব্দ সংকেত ------------------------------------xii

ভূমিকা ---০১-০৪

প্রথম অধ্যায়

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	**(০৬-৪০)**
শাস্তির সংজ্ঞা	০৬
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচয় (Deterrent Punishment)	০৭
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	০৮
বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের উম্মতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নমুনা	১০
শাস্তির প্রকারভেদ	১০
কিসাসের পরিচয়	১২
দিয়াতের পরিচয়	২১
অপরাধের পরিচয়	২৬
দুর্নীতির পরিচয়	৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি, ব্যক্তিগত অপরাধ ও শাস্তি বিধান	**(৪২-৬৫)**
শিরকের শাস্তির বিধান	৪২

Dhaka University Institutional Repository

কুফরের শাস্তির বিধান	৪৩
মুনাফিকের শাস্তির বিধান	৪৪
কর্তব্যে অবহেলার শাস্তির বিধান	৪৫
হারাম উপার্জনের শাস্তির বিধান	৪৭
তাকওয়া বিহীন জীবন যাপনের শাস্তির বিধান	৪৮
মিথ্যা কথা বলার শাস্তির বিধান	৪৯
কবর বা মাজার,বেদীতে ফুল দেওয়ার বিধান	৫১
সৎকাজে আদেশ না করা ও অসৎকাজে নিষেধ না করার শাস্তির বিধান	৫৩
ফরয ছেড়ে দেওয়ার শাস্তির বিধান	৫৪
মান-সম্মান,ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার শাস্তির বিধান	৫৬
সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ভঙ্গের শাস্তির বিধান	৫৬
একে অপরকে উপহাস করার শাস্তির বিধান	৫৭
একে অপরকে দোষারোপ করার শাস্তির বিধান	৫৮
মন্দ নামে ডাকার শাস্তির বিধান	৫৮
অমূলক ধারণা করার শাস্তির বিধান	৫৯
দোষান্বেষণের শাস্তির বিধান	৬০
গীবত করার শাস্তির বিধান	৬০
ইবাদাত আদায় না করার বিধান	৬১
সালাত ছেড়ে দেয়ার শাস্তির বিধান	৬২
যাকাত আদায় না করার শাস্তির বিধান	৬২
রোযা না রাখার শাস্তির বিধান	৬২

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ পালন না করার শাস্তির বিধান ৬৩

খ. বাধ্যতামূলক নয় এমন ইবাদত তরক করার বিধান ৬৩

পরিবেশ দূষণের শাস্তির বিধান ৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবার, পারিবারিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান (৬৭-১১৪)

পরিবারের সংজ্ঞা ৬৭

ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা ৬৮

মুহাররমকে বিয়ে করার বিধান ৭৩

কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবীকে বিয়ে করার বিধান ৭৬

বদল বিয়ের বিধান ৭৮

বিয়ের পূর্বে দোষ-ত্রুটি গোপন করার বিধান ৭৯

দেন-মোহর প্রদানের বিধান ৮০

দৃষ্টি অনিয়ন্ত্রনের বিধান ৮৪

পর্দা গ্রহণ না করার বিধান ৮৯

পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার বিধান ১০০

ভিন্ স্ত্রী-পুরুষের গোপন সাক্ষাতকার বা পরকীয়া প্রেমের বিধান ১০২

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার খর্ব করার বিধান ১০৬

তালাক দানে সীমা লঙ্গনের বিধান ১০৭

হিলা বিয়ের বিধান ১১০

যৌতুকের শাস্তির বিধান ১১৩

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ, সামাজিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান **১১৫-২২৭**

ইসলামী সমাজের সংজ্ঞা ১১৭

চুরির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান ১১৮

ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তির বিধান ১৩৬

ডাকাতি ও সন্ত্রাসে সহযোগীদের শাস্তির বিধান ১৪৪

অপহরণের শাস্তির বিধান ১৪৫

মানব অপহরণ ও গুমের শাস্তির বিধান ১৪৯

যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ১৫১

নাবালিগা, পাগল মেয়ে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যিনার বিধান ১৭০

ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে যিনার বিধান ১৭০

ভূলবশত সঙ্গমের শাস্তির বিধান ১৭১

পুরুষদের সমকামিতার শাস্তির বিধান ১৭১

মহিলাদের সমকামিতার শাস্তির বিধান ১৭২

পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান ১৭২

কায্ফ বা যিনার অপবাদের শাস্তির বিধান ১৭৩

স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি ১৭৯

মদ্যপানের শাস্তির বিধান ১৮৪

ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তির বিধান ১৯২

রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতার শাস্তির বিধান ২০৯

হত্যার শাস্তির বিধান ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

হত্যার প্রকারভেদ ২১৭

আঘাতের শাস্তির বিধান ২২৩

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনীতি, অর্থনৈতিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান **২২৮-২৮২**

অর্থনীতির পরিচয় ২৩২

ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি ২৩৩

সুদের শাস্তির বিধান ২৩৬

ঘুষের শাস্তির বিধান ২৪৪

জুয়ার শাস্তির বিধান ২৪৯

লটারির শাস্তির বিধান ২৫৪

কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণের বিধান ২৫৪

অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসার বিধান ২৫৫

অপসংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান ২৫৬

মুদ্রা জাল করার বিধান ২৫৭

মজুতদারীর শাস্তির বিধান ২৫৮

চোরাচালানের শাস্তির বিধান ২৬২

সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার বিধান ২৬৩

চাঁদাবাজীর শাস্তির বিধান ২৬৪

লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের বিধান ২৬৪

ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান ২৬৫

প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়ার বিধান ২৬৬

ভেজাল মিশানোর বিধান ২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

কর বা রাজস্ব ফাঁকির বিধান ২৬৭

ইসরাফ বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান ২৬৯

তাবজীর বা অপচয়ের বিধান ২৬৯

অংশীদারের অংশ না দেওয়ার বিধান ২৭০

অসিয়ত পূর্ণ না করার বিধান ২৭১

কৃপণতার বিধান ২৭২

রেশনিং প্রথার বিধান ২৭৩

শ্রমিকের অধিকারের বিধান ২৭৪

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের বিধান ২৭৭

পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষ প্রতিরোধের বিধান ২৭৮

কারবারী ইন্সিওরেন্সের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা গঠনের বিধান ২৮১

মুনাফা ও শিল্পপণ্যে মজুরের অংশ পাওয়ার বিধান ২৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায় এর প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা ২৮৩-২৮৭

উপসংহার ২৮৮

গ্রন্থপঞ্জি ২৯০-২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291

স্মারক নং.............................

Date..............................20

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোঃ মাহবুবুল আলম** কর্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

(ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়"** অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণা পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করা হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

মোঃ মাহবুবুল আলম
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি. নং-২০/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সালাত ও সালাম সেই মানবতার মুক্তি দিশারী রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি, যার আগমণে এ পৃথিবী ধন্য হয়েছে। পাশাপাশি আওলাদে রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, শহীদান ও মুমেনগণের প্রতি লাখ কোটি সালাম পেশ করত আমি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাফিজ মুজতবা রিজা আহমাদ স্যারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর যথাযথ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভ রচনা করা আদৌ সম্ভব হতো না। তাঁর ব্যক্তিগত ও বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকা স্বত্ত্বেও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ সহ সার্বিক ব্যাপারে তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বর্তমান অভিসন্দর্ভের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ইসলামী ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আহসান সাইয়েদ প্রমুখ স্যারের নিকট থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাঁদের সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা তাঁদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমাকে গবেষণার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আমার সকল শিক্ষকবৃন্দের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে অধ্যাপক ড. আ. খ. ম.ওয়ালিউল্লাহ, অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন, অধ্যাপক ড. সেকান্দর আলী, অধ্যাপক ড. মুজাম্মেল আলী, অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক ড. সফিকুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান ও ড. মুস্তাফিজুর রহমান থেকেও আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদেরসহ বিভাগের সকল শিক্ষক ও কর্মচারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন রইল। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.ক.ম. ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী, অধ্যাপক ড. ইয়াকুব আলী, অধ্যাপক ড. নাছির উদ্দীন মিঝি, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের অধ্যাপক ড. আকরাম হোসাইন মজুমদার. ফিকহ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু বকর যাকারিয়া, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল কাদের, গাজীমুড়া আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ড. আমিনুল ইসলাম, রাজাপুর ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. মানজুরুর রহমান, এম.ফিল গবেষক মনিরুজ্জামান (কামাল) প্রমুখ আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ-খবর ও পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মের তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার সহ ধন্যবাদ রইল।

Dhaka University Institutional Repository

সুয়াগঞ্জ টি.এ হাইস্কুল এন্ড কলেজের গভর্ণিং বডির সাবেক সভাপতি মোস্তফা মোর্শেদ আহাম্মদ চৌধুরী, নাছিমুল আলম চৌধুরী (নজরুল) সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও বর্তমান সভাপতি ইব্রাহীম কবীর, সাবেক পরিচালক, অর্থ ও হিসাব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সদস্যবৃন্দসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাঁরা আমাকে এ গবেষণাকর্ম পরিচালনার সুযোগ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি আমার সহকর্মীবৃন্দ, সুভাকাঙ্খী, বন্ধুমহল যারা আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে অনেক সময় আমার পরিবারের সদস্যগণ আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী মিসেস শিরিনা আক্তার এবং স্নেহের কন্যা সৈয়দা মাহজাবিন সাকিবা ও সৈয়দা আফরিন মাইশা অধিকাংশ সময় আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েও তারা আমার মনোবল যুগিয়েছে। তাদের সকলের অবদানকে আমার জীবনে কল্যাণের সহায়ক জ্ঞান করি। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাদের অবদানের কথা উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব মোঃ ফজর আলী, মমতাময়ী মা মরিয়ম বেগম, নানা আলহাজ্ব মোঃ আব্দুস সোবহান মেম্বার, মামা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুর রশিদ, ডা. মোঃ আবদুল খালেক, চাচা মরহুম মোঃ ইউনুছ মিয়া, বড়বোন আয়েশা বেগম, বড় দুলাভাই মরহুম আবু সাইদ, ছোট ভাই সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ কামাল হোসাইন, আমার স্নেহের ছোট ভাই ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষক মোঃ মিজানুর রহমান, ছোটবোন মাছুমা বেগম, প্রবাসী ভগ্নিপতি কবির হোসেন, ছোট বোন সহকারী শিক্ষক খাদিজা আক্তার, ভগ্নিপতি সহকারী শিক্ষক মোঃ আবদুল মমিন, নাহিদা সুলতানা, ভগ্নিপতি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক মোঃ আবু সুফিয়ান, চাচাতো ভাই প্রবাসী মোঃ আলী হোসেন, জেঠাতো ভাই পিএইচ.ডি গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক মোঃ জুলফিকার আহমদ আমার জীবনে সফলতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের দোয়া ও সুনির্দেশনা আমার অগ্রযাত্রার মাইলফলক হিসেবে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকল কর্মের সর্বোচ্চ প্রতিদান প্রদান করুন।

আমার গবেষণা কর্মের সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মুদ্রণ কাজের সার্বিক তদারকিতে আন্তরিকতার সাথে সময় প্রদান ও অক্লান্ত পরিশ্রমকারিগণের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন। প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করতে পেরে পরম করুনাময়ের নিকট আবারও শুকরিয়া আদায় করছি। যাতে তিনি আমাদের সকল ভাল কাজে সহায় হন। (আমিন)

মোঃ মাহবুবুল আলম
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি. নং ২০/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু.	:	অনূবাদ/ অনুদিত
আ.	:	আরবী / আলাইহিস সালাম
ইং.	:	ইংরেজী
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খৃ./ খ্রী. / খ্রি.	:	খৃষ্টাব্দ/ খ্রীষ্টাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ
ড.	:	ডক্টর/ পিএইচ. ডি
প্রাগুক্ত	:	পূর্বের উক্তি/ পূর্বোক্ত
বাং.	:	বাংলা
রহ.	:	রাহমাতুল্লাহি আলাই
রেজি.	:	রেজিস্ট্রেশন/ রেজিষ্টার্ড
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
স./ সা.	:	সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম
সংস্ক.	:	সংস্করণ
সম্পা.	:	সম্পাদনের সন
হি.	:	হিজরী
হা. নং.	:	হাদীস নম্বর
তা. বি.	:	তারিখ বিহীন
opcit	:	Open Cito
Ed.	:	Edition
Ibid	:	(Ibidem)in the same place
Vol	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীর মালিক। তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। তারা কিভাবে তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করবে তার সঠিক দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। যারা তাঁর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হবে তাদের জন্য রয়েছে নাজাত ও শ্বাশ্বত জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। আর যারা তার নির্দেশিত পথ পরিহার করে অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে অন্যায়,অপরাধ,দুর্নীতি করবে , তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর পরকালীন জীবনে জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। মানুষ সমাজ জীবনে মান-সম্মান, ন্যায়-নীতির পথ পরিহার করে অপরাধ ও দুর্নীতির অবলম্বন করলে তাকে সঠিক পথে ফিরানোর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিকল্প নেই। ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বলতে এমন শারীরিক শাস্তি প্রদান করাকে বুঝায়, যা সরাসরি জনসমক্ষে প্রদান করা হয়। যার তীব্রতা ও ভয়াবহতা অবলোকন করে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠে, অপরাধ ও দুর্নীতি প্রবণতা দূরভীত হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে নিবৃত্তিমূলক শাস্তিও বলা হয়। কেননা অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অন্যান্য মানুষকে অপরাধ ও দুর্নীতি করা হতে নিবৃত্ত করাই এ শাস্তি দানের প্রধান উদ্দেশ্য। যখন সমাজে কোন অপরাধী বা দুর্নীতিবাজ তার অপরাধ ও দুর্নীতির জন্য নিশ্চিত শাস্তির সম্মুখীন হয়, পার পাওয়ার কোন সুযোগ না থাকে, তখন সে সমাজে কোন অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হয় না। আর যদি সমাজে অপরাধ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয়, পার পাওয়ার সুযোগে বেঁচে যায়, তাহলে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজরা অপরাধ ও দুর্নীতি সংগঠনে উৎসাহী হয়। শাস্তি অপরাধ সংঘটন নিবারণ করে। যদি অপরাধ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজ অপরাধ ও দুর্নীতি করার সাহস পাবে না। এ অবস্থায় অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদেরকে দেয়া শাস্তি অন্যান্য সম্ভাব্য অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের নিকট এবং অপরাধ ও দুর্নীতি প্রবণশীল মানুষের নিকট দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদেরকে এরূপ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রধান করা হবে, যা প্রত্যক্ষ বা দর্শন করে সমাজের অন্যান্য অপরাধী ও দুর্নীতিবাজরা পুনরায় অপরাধ ও দুর্নীতি করতে ভয় পাবে। কারণ পুনরায় অপরাধ করলে তাকে ঐ একই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর এ অপরাধ ও দুর্নীতির প্রবণতা পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকে শুরু হয়েছে। যখন আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে বেহেশতে বসবাস করতে দিয়ে সঙ্গিনী হিসেবে হযরত হাওয়া (আ.) কে প্রদান করেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের দু'জনকে বেহেশতের একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনায় তাঁরা এ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁদেরকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়ে পৃথিবীতে সাড়ে তিনশত বৎসর বিচ্ছেদের পর আরাফাতের ময়দানে একত্র করে তাওবার মাধ্যমে দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"তাঁরা উভয়ে (আদম ও হাওয়া) বলল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না কর, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাব" (আল-কুরআন,৭:২৩)

তারপর আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া (আ.) দুনিয়ায় একটা নির্দিষ্ট সময় অবস্থান ও পারিবারিক জীবনে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান জন্ম দেওয়ার সুযোগ দেন। বিপরীত জোড়ার ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহের আদেশ আসলে কাবিল তার জোড়ার বোনকে বিয়ে করার সুযোগ না পেয়ে বিবাহ সংক্রান্ত বিভেদে আপন ভাই হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে হত্যাজনিত অপরাধ সৃষ্টি করে। তারপর বিভিন্ন নবী ও রাসূলের জামানার লোকদের অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে অকস্মাৎ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে পাকড়াও করেছেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আযাব-গজব জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছিল এবং গোটা জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। ইসলাম মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জীবন ও জগতের সামগ্রিক কর্মের দিক নির্দেশনা ও মূলনীতি বিদ্যমান। মানুষ সামাজিক জীব, একা বা আলাদা করে বসবাস করতে পারে না। সমাজ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের সমভাবে সুবিচার করার অভিপ্রায় থাকে না। ফলে মানুষ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে লোভ-লালসার বসবতি হয়ে অপরাধ ও দুর্নীতি করে। ইসলামে অপরাধ ও দুর্নীতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু পারলৌকিক শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেখানে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতো সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার, সেখানে এ শাস্তির অনুপস্থিতিতে সমাজ কলুষিত, নিগৃহীত ও নিপীড়িত। যদি ইহলৌকিক অপরাধ ও দুর্নীতির জন্য অপরাধী ও দুর্নীতিবাজকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা না যায়, তাহলে এদেশ ও পৃথিবী অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে, ক্ষতিগ্রস্থ হবে বিশ্ব শান্তি এবং বিপন্ন হবে বিশ্ব মানবতা। আইনের মারপ্যাঁচে প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরের মানুষ অপরাধ ও দুর্নীতির সঠিক ও ন্যায় বিচার পায় না। যে বিচার পরিমাণ ন্যায় পায় তা অপর্যাপ্ত ও দৃষ্টান্তমূলক নয়। তাই তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রত্যাশা করে।

আবার যে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, এমপি, মন্ত্রী, আমলা এমনকি শীর্ষ স্থানীয় নেতার আত্নীয়-স্বজন হলেও সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ থাকে। এজন্য প্রজাতন্ত্রের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সবোর্চ্চ স্তর পর্যন্ত অপরাধী ও দুর্নীতিবাজরা যে যেই অবস্থানে কর্ম করছে তারা সকলেই সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, দেশাত্নবোধ, আইন ও নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে বেপরোয়াভাবে অপরাধ ও দুর্নীতি করছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রজাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপরাধ ও দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাই ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে এসব অপরাধ ও দুর্নীতির মূলৎপাটন করা সম্ভব।

আমাদের দেশে প্রচলিত সাংবিধানিক আইনে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে অপরাধ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে কারো কারো শাস্তি হয় আবার সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কারোর শাস্তিই হয় না। যাদের শাস্তি হয় তা পর্যাপ্ত ও দৃষ্টান্তমূলক না হওয়ায় এ শাস্তির বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধ ও দুর্নীতি বন্ধ হয় না। এ সুযোগে প্রকৃত অপরাধী দুর্নীতিবাজরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কেননা মানব রচিত সংবিধান মানুষের ভবিষ্যত কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ণয় করতে পারে না। যার দরুন এ সংবিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। এ কারণে বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত মোট ষোলবার সংশোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যে সংবিধান মানব জাতির জন্য দিয়েছেন তা শ্বাশ্বত, চিরন্তন, যার মধ্যে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সব সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। কখনো এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধনের দরকার নেই। কেননা এ সংবিধানে অপরাধ ও দুর্নীতির যে শাস্তির ব্যবস্থা বিদ্যমান তা একদিকে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের জন্য পর্যাপ্ত শাস্তি আর অন্যান্য অপরাধ প্রবণশীলদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ফলে তারা আর অপরাধ ও দুর্নীতি করতে আগ্রহী হবে না।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৯৫% লোক মুসলিম। তাদের সাথে অন্যান্য ধর্মের লোকও তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশীয় আইন মেনে চলে। এ সংবিধানে যদিও মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য সকল আইন আছে কিন্তু এ আইনের বা সংবিধানের যথার্থ প্রয়োগ হয় না। দেশের সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে সর্বনিম্ম স্তর পর্যন্ত আইন না মানার প্রবনতা লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। আর এই প্রবনতা আমাদের দেশের সকল ক্ষেত্রকে ধ্বংশের সম্মুখীন করে তুলেছে। যার ফলে মানুষ অবাধে অপরাধ ও দুর্নীতি করে বেড়ায়। তাদের মধ্যে একটি ধারণা বদ্ধমূল যে, আইনের ফাঁক-ফুকুরে বেঁচে যেতে পারবে, আবার দায়মুক্তির মাধ্যমেও পার পেয়ে যেতে পারবে। তাই চোর আরো বেশী চুরি করে, ডাকাত আরো বেশী ডাকাতি করে, ধর্ষক আরো বেশী ধর্ষণ করে, হত্যাকারী আরো বেশী হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। কারণ সে জানে তার অপরাধের তেমন কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে না। সে কোন না কোনভাবে বেঁচে যেতে পারবে। আর এ বেঁচে যাওয়ার প্রবনতা মানুষকে অত্যধিক অপরাধী ও দুর্নীতিগ্রস্থ করে তুলে। ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রয়োগ থাকলে এ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব যে, জনপ্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন-আদালত, ব্যাংক, বীমা,পরিবহন, বিদ্যুৎ,গ্যাস সহ অন্যান্য সকল সেক্টরে অপরাধ ও দুর্নীতির চিত্র পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি সামাজিক অপরাধ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, যৌতুক, অধিকার খর্ব, মাদক গ্রহন ও পাচার, সুদ, ঘুষ, সরকারী সম্পদ দখল, কর ফাঁকি, নারী ও শিশু পাচার, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, সীমান্তে মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ সকল অপরাধ অহরহ ঘটছে। কারণ এসব অপরাধের যর্থাথ শাস্তি হয় না। যদিও এসব অপরাধের সাময়িক শাস্তি হয় তাতে অপরাধীর শিক্ষা হয় না। ফলে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজরা আরো বেশী অপরাধ প্রবণ হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসে এবং সমাজকে অপরাধ ও দুর্নীতির অভয়ারণ্যে পরিণত করে। যদি অপরাধ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতো তাহলে তারা অপরাধ ও দুর্নীতি করার সাহস পেত না। সমাজ ও রাষ্ট্র একটি শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে উঠত।

তাই ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সম্পর্কীয় কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহলৌকিক অপরাধ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং পারলৌকিক পরিণাম বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে সঠিক পথে রাখা। সে সাথে এ শাস্তির বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি নির্মূলে প্রশাসন ও সরকারকে সার্বিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এ বিষয়বস্তুকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : এখানে শাস্তির সংজ্ঞা, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচয় (Deterrent Punishment), দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের উম্মতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নমুনা, শাস্তির প্রকারভেদ, কিসাসের পরিচয়, দিয়াতের পরিচয়, অপরাধের পরিচয়, দুর্নীতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্যক্তি, ব্যক্তিগত অপরাধ ও শাস্তির বিধান : এখানে ব্যক্তিগত অপরাধের শাস্তির আলোচনায় শিরকের শাস্তির বিধান, কুফরের শাস্তির বিধান, মুনাফিকের শাস্তির বিধান, কর্তব্যে অবহেলার শাস্তির বিধান, হারাম উপার্জনের শাস্তির বিধান, মিথ্যা কথা বলার শাস্তির বিধান, তাকওয়া বিহীন জীবন যাপনের শাস্তির বিধান, কবর বা মাজার,বেদীতে ফুল দেওয়ার বিধান, সৎকাজে আদেশ না করা ও অসৎকাজে নিষেধ না করার শাস্তির বিধান, ফরয ছেড়ে দেওয়ার শাস্তির বিধান, মান-সম্মান,ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার শাস্তির বিধান, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ভঙ্গের শাস্তির বিধান, একে অপরকে উপহাস করার শাস্তির বিধান, একে অপরকে দোষারোপ করার শাস্তির বিধান, অমূলক ধারণা করার শাস্তির বিধান, মন্দ নামে ডাকার শাস্তির বিধান, দোষান্বেষণের শাস্তির বিধান, গীবত করার শাস্তির বিধান, ইবাদাত আদায় না করার বিধান, সালাত ছেড়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার শাস্তির বিধান, যাকাত আদায় না করার শাস্তির বিধান, রোযা না রাখার শাস্তির বিধান, হজ্জ পালন না করার শাস্তির বিধান, পরিবেশ দূষণের শাস্তির বিধান তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : পরিবার, পারিবারিক অপরাধ ও শাস্তির বিধানঃ এখানে পারিবারিক অপরাধের শাস্তির বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবারের সংজ্ঞা, ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা, মুহাররমকে বিয়ে করার বিধান, কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবীকে বিয়ে করার বিধান, বদল বিয়ের বিধান, বিয়ের পূর্বে দোষ-ত্রুটি গোপন করার বিধান, দেন-মোহর প্রদানের বিধান, দৃষ্টি অনিয়ন্ত্রনের বিধান, পর্দা গ্রহণ না করার বিধান, পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার বিধান, ভিন্ স্ত্রী-পুরুষের গোপন সাক্ষাতকার বা পরকীয়া প্রেমের বিধান, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার খর্ব করার বিধান, তালাক দানে সীমা লঙ্গনের বিধান, হিলা বিয়ের বিধান, যৌতুকের শাস্তির বিধান আলেঅচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : সমাজ, সামাজিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান : এখানে সামাজিক অপরাধের শাস্তির বিধানের আলোচনায় সমাজ ও ইসলামী সমাজের সংজ্ঞা, চুরির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান, ডাকাতি ও লুন্ঠনের শাস্তির বিধান, ডাকাতি ও সন্ত্রাসে সহযোগীদের শাস্তির বিধান, অপহরণের শাস্তির বিধান, মানব অপহরণ ও গুমের শাস্তির বিধান, যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান, নাবালিগা, পাগল মেয়ে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যিনার বিধান, ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে যিনার বিধান, ভূলবশত সঙ্গমের শাস্তির বিধান, পুরুষদের সমকামিতার শাস্তির বিধান, মহিলাদের সমকামিতার শাস্তির বিধান, পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান, কায্ফ বা যিনার অপবাদের শাস্তির বিধান, স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তির বিধান, ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তির বিধান, রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতার শাস্তির বিধান, হত্যার শাস্তির বিধান, হত্যার প্রকারভেদ, আঘাতের শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : অর্থনীতি, অর্থনৈতিক অপরাধ ও শাস্তির বিধানঃ এখানে অর্থনৈতিক অপরাধের শাস্তির বিধান বর্ণনায় অর্থনীতির পরিচয়, ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি, সুদের শাস্তির বিধান, ঘুষের শাস্তির বিধান, জুয়ার বিধান, লটারির শাস্তির বিধান, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণের বিধান, অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসার বিধান : অপসংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান, মুদ্রা জাল করার বিধান, মজুতদারীর শাস্তির বিধান, চোরাচালানের শাস্তির বিধান, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার বিধান, চাঁদাবাজীর শাস্তির বিধান, লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের বিধান, ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান, প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়ার বিধান, ভেজাল মিশানোর বিধান, কর বা রাজস্ব ফাঁকির বিধান, ইসরাফ বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান, তাবজীর বা অপচয়ের বিধান, অংশীদারের অংশ না দেওয়ার বিধান, অসিয়ত পূর্ণ না করার বিধান, কৃপণতার বিধান, রেশনিং প্রথার বিধান, মুনাফা ও শিল্পপণ্যে মজুরের অংশ পাওয়ার বিধান, ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের বিধান, পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষ প্রতিরোধের বিধান, কারবারী ইন্সিওরেন্সের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা গঠনের বিধান, শ্রমিকের অধিকারের বিধান তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায় এর সার্বিক মূল্যায়নে কিছু প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।
পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি নামে সহায়ক গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শাস্তির সংজ্ঞা

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচয় (Deterrent Punishment)

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের উম্মতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নমুনা

শাস্তির প্রকারভেদ

কিসাসের পরিচয়

দিয়াতের পরিচয়

অপরাধের পরিচয়

দুর্নীতির পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীতে যত ধর্মের প্রচলন আছে এগুলোর মধ্যে ইসলামই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত শান্তির ধর্ম। এ ধর্ম ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনসহ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষের মাঝে নৈতিকতা জাগ্রত করার জন্য, তাদেরকে কল্যাণের কথা শিক্ষাদানের জন্য, তাদের জীবন কীভাবে সুন্দর ও সুখের হবে, তার দিক-নির্দেশনা দিতে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং নবীদের সব সময় মানুষের প্রতি দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের প্রতি রূঢ় ও কষ্টদায়ক আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি"।[১] রাসূলুল্লাহ (স.) সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী তথা সকল সৃষ্টি জগতের করুণার আঁধার। তাঁকে অমান্য করলেও তাঁর দয়া থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। তিনি আরো বলেন, "তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।"[২] মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন। নবী ও রাসূলগণ কারো কর্ম পরিচালক নয়। প্রত্যেকে মুক্তভাবে নিজের এখতিয়ার অনুসারে পরিচালিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে হাশরের ময়দানে তাদের কৃতকর্মের বিচার হবে। কোন নবী মানুষ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন নি। তরবারির ভয়ে রাসূলুল্লা (স.) এর নয় বরং ইসলামের উদার নীতি ও আদর্শের কারণে ইসলাম গ্রহন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও"।[৩] রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তম চরিত্র ও নৈতিক আদর্শের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন।

এতো কিছুর পরও সমাজে একদল মানুষ পাওয়া যায়, যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। ফলে সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে, জনগণের ভোগান্তি বাড়ে এবং অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমাজের বিপর্যয়কারী ঐসব অপরাধীর লাগাম টেনে ধরতে এবং জনগণের মাঝে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আইনে শাস্তির বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন। অপরাধভেদে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি রয়েছে তম্মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অন্যতম। যাতে জনগণ এ শাস্তি অবলোকন করে অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকে। আর কিছু কিছু শাস্তি রয়েছে যা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালকদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে তারা স্থান-কাল পাত্রভেদে শাস্তির পরিমাণ কমবেশি করতে পারেন।

শাস্তি প্রদান করলে আল্লাহ্ তা'য়ালার কোন ধরনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায় না। আবার তাঁর কথা পৃথিবীর কেউ অমান্য করলেও মহান সত্তার মর্যাদার কোন কমতি হয় না। তিনি শুধু ব্যক্তির সংশোধন ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।[৪]

শাস্তির সংজ্ঞা :

আরবীতে শাস্তিকে العقوبة বলা হয় । শাস্তির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেন-
"শরী'আত প্রবর্তক (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) এর নির্দেশ অমান্য করার জন্য জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল।"[৫] শাব্দিক অর্থে 'শাস্তি' বলতে কৃত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কষ্ট দেয়া বুঝায়। এ কষ্ট অবশ্য

১. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭
২. আল-কুরআন, ৮৮ : ২২
৩. আল-কুরআন, ৫০ : ৪৫
৪. আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনাঈ* (লেবানন, মুআসসাতুর রিসালাহ, সংস্ক. ১৪, ১৪১৯ হি.) খ. ১, পৃ. ৬০৯
৫. هى الجزاء المقرر المصلحة الجماعة على عصيلن امر الشرع. (আব্দুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক বা মানসিক বা উভয় প্রকার হতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও মানুষের জান, মালের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন-কানুন তৈরী করে অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।[৬] অপরাধ শব্দটি হল কারণ এবং উক্ত কারণের ফল হচ্ছে শাস্তি। অতএব শাস্তি হবে রাষ্ট্রের আদেশ নিষেধ অপ্রতিপালনের জন্য প্রতিশোধ স্বরূপ ব্যবস্থা। অন্যথায়, আভিধানিক অর্থে শাস্তি বলতে সংঘটিত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কষ্ট দেয়া বোঝায়। এই অর্থে শাস্তি হল ক্লেশ। যারা দেশের আইন ভঙ্গ করেন তারাই এ ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য হন। সুতরাং কৃত অপরাধের জন্য অপরাধীকে যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা বা পীড়ন করা হয় ইহার নামই শাস্তি।[৭]

অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য যে শারীরিক বা মানসিক যাতনা কিংবা পীড়ন করা হয় তার নাম "শাস্তি"। অপরাধের জন্য এ ধরনের যাতনা বা কষ্ট-ক্লেশ আরোপ করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। কারণ অপরাধীর প্রায়শ্চিত্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা তার সংশোধন ও নব জন্ম লাভের উপায়। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গের জন্য আইনানুগ অপরাধী প্রমাণিত হলে, শাস্তির পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, আসামীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।[৮]

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পরিচয় (Deterrent Punishment) :

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে এমন এক প্রকারের শাস্তি যার প্রচন্ডতা ও তীব্রতা দেখে অপরাধীর হৃদয় ও মন ভয়ে কেপে উঠে এবং অপরাধ ও দুর্নীতির প্রবণতা দূর হয়ে যায়। যদি কোন অপরাধী তার অপরাধ ও দুর্নীতির জন্য নিশ্চিত শাস্তির সম্মুখীন হয় তাহলে সে আর অপরাধ সংঘটিত করবে না।

দৃষ্টান্তমূলক বা নিবৃত্তিমূলক শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১। (ক) দৃষ্টান্ত স্থাপন : অপরাধীর শাস্তি বিধান করে সমাজে অনুরূপ ধরনের অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য অনুরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা; এবং

(খ) পুনরাবৃত্তি রোধে : শারীরিক দন্ডদান করে অপরাধীকে ভবিষ্যতে উক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা হতে বিরত রাখা। সাধারণ অর্থে এ মতবাদের লক্ষ্য সমাজ সংরক্ষণের জন্য অপরাধীর প্রতি এরূপ দৃষ্টান্তমূলক আচরণ করতে হবে যেন আইনভঙ্গ করার ভয়াবহ পরিণতির বিষয় অনুধাবন করে অন্যান্য ব্যক্তিরাও অনুরূপ অপরাধ করা হতে বিরত থাকে।[৯]

২। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হল অপরাধ বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন বা চরমতম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা। অপরাধীকে তার কৃতকর্মের জন্য এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কেহ অনুরূপ অপরাধ না করে এটাই এই মতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মতবাদটি যে দু'টি বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা হল-

(ক) অপরাধীকে চরমতম শাস্তি প্রদান করে এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সমাজের অন্য কেউ অনুরূপ অপরাধ সংঘটন করতে পুনর্বার সাহস না পায়।

(খ) চূড়ান্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নজীর স্থাপন করা হলে কোন অপরাধী ভবিষ্যতে উক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা হতে নিবৃত্ত থাকবে। অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করাই হল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির

৬. অধ্যক্ষ এ.এ. এম মনিরুজ্জামান; মোহাম্মদ হায়দার আলী, *জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী* (ন্যাশনাল ল' পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ৬, ২০১২) পৃ. ২৯৩

৭. অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, *জুরিস্প্রুডেন্স* (হিরা পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ১, জুলাই ২০১১), পৃ. ২১৮

৮. জাকিয়া সুলতানা জলি; মো: শাহিনুর রহমান, *জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লীগ্যাল থিওরী* (সম্পাদনায় : এম জগলুল কবির, পাইভ জুয়েল পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ১, জানুয়ারী ২০১৩), পৃ. ৩৪৫

৯. জাকিয়া সুলতানা জলি; মো: শাহিনুর রহমান, *জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লীগ্যাল থিওরী* , প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

মূল উদ্দেশ্য।[১০]

৩। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে 'নিবৃত্তমূলক' অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ভবিষতে অন্যান্য মানুষকে অপরাধ করা হতে নিবৃত্ত করাই এ শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য। এ মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন যে, অপরাধীকে দেয় শাস্তি অন্যান্য সম্ভাব্য অপরাধীর নিকট এবং অপরাধ প্রবণশীল মানুষের নিকট দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অপরাধীকে এরূপ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে যা প্রত্যক্ষ বা দর্শন করে সমাজের অন্যান্য অপরাধী পুনরায় অপরাধ করতে ভয় পাবে। কারণ পুনরায় অপরাধ করলে তাকে ঐ একই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শাস্তি অপরাধ সংঘটন নিবারণ করে। প্রত্যেক মানুষের একইভাবে ন্যায় কাজ করার অভিপ্রায় থাকে না বলে কিছু কিছু মানুষ অন্যায় কাজ করে। এজন্য ফৌজদারী বিচারে শাস্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত, সম্ভাব্য অপরাধীদের মনে অপরাধের জন্য শাস্তির ভীতি সঞ্চার করা এবং তাদের মনে অপরাধ করা হতে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করা।[১১]

দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি সম্পর্কে Salmond বলেন, æPunishment is before all things deterrent and the chief and of the law of crime is to make the evil-doer on example and a warning to all that are like-minded with him."

সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ ধরনের শাস্তি সমাজের সকল প্রকার অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের প্রতি সতর্কতামূলক পূর্ব সংকেত। সে মতে সকল অপরাধ ও দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে পর্যাপ্ত শাস্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল দেশ, জাতি, সমাজ সংরক্ষণের জন্য অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের প্রতি এমন দৃষ্টান্তমূলক আচরণ করতে হবে, যাতে আইন ভঙ্গ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্যক অনুধাবন করে সমাজের অপরাপর সদস্যগণও একই অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটন করা হতে বিরত থাকে।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মাইলফলক। এ শাস্তির বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি (অপরাধী ও দুর্নীতিবাজ) কে সংশোধন করা হয়। সমাজের অন্যান্য মানুষকে অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অপরাধ ও দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি রোধ, সাধারণ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। তাই এ শাস্তির যথার্থ প্রয়োগে একটি দেশ বা পৃথিবী হতে পারে শান্তির নীড়। নিম্নে এ শাস্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল-

১. সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হবার পূর্বে সাধারণ মানুষকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। এরপরও যদি অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়, তবে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজকে এমনভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে সে ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়। আর অন্যান্য সাধারণ মানুষকে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি কাজে লিপ্ত হতে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে।[১২] দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজ সংস্কারের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই নীতি অনুসরণ করে একজন বিজ্ঞ ইংরেজ বিচারক আসামীকে লক্ষ্য করে তাঁর রায়ে বলেন যে, æI don't punish you for

১০. অধ্যক্ষ এ.এ.এম মনরুজ্জামান; মো: হায়দার আলী, *জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী*, প্রাগুক্ত পৃ.২৯৫

১১. অধ্যক্ষ অলতাফ হোসেন, *জুরিস্প্রুডেন্স*, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৬

১২. ইবনুল হুমাম, *শরহে ফাতহুল কাদির মাআ তাকমিলাতি নাতাইজিল অফকার ফী কাশফির রুমুযি ওয়াল হিদায়া* (মাতবাআ আমিরিয়্যাহ, সংস্ক. ১,), খ. ৪, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

stealing the sheep but so that sheep may not be stolen.” অর্থাৎ দেখ, একটি ঘোড়া চুরি করার দায়ে তোমাকে ফাঁসি দেয়া হবে না, কিন্তু আর যেন ঘোড়া চুরি না হয়, সেই জন্যই আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি।

২. দেশের জনগণের কল্যাণ ও প্রয়োজনেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই শাস্তি কঠিন করলে যদি জনগণের অধিক কল্যাণ হয় তবে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। আর যদি শাস্তি সহজ ও হালকা করলেও জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করতে অসুবিধা না হয়, তবে তা সহজ হালকাভাবে করা যেতে পারে।[১৩]তবে অপরাধের শাস্তি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক করা হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অপরাধ ও দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং মানুষ নিরাপদ ও স্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে পারে। অন্যথায় শান্তি,শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে।

৩. অপরাধী ও দুর্নীতিবাজের অপরাধের মাত্রা যদি এতটা বেড়ে যায় যে, তাকে সমাজ থেকে সরিয়ে না দিলে কিংবা দূরে না রাখলে সমাজের মানুষের শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয়, তবে শান্তি রক্ষার্থে তাকে বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা কিংবা আমৃত্যু জেলে পুরে রাখা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।[১৪] যেমন হত্যার শাস্তি কিসাস হিসেবে হত্যা না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে হত্যাজনিত অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। আইনের ফাঁকে জঘন্যতম অপরাধ ও দুর্নীতি করেও বেঁচে যাওয়ার প্রবণতাই এসব অপরাধ ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান প্রবর্তিত হলে অনেকাংশে এসব অপরাধ ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৪. সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। আর এ ধরনের শাস্তি ব্যক্তিকে সংশোধন করা এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য প্রদান করা হয়, তা সবই শরী‘আত সম্মত। অতএব শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ও নির্ধারিত শাস্তিকে দৃষ্টান্তমূণক শাস্তি মনে করার কোন কারণ নেই। এর বাইরেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে পারে।[১৫] সরকার প্রয়োজন মনে করলে এ ধরনের অপরাধ নিবারনে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির বিধান সংবিধানে সংযোজন ও প্রয়োগ করে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। আর এ ধরনের শাস্তির দৃশ্য অবলোকন করে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজরা অপরাধ ও দুর্নীতি ত্যাগে অনুপ্রাণিত হবে।

৫. অপরাধী ও দুর্নীতিবাজকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার অর্থ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা নয়। এ শাস্তি দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হল তাকে সংশোধন করা এবং অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখা। শাস্তির ভয়াবহতা এমনভাবে প্রদর্শন করা যাতে সে যেন পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে বারণ করে। তাই যে বিচারক অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নির্দেশ দিবেন তার উচিত তাদের প্রতি ইহসান ও দয়া করা। একজন পিতা যেমন তার সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানোর জন্য শাস্তি দেন কিংবা একজন ডাক্তার রোগীকে আরোগ্য করার উদ্দেশ্যে কষ্ট দেন, তেমনি একজন বিচারক অপরাধীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এ শাস্তির নির্দেশ করবেন।[১৬]একইভাবে, হিন্দু শাস্ত্রকার Monu বলেন, æPenalty keeps the people under control, penalty protects them, penalty remains awake when people are asleep, so the wise have regarded punishment (Danda) as source of righteousness.”

১৩. আল মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল ওলায়াত* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ) পৃ. ২০৬; ইবনে ফারহুন আল-মালিকী, *তাবসিরাতুল হুকাম ফী উসূলীল আকাদিয়া ওয়া মানাহিজিল আহকাম* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, সংস্ক. ১, ১৪১৬ হি, খ.২), পৃ. ২৭১,২৭২

১৪. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবেদীন, *হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন* (বৈরুতঃ মাতবাআ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী,সংস্ক. ১, ১৯১৫, খ. ৫), পৃ.৪৮০

১৫. ইবনু আবেদীন, *হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৪৮০

১৬. আহমদ ইবনু তাইমিয়্যা, *আল-ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যাহ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), পৃ.১৭১

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের উম্মতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নমুনা :

আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে বহু নবী-রাসূলের যামানায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিকে তাদেরকৃত অপরাধ ও দুর্নীতির কারণে পাকড়াও করেছেন এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছেন। যেমন- নূহ (আ.) এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গে ও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যপরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামুদ জাতির একটি হৃদয় বিধারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংশ করে দেয়া হয়েছে। লূত (আ.) এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণে একে বাহরে মাইয়্যেত তথা মৃত সাগর, বাহরে লূত বলে।[১৭] হযরত মুসা (আ.) এর সময় ফিরাউন ও তার সৈন্য বাহিনী আল্লাহর তা'য়ালার অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য নীল নদে ডুবিয়ে সলিল সমাধি হয়েছে।

শাস্তির প্রকারভেদ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক) একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক থাকার দৃষ্টিতে শাস্তি চার প্রকার-

১. মৌলিক বা প্রকৃত শাস্তি : কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য শরী'আত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে মূলত যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- হত্যার জন্য কিসাস, চুরির জন্য হস্ত কর্তন ইত্যাদি।

২. বিকল্প শাস্তি : শরয়ী কোন কারণে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি যদি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তবে মূল শাস্তির পরিবর্তে যে শাস্তি প্রদান করা হয় তাই বিকল্প শাস্তি। যেমন কিসাস-এর বিকল্প দিয়াত, হদ্দ এর বিকল্প তা'যীর।

বিকল্প শাস্তি হিসেবে যা উল্লেখ করা হল বিকল্প শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তা প্রকৃত অর্থে মৌলিক ও প্রকৃত শাস্তি। যখন কঠিনতর শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, তখন তার পরিবর্তে বিকল্প শাস্তিই অন্য শাস্তির তুলনায় কঠিন। যেমন সাদৃশ ইচ্ছেকৃত হত্যার প্রকৃত শাস্তি হল দিয়াত। কিন্তু কিসাস-এর বিপরীতে এ শাস্তিকে বিকল্প শাস্তি হিসেবে মনে করা হয়। এমনিভাবে তা'যীর মূলত প্রকৃত শাস্তি। কিন্তু শরয়ী কোন কারণে যদি কিসাস বা হদ কায়েম করা না যায়, তখন তা'যীর হিসেবে যখন হত্যার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তা হবে বিকল্প শাস্তি।

৩. অনুগামী শাস্তি : এমন শাস্তি যার জন্য কোন ধরনের নির্দেশনা বিচারকের পক্ষ থেকে দেয়ার প্রয়োজন নেই। বিচারক অপরাধ সাব্যস্ত হলে শরী'আত নির্ধারিত মৌলিক শাস্তি নির্ধারণ করলেই তার অনুগামী হিসেবে আপনা আপনিই সে শাস্তি অপরাধীর উপর বর্তাবে। যেমনঃ হত্যাকরীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া। অর্থাৎ কোন হত্যাকারীর হত্যা প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এই মর্মে রায় দিলেন যে, তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। তিনি রায়ে একথা উল্লেখ করেননি যে, হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। এমতবস্থায়ও হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া মূল শাস্তি নয়, অনুগামী শাস্তি। এমনভিবে কোন ব্যক্তি অপবাদের শাস্তিতে দন্ডিত হলে সে অনুগামী শাস্তি হিসেবে সাক্ষ্যদানের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। বিচারকের পক্ষ থেকে সাক্ষ্যদানের অযোগ্য হিসেবে কোন রায় ঘোষণার প্রয়োজন নেই।

৪. পরিপূরক শাস্তি : বিচারক কোন অপরাধীর জন্য নির্ধারিত মূল শাস্তির পরিপূরক হিসেবে যে শাস্তির নির্দেশ দেন, তা হলো পরিপূরক শাস্তি। যেমন বিচারক কোন চোরের চুরি সাব্যস্ত হওয়ায় তার হাত কর্তনের

১৭. মুফতি মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন* (অনু.ও সম্পা.: মাওলানা মহী উদ্দীন খান, (মদীনা মুনাওয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প), পৃ. ৩৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

রায়-এর সাথে আরো নির্দেশ দিলেন যে, হাত কর্তনের পর তা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। গলায় ঝুলিয়ে রাখার কাজটি মূল শাস্তির বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। মূল শাস্তি বাস্তবায়নের পূর্বে এককভাবে এটি করার সুযোগ নেই। অনুগামী শাস্তি ও পরিপূরক শাস্তির দুটোই মূল শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। পার্থক্য হচ্ছে, অনুগামী শাস্তির বিষয়টি বিচারকের রায়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কিন্তু পরিপূরক শাস্তির ক্ষেত্রে তা বিচারকের রায়ে উল্লেখ করার আবশ্যকতা রয়েছে।[১৮]

খ) প্রয়োগের স্থানভেদে শাস্তি তিন প্রকার-

১. শারীরিক শাস্তি : এমন শাস্তি যা মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয়। যেমন মৃত্যুদন্ড, বেত্রাঘাত ও জেল ইত্যাদি।

২. মানসিক শাস্তি : এমন শাস্তি যা মানুষের মনে দাগ কাটে, শরীরের উপর বর্তায় না। যেমন উপদেশ, ধমক, ভর্ৎসনা ইত্যাদি।

৩. অর্থনৈতিক শাস্তি বা অর্থদন্ড : এমন শাস্তি যা অপরাধীর মালের উপর বর্তায়। ফলে সে কষ্ট পায়। যেমন দিয়াত, জরিমানা ইত্যাদি।

গ) যে সব অপরাধের উপর ভিত্তি করে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়, তার ভিত্তিতে শাস্তি চার প্রকার-[১৯]

প্রথমত হদ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। হুদূদ শব্দটি 'হদ্দ' এর বহু বচন। এর আভিধানিক অর্থ বাধা দান বা বারণ করা। দু বস্তুর মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধককেও হদ্দ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে সীমানা, পরিধি ও প্রান্তভাগ প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহার করা হয়।[২০]সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যা মানুষকে কোন কিছু থেকে মানুষকে বারণ করে রাখে তাকে হদ্দ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে আরবীতে দারোয়ান ও কারারক্ষীকে হাদ্দাদ বলা হয়। কেননা তাদের একজন অপরিচিত কাউকে বাইর থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। অপরজন কয়েদীদেরকে ভেতর থেকে বাইর যেতে বারণ করে।আর 'হুদূদুল্লাহ' বলতে আল্লাহ তা'য়ালার নিষিদ্ধ বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' হল কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।

হানাফীগণের মতে, হদ্দ হল আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রবর্তিত শরী'য়াতের সুনির্ধারিত শাস্তি।[২১] শাফি'ঈদের মতে, হদ্দ হল যে সব অপরাধের জন্য আল্লাহর কিংবা কোন মানুষের অধিকার অথবা একসাথে আল্লাহ ও মানুষের অধিকার বিঘ্নিত হয়, সে সব অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তি।[২২]এ ধরনের শাস্তিসমূহে বান্দাহর অধিকারের চাইতে আল্লাহর অধিকারের বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল ধরা হয়। এ কারণেই কিসাসকে হদ্দ বলা হয় না। কেননা এতে আল্লাহর অধিকারের চাইতে বান্দাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। অনুরীপভাবে তা'যীরকেও হদ্দ বলা হয় না। কেননা এটা সুনির্ধারিত নয়। কারো কারো মতে, কিসাস হদ্দের অন্তর্ভূক্ত তাদের মতে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শরী'আতের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহই হল হুদূদ। চাই তা আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য ফরয করা হোক কিংবা বান্দাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য করা হোক।[২৩] কেননা হদ্দের আওতাভূক্ত অপরাধগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শাস্তি কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। শরী'আতের হদ্দগুলো হল- চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তি। তবে কোন কোন ফকীহ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকে হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৮. আব্দুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৬৩২-৬৩৩

১৯. আব্দুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৬৩২-৬৩৪

২০. ইব্রাহীম মুস্তফা গং, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (ইউ. পি : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, দেওবন্দ) পৃ. ১৬০

২১. আবু বকর মুহাম্মদ সারাখসী, *আল-মাবসূত* (দারুল মা'আরিফাহ), খ. ৯, পৃ. ৩৬

২২. আল-জুমাল, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব* (দারুল ফিকর), খ. ৫, পৃ. ১৩৬

২৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, কোন কোন হদ্দ সাধারণত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইন নির্মম। কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করার অধিকারীও নয়। কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তদুপরি অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলেও হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে।
স্মতব্য যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তেও অনুপস্থিতির কারণে হদ্দ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এ নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র বা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে সাধারণ দন্ড দেবেন। যেমন চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে; কিন্তু এমনতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং অবস্থানুযায়ী সাধারণ অন্য কোন দন্ড দেয়া হবে। **দ্বিতীয়ত** কিসাস ও দিয়াত সংক্রান্ত নির্ধারিত শাস্তি।

কিসাসের পরিচয় : কিসাসের শব্দটি ক্বাস (قص) শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ কর্তন করা বা সমতা।[২৪] ইসলামের পরিভাষায় ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানী কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তি স্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা। অথবা, অপরাধী যে পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তদ্রুপ পদ্ধতিতে তাকে শাস্তি বিধান করার নাম কিসাস।[২৫] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[২৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।"[২৭]এ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিধৃত হলেও যেহেতু এ আয়াতটি মানসূখ হবার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলীল নেই, সেহেতু আয়াতের বিধান মুসলমানদের জন্যও সমভাবে কার্যকর।[২৮] কিসাস সাব্যস্ত হবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো, তার পরিবার-পরিজন দুটো বিধানের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয়তো দিয়াত গ্রহণ করবে কিংবা

---

২৪. আল-মুজামুল ওয়াসিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০; ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪১

২৫. ان يعاقب المجرم بمثل فعله আব্দুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৬৬৩

২৬. يايها الذين امنوا كتب عليكم القساص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باجسان- ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم- ولكم فى القصاص حيوة ياولى الالباب لعلكم تتقون- (আল-কুরআন, ২: ১৭৮-১৭৯)

২৭. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص- فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون- (আল-কুরআন, ৫: ৪৫)

২৮. আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *আল-বদা'ইয়ুস সনা'ই* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ. ৭, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

তার কিসাস গ্রহণ করা হবে।"[২৯]এছাড়াও কিসাস ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[৩০]ইসলামী আইনে মানুষের জন্য কিসাস বিধিবদ্ধ করে দেয়ার পেছনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যৌক্তিকতা রয়েছে। কিসাস সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ একটি বিধান। এতে হত্যার পরিবর্তে হত্যার এবং আঘাতের বিপরীতে সমপরিমাণ আঘাত দেয়ার অধিকার বিচারককে প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে অধিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। কারণ, পাশবিক শক্তি দ্বারা তাড়িত ব্যক্তি কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য কাউকে খুন করলে কিংবা আহত করলে তার উপর কিছুটা দেরীতে হলেও সমপরিমাণ শাস্তি আরোপিত হবে মর্মে যখন সে জানতে পারবে, তখন সে আর হত্যা বা আহত করার পথে পা বাড়বে না। যদি কিসাসের বিধান না থাকত তবে অপরাধী আরো বেপরোয়া হয়ে ব্যাপকভাবে অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে।

আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও দেখতে পাই যে, মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছে হল অন্যের উপর বিজয়ী হওয়া। অন্যের উপর নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা। অন্যকে দমনের জন্য সকল পথ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে হত্যা করা। কিন্তু যখনই সে জানতে পারবে যে, তার এই বিজয় একান্ত সাময়িক। এ অন্যায়ের ফলে কিছু সময় পরই তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে, তবে অপরাধী অপরাধ থেকে বিরত থাকবে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। কিসাসের ফলে সমাজে হত্যা, খুন, আহত করার মত ঘটনা হ্রাস পায়। এ ধরনের বিচারের ফলে (কিসাসের মাধ্যমে) কিছু অপরাধীর প্রাণ সংহার হলেও এর মাধ্যমে ঐসব অপরাধীর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকলেও প্রাণ দিতে হত। তাই কিসাসকে বাহ্যত দৃষ্টিতে কিছুটা অমানবিক ও কঠিন বিচার মনে হলেও প্রকৃত অর্থে এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উপযোগী ও সমাজের কল্যাণকর একটি বিচার।

কিসাস ওয়াজিব হবার জন্য হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তি, হত্যার কাজ এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। এ শর্তাবলীর কোন একটি যদি পাওয়া না যায়, তবে কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তবে যে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে চারটি শর্ত পূরণ হতে হবে।

ক. হত্যাকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাই শিশু ও পাগল থেকে কিসাস গ্রহণ কর যাবে না। কারণ, কিসাস হলো শাস্তি। শিশু ও পাগল শাস্তির যোগ্য নয়। শাস্তি অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। শিশু ও পাগলের কাজকে অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না। এমনিভাবে ওজর বশত যিনি হুঁশ হারিয়েছেন, যেমন ঘুমন্ত ও বেহুঁশ ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তবে মাতাল ব্যক্তি থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। কারণ, মাতাল ব্যক্তি শরীআতের বিধান মানতে বাধ্য যা পাগল ও শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

খ. হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তিকে হত্যার ইচ্ছা থাকতে হবে। তাই হত্যার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ যদি নিহত হয় তবে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না।

গ. সন্দেহাতীতভাবে হত্যাকারীর হত্যার ইচ্ছার বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে।

ঘ. হানাফীদের মতে স্বেচ্ছায় হত্যাকারী কিসাস দিতে হবে। জবদস্তিমূলক কারণে হত্যাকারীদের কিসাস দেয়া যাবে না।

---

২৯. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يودى واما يقاد- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৩, পৃ. ১৬৫; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, খ. ২, পৃ. ৯৮৮-৯৮৯

৩০. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশ্ক, দারুল ফিকর, সংস্ক. ২, ২০০৯) খ. ৬, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ইমাম যুফারের মতে, জোরজবরদস্তির কারণে হত্যাকারীকে কিসাস দেয়া যাবে।[৩১]হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করার জন্য নিহত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে-

১. নিহত ব্যক্তি পবিত্র ও নিরাপরাধ হতে হবে– যাকে হত্যা করা শরীআত হারাম। তাই কোন মুসলমান যিম্মী, কাফির, মুরতাদ, বিবাহিত ব্যভিচারী, বিদ্রোহী ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময়ে কিসাস দেয়া যাবে না।

২. নিহত ব্যক্তির সাথে হত্যাকারীর পিতৃত্বের সম্পর্ক থাকতে পারবে না। তাই সকল ইসলামী আইনজ্ঞের মতে কোন পিতা, দাদা, নানা, মা, দাদী, ও নানীর কেউ যদি তাদের নিজের সন্তান বা নাতি, নাতনিকে হত্যা করে, তবে তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য মালিকীগণ বলেন, যদি পিতা বা দাদা ইত্যাদি কারো নিজ সন্তানকে হত্যার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার শেখানোর কোন সম্পর্ক না থাকে এবং হত্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রমাণিত হয়, তবে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। আর যদি সন্তান তার মা-বাবা কিংবা তদূর্ধ্ব কাউকে হত্যা করে, তবে এ হত্যাকারী সন্তান থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে মর্মে সকল ইসলামী বিশেষজ্ঞ একমত।

৩. মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণের মতে ধর্ম ও স্বাধীনতার দিক থেকে নিহত ও হত্যাকারীর মধ্যে সমতা থাকতে হবে। তাই কোন মুসলিম যদি কাফিরকে হত্যা করে কিংবা কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন দাস বা দাসীকে হত্যা করে, তবে ঐ মুসলিমা ও স্বাধীন হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না; দিয়াত গ্রহণ করতে হবে। তারা তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কাফির হত্যার বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।"[৩২]রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, "মুসলমানদের রক্তের মর্যাদা পরস্পর সমান। তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন তাদের যিম্মায় থাকে। আর কোন মুসলমানকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।"[৩৩]রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, "কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।"[৩৪]

হানাফী মাযহাবের মতে, কিসাস গ্রহণের জন্য ধর্ম ও স্বাধীনতার সমতার শর্ত করা যাবে না। এখানে মানুষ হিসেবে সমতার বিষয়টি মূখ্য। কারণ, যে আয়াতে কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে সকল মানুষ প্রযোজ্য। কারো পার্থক্য করা হয়নি। সেখানে আল্লাহ বলেছেন, "হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারে।"[৩৫]আল্লাহ তা'য়ালা আরো

---

৩১. আবুল ওয়ালীদ ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ* (বৈরুত, ১৯৮১), খ. ২, পৃ. ৩৮৮; আল বাহুতি, *কাশশাফুল কিনা*, খ. ৫, পৃ. ৬০৬

৩২. لا يقتل مسلم بكافر মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল- বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮; সুলায়মান আবি দাঊদ, *আস- সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৮

৩৩. المسلمون تتكافا دما ءهم-ويسعى بذمتهم ادناهم- ولا يقتل مؤمن بكافر- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯

৩৪. لا يقتل حر بعبد - আলী দারাকুতনী, *আস- সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৩

৩৫. يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان- ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم- ولكم فى القصاص حيوة ياولى الالباب لعلكم تتقون- (আল-কুরআন, ২: ১৭৮-১৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

বলেন,"আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম।"[৩৬]আর হত্যাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ- হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, হত্যার কাজটি সরাসরি করতে হবে; কোন মাধ্যম গ্রহণ করে হত্যা করা হলে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মানুষ চলাচলের রাস্তায় সরকারি অনুমতি ব্যতীত গর্ত করায় তাতে পতিত হয়ে কেউ মারা গেল। অন্যান্য আলিমদের মতে, সরাসরি হত্যা শর্ত নয়। সরাসরি হত্যা না করলেও কিসাস গ্রহণ করা যাবে।

অতঃপর নিহতের অভিভাবকের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ- হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কারা তা জ্ঞাত থাকতে হবে। যদি তা জানা না থাকে তবে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য অন্য ইমামগণ তাদের সাথে ভিন্নমত পেশ করেছেন।[৩৭]

বিচারক কিসাসের রায় ঘোষণার ব্যাপারে ৬টি প্রতিবন্ধকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন :

ক. সন্তানকে বাবা হত্যা করলে তার পিতৃত্ব তাকে মৃত্যুদন্ড দানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

খ. সমতা না থাকা; তাই কোন মুসলিম কাফিরকে হত্যা করলে কিংবা কোন ক্রীতদাস স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে উভয়ের মধ্যে দীন ও স্বাধীনতার অসমতা কিসাসের জন্য প্রতিবন্ধক।

গ. সরাসরি হত্যা না করে কোন মাধ্যম গ্রহণ করে হত্যা করলে তা কিসাসের জন্য প্রতিবন্ধক।

ঘ. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হত্যাকৃত ব্যক্তির স্বজন কারা তা জানা না গেলেও কিসাস হবে না।

ঙ. হানাফী আইনবিদদের নিকট যদি কাফির রাষ্ট্রে হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না।

চ. একাধিক ব্যক্তি মিলে হত্যা করার বেলায় তাদের মধ্যে যারা সরাসরি হত্যার কাজে জড়িত নয়, তাদের জন্য কিসাস প্রতিবন্ধক।[৩৮]

বিচারক স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর কিসাস এর রায় প্রদান করলে কে কার্যকর করবে এ ব্যাপারে আইনজ্ঞদের বক্তব্য হল– যদি কিসাসের হকদার একজন হন এবং তিনি বালেগ ও জ্ঞানী হন তবে তিনিই কিসাস বাস্তবায়নের জন্য হকদার হবেন। কারণ আল্লাহ বলেন, "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহয্যপ্রাপ্ত হয়েছে।[৩৯]

---

৩৬. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص- فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون- (আল-কুরআন, ৫: ৪৫)

৩৭. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ২৪০

৩৮. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৪; আল-কাসানী, খ. ৭, পৃ. ২৩৭

৩৯. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا- (আল-কুরআন, ১৭:৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

আর যদি কিসাসের হকদার পাগল কিংবা নাবালক হয়, তবে বিচারক তার পক্ষে কিসাস বাস্তবায়ন করবেন এটাই অধিকাংশ আইন বিশারদের অভিমত।[৪০]অনেকে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে নাবালকের বালেগ হওয়া এবং পাগলের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিচারক তার প্রতিনিধি হিসেবে কিসাস বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।[৪১]যদি স্বজনদের সংখ্যা একাধিক হয় এবং তারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী হয়, তবে তাদের যে কোন একজন কিসাস প্রয়োগের কাজ সম্পন্ন করবেন।

আর যদি ওয়ারিসদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্ত, জ্ঞানী ও পাগল মিশ্রিত থাকে, এমতাবস্থায় নাবালক ওয়ারিসের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং পাগলের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। বড় ও জ্ঞানীরাই তাদের পক্ষে কিসাস প্রয়োগ করবেন। তবে অনুপস্থিত স্বজনের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত কিসাস স্থগিত থাকবে। কারণ তার ক্ষমা করার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে সন্দেহের দিকটি স্পষ্ট। সন্দেহ অবস্থায় কিসাস সাব্যস্ত করা যাবে না। এটা হানাফী ও মালিকী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মত। আর হানাফী মাযহাবের একটি অংশ, শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের আলিমদের মতে, স্বজনদের সকলে উপস্থিত না থাকলে অন্যদের পক্ষ থেকে কেউ দায়িত্ব পালন করে কিসাস সাব্যস্ত করা যাবে না। এমনকি বাবা, দাদা বা রাষ্ট্র প্রধান ও ওয়ারিসের প্রতিনিধিত্ব করবে না।[৪২]

কিসাস বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দু'টি মত রয়েছে–

১. হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে যে পদ্ধতিতে হত্যা করুক না কেন, তার কিসাস হবে ধারালো তলোয়ার দ্বারা। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "একমাত্র তরবারি দ্বারাই কিসাস গ্রহণ করা হবে।" এটি হানাফী ও হাম্বলী বিশুদ্ধমত।[৪৩]

২. যদি কোন হারাম পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, যেমন মদ্যপান করিয়ে বা সমকামের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে ধারালো তরবারি দ্বারা কিসাস গ্রহণ করতে হবে।[৪৪] আর যদি হারাম পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে হত্যা কর হয়, তবে হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করেছে, তার বদলা বা কিসাস সে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। তাই খুনী পাথরের আঘাতে খুন করলে তার কিসাস পাথরের সাহায্যে হবে, ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে নয়। অবশ্য রাষ্ট্র প্রধান তরবারির মাধ্যম কিসাস গ্রহণ করা যদি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন তবে তা করাই ভাল। মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের আইনজ্ঞগণ এ মত পোষণ করেন।[৪৫] প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, আল্লাহর বাণী, "তোমরা যদি শাস্তি দাওই, হবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।"[৪৬]

---

৪০. আল-কাসানী, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ২৪৩

৪১. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮১

৪২. আল-কাসানী, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ২৪৩

৪৩. -لاقود الا بالسيف মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরবী), খ. ৭, পৃ. ৭৪০

৪৪. ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৩৯৬

৪৫. আল-মুগনী, *আল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ৪৪

৪৬. -وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (আল-কুরআন, ১৬ : ১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন : "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ"।[৪৭]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যারা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের শাস্তি আগুনে পুড়িয়ে আর যারা পানিতে চুবিয়েছে, তাদের আমরা পানিতে চুবাবো।" তাদের যুক্তি হল, কিসাস মানেই সমতা। তাই যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, সে পদ্ধতিতেই তার কিসাস হলে সমতা হয়।[৪৮]যে সব কারণে কিসাস রহিত করা হবে তা হলোঃ

ক. কোন কারণে আসামীর মৃত্যু হয়ে থাকলে কিসাস রহিত হবে। চাই সে মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হোক কিংবা অন্যায়ভাবে হত্যার শিকার হোক কিংবা ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করা হোক। কারণ, যার উপর কিসাস কার্যকর করা হবে, তিনিই যখন নেই তখন কিসাস রহিত না করার কোন সুযোগ নেই। খুনের আসামী মারা গেলে তার উপর থেকে দিয়াত রহিত হবার ব্যাপারে সকল আইনজ্ঞ একমত। এমতাবস্থায় আসামীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে কিনা সে ব্যাপারে ইসলামী আইনজ্ঞগণ দু'ধরণের মত পেশ করেছেন। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞগণের এবং শাফিঈ মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতে, আসামী মারা যাবার কারণে কিসাস রহিত হয়ে গেলে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে না। কারণ কিসাস হল নির্দিষ্ট করা একটি অবধারিত শাস্তি। আসমীর মৃত্যুর কারণে অবধারিত সে বিষয়টি রহিত হয়ে গিয়েছে। তাকে আর অন্য কোন শাস্তি দেবার সুযোগ নেই। আর আসামীর সন্তুষ্টি ও আগ্রহ ব্যতীত নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের দিয়াত গ্রহণের কোন বিধান হতে পারে না।[৪৯]আর হাম্বলী ও শাফি'ঈদের একটি মতে, আসামীর মৃত্যুবরণ করার কারণে কিসাস রহিত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ইচ্ছে করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। কারণ খুনীর বিচারের ব্যাপারে দুটো বিষয়ের একটি ওয়জিব হবে। হয়তো কিসাস নয়তো দিয়াত। এ ক্ষেত্রে আসামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। তাই তার মৃত্যুবরণ করার কারণে যখন কিসাস রহিত হয়ে গেল তখন তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হতে কোন বাধা নেই।[৫০]

খ. যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক খুনী আসামীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস রহিত হবে। কিসাস কার্যকর করার চেয়ে ক্ষমা করে দেয়া ইসলামী আইনে উত্তম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[৫১]রাসূলুলুল্লাহ (স.) বলেন,"কোন ব্যক্তি তার প্রাপ্য যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"[৫২]

---

৪৭. - جزاء سيئة سيئة مثلها (আল-কুরআন, ৪২: ৪০)

৪৮. ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৩-২৮৪

৪৯. আদ-দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ-৭, পৃ. ২৮৬

৫০. মুহাম্মদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪৮; মানছুর আল-বাহুতি, *কাশ্শাফুল কিনা*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)খ.৫, পৃ. ৬৩৩

৫১. يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان- ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم- ولكم فى القصاص حيوة ياولى الالباب لعلكم تتقون- (আল-কুরআন, ২ : ১৭৮-১৭৯)

৫২. ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله به عزا- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল- মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৭২০৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট কিসাস সংক্রান্ত কোন মামলা উত্থাপন হলেই তিনি তা ক্ষমা করে দিতে নির্দেশ দিতেন।"[৫৩]ক্ষমা করার অর্থ হল কোন ধরনের আর্থিক বিনিময় ছাড়া আসামীকে ক্ষমা করা। যদি দিয়াত গ্রহণ করার বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়, তবে তাকে ক্ষমা না বলে সন্ধি বলতে হবে। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞগণ এ মত পোষণ করেন। আর শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ বলেন, দিয়াত গ্রহণ করে হোক আর না করে হোক, কিসাস থেকে অব্যাহতি দিলেই তাকে ক্ষমা বলা হবে।[৫৪] আর ক্ষমা করার জন্য ক্ষমাকারী যে শব্দাবলী ব্যবহার করবে তা হল ক্ষমার রুকন বা ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে সে বলবেঃ আমি ক্ষমা করলাম, আমি রহিত করলাম, আমি দায়মুক্ত করলাম, আমি হেবা বা দান করলাম ইত্যাদির কোন একটি শব্দ বলা।[৫৫] অতঃপর ক্ষমা কার্যকর করার জন্য দুইটি শর্ত পূরণ হতে হবে–

১. ক্ষমাকারীর প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

২. ক্ষমাকারীর ক্ষমা করার অধিকারী হতে হবে। যার ক্ষমা করার মত অধিকারই নেই, সে ক্ষমা করে দিলেও ক্ষমা কার্যকর করা যাবে না।[৫৬]আর এ ক্ষমা সংক্রান্ত বিধানাবলী নিম্নরূপ-

ক. হানাফী ও মালিকী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ ক্ষমা করে দিলে তারা হত্যাকারী থেকে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। এমনকি দিয়াতও গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের নিকট ক্ষমা মানেই হল কোন বিনিময়ে ছাড়া ক্ষমা। যদি দিয়াত কিংবা কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ হত্যাকারী থেকে গ্রহণ করতে চান তবে তা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন। তখন আর তাকে ক্ষমা করা হয়েছে বলা যাবে না, বরং সন্ধি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। আর শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের আইনাজ্ঞদের মতে, যদি দিয়াত গ্রহণ করেও ক্ষমা করা হয়, তাহলে তাকেও ক্ষমা বলা হবে। যদি ক্ষমা করার সময় ক্ষমাকারী দিয়াত দেয়া বা না দেয়া সংক্রান্ত কোন মন্তব্য না করে, তবে শাফি'ঈদের মতে দিয়াত দিতে হবে না। আর হাম্বলীদের মতে দিয়াত দিতে হবে।[৫৭]

খ. যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক একজন হন আর তিনি ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করেন, তবে ক্ষমাকৃত ব্যক্তির রক্ত পবিত্র ও নিরাপদ রক্ত বলে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় যদি ক্ষমাকারী অভিভাবক তার ক্ষমাকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ক্ষমাকৃত ঐ খুনীকে হত্যা করে, তবে হানাফী ও মালিকীদের মতে হত্যাকারী রাজী হলে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক একাধিক হয় আর তাদের একজন হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন, তবে হত্যাকারী থেকে কিসাস রহিত হবে। কারণ, কিসাস এমন একটি জিনিস যা বিভক্ত করা যায় না। কিসাসের কোন অংশ পরিমাণ দিয়াত দিতে হবে। মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, একাধিক অভিভাবক থাকা অবস্থায় যদি এমন একজন অভিভাবক ক্ষমা করেন যিনি মর্যাদা ও আত্মীয়তার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় উপরে, তবে কিসাস রহিত হবে। যদি ক্ষমাকারীর মর্যাদা অন্যদের চেয়ে নিম্নে হয় তবে কিসাস রহিত হবে না।

---

৫৩. ما رفع الى رسول الله صلعم امر فيه القصاص الا امر فيه بالعفو- সুলায়মান আবূ দাঊদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৪৪৯৯

৫৪. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪; মুহাম্মদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯

৫৫. عقوت او اسقطت او ابرات او وهبت- আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৪৬

৫৬. ইবনে রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ২৯৪

৫৭. আদ-দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

যদি এমন হয় যে, একাধিক অভিভাবকের মধ্য থেকে একজন ক্ষমা করেছেন বটে কিন্তু অন্য একজন খুনীকে হত্যা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, হত্যাকারীকে কিসাস দেয়া যাবে না। কারণ, তার হত্যার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ। হতে পারে এই হত্যাকারী তারই নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে খুনীকে ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়টি জানে না। অথবা ক্ষমার বিষয়টি জানে তবে এই অবস্থায় খুনী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যে হারাম তা জানে না। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, ক্ষমার বিষয়টি না জানলে ভিন্ন কথা। জানার পর হত্যা করা হলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে।[৫৮]

গ. নিহত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবকের পক্ষ থেকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে কিসাস ছাড়াও অন্য কোন শাস্তি দিতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে হানাফী ও মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞগণ বলেন : অভিভাবকের ক্ষমা করার পরও রাষ্ট্র প্রধান তা'যীর হিসেবে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন। তা'যীর হিসেবে তার জন্য যে কোন ধরনের শাস্তি দেবার অধিকার সংরক্ষণ করেন। কারণ, হত্যাকান্ডের সাথে দু' ধরণের হক জড়িত-

১. আল্লাহর হক (সমাজ ও জনসাধরণের হক) ও

২. নিহত ব্যক্তির হক।

ক্ষমা করার মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির হক থেকে হত্যাকারী দায়মুক্ত হলেও আল্লাহর হক থেকে দায়মুক্ত হয়নি। এ ব্যাপারে মালিকীদের বক্তব্য হল, রাষ্ট্র প্রধান তা'যীর হিসেবে যাচ্ছে তাই শাস্তি দিতে পারবেন না। তিনি সীমিত আকারে সর্বোচ্চ ১০০বেত্রাঘাত বা একবছর কারাদন্ড দিতে পারবেন।[৫৯]আর শাফি'ঈ ও হাম্বলীদের মতে, যদি হত্যাকারীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে তার উপর রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে অন্য কোন শাস্তি বিধান করা বাধ্যতামূলক নয়।[৬০] ইমাম মাওয়ারদী বলেন, শাফি'ঈ মাযহাবের প্রণিধানযোগ্য মত হল, কিসাস ক্ষমা করে দেয়ার পরও রাষ্ট্রপ্রধান শাস্তি দিতে পারবেন।[৬১]

ঘ. নিহত ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তার হত্যাকারীকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে যান, যেমন কোন এক ব্যক্তিকে আহত করা হল। সে বলল, আমি যদি এ আঘাতের কারণে মারা যাই তবে হত্যাকারী দায়মুক্ত হবে। তাকে আমি ক্ষমা করে গেলাম। এমতাবস্থায়, হানাফী, শাফি'ঈ মাযহাবের আইনজ্ঞদের নিকট ঐ হত্যাকারীর কিসাস রহিত হবে। নিহতের ওয়ারিসগণ দিয়াত দাবি করতে পারবেন না। কারণ, নিহত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার হক রহিত করে গিয়েছেন।আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন,"অতএব কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।"[৬২]আর মালিকী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, যদি নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে সুস্থ থাকা অবস্থায় বলে যে, যদি তুমি আমাকে হত্যা কর তবে তুমি দায়মুক্ত হবে কিংবা তাকে আহত করার পর এবং হত্যার আয়োজন সম্পন্ন করার পূর্বে বলে যে, তোমাকে আমার রক্ত হরণের দায় থেকে

৫৮. মুহাম্মদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮; মানছুর আল-বাহুতি, *কাশ্‌শাফুল কিনা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ. ৫, পৃ. ৬৩৩

৫৯. আদ-দারদীয়, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ- ৪, পৃ. ২৬১; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৮

৬০. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ৩, পৃ. ২৯৬; মুহাম্মদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১

৬১. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭৪৫

৬২. فمن تصدق به فهو كفارة له- (আল-কুরআন, ৫: ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত করে গেলাম। এমতাবস্থায় হত্যাকারীকে দায়মুক্ত করা যাবে না। নিহতের হকদাররা কিসাস গ্রহণ করবেন। কারণ, এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি কিসাস ওয়াজিব হবার পূর্বেই হক রহিত করে গিয়েছেন। তবে যদি নিহত ব্যক্তি হত্যাকারী কর্তৃক তাকে হত্যার সকল আয়োজন সম্পন্ন করার পর বলেন যে, আমি মারা গেলে তুমি দায়মুক্ত হবে। তোমাকে আমি দায়মুক্ত করে গেলাম। এমতাবস্থায় কিসাস রহিত হবে। কারণ, সে ওয়াজিব হবার পর তা রহিত করেছে।[৬৩]

৩. যেসব কারণে কিসাস রহিত হয় তার অন্যতম হল সন্ধি। সকল ইসলামী আইনজ্ঞের ঐকমত্যে সন্ধির মাধ্যমে কিসাস রহিত হবে। কত পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে নিহত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক ও আসামীর মধ্যে সন্ধি হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। সম্পদ দিয়াতের সমপরিমাণ হতে পারে কিংবা কম-বেশি হতে পারে। নগদ কিংবা বাকীও হতে পারে। দিয়াত জাতীয় সম্পদ দ্বারা ও হতে পারে আবার অন্য সম্পদ দ্বারা ও হতে পারে।[৬৪]ইসলামী আইনে সন্ধির প্রতি ব্যাপক উৎসহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়" ।[৬৫]রাসূলুলুল্লাহ (স.) বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করা বৈধ। তবে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার জন্য সন্ধি করা যাবে না।"[৬৬]সন্ধির বিধানাবলী ক্ষমার বিধানবলীর অনুরূপ। ক্ষমা করার ফলে কিসাসের ক্ষেত্রে যেসব প্রভাব পড়ে, সন্ধির ক্ষেত্রেও তাই। ইসলামী আইনজ্ঞগণ আর একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যদি নিহত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক নাবালেগ হয় কিংবা পাগল হয় কিংবা রাষ্ট্র নেয়, তবে দিয়াত সমপরিমাণ সম্পদের কমে সন্ধি করা বৈধ হবে না।[৬৭]

৪. যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক নিজেই কিসাসের হকের ওয়ারিশ হয়। যেমন : এক ব্যক্তির উপর কিসাস ওয়াজিব হল, তখন যে কিসাসের হকদার সে মারা গেল অমনি হত্যাকারী কিসাসের পূর্ণ উত্তাধিকার কিংবা আংশিক উত্তরাধিকার কিংবা হত্যাকারী থেকে যার কোন কিসাসের হক নেই, তার ওয়ারিস হয় ছেলে। এমন অবস্থায় কিসাস রহিত হয়। কিসাসের ওয়ারিস হবার ক্ষেত্রে দু'টি ধরন হতে পারে।

ক. হত্যাকারীর কিসাসের ওয়ারিস হবার উদাহরণ হল : কোন ছেলে তার বাবাকে হত্যা করল। হত্যাকারী ছেলের একটি ভাই ব্যতীত আর কোন ওয়ারিস নেই। অতঃপর কিসাসের হকদার একমাত্র ভাইটি মারা গেল। এখন মৃত ভাইয়ের একমাত্র ওয়ারিস হিসেবে ঐ ভাই জীবিত আছে, যে বাবার হত্যাকারী। এমতাবস্থায় বাবার হত্যাকারী থেকে কিসাস রহিত হবে। কারণ, কিসাস বিভক্ত করা যায় না। আর এমন ব্যক্তির উপর কিসাস বাস্তবায়ন করা যায় না যে একই সাথে আবার বিবাদী। এমনিভাবে অংশবিশেষ ওয়ারিস হলেও কিসাস বাস্তবায়ন করা যাবে না।

খ. এমন ব্যক্তির কিসাসের ওয়ারিস হওয়া যার হত্যাকারী থেকে কিসাসের হক নেই। এর উদাহরণ হল-পিতামাতার দুইজনের একজন অন্যজনকে হত্যা করল। তাদের একটি মাত্র সন্তান (ছেলে হোক বা মেয়ে

৬৩. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৬৪. আদ-দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪০

৬৫. والصلح خير (আল-কুরআন, ৪:২২৮)

৬৬. الصاح جئز بين المسلمين الا احل حرما او حرم حلالا (সুলয়মান আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* নং ৩৫৯৬

৬৭. আদ- দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ২৮৫; আল-হাসকীফী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

হোক)। এমতাবস্থায় কিসাস রহিত হবে। কারণ, একমাত্র সন্তানই হল এ অবস্থায় কিসাসের হকদার। ইসলামী আইনে যদি বাবা সন্তানকে হত্যা করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয় না। রাসূলুল্লহ (স.) বলেছেন, “সন্তানের জন্য পিতার উপর কিসাস নেয়া হবে না।” এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে সন্তানের জন্য সে পিতা বা মাতাকে কিসাস দেয়া যাবে যে নিজের সন্তানকে নয় বরং অন্য একজনকে হত্যা করেছে।[৬৮]

দিয়াতের পরিচয় :

দিয়াত শব্দটির প্রতিশব্দ আকল। ইসলামী আইনের পরিভাষায় দিয়াত হল, “মানুষের জীবন বা জীবনের আওতায় পড়ে এমন কিছুর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য আর্থিক দন্ড।”[৬৯]দিয়াত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা ধারা সাব্যস্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়াত ওয়াজিব করে বলেন, “কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গের রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয় যদি না তারা ক্ষমা করে।”[৭০] আয়াতটি শুধুমাত্র ভুলক্রমে হত্যার ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও তা সব ধরনের হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে মর্মে আলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[৭১]

কিছু কিছু হত্যার শাস্তি হিসেবে ইসলামী আইনে দিয়াতকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : “কোন ব্যক্তি যদি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করে আর তা প্রমাণিত হয়, তবে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। তবে নিহত ব্যক্তির স্বজনরা যদি ক্ষমা করে, তবে দিয়াত। আর প্রাণের বিনিময়ে দিয়াতের পরিমাণ হল একশত উট..।[৭২]ইসলামী আইনজ্ঞগণ দিয়াত একটি শরী'আত সম্মত শাস্তি হবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৭৩]দিয়াতের হদ্দ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ। সাধারণভাবে বলা যায়, এর পরিমাণ হল একশত উট। একশত উট হল পূর্ণ দিয়াত। আলোচনার ক্ষেত্রে কোথাও যদি শুধু দিয়াত শব্দ উল্লেখ করা হয়, তবে পূর্ণ দিয়াত বা (১০০) একশত উট বুঝায়। আর দিয়াত দুই ধরনের হতে পারেঃ

ক. দিয়াত মুগাল্লাজা : ইচ্ছাকৃত হত্যা বা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য এ দিয়াত প্রযোজ্য।

খ. দিয়াত মুখাফ্‌ফাফা : ভুলবশত ও কারণবশত হত্যার জন্য এ দিয়াত প্রযোজ্য। দিয়াত মুগাল্লাজা কিংবা মুখাফ্‌ফাফা হওয়ার বিষয়টি উটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে উটের বয়স ও মানের উপর। অর্থাৎ বিচারক যদি ইসলামী আইনের ভিত্তিতে কোন হত্যাকারীর শাস্তি হিসেবে দিয়াত মুখাফ্‌ফাফা ধার্য করে, তবে তাতেও তুলনামূলক নিম্নমানের এবং কম বয়সের একশতটি দিতে হবে।[৭৪]

---

৬৮. মুহাম্মদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮; ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৬৮

৬৯. আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী, *আদ-দুররুল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৬

৭০. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا- (আল-কুরআন, ৪ : ৯২০)

৭১. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯৯

৭২. ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان فى النفس ماة من الابل- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১০

৭৩. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯৯

৭৪. আবদুল কাদের আওদাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭১

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফাসহ অধিকাংশ ইসলামী আইনজ্ঞের মতে দিয়াত উট, স্বর্ণ ও রৌপ্য এ তিন প্রকারের যে যে কোন এক প্রকার দ্বারা হতে পারে। উটের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য "মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত হল একশত উট।"[৭৫]ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে দিয়াত ছয় প্রকারের হতে পারে: মৌলিকভাবে উট, এছাড়াও স্বর্ণ মালিকগণ এক হাজার দীনার, রৌপ্যের মালিক বার হাজার দিরহাম, গরুর মালিক দুইশত গরু, ছাগলের মালিক দুইহাজার ছাগল এবং পোশাকের মালিক উন্নতমানের দুইশত পোশাক দিয়াত হিসেবে প্রদান করবে।"[৭৬]হানাফী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, দিয়াত ওয়াজিব হবার দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে–

১. নিহত ব্যক্তি শরীআতের দৃষ্টিতে পবিত্র ও নিরপরাধ হতে হবে। এ শর্তের সাথে অন্যান্য আইনজ্ঞগণ একমত।

২. নিহত ব্যক্তি মূল্যবান হতে হবে। তাই হানাফীদের মতে, যুদ্ধরত কোন কাফির যদি তার দেশে ইসলাম গ্রহণ করে সেখানে থেকে যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত না করে, আর ভুলক্রমে হত্যাকারী কোন মুসলিম বা যিম্মী হয়, তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে না। ইসলাম, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া দিয়াত ওয়াজিব হবার জন্য কোন শর্ত নয়।[৭৭]শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে প্রহার করার ফলে, যেমন পিতা শরীআতসম্মত কোন ব্যাপারে শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে সন্তানকে প্রহার করল কিংবা ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমকে প্রহার করল কিংবা স্বামী তার স্ত্রীকে বেপরোয়া হবার কারণে বা সালাত আদায় না করার কারণে প্রহার করল কিংবা পিতার অনুমতি ছাড়া কোন শিক্ষক ছাত্রকে প্রহার করল আর তাতে কেউ মারা গেল, এমতাবস্থায় তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে আলিমদের দু'ধরনের মত রয়েছে–

ক. হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, এ অবস্থায় দিয়াত ওয়াজিব হবে। কারণ, উদ্দেশ্য হল আদব শেখানো ও ভয় দেখানো, ধ্বংস করা নয়। মারা যাবার কারণে প্রমাণিত হয় যে, শিষ্টাচার শেখানোর জন্য প্রহার করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়েছে। আর সীমালংঘনের কারণেই দিয়াত ওয়াজিব হবে।

খ. মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের মত অনুযায়ী এ অবস্থায় দিয়াত হবে না। যদি না তদন্তের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, শিষ্টাচার শেখানোর জন্য প্রহার করার সময় এমন বাড়াবাড়ি ছিল যার ফলে মারা যাওয়া সম্ভব। কারণ হল, আদব শেখানোর জন্য প্রহার করা শরীআতসম্মত ও মুবাহ। এ বৈধ কাজটি করতে গিয়ে প্রাণনাশ হওয়ায় দিয়াতের মত শাস্তি দেয়া যাবে না যেমনটি শাস্তি দেয়া যায় না হুদূদ ও তা'যীর বাস্তবায়নকারীকে।[৭৮]দিয়াতের ধরণ নির্ধারনে ইসলামী আইনজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। হানাফী, মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের প্রাক্তন মত অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার দ্বারা দিয়াত আদায় করা যাবে:

ক. উট; খ. স্বর্ণ; গ. রৌপ্য।

৭৫. - وان فى النفس الدية ماة من الابل ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ.* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১০

৭৬. ইমাম আবদুল্লাহ যাইলাঈ, *নাসবুর রায়াহ*, (মাতবুআতু মাজুলিসুস ইসলামী, সংস্ক. ২), খ. ৪, পৃ. ৩৬১

৭৭. আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৫২

৭৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাদের স্বপক্ষে হযরত আমর ইবন হাযম (রা.)এর লিখিত চিঠিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাতে বলেন : "মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত দিতে হবে আর তা হল একশত উট।"[৭৯]এ ছাড়া হযরত উমর (রা.) স্বর্ণের মালিকদের উপর এক হাজার দীনার এবং রৌপ্যের মালিকদের উপর দশ হাজার দিরহাম দিয়াত হিসেবে ধার্য করেছেন।[৮০]ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) এর মতে নিম্নবর্ণিত ছয় প্রকারের যে কোন এক প্রকার সম্পদ দ্বারা দিয়াত দেয়া যাবে। তা হল : (১) উট, (২) স্বর্ণ, (৩) রৌপ্য, (৪) গরু, (৫) ছাগল ও (৬) পোশাক। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হল হযরত উমর (রা.) এর বক্তব্য। তিনি একবার বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন : "জেনে রাখ, উটের দাম বেড়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি স্বর্ণের মালিকের উপর একহাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকের উপর বার হাজার দিরহাম, গরুর মালিকের উপর দু'শত গরু, ছাগলের মালিকের উপর দু'হাজার ছাগল এবং পোশাকের উপর দু'শত প্রস্থ দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করেন।"[৮১]

ইমাম শাফি'ঈর সর্বশেষ মতানুযায়ী, যদি উট পাওয়া যায় তবে একশত উটই হল মূলত দিয়াতের জন্য নির্ধারিত। হত্যাকারী দোষত্রুটি মুক্ত অবস্থায় তা হস্তান্তর করবে। যদি উট পাওয়া না যায় তবে একশত উটের সমপরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তাদের প্রমাণ হল : হযরত উমর (রা.) এর বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে আটশত দীনার এবং আট হাজার দিরহাম দিয়াত হিসেবে দেয়া হত। কিন্তু উমর (রা.) এর সময় উটের দাম বেড়ে যাওয়ার এক হাজার দীনার এবং বার হাজার দিরহামের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, "জেনে রাখ, উটের দাম বেড়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি স্বর্ণের মালিকের উপর একহাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকের উপর বার হাজার দিরহাম, গরুর মালিকের উপর দু'শত গরু, ছাগলের মালিকের উপর দু'হাজার ছাগল এবং পোশাকের উপর দু'শত গ্রস্থ দিয়াতের পরিমাণ ধার্য করেন।[৮২]উপরোলিখিত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, ইসলামী আইনজ্ঞগণ শুধুমাত্র রৌপ্যের পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর পরিমাণ নির্ধারণে বিরোধ করেননি। মোটকথা দিয়াতের পরিমাণ হল একশত উট বা একহাজার দীনার বা দশ হাজার দিরহাম (হাম্বলীদের নিকট) আর বার হাজার দিরহাম (জমহূরের নিকট) বা দু'শত গরু বা দু'হাজার ছাগল বা দু'শত ভাল মানের পোশাক (চাদর ও লুঙ্গি)।[৮৩] এ দিয়াত যখন উট ধারা প্রদান করা হবে, তখন হত্যার প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে তার গুণগত মান কমবেশী হবার বিধান দিয়েছে ইসলাম (যাকে দিয়াতে মুগাল্লাযা ও মুখাফ্ফাফা নামে অবহিত করা হয়)। যদি উট ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা দিয়াত দেয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কম বেশি করার সুযোগ নেই। কেননা শরী'আত তার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। অধিকাংশ আইনজ্ঞের মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত মুগাল্লাযা বা উন্নতমানসম্পন্ন দিতে

---

৭৯. - ان فى النفس الدية- ماة من الابل ইমাম আল-বায়হাকী, *সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত,হা.নং. ১৫৯৫০; আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৪৪৭

৮০. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০; মুহাম্মদ আল খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৯

৮১. الا ان الابل قد غلت- قال الراوى- فقوم على اهل الذهب الف دينار- وعلى اهل الورق الثنى عشر الفا- وعلى اهل البقر ماتى بقرة- وعلى اهل الشاء الفى شاة وعلى اهل الحلل ماتى حله- যাইলাঈ, মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-হানাফী, *নাসবুর রায়াহ লি আহাদিসিল হিদায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬১

৮২. الا ان الابل قد غلت- قال الراوى- فقوم على اهل الذهب الف دينار- وعلى اهل الورق الثنى عشر الفا- وعلى اهل البقر ماتى بقرة-وعلى اهل الشاء الفى شاة وعلى اهل الحلل ماتى حله- প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩

৮৩. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হবে। আর ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত মুখাফ্ফাফা বা তুলনামূলক কম মানসম্পন্ন উট দিতে হবে।[৮৪]

তৃতীয়ত তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি। তা'যীর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, বাধা প্রদান করা, প্রতিরোধ করা। শব্দটি সাহায্যার্থেও ব্যবহৃত হয়। তা'যীর মানুষকে শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর রাসূলকে শক্তি যোগাও আর তাকে সম্মান কর।"[৮৫] অতঃপর এই তা'যীর শব্দটি হদ ব্যতীত আদব শেখানো ও তিরস্কার অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কেননা তা'যীর অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করতে বাধা প্রদান করে।[৮৬]ইসলামী আইনে তা'যীর বলতে, যেসব অপরাধের জন্য হদ[৮৭] ও কাফফারা[৮৮]ওয়াজিব হয়, সেসব ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের জন্য শরীআতসম্মত অনির্দিষ্ট শাস্তিকে বুঝায়। চাই উক্ত অপরাধ আল্লাহ তা'আলার অধিকারের ক্ষেত্রে হোক, যেমন রমযান মাসের দিনের বেলায় বিনা ওজরে খাওয়া, সালাত পরিত্যাগ করা, সুদ খাওয়া, মানুষের চলাচলের রাস্তায় ময়লা-আর্বজনা ও কষ্টদায়ক জিনিস ফেলা ইত্যাদি অথবা উক্ত অপরাধ বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রে হোক, যেমন স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর লজ্জাস্থান ব্যতীত মিলিত হওয়া, নিসাব হতে কম পরিমাণ মাল চুরি করা, অসংরক্ষিত মাল চুরি করা, আমানতের খেয়ানত করা, ঘুষ খাওয়া, যেনা ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, গালি-গালাজ করা, কাউকে কাফির, ফাসিক ও ফাজির ইত্যাদি বলা।

চতুর্থত কিছু কিছু দিয়াত ও তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাফফারার শাস্তি। কাফফারা হচ্ছে একটি গোলাম আযাদ করা। যদি মালিকানায় গোলাম না থাকে কিংবা ক্রয় করে আযাদ করার মত আর্থিক সামর্থ্য না থাকে অথবা বাস্তবে কোন গোলাম পাওয়া না যায়, তবে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।[৮৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন : "কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয়, তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রাদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন, সে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৯০] সুতরাং কাফফারা সংশ্লিষ্ট অর্থ হত্যাকারীর স্বীয় অর্থ থেকে ব্যয় করতে হবে।

ঘ) বিচারকের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের এখতিয়ার থাকা না থাকার দিক থেকে শাস্তি দুই ধরনের-

৮৪. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. পৃ. ৩০৩-৩০৪

৮৫. وتعزروه وتوقروه- (আল-কুরআন, ৪৮ : ৯)

৮৬. *আল-মুলাখ্খাছ আল-ফিকহী*, খ. ২, পৃ. ৫৪৬

৮৭. হদ হচ্ছে শরী'আত কর্তৃক সু-নির্ধারিত শাস্তি যা নির্দিষ্ট অপরাধীর উপর প্রযোজ্য।

৮৮. কাফফারা অপরাধ তিন প্রকার: (ক) যাতে শুধু হদ আবশ্যক কিন্তু কোন কাফফারা নেই; (খ) যাতে শুধু কাফফারা আছে, কোন হদ নেই এবং (গ) কাফফারা ও হদ কোনটিই নেই।

৮৯. আশ-শাওকানী, *লাইলুল আওতার*, নাসবুর রায়াহ, প্রাগুক্ত, খ, ৪, পৃ. ৩৫৬

৯০. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو- لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (আল- কুরআন, ৪ : ৯২)

Dhaka University Institutional Repository

১. শরী'আত বা রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি : এক্ষেত্রে বিচারকের কম বা বেশি করার কোন এখতিয়ার নেই। যেমন হদ্দ হিসেবে নির্ধারিত বেত্রাঘাত, ভর্ৎসনা করা কিংবা উপদেশ দেয়া।

২. এমন শাস্তি যার ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ দুটি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিচারককে সেক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শাস্তির কোন একটি কিংবা তার মাঝামাঝি কোন শাস্তির রায় ঘোষণা করতে পারবেন। যেমন জেল, জরিমানা, তা'যীর হিসেবে বেত্রাঘাত ইত্যাদি।

ঙ) বিচারকের রায় বাধ্যতামূলক হবার দিক থেকে শাস্তি দুই প্রকার-

১. নির্ধারিত শাস্তি : ঐসব শাস্তি শরী'আত প্রণেতা যার ধরণ ও প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর তিনি বিচারককে তাতে কম-বেশিকরণ ছাড়াই প্রয়োগের জন্য বাধ্য করেছেন, যার কোন বিকল্প বিধান করার সুযোগ নেই। যা ক্ষমা করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানকেও দেয়া হয়নি। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। হত্যার শাস্তি কিসাস বা দিয়াত।

২. অনির্ধারিত শাস্তি : আইনে বিভিন্ন ধরণের শাস্তির উল্লেখ থাকে। তা থেকে অপরাধেরও অপরাধীর ধরণ ও অবস্থা বুঝে বিচারক যে কোন একটি বা একাধিক শাস্তি অপরাধীর জন্য নির্ধারণ করে দিবেন।

অপরাধ মানব সমাজের মতোই আদি একটি সামাজিক প্রপঞ্চ। মূলত অপরাধ মানুষের অন্তর্নিহিত দুষ্প্রবৃত্তির এক চিরন্তন কদর্য অভিব্যক্তি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অনেক মহৎ গুনাবলীর অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, যুগপৎভাবে মানুষ ষড়রিপুর দ্বারাও তাড়িত। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ নিজের অন্তনির্হিত দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় নানারূপ অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে হযরত আদম (আ.) কে প্রথম মানুষ হিসেবে প্রেরণ করেন এবং মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গন্ধম ফল খাওয়ার অপরাধে তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয় যখন কাবিল হযরত হাবিলকে হত্যা করে। সে রক্তপাত হতে শুরু করে অদ্যবধি পর্যন্ত পৃথিবীতে নানা ধরনের অপরাধ যেমন- হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বিরাজমান। সুতরাং, এ কথা সহজেই অনুমেয়, অপরাধ সমাজের মধ্যে আদি ও চিরন্তন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজ বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে কুসংস্কার এতবেশি প্রবল ছিল যে, দেব-দেবীর অলীক ইচ্ছা না জেনে তারা কোন কাজ করত না। তীর নিক্ষেপ করে দেবতার মনোভাব নির্ণয় করত। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য প্রায়শই নরবলি দেয়া হত। সমাজে নারীদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। নারীর কোন অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সমাজে বহুপত্নী ও বহুপতি প্রথা ছিল। সমাজে ক্রীতদাস প্রথাও চালু ছিল। সামাজিক অনাচার, অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ অসাম্য, মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল। হত্যা, লুটতরাজ, রাহাজানি, ছিনতাই ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। একটি গোত্র অপর গোত্রের উপর বিনা কারণে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এমন কি বংশ পরম্পরায় দীর্ঘ যুদ্ধাবগ্রহ লেগে থাকত। কথিত আছে, সামান্য ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে বংশ পরিক্রমায় শতশত বৎসর যুদ্ধ চলেছিল। তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু, জান-মালও হরণ করা হত। তাদের অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছে ছিল যে, ঐশী হস্তক্ষেপ ছাড়া এগুলো প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না।

ঠিক এমনই এক প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি মানব সমাজে তাঁর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজকে অন্যায় ও অপরাধের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত আসমানী কিতাবগুলোতে (তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল) যেসব মৌলিক ধর্মীয় ভাবধারা প্রচলিত হয়ে আসছিল, রাসূলুল্লাহ (স.) সেই ধারাকেই আরো গতিশীল, বেগবান, সংযোজিত ও

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী করে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগমনের পূর্বে পশ্চিমে যে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য এবং পূর্বে যে বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্য ছিল, তার অধিকাংশ অধিবাসীই আসমানী কিতাবের বিধান পরিহার করে মানব সভ্যতাকে অপরাধের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিল। মানুষে মানুষে, ধনী-গরীবে, নর-নারীতে এত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, মানুষের সাধারণ জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রশংসিত রোমান আইনেও দাসকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হত। সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না। আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করে ঘোষণা করেন আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো, প্রভু-ভৃত্য, সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। বিনা বিচারে মৃত্যুদন্ড, ব্যভিচার, অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ, কন্যা সন্তান ও দাসদের হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের মধ্যে একই ইসলামী আইন আইন প্রয়োগ করা হয়। এভাবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় ইসলামী আইনের আলোকে দন্ডবিধি ও দেওয়ানী আইন প্রণয়ন করা হয়। মানব সমাজ সততই পরিবর্তনশীল। মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু নিয়ম ও বিধি বিরচিত হয়েছে। ইসলামী শরী'আত সতত পরিবর্তনশীল সমাজের সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা অদ্যবধি কার্যকর। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে মানুষকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ নির্দেশ ভঙ্গ করা হলে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং অপরাধ মানব সভ্যতার জন্য হুমকি ও সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। নিম্নে এ অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

অপরাধের পরিচয় :

অপরাধের আরবী প্রতিশব্দ জিনায়াত, এর অর্থ দন্ডযোগ্য অপকর্ম।[৯১] জিনায়াত,ইশতিরাফ, কমিট্যাল অফ এ ক্রাইম, ফেলোনি, মা ফাওকাল জুনহাতি মিলান জারাইম।[৯২] অপরাধের আরবী শব্দ 'জারিমাহ'। মাওয়ার্দী বলেন, "জারীমা হচ্ছে ঐ সব মাখতুরাত(শরী'আত নিষিদ্ধ) কাজ যেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'য়ালা হদ্দ বা তা'যীরের ভয় প্রদর্শন করেজেন।"[৯৩]অপরাধ বিজ্ঞানী পারমিলি বলেন, অপরাধ হচ্ছে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও শাস্তি যোগ্য এমন কোন কাজ, যা প্রায় সর্বদাই প্রচলিত নৈতিক মানদন্ড অনুযায়ী গর্হিত বলে বিবেচিত হওয়ায় তা সমাজের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য শাস্তির মাধ্যমে নিরোধ করা হয়।[৯৪]

হানাফীদের মতে, অপরাধ সেই নিষিদ্ধ কাজ যা ব্যক্তি বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়।

শাফেয়ীদের মতে, প্রাণ নাশকারী বা অঙ্গহানিকর কাজই হচ্ছে অপরাধ।

মালেকীদের মতে, হারবী শত্রু নয়, এমন কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রানাশ বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ; চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্চাকৃতভাবেই হোক, যথার্থ কারণে আর নেহাৎ অপবাদের ভিত্তিতেই হোক।

হাম্বলীদের মতে, সাধারণভাবে এমন সব কাজই অপরাধ পদবাচ্য যা মানবদেহের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং ফলে কিসাস বা ঐ জাতীয় দন্ড অপরিহার্য হয়।[৯৫] মিশরীয় আইনে বলা হয়েছে- এমন সব অপরাধ যার জন্যে প্রাণদন্ড, কঠোর দৈহিক শ্রমের দন্ড বা কারাদন্ড হয়ে থাকে সে সবই অপরাধ।[৯৬]

৯১. আল-মিসবাহুল মুনির খ. ১, পৃ.১৪৪; মুখতারুস সিহাহ, খ. ১,পৃ. ১৪৪

৯২. ইলিয়াস, *মর্ডাণ ডিকশনারী*,(বৈরুত, ১৯৮৬) পৃ.১২৬

৯৩ *আহকামুস সুলতানিয়া ওয়াল বিলায়িতিদ দীনিয়া*, পৃ. ১৯২

৯৪. অধ্যক্ষ এ.এ.এম মনিরুজ্জামান, *জুরিস্প্রুডেন্স এন্ড লিগ্যাল থিওরী*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯০

৯৫. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) খ.১০, পৃ

৯৬. আবদুল কাদের আওদাহ,*আশ-তাশরীউল জিনাঈ আল-ইসলামী*, (বৈরুত: ১৯৮৩) খ.২, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

1. An act commited or omitted in violation of law forbidding or commanding it and for which punishment is imposed upon conviction.

2. Unlawful activity Statistics relating to violent crime.

3.A serious offence, especially one in violation of morality.

4. An unjuast, senseless, or disgraceful act or condition.It`s a crime to squnder our country`s natural resources.

অর্থাৎ - ১. এমন কিছু করা যার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপিত হয়;

২. বে-আইনী কাজ করা ;

৩. মারাত্মক দোষ বা পাপ, বিশেষত নৈতিক স্খলন ;

৪. অন্যায্য, বিবেক -বর্জিত বা অপ্রীতিকর কাজ বা অবস্থা।[৯৭]

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে শরী'আত নিষিদ্ধ; ক্ষতিকর কাজ করা এবং শরী'আতে নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়িত না করা এ দুটোকেই অপরাধ বলা হয়েছে। অপরাধ বলতে শরীআতের এমন আদেশ ও নিষেধ বুঝায় যা লংঘন করলে হদ্দ অথবা তা'যীর প্রযোজ্য হয়। সুতরাং শরী'আত যে কাজ নিষিদ্ধ করেছে, এমন প্রতিটি কাজে লিপ্ত হওয়া অপরাধ এবং নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে সে কাজে লিপ্ত হলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে শরী'আত যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে, এমন প্রতিটি কাজ না করা অপরাধ এবং না করলে শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৯৮]সাধারণ আইনের সাথে এ সংজ্ঞার কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা সাধারণ আইনে অপরাধ হচ্ছে সে কাজ করা যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যা করতে পূর্বাহ্নে নিষেধ করা হয়নি, তা করা নিশ্চয়ই অপরাধ হতে পারে না।

সাধারণভাবে অপরাধের তিনটি দিক থাকে।

ক. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরী'আতের মূলনীতির লংঘন;

খ. অপরাধী পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ, বিবেকসম্পন্ন হবে;

গ. অপরাধীর এ কাজ অপরাধরূপে গণ্য হবে;

প্রথমত শরী'আতের এই মূলনীতির তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ যে কাজই করবে, অপরাধ আইনের চোখে তা মুবাহ (দোষমুক্ত কাজ)। তবে যে কাজটিকে নিষিদ্ধ করে আইনে কোন ধারা উদ্ধৃত হয়েছে, কেবলমাত্র সে কাজটি করাই অপরাধ গণ্য হবে। সে অপরাধের একটা শাস্তি ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যা সে অপরাধকারীর ওপর প্রয়োগ করা হবে। সে স্থানে এবং যে সময়ে সে কাজটির নিষিদ্ধ হওয়ার কথা, ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত হতে হবে। এ মূলনীতির সার কথা হচ্ছে-

১.অপরাধ সাব্যস্তকারী আইনটি সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সে আইন জারির পূর্বে কৃত অপরাধের উপর তা প্রযোজ্য (Retrospective effect) হবে না।

২. ফৌজদারী অপরাধের বিচারক কিয়াসের (Analogy) আশ্রয় নেবেন না। যদিও ফৌজদারী আইন কতক কিয়াসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ইসলামী শরীআত মানব রচিত সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে গিয়েছে।

---

৯৭. Free online dictionary,Thesaurus and Encyclopaedia of crime

৯৮. আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরীউল জিনাঈ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৬৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতার মূলনীতি এ পর্যায়ে আলোচিতব্য বিষয় হচ্ছে অপরাধকারীর সাথে অপরাধের সংশ্লিষ্টতা। অর্থাৎ আইন যে কাজটিকে অপরাধ গণ্য করেছে, সে কাজটি যে করল, তার সাথে সে কাজটির সম্পর্ক বিবেচনা ও প্রমাণ করা। কেননা এ সম্পর্ক প্রমাণিত হলেই সে তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি পাওয়ার অধিকারী। ফৌজদারী অপরাধ কাজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণের জন্য জরুরী হচ্ছে কাজটি ও অপরাধীর মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ।

এ সম্পর্কটি দুটি দিক দিয়ে বিবেচ্য-

১. বাস্তবতার দৃষ্টিতে অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য ঘটনার মধ্যকার বস্তুগত সম্পর্ক;

২. ভাবগত বা তাৎপর্যগত সম্পর্ক। অপরাধীর তাৎপর্যগত তৎপরতা ও মূল ঘটনাটির মধ্যকার সম্পর্ক। তাৎপর্যগত তৎপরতা বলতে বোঝায় অপরাধীর ভুল ও গুনাহ। ইসলামী শরী'আত এবং প্রধান অপরাধ আইনসমূহে বস্তুগত সম্পর্কের পাশাপাশি তাৎপর্যগত সম্পর্কের ব্যাপারটিও বিবেচনা করার পক্ষপাতি।

ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীল সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণের সমস্ত নিদর্শন ইসলামী শরী'আতের আওতাধীন। তাই দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণরূপে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের ঘোষণায় ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীল ও শাস্তির ব্যাপারে ইচ্ছা, এখতিয়ার ও গুনাহের মূলনীতি বিধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তা এ যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। আর এ যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে আর এ যে, তার কর্ম অচিরেই দেখান হবে।"[৯৯] ইসলামে কাজের দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র হচ্ছে সে মানুষ, যার অনুভূতি সুস্থ, যে লোক স্বাধীন, স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা-ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এ কারণে শরী'আত পালনে বাধ্য। কেননা, শরী'আত পালনের যোগ্যতা আছে, সুস্থ অনুভূতি বহাল এবং তা প্রয়োগের অধিকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্ব চাপানো যেতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশক্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানের অবিচল।"[১০০]

এ আয়াতের ভিত্তিতে জোর-জবরদস্তি-নিপীড়ন ও হত্যার ভয় দেখানোর কারণে কেউ কুফরী করলে ইসলামী শরী'আতে সে জন্য দোষী সাব্যস্ত করা ও পাকড়াও করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন -

"কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমা লংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না"।[১০১]

অনুরূপভাবে একথা স্পষ্ট যে, অপরাধীকে পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিমান হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- তিনজনের অপরাধ ধরা হয় না, বালক যতক্ষণ না পূর্ণবয়স্ক হয়, নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না নিদ্রামুক্ত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। অপরদিকে ইসলামী শরী'আতের অপর মূলনীতিটি হচ্ছে, কোন লোকই অন্য ব্যক্তির অপরাধের জন্য দায়ী হবে না। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে এবং পূর্ণমাত্রার ইচ্ছা স্বাধীনতা থাকা অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে তবেই তার দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যে সৎকর্ম করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।"[১০২]

তৃতীয়ত বস্তুগত স্তম্ভ : মানুষ কার্যত অপরাধ করলেই তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। মনের চিন্তা বা কল্পনা

৯৯. -لاتزر وازرة وزر اخرى- وان ليس للانسان الا ما سعى- وان سيعة سوف يرى (আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৮-৪০)

১০০. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله- ولهم عذاب عظيم- (আল-কুরআন, ৬ : ১০৬)

১০১. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه- (আল-কুরআন, ২ : ১৭৩)

১০২. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بطلام للعبيد- (আল-কুরআন, ৪১ : ৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

গণনার যোগ্য নয়। ইসলামী আইনের মূল কথা, মানুষের মনে যা কিছুই উদয় হয়, সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। অতএব, শুধু চিন্তা বা সংকল্প গ্রহণ করাতেই কেউ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না।[১০৩] সুতরাং, কোন কাজকে প্রথমত অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য এর সমর্থনে এমন নস[১০৪] বিদ্যমান থাকতে হবে যা সংশ্লিষ্ট কাজকে হারাম ঘোষণা করে এবং সে কাজে লিপ্ত হলে শাস্তি নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয়ত যে নসটি সংশ্লিষ্ট কাজকে হারাম ঘোষণা করে, সে নসটি নিষিদ্ধ কাজ করার সময় আইনত বলবৎ রয়েছে, যেখানে কাজটি করা হয়েছে এবং যে করেছে তার উপরই এর নির্দেশ আরোপিত হয়েছে। রোমান আইনে অপরাধকে ইচ্ছাসংশ্লিষ্ট করে একে বলা হয়েছে 'ডিলিক্ট' (Delict) ।

ডিলিক্ট-এর সংজ্ঞা হচ্ছে এরূপ, আইন অমান্য বা অগ্রাহ্য করে ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বে-আইনীভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কিছু করা হলে একে ডিলিক্ট বলে। অর্থাৎ সে অপরাধ, ভুল বা অন্যায় আচরণের পেছনে ইচ্ছা সক্রিয় থাকলেই কেবল এটা ডিলিক্টের আওতায় পড়বে, নতুবা নয়।

এ প্রসঙ্গে W.W. Bucklnad বলেন, æObligation Ex Delicto involved essentially a wrong done, consisting in breach for a jus in rem, giving rise to an action for a penalty, distinct from which also existed in many cases for restoration."

মুখ্যত সরকারী ও বেসরকারী দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া অন্যায়মূলক আচরণসমূহের মধ্যে সরকারী অন্যায়মূলক আচরণকে বলা হতো ক্রাইম বা অপরাধ এবং বেসরকারী অন্যায়মূলক আচরণকে বলা হতো টর্ট বা ক্ষতি।১০৫

স্যার আবদুর রহীম তাঁর বিখ্যাত "মোহামেডান জুরিসপ্রুডেন্স" পুস্তকের নবম অধ্যায়ে অপরাধকে 'অপরাধ' ও 'ক্ষতি' (Tort) এ দুই নামে অভিহিত করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি অপরাধকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, একটি ক্ষতি, অপরটি অপরাধ। তিনি লিখেন,"ক্ষতি করা এবং অপরাধ করা আইনের দৃষ্টিতে দুইটি ভিন্ন কাজ হলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ বলেন, এমন অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়ে গণঅধিকার ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে মিশে গিয়েছে। তবুও মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণ এই দুই কাজকে দুই ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলেছেন। প্রতিকারের নিরিখে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যে কাজের প্রতিকার কোন ব্যক্তি নিজে পেতে অধিকারী তাকে ক্ষতি বলা হয়, আর যে কাজের প্রতিকার জনসাধারণ পেতে অধিকারী তাকে অপরাধ বলা হয়। যে কাজের আঘাত কাকেও ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করে, আইনের দৃষ্টিতে তাই ক্ষতি (Tort) । একব্যক্তির কাজের জন্য যদি অপর ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ লাভের হকদার হয়, তখন সে কাজকে ক্ষতি বলা হয়। কোন ব্যক্তির কাজের জন্য যখন জনসাধারণ আহত হয়, তখন সে ব্যক্তির কাজকে অপরাধ বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক নিরাপত্তার, সম্পত্তির হেফাজতের এবং কার্যের স্বাধীনতা আছে। এই অধিকার ভঙ্গ করলে ক্ষতি হয়।"[১০৬] উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায় যে, ইসলামী আইন অপরাধ অপরাধীর সংজ্ঞার ব্যাপারে কমবেশি পূর্ববর্তী রোমান আইনের দ্বারা প্রভাবিত। আর এরূপ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, ইসলামী আইনের একটি উৎস এবং সর্বপ্রথম উৎসই হচ্ছে ইসলাম-পূর্ব যুগের ও প্রচলিত আইন ও দেশাচারসমূহ যেগুলোকে আল-কুরআন এসে রদ বা রহিত করেনি এবং বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে সেগুলো আমাদের নিকট পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এভাবে তাওরাতের রজম পদ্ধতি বা ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে

১০৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম* (ঢাকা: ২০০৪) পৃ.১৮-২৮

১০৪. পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুনির্দিষ্ট বিধানকে নস বলে।

১০৫. রামকান্ত সিংহ, *রোমান আইন*, (সংস্ক. ৪, ২০০৪, সৃজনী প্রকাশনী, নীলক্ষেত, ঢাকা) পৃ. ৪২৮-২৯

১০৬. গাজী শামছুর রহমান, (অনুবাদ) *ইসলামী আইন তত্ত্ব* (ই.ফা.বা. সংস্ক. ২, ১৯৮৪) পৃ. ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদন্ডাদেশ দানের বিধান ইসলামও চালু রেখেছে।[১০৭] বাংলাদেশে বলবত ফৌজদারী কার্যবিধির ৪(খ) ধারায় 'অপরাধ, সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অপরাধ বলতে সে সকল কার্য অথবা কার্যবিরতিকে বুঝায়, যা বর্তমানে বলবৎ কোন আইনে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। এর দ্বারা সেসকল কার্যও বুঝাবে, যেসব কার্য সম্পর্কে ১৮৭১ সনের গবাদি পশুর বে-আইনী প্রবেশ আইনের ২০ ধারা অনুসারে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। সুতরাং অপরাধ হচ্ছে এমন সব এক নিন্দনীয় মানবিক আচরণ, যা কেবলমাত্র শাস্তিমূলক বিধান দ্বারাই যথোপযুক্ত প্রতিকার করা সম্ভব।

অর্থাৎ অপরাধমূলক সে সকল কার্য করা বা বিরত থাকার বিধান মান্য করলে বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনে তা দন্ডনীয় হবে না। অতএব, কোন ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্ম হতে উদ্ভূত ক্ষতিকর পরিণতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপরাধী বলা হয় এবং এরূপ ক্ষতিকর পরিণতি সংশ্লিষ্ট অপরাধীর ইচ্ছারই ফসল হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রবৃত্তিমূলক অপরাধ প্রবণতার জন্য চারটি উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমনঃ প্রবৃত্তি, প্রস্তুতি, উদ্যোগ এবং সমাপ্তি। এই উপাদান চতুষ্টয়যোগে একজন অপরাধীর অপরাধ কার্যের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে। 'অপরাধ' শব্দটির সাথে অন্যায় শব্দটির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। একজন ইচ্ছাকৃত অন্যায়কারী যদি অপর কোন ব্যক্তির জন্য অনিষ্টকর পরিণতি কামনা করে উক্ত অনিষ্টকর পরিণতি ঘটানোর লক্ষ্যে অপরাধ সংঘটন করে, তবে এরূপ ইচ্ছাকৃত অন্যায়কারী আইনত দায়ী হয় এবং দন্ড প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সে অন্যের অনিষ্ট সাধন করতে চায়, সেহেতু সে অন্যায় করছে, আর অন্যায় হল অন্যের ক্ষতি সাধনের নামান্তর মাত্র। অন্যায়ের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে অধ্যাপক স্যামান্ড বলেন যে, অন্যায় বলতে এমনসব অপরাধমূলক কাজকে বুঝায়, যে কাজগুলো সার্বিকভাবে অধিকার ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী। এভাবে অন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেও অপরাধ ও অপরাধীকে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। মুসলিম আইন বিজ্ঞানীরা অপরাধে শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে অপরাধকে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। শাস্তির মাত্রা হতে অপরাধকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন-

প্রথমত হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধ : যেসব অপরাধের জন্য হদ্দ নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ হদ্দ-এর আওতাভুক্ত অপরাধের শাস্তির পরিমাণ ও ধরন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন যেনা, যেনার অপবাদ, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, বিদ্রোহ, ধর্মত্যাগের অপরাধ ইত্যাদি। এ অপরাধসমূহের শাস্তি রহিত করা যায় না। এমনকি কাযী বা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ কেউই এ অপরাধ মাফ করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ : যে সব অপরাধের জন্য কিসাস (মৃতুদন্ড বা অঙ্গহানী) অথবা দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন কতলে আমদ, কতলে শিবহি আমদ, কতলে খাতা এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধনের অপরাধসমূহ কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ।

তৃতীয়ত তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ : যেসব অপরাধের জন্য তা'যীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হদ্দ, কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ ব্যতীত অন্য সব অপরাধ তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ। তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধের শাস্তি শরীআতে নির্ধারণ করা হয় নি, বরং শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার বা তাঁর

---

১০৭. ড. মুহম্মদ হামীদুল্লাহ (প্যারিস), *ইমার্জেন্স অব ইসলাম*, (হিস্টরী অব জুরিপ্রুডেন্স, ইং ভার্সন, আফযল ইকবাল, ইসলামিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট, ইসলামাবাদ, সংস্ক. ১, ১৯১৩; ঐ বাংলা ভাষ্য-ইসলামী আইন ও তার মূলনীতিসমূহ), পৃ. ১২, অনুবাদ-সম্পাদনা, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.; স্যার আবদুর রহীম, *ইসলামী আইনতত্ত্ব*, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, *প্রথা এবং রীতি*, পৃ. ১১৩-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার অথবা বিচারক অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির বা পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন না হলেই শুধুমাত্র ক্ষমা আইনগতভাবে কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষও অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে সরকার বা বিচারক অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে না।

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অপরাধ- এর দৃষ্টিকোণ হতে অপরাধ দু'প্রকার।

প্রথমত ইচ্ছাকৃত অপরাধ : যেসব অপরাধের মধ্যে অপরাধীর অপরাধের প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ অপরাধী ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ বা নিষেধ লংঘন করায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেসব অপরাধকে ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলা হয়। ইচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তির পরিমাণ কঠিনতর তবে এক্ষেত্রে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত ইচ্ছা বর্হিভূত অপরাধ : যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে অরাধীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ আদেশ বা নিষেধ লংঘনের সংকল্প করা হয় নাই; বরং ভূলবশতঃ অরাধী কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন তাকে ইচ্ছা বহির্ভূত অপরাধ বলা হয়। এ অপরাধের শাস্তির পরিমাণ হালকা, শুধুমাত্র অসাবধানতা ও অসতর্কতার দরুন শাস্তি দেয়া যেতে পারে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকেও অপরাধ দু' শ্রেণীতে বিভক্ত-

প্রথমত ইতিবাচক অপরাধ : ইসলামী শরীআত অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করা নিষিদ্ধ, সে সমস্ত কাজে লিপ্ত হলে তাকে ইতিবাচক অপরাধ বলা হয় যেমন চুরি, শরাব পান ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত নেতিবাচক অপরাধ : ইসলামী শরীআতে যে সকল কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে সকল কাজ না করাকে নেতিবাচক অপরাধ বলা হয়। ইতিবাচক অপরাধ নেতিবাচক উপায়েও সংঘটিত হতে পারে এবং এর জন্য অপরাধী শাস্তি ভোগ করবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে গৃহবন্দী করে রাখার পর তাকে পানাহার না করায়, শীত নিবারক বস্ত্র না দেয় এবং ফলশ্রুতিতে ঐ ব্যক্তি অনাহার ও শীতের প্রকোপে মারা যায়, সেক্ষেত্রে হত্যার উদ্দেশ্য উক্ত কাজ করা অপরাধী ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধের দোষী সাব্যস্ত হবে।

অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ধরনের দিক হতে অপরাধ দুই প্রকার-

প্রথমত অপুনরাবৃত্ত অপরাধ : এ ধরনের অপরাধ একটিমাত্র অপরাধকর্ম হতে উদ্ভূত হয়। যেমন চুরি, শরাবপান। হদ্দ, কিসাস ও দিয়াতের সমস্ত অপরাধ এ শ্রেণির অপরাধ।

দ্বিতীয়ত অব্যাহত অপরাধ : এ ধরনে অপরাধ কোন কাজ পুনঃ পুনঃ করার ফলে সংঘটিত হয় অর্থাৎ কাজটি সরাসরি অপরাধ নয় কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়া অপরাধ। তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ এ শ্রেণীভুক্ত অপরাধ।

অর্থাৎ যে নস সংশ্লিষ্ট কাজটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, সে নস যদি অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য অভ্যস্ত হওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করে, তবে তা অভ্যাসগত অপরাধ। আর যদি সংশ্লিষ্ট কাজটি সংঘটিত হওয়াকে অপরাধ গণ্য করে, তবে তা অপুনরাবৃত্ত অপরাধ। প্রকাশ পাওয়ার সময়কাল হিসেবে অপরাধ দু'প্রকার।

প্রথমত সংঘটিত হওয়ার সময়ই অথবা কিছুক্ষণ পরেই যে অপরাধ প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়ত সংঘটিত হওয়ার সময় যে অপরাধ প্রকাশ পায় না অথবা অপরাধ সংঘটনের অনেক পরে যা অবহিত হওয়া যায়। দু'টি দিক হতে এই শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব রয়েছে -

প্রথমত অপরাধকর্মটি হদ্দের আওতাভুক্ত হলে এবং এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী বিদ্যমান থাকলে তাদেরকে সচক্ষে অপরাধকর্মটি সংঘটিত হতে এবং অপরাধীকে সরাসরি উক্ত কর্মে লিপ্ত দেখতে হবে। ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

মালিক (র.) -এর মতে প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট ঘটনার আদ্যপান্ত শ্রবণপূর্বক সাক্ষ্য দিলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু অপর ইমামগণের মতে উপরোক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত যে কেউ অপরাধীকে অপরাধকর্মে লিপ্ত দেখবে সে তাকে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগে বাঁধা প্রদান করবে, এটা তার অধিকার ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের আদেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।"[১০৮]মানুষ কেন অপরাধ করে, অপরাধের কারণ কি মানুষের শারীরিক বা মানসিক ত্রুটির উপর নির্ভর অথবা আর্থিক সংকট বা সামাজিক অসংগতি এর জন্য দায়ী, এসকল বিষয় নিয়ে অপরাধবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের আলোকে অপরাধের কারণ সমূহ আলোচনা করা হল-

ক. প্রাকৃতিক বা শারীরিক কারণ : মানুষের অপরাধ প্রবণতা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বলে অনেকে মনে করেন। Lombroso কয়েদীদের উপর পরিচালিত তার একটি গবেষণায় দেখেছেন, কতিপয় শারীরিক বৈশিষ্ট্য অপরাধের কারণ হিসেবে কাজ করে। তবে Dr. Gorming-এর একটি নিরীক্ষায় দেখা যায়, ইংলিশ ও স্কটিশদের মধ্যে পর্যাপ্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে আইন মান্যকারী ও দন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। তাই তার স্রেফ সিদ্ধান্ত হল, অপরাধের কারণ হিসেবে শারীরিক প্রকৃতির কোন ভূমিকা নেই। অতি সম্প্রতি Hooton অপরাধীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ব্যাপক গবেষণা চালাতে গিয়ে ১৭০০ মার্কিন মামলা নিয়ে দীর্ঘ বার বছর ব্যয় করেন এবং অপরাধের কারণ হিসেবে শারিরীক বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করেন। এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত না হলেও অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর দৈহিক ত্রুটি ও শারীরিক অনুপযুক্ততা লক্ষ্যণীয়। আবার বংশানুক্রমে প্রাপ্ত প্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের কারণ হয়ে থাকে।

খ. মানসিক কারণ : বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেও প্রাপ্ত বয়স্ক এবং কিশোর অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে মানসিকতার সম্পর্ক নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরূপ অভিজ্ঞতায় দেখো গেছে যে, অধিকাংশ অপরাধীই স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। তবে পরবর্তীকালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিক্ষায় দেখা গেছে যে, অপরাধীদের মধ্যে গুটিকয়েক স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বেশ কয়েকজনেরই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা রয়েছে, যাদের অধিকাংশই ৮০ থেকে ৯৫ এর মধ্যে। বার্ট মত প্রকাশ করেন যে, অপরাধের যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা প্রধানত দায়ী। তাঁর মতে, এরূপ অপরাধীদের অধিকাংশই জড়বুদ্ধি, নির্বোধ তথা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন। কারণ তিনি মনে করেন, বোকার মত স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করার মধ্যে বোকারূপ অপরাধীরা বিকৃত আচরণ করে এবং অপরাধ সংঘটন করে। Rex and Knight এর মতে, অপরাধ এবং বুদ্ধির স্বল্পতার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কই অপরাধীকে আত্মনিয়ন্ত্রীত ও সচ্চরিত্র হতে অসম্ভব করে তোলে। এভাবে অপরাধের কারণ হিসেবে অনেকে প্রবৃত্তি, আবেগ, চতুপার্শ্বস্থ নিকৃষ্ট পরিবেশকে দায়ী করেন।

গ. অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক কারণ তথা দারিদ্র এবং অপরাধের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য যথোপযুক্ত পরিসংখ্যানের অভাব থাকলেও সাধারণতভাবে অভাবকে অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই কোন কোটিপতি সিঁধেল চুরি করে না বরং ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির ব্যক্তি এরূপ করে থাকে। অবশ্য কতিপয় অপরাধ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সমভাবে করে। Glueck- এর মতে,

---

১০৮. كنتم عير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر- وتؤمنون بالله- (আল-কুরআন, ৩ : ১১০)

আর্থিকভাবে একেবারে প্রান্তিক অবস্থায় নিমজ্জিত পরিবারের লোকদের অপরাধ প্রবণতার প্রতি তার সমীক্ষার যথার্থতা দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এভাবে আর্থিক সংকট বা আর্থিক মন্দা অপরাধের সংখ্যাকে বাড়িয়ে তোলে মর্মে অনেকেই মত প্রকাশ করেন।

অপরাধের কারণ হিসেবে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হলেও এদের কোন একটি নির্দিষ্ট কারণেই যে অপরাধ সংগঠিত হয়, এরূপ নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। অনেকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে অপরাধের কারণ বললেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সীমানা নির্ধারণ করা দুরূপ বিধায় তাও সামগ্রিকভাবে মানা যায় না। তাই বংশ পরম্পরা, উত্তরাধিকার সূত্র, পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদিকে অপরাধের কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন।

এভাবে অপরাধের প্রধান কারণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং অপরাধবিজ্ঞানী একমত হতে পারছেন না। সমাজ, সমাজের ক্রমবিকাশ, মানবমন ইত্যাদি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের ফলেই এরূপ সিদ্ধান্তগত বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা। মার্কস ও এঙ্গেলসর অপরাধের জন্য অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেন। প্যাটশিয়া জ্যাকব ক্রমোজম বা জ্বীনগত বৈশিষ্ট্যকে মানুষের অপরাধপ্রবণতার জন্য দায়ী করেন। Goddard মানসিক বিকারকে, ফ্রয়েড পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি, Homal সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে, ড. সাদার ল্যান্ড সামাজিক সংগঠন বা সামাজিক কাঠামোতে অপরাধের কারণ নিহিত মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

যাই হোক অপরাধের কারণ সম্পর্কে যত মতবাদই থাকুক না কেন, মানুষ অপরাধ করে এটা চূড়ান্ত সত্য ও সমস্যা। এটা সামাজিক সমস্যা ও অবক্ষয়, তাই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের সুমহান লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের ফৌজদারী আইন অপরাধকে দূরীভূত করে সমাজে মানুষের বাসযোগ্য, কল্যাণকর পরিবেশ আনয়নে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[১০৯] আর এ অপরাধীরা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে-

ক. কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দ্বারা সকল বিধানই এ শ্রেণীর অপরাধীর জন্যে প্রযোজ্য, শরী'আতের পরিভাষায় এরা মুকাল্লাফ বা প্রাপ্তবয়ষ্ক। সুতরাং এ শ্রেণীর অপরাধীর জন্যে নির্ধারিত শাস্তি তাদের ভোগ করতেই হবে। আইনগত শাস্তি থেকে তাদেরকে রেয়াত দেয়া আল্লাহর আইনকে অস্বীকার ও অমর্যাদা করারই শামিল। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তা হলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[১১০]

খ. নাবালগ বা শিশু যেহেতু শরী'আতের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ নয়, এ জন্য অপরাধী শব্দটি তার জন্য প্রযোজ্য নয়। অপরিপক্ক বুদ্ধির জন্য সে অবশ্য অন্যের ক্ষতি করতে পারে। শিশু যদি কারো ব্যক্তিগত অধিকারে আঘাত করে এবং সে আঘাতের দ্বারা অপর ব্যক্তির এমন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, যা শিশুর দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যায়, তাহলে তার কাজের জন্য দায়ী হবে। শিশুর অভিভাবক এ প্রকার দায়িত্ব শিশুর সম্পত্তি থেকে প্রতিপালন করতে পারেন। যে কাজের জন্য অন্যের ক্ষতি হয়, সে কাজ যখন শিশু করে, তখন তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, অবশ্য সে কারণে শিশুকে অপরাধী বলা যায় না। সুতরাং সে ক্ষতিপূরণ শাস্তিস্বরূপ নয়, ক্ষতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। শিশু তার সম্পত্তি থেকে তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনকে ন্যায্যমত খরচ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিতে বাধ্য। এ সম্পর্কে উপর যে আইন প্রযোজ্য হয়, শিশুর উপরও সে আইন প্রযোজ্য। কিন্তু যে দায়িত্ব শাস্তিমূলক, শিশু সে দায়িত্ব প্রতিফলনে বাধ্য নয়। রক্তমূল্য পরিশোধের দায়িত্ব তার নেই।

১০৯. অধ্যক্ষ এ.এ. এম মনিরুজ্জামান, *জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯১

১১০. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.-২ (বৈরুত : দারু ইবনে কাছির, ১৯৮৭) কিতাবুল হুদূদ, পৃ. ১০০৩

Dhaka University Institutional Repository

তবে সম্পত্তির যে কর ধার্য আছে, তা তাকে দিতে হয়।[১১১] উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ ক্ষেত্রে করখেলাপীর শাস্তি থেকে সে মুক্ত থাকলেও তার সম্পদের উপর সরকারি কর খেলাফীর মামলাও হতে পারে এবং সে কর আদায়যোগ্য বটে।

গ. যে ব্যক্তি উম্মাদ, আইনের চোখ সে অপরিণত বুদ্ধি শিশুর সমান। তবে উন্মাদ ব্যক্তি যখন সুস্থ থাকে, সে সময় তার কাজ আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হয়। অমুসলিম পাগলের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে পাগলের অভিভাবককে তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হবে। এ দাওয়াত গৃহীত না হলে তার বিবাহ-বন্ধন্ন ছিন্ন হবে।[১১২] উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, পাগল ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায়ই কেবল অপরাধী শব্দটি তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে এবং তার শাস্তিও যথারীতি তাকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু পাগল অবস্থায় সে কারো কোন ক্ষতি করে থাকলে তার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তার পাগল অবস্থায় দায়-দায়িত্ব তার অভিভাবকদেরই পালন করতে হবে।

ঘ. যে সমস্ত অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করে তাদেরকে শরী'আতের পরিভাষার যিম্মী বলা হয়ে থাকে। তাদের উপর মুসলিম আইন প্রযুক্ত হয়, তবে এ প্রয়োগ সঠিক নয়। আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ (স.) -এর নবূওয়াতের প্রতি বিশ্বাস না রেখেও সে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে। তাকে অজ্ঞ বলা চলে, কিন্তু তার এরূপ অজ্ঞতার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, অমুসলিমরা যাতে বিশ্বাস করে তাতে তাদের যাকাত দাও। তাদের এ সমস্ত বিশ্বাসের জন্য তারা শাস্তিযোগ্য হয় না। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, অমুসলিম মদ্যপানের জন্য শাস্তি পায় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলেন, অমুসলিম মদের ব্যবসা করতে পারে এবং তাদের মদের দোকান নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। তিনি আরো বলেন, মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নিষিদ্ধ সম্পর্কের মহিলাকে বিয়ে করতে পারে এবং মুসলিম রাষ্ট্র সে বিয়েকে কার্যকর বলে গণ্য করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্ব-স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু কুফরীর আমলে তার যৌনাচারকে ব্যভিচার মনে করা হয় না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) এ প্রশ্নে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সাথে একমত কিন্তু তাঁরা বলেন যে, ঐ স্ত্রী মুসলিম রাষ্ট্রে মামলা করে তার স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ আদায় করতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, অমুসলিমদের মধ্যে নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিয়ে সমর্থন করলে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকারকেও স্বীকার করতে হয়, নতুবা অসহায় স্ত্রী ভরণ-পোষণের অভাবে মারা যেতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত নীতির আলোকে যিম্মী বোধশক্তিসম্পন্ন অপরাধীর বিচার ও অব্যাহতিদানের নির্দেশ আদালতকে দিতে হবে। আরো লক্ষণীয়, অমুসলিমদের যে আইন বা প্রথা মুসলমানদের আইন ও প্রথার সাথে মিলে যায় তা' কার্যকরী করতে কোন বাধা নেই। অমুসলিমদের যে আইন বা প্রথা তাদের আইন বিরোধী মুসলিমগণ তা গ্রাহ্য করেন না। মানুষের অধিকারের পক্ষে যে ইসলামী আইন প্রচলিত, মুসলিম রাষ্ট্র সে আইন যিম্মীদের উপরও প্রয়োগ করে, আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে ইসলামে যে আইন বিদ্যমান, সেদিকে অমুসলিমদেরকে আহ্বান করা যায়, কিন্তু সেগুলি পালন না করলে তাদের শাস্তি দেয়া যায় না।[১১৩] উক্ত নীতির আলোকে এমন অনেক অপরাধ আছে যেগুলো মুসলমান নাগরিকের ক্ষেত্রে অপরাধ হলেও যিম্মীকে ঐ অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত করা যায় না।

ঙ. মুসলিম রাষ্ট্রের একজন মুসলিম নাগরিকের সাথে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের বাণিজ্যিক চুক্তি হলো। বিদেশী রাষ্ট্রের আইন বলে, নাগরিকটি প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সের না হলে তার সাথে চুক্তির

১১১. *ইসলামী আইন তত্ত্ব*, পৃ. ১৮৯

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

কোন বৈধতা নেই। তাই চুক্তিটি আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন। ইসলামী আইনে বয়সের কোন শর্তসীমা নেই, বরং তার দৈহিক পূর্ণতাই বিবেচনা করা হবে যা উক্ত বয়সের পূর্বেও কারো হয়ে যেতে পারে। যখন আদালতে মামলা আসলো, তখন এডভোকেট সাহেব বললেন, আমার মক্কেল চুক্তি সম্পাদনকালে যেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল তাই তার ওপর আইনত চুক্তির কোন দায়িত্ব বর্তায় না, সুতরাং এ চুক্তি কোন চুক্তিই নয়, তা বাতিল। এ জাতীয় ব্যাপারগুলো হলো 'প্রাইভেট ইন্টারন্যাশাল ল' এর সাথে সম্পৃক্ত। আর এ জন্য আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যে, বিবাদী যে আইনের অধীন সে অনুযায়ী রায় দিতে হবে, বাদী যে আইনের অনুযায়ী তা এখানে প্রযোজ্য হবে না।[১১৪]

দুর্নীতির পরিচয় :

দুর্নীতি বর্তমান বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা। শাব্দিক অর্থে দুর্নীতি বলতে সমাজে প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধাচরণকে বুঝায়। সাধারণত ক্ষমতার অপব্যবহার, চক্রবৃদ্ধি সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, দলীয় প্রভাব খাটানো, পুলিশী গ্রেফতার ও মামলা জড়িয়ে দেওয়ার ভীতিপ্রদর্শন করে অর্থ আদায়, সরকারি সম্পদের অপচয় ও আত্মসাৎ, করফাঁকি, স্বজনপ্রীতি, অবৈধভাবে উপহার-উপঢৌকন প্রভৃতি গ্রহণ করাকে দুর্নীতি বলা হয় । বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে সুযোগ-সুবিধাকে অবৈধভাবে কাজে লাগানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি রাজনৈতিক দুর্নীতির পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি হুমকি সৃষ্ট করে। যার প্রভাব রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ, প্রশাসনিক দায়িত্বপালনে অনীহা, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। প্রশাসনিক দুর্নীতি সমাজে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে। স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে সমাজের যোগ্য ব্যক্তিরা স্বীয় স্বার্থ হতে বঞ্চিত হয়। প্রশাসনিক দুর্নীতি মানুষের ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী। কারণ দুর্নীতির মাধ্যমে যদি সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তবে দায়িত্ব পালনের প্রতি আগ্রহ লোপ পায়। যা পরিণামে প্রতিভা বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি জাতীয় জীবনে বিপর্যয় বয়ে আনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতির মাধ্যমে পরীক্ষা পাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, জাল সনদপত্র, আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ইন্টারভিউতে প্রথম করে দেয়া, প্রভৃতি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থবির করে দিচ্ছে।

মানুষের দুর্নীতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির প্রভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যথাযথভাবে না হওয়ায় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে আত্মসাৎ করার ফলে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না। দুর্নীতি দারিদ্র্য প্রসারের সহায়ক। দুর্নীতির আশ্রয়ার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করার মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাবে দারিদ্র্য ও নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া দুর্নীতির প্রভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। ফলে দারিদ্র্য হ্রাস না পেয়ে দারিদ্র্য ব্যাপকতা লাভ করে। দুর্নীতি সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং নৈতিক চরিত্রকে ধবংশ করে দেয়। দুর্নীতির প্রভাবে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারে না। সমাজে সৎ

১১৪. জালালাবাদী সম্পাদিত, *খুতবাতে বাহ্ওয়ালপুর* (১৫১ নং অনুচ্ছেদ, মহানবী স্মরণিকা ১৪২৯/২০০৮ সংখ্যা) পৃ. ৮৩; ইউ/১১ নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ব্যাপক দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়ে নীরবতা পালনে বাধ্য হয়। সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনে দুর্নীতি। দুর্নীতি সমাজে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ও কলহ সৃষ্টি করে দুর্নীতি চক্রাকারে ক্রিয়াশীল আত্মঘাতী সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে যে ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয়ে অন্যকে প্রতারিত করে, আবার সেও অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনিও ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন। এভাবে চক্রাকারে দুর্নীতি সমাজে প্রসাতির হয়। দুর্নীতির প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কার্যকর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ফলে সমাজের মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

ইসলাম একদিকে যেমন দুর্নীতি দূরীকরণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি তা প্রতিকারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। এজন্য ইসলাম সকল প্রকার দুর্নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করে তার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে। মিথ্যাচার, ওয়াদাভঙ্গ করা, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করা, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি , সরকারি অর্থ অপচয় বা অপব্যয় করা, প্রশাসনিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যুলূম বা হয়রানি করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি বিষয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আপনি অনেককে দেখবেন যে, তারা পাপ-দুর্নীতি, সীমালঙ্ঘন ও হারাম ভক্ষণ-ঘুষ গ্রহণে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তারা যা করছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।[১১৫] এছাড়া রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রতিপক্ষের দুর্নাম, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা, তার দোষ খুঁজে বেড়ানো, গীবত করা, সুবিধা লাভের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকট চোগলখোরী করা ইত্যাদি বিষয়ও দুর্নীতির আওতায় পড়ে। এ সকল বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেমন মিথ্যাচার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক।[১১৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ধ্বংস ও ব্যর্থতা সে ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে।"[১১৭] ইসলাম যে কোন ওয়াদা চুক্তি যথাযথভাবে পালন করার প্রতি জোর দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমসূহ পূরণ কর।"[১১৮] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি- (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তা বঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে।"[১১৯]

মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ বা জবর দখলকারীর জন্য ইসলামে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এবং পরকালে তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে-অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[১২০] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যারা ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে,

১১৫. আল-কুরআন, ৫:৬২

১১৬. আল-কুরআন, ৩:৬১

১১৭. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ.১৮৫

১১৮. আল-কুরআন, ৫:১

১১৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৪৬

১২০. আল-কুরআন, ৪:১০

Dhaka University Institutional Repository

তারা নিজেদের উদরে আগুন ছাড়া আর কিছু খায় না এবং অচিরেই তারা অগ্নিতে পৌঁছে যাবে।"[১২১] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দাংশ আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমীনের নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।"[১২২] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "পুরুষ অথবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত কর্তন কর। তা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং নির্ধারিত আদর্শ দন্ড।"[১২৩]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, শেষ পর্যন্ত যখন তাকে ধরবেন তখন তাকে আর অবকাশ দেয়া হবে না।"[১২৪] তিনি আরও বলেন, "অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আকে ভয় কর; কেননা ঐ দু'আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।"[১২৫]

অপরদিকে হারাম জিনিস বিক্রয়, ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয়, মজুদদারী, চোরামাল ক্রয়, বাজার স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ, মোনাফাখোরী, ধোঁকাবাজী, ওজনের কম দেওয়া, সুদ খাওয়া, ইত্যাদি অর্থনৈতিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ও তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম এবং গুনাহ পর্যায়ের কাজ। এ কারণে তা ক্রয় বা বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করাও হারাম। শূকর, মদ্য, হারাম খাদ্য পানীয়, মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি প্রভৃতি এ পর্যায়ে গণ্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ্য, মৃতজীব-জন্তু, শূকর, মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।"[১২৬] আল্লাহ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন। "রাসূলুল্লাহ (স.) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জিত অর্থ, গণকের উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"[১২৭] পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেয়া কিংবা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নেয়া ইসলামী বিধান মতে দুর্নীতির শামিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী, "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[১২৮] ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। হাট-বাজার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলেই দ্যব্যমূল্য আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, বাজারে পণ্য আমদানি ও তার চাহিদা অনুপাতে দ্রব্যমূল্য উত্থান-পতন হতেই থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে তাই দেখা যায়, যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

---

১২১. আল-কুরআন, ৪:২৯

১২২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল মাযালিম ওয়াল কিসাস), খ. ২, পৃ.৪৮৩

১২৩. আল-কুরআন, ৫:৩৮

১২৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুত তাফসীর), খ. ৪, পৃ. ৪২৮

১২৫. প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, হা.নং ৪০০০

১২৬. প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ্য, খ.২, পৃ.৩৭৪

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

১২৮. আল-কুরআন, ৮৩:১-৩

Dhaka University Institutional Repository

পেলো লোকেরা এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয় আল্লাহ তা'আলা। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন, তিনি সস্তা করেন। রিযিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোনরূপ যুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার উপর দাবিদার কেউ থাকবে না।"[১২৯] রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ চাপানো মারাত্নক যুলুম এবং সেই যুলুম থেকে মুক্ত ও পবিত্র থেকেই তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন।

ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও স্বার্থপরতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফতি করতে খাদ্যপণ্য ও জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোরতা। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (স.) পণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিন ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "যে লোক চল্লিশ রাত্রিকাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে সম্পকৃহীন হয়ে গেল এবং আল্লাহও সম্পর্কহীন হয়ে গেলেন তার থেকে।"[১৩০] রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।"[১৩১]

ইসলাম ধোঁকা প্রতারণার সকল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছেন। তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক কোন ক্রমেই তা বৈধ নয়। ইসলামের দাবী হচ্ছে সব ব্যাপারেই সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জনই সততা অবলম্বন করা ও পণ্যের দোষ-ক্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত হবে। আর যদি তারা দুজন মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়েল রবকত নির্মূল হয়ে যাবে।"[১৩২] ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া বা ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা গর্হিত কাজ। যেমন ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা অথবা দাম বৃদ্ধি করে দেয়া ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।"[১৩৩] পণ্য বিক্রয় পাত্র দ্বারা মাপার সময় বা পাল্লা দ্বারা ওজন করতে কম দেয়াও ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া

---

১২৯. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', হা.নং. ১১২৩৫

১৩০. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হা.নং. ৪৬৪৮

১৩১. ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম* (করাচী, আসাহহুল মাতাবি-১৯৩০ খৃ.), হা.নং.৩০১৩

১৩২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্নু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ,' পৃ. ৩২৬

১৩৩. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, সুনান আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.-২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে এবং সূরা আল-আন'আমে এ বিষয়ে বলা হয়েছে,"তোমরা মাপার পাত্র ও ওজনের পাল্লা সুবিচার সহকারে পূর্ণ ভর্তি করে দাও। মানুষের সাধ্য-সামর্থর অধিক আমরা কোন দায়িত্বই তার উপর চাপিয়ে দেইনা।"[১৩৪] সেখানে আরও বলা হয়েছে, "আর তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ় সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই ভাল ও উত্তম।"[১৩৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, "ওজনে যারা কম করে তাদের জন্যে বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয় তখন পুরাপুরি গ্রহণ করে। আর যখন মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে।"[১৩৬]

ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে-শুনে ক্রয় করা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল।"[১৩৭] সুদের পন্থায় 'মুনাফা' লাভ করার সকল পথকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও হারাম করে দিয়েছে। তার পরিমাণ কম হোক বা বেশি, ইসলামে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সুদী কারবার ছেড়ে দাও যদি তোমরা ইমানদার হও। যদি তোমরা তা না কর তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। আর তোমরা যুলুম করবে না আর না তোমাদের উপর যুলুম করা হবে।"[১৩৮]

এইভাবে ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল প্রকার দুর্নীতিকে হারাম ঘোষণা করে তার মূলোচ্ছেদ করেছে। অবৈধ উপায়ে ও অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ লেনদেনের একটি পন্থা হচ্ছে ঘুষ। প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে। শাসক-প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্য ঘুষের পথাবলম্বন করাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং

---

১৩৪. আল-কুরআন, ৬:১৫২

১৩৫. আল-কুরআন, ১৭:৩৫

১৩৬. আল-কুরআন, ৮৩:১-৬

১৩৭. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান* (অনু: মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৭), পৃ.৩৪২

১৩৮. আল-কুরআন, ২:২৭৮-২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।"[১৩৯]

সর্বোপরি হারাম উপায়ে তথা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ করে ইবাদত করলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। এমনকি এ অবৈধ সম্পদ দ্বারা কোন ভাল কাজ করলে বা দান-সাদাকাহ করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ(স.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে সাদকাহ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছেয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। কিন্তু তিনি মন্দকে সৎকর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে মেটাতে পারে না।"[১৪০] প্রকৃতার্থেই দুর্নীতি ও প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন অকল্যাণকর ও অপমানজনক। ইসলাম এমন গর্হিত কাজ হতে মানব জাতিকে বেঁচে থাকার সতর্কবাণী দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ-অসৎকর্মের মাধ্যমে সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে।"[১৪১]

দুর্নীতি বাংলাদেশের রন্ধ্রেরন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। দুর্নীতির কারণে দেশে অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার প্রসার বাড়ছে। চোরাচালানী ও মজুদদারীর দরুণ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ কারণে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠাবান মানুষের কষ্টের অন্ত নেই। সুতরাং দুর্নীতি করাতো দুরের কথা, যে সমস্ত ছিদ্র পথে দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায় তার প্রতিটি পথ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। তারপরও যারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। যাতে আর কেউ দুর্নীতি করার সাহস না পায়।

---

১৩৯. আল-কুরআন, ২:১৮৮

১৪০. ইমাম ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, পৃ.-২৪২

১৪১. আল-কুরআন, ১০:২৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি, ব্যক্তিগত অপরাধ ও শাস্তির বিধান

- শিরকের শাস্তির বিধান
- কুফরের শাস্তির বিধান
- মুনাফিকের শাস্তির বিধান
- কর্তব্যে অবহেলার শাস্তির বিধান
- হারাম উপার্জনের শাস্তির বিধান
- মিথ্যা কথা বলার শাস্তির বিধান
- তাকওয়া বিহীন জীবন যাপনের শাস্তির বিধান
- কবর বা মাজার,বেদীতে ফুল দেওয়ার বিধান
- সৎকাজে আদেশ না করা ও অসৎকাজে নিষেধ না করার শাস্তির বিধান
- ফরয ছেড়ে দেওয়ার শাস্তির বিধান
- মান-সম্মান,ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার শাস্তির বিধান
- সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ভঙ্গের শাস্তির বিধান
- একে অপরকে উপহাস করার শাস্তির বিধান
- একে অপরকে দোষারোপ করার শাস্তির বিধান
- অমূলক ধারণা করার শাস্তির বিধান
- মন্দ নামে ডাকার শাস্তির বিধান
- দোষান্বেষণের শাস্তির বিধান
- গীবত করার শাস্তির বিধান
- ইবাদাত আদায় না করার বিধান
- সালাত ছেড়ে দেয়ার শাস্তির বিধান
- যাকাত আদায় না করার শাস্তির বিধান
- রোযা না রাখার শাস্তির বিধান
- হজ্জ পালন না করার শাস্তির বিধান
- পরিবেশ দূষণের শাস্তির বিধান

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি, ব্যক্তিগত অপরাধ ও শাস্তির বিধান

পরিবার ও মানব সমাজের প্রথম এবং প্রধান বুনিয়াদি উপাদান হল ব্যক্তি। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, দল, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি ও বিশ্ব। আর ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করেই এ সামষ্টিক সমাজ সংগঠিত হয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ সংগঠন ও সভ্যতা বিনির্মাণ বা কল্পনা করা যায় না। তাই সকল সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্মে ও নীতি-দর্শনে ব্যক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা ব্যক্তির চিন্তা, চেতনা, আদর্শ , আকিদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিক-শৃঙ্খলা, মননশীলতা, আচার-আচরণ, কার্যক্রম, তৎপরতা, স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ব্যক্তির কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে স্বচ্ছ সুন্দর ও নির্ভেজাল পন্থা অবলম্বনের পথ নির্দেশনা ইসলাম প্রদান করেছে। পাশাপাশি যাবতীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামী, অসত্য, অন্যায়, বাতিল পথ ও অস্বচ্ছ-অসুন্দর এবং অন্ধকারময় ভ্রষ্টার পথ পরিষ্কার করে আলোকিত সত্য সুন্দর সাবলীল জীবনের সন্ধান দিয়েছে। যার মাধ্যমে ব্যক্তি ইহলৌকিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্মল শান্তির পরিবেশ তৈরী করে আরাম আয়েশে জীবন কাটাতে পারে। আর আখিরাতে অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি, মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু বিপরীত দিকে চলতে গেলেই ব্যক্তির জীবনে নেমে আসে ব্যর্থতা, দুঃখ-কষ্ট, অপমান ও গ্লানি। পাশাপাশি ইহলৌকিক যাবতীয় অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর পারলৌকিক জীবনে অবিরাম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও দুঃখময় জীবন। তাই নিম্নে ব্যক্তিগত অপরাধ সমূহের ইহলৌকিক ও পরকালীন শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হল-

শিরকের শাস্তির বিধান :

শিরক আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ পরস্পর অংশীদার করা, অংশীদার সাব্যস্ত করা। পরিভাষায় বিভিন্ন প্রভুর উপর বিশ্বাস করাকে শিরক বলে।[১] আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা বা তাঁর সমকক্ষ মনে করা সবচেয়ে বড় শিরক। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া নবী, দেব-দেবী, পীর-আউলিয়া বা অন্য কোন কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়। খাদ্য অন্বেষণে বা রোগমুক্তির বা অন্য কোন কামনা বাসনা পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া কাউকে আহ্বান করা হয় তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে"।[২]যিনি জীবন, রিজিক, ধন-দৌলত, মান-ইজ্জত সবকিছু দান করছেন তাঁর সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে করা বড় অপরাধ। আল্লাহ বলেন- "আর যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলল : হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়"।[৩] কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে তাহলে তার সকল নেক আমল ধ্বংশ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "আপনার প্রতি, আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যদি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির

১. ড. মুহাম্মদ রাউস কালয়াভী; ড. হামেদ সাদেক কাইনাভী, *মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা*, (করাচি : পাকিস্তান) পৃ. ২৬০

২. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولايضرك- فان فعلت- فانك اذا من الظلمين- (আল-কুরআন, ১০:১০৬)

৩ واذ قال لقمن لابنه وهو يعظه يبني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم- (আল-কুরআন, ৩১:১৩)

Dhaka University Institutional Repository

করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবেন”।[৪] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, শিরক সকল নেক আমল ধ্বংশ করে দেয়। কেউ যদি মনে শিরক লালন করে দান- সদকা, নেক -আমল বা পূণ্যের কাজ-কম করে তা সম্পূর্ণরুপে নিস্ফল হবে।তাই মুসলিম মুমিন ছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, নাসারাদের সকল ভাল কর্ম আল্লাহর দরবারে গ্রহনীয় হবে না। শিরক পৃথিবীর সর্বোচ্চ অপরাধ সমূহের একটি অন্যতম অপরাধ।এ অপরাধ ক্ষমা করার যোগ্য নয়। কেননা বান্দা তার স্বীয় স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-“আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াবী সকল অপরাধ ক্ষমা করলে ও শিরক ক্ষমা করবেন না। যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে নিপতিত”।[৫] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-“অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাঁর পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে”।[৬] তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক মুহাম্মদ (স.) সর্বদা শিরক থেকে পরিত্রাণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মুশরেকেরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করেনা, বরং পূণ্যের কাজ মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল তারা এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই দুনিয়ার জীবনে মানবিক আইন বা রাজনৈতিক কারণে শাস্তি অনিবার্য না হলে ও পরকালে জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি অবধারিত ও চিরস্থায়ী হবে।

কোন মুসলিম যদি আল্লাহর সাথে শরীক করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে। তাই এ ধরনের মুশরিক হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হল মুরতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ন্যায়। আর তা হল হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা, যাতে কেউ যেন এ কাজ না করে। কেননা ইসলাম গ্রহনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই । তবে বুঝে-শুনে কেউ ইসলাম গ্রহন করে তা প্রত্যাখান করলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

কুফরের শাস্তির বিধান :

কবিরা গুনাহ সমূহের অন্যতম কবিরা গুনাহ হল কুফর। কোন ব্যক্তি বৈধ মনে করে বারবার কবিরা গুনাহ করলে বেঈমান হয়ে যায়। এ কুফর শোকবের বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা। ইসলামের পরিভাষায় কুফর হলো রাসূলুল্লাহ (স.) কে এবং যা তিনি দ্বীনের প্রয়োজনে নিয়ে এসেছেন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।[৭] আর এ কুফর হল ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, তার মূল অর্থ বিশ্বাসে কুফরী করা।[৮] যে ব্যক্তি আল্লাহ্, রাসূল, কুরআন, হাদীস, জম্ম-মৃত্যু, কবর-হাশর, ফেরেশতা, ইত্যাদি অস্বীকার করে এমনকি তার জম্মকে পর্যন্ত অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। ব্যক্তির কুফরির কারণে তার নেক আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ওপর মুরতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রয়োগ হবে। কাফির ব্যক্তি

৪. ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك- لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسر- (আল-কুরআন, ৩৯:৬৫)

৫. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما- (আল-কুরআন, 8:8৮)

৬. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا- ولا يشرك بعبادة ربه احدا -(আল-কুরআন, ১৯:১১০)

৭. মুফতী আমিমূল ইহসান, *কাওয়ায়েদুল ফিকহ* (আশরাফী বিকাদফু দেওবন্দ, হিন্দ), পৃ. ৪৪৫

৮. মুহাম্মদ ইবনে জামিল জয়নু, *মাজমুয়াতু রেসায়েলেত তাওজিহাতুল ইসলামিয়া* (সংস্ক. ৫, ১৯৯৪), পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকে। সে প্রকৃতিকে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক মনে করে। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়, তাতে কারো কোন হাত নেই। তার এ চিন্তা অমূলক ও ভ্রান্ত। কেননা পৃথিবীর কোন কিছু নেই যা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বাহিরে আছে। সব কিছু তারই নিয়ন্ত্রণে। মানুষ স্বীকার করুক আর না করুক। কেউ যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাতে আল্লাহ তা'য়ালার কোন কিছু যায় আসে না বরং সে ব্যক্তি নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা সে দুনিয়ার জীবনে সাময়িক কল্যাণে লাভ করলেও লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান নিয়ে বেঁচে থাকে। তাঁর সামাজিক কোন মূল্যায়ন থাকে না। আর পরকালীন জীবন তার জন্য ভয়াবহ ও কঠিন হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তার চেয়ে অত্যধিক জালেম আর কে হতে পারে। যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা তার কাছে সত্য আসার পরও তাঁকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই হবে সেসব কাফেরদের আশ্রয়স্থল?"[৯] কাফেররা দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে অস্বীকার করলেও পরকালে তারা সবই সত্য অবলোকন করবে। তখন তারা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় দোয়া করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন "আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফেররা বলবে: হায়! আফসোস- আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম"[১০] দ্বীন বা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কিন্তু বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পর তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আর কাফির যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে তাহলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবে। তাহলে কেউ আর এভাবে কুফরি করার সুযোগ পাবে না।

মুনাফিকের শাস্তির বিধান :

মুনাফেক শব্দটি নেফাক থেকে সংকলিত। এর অর্থ মুনাফেকী কাজ করা বা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বণ করা। পারিভাষিক অর্থে মুনাফিক হল যে কুফরী গোপন করে ইসলামকে প্রকাশ করে।[১১]যে ব্যক্তি অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে মুনাফেক বলে।[১২] মুহাম্মদ ইবনে জামিল জাইনু বলেন- মুখে ইসলাম প্রকাশ করা, আর অন্তরে কুফরী লালন করার নামই নেফাক।[১৩]রাসূলুল্লাহ (স.) এর জামানায় কাফের ও মুসলিমদের মধ্যে একদল লোকের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিক বলেছেন। তারা সুবিধার জন্যে মুসলমানদের কাছে এসে বলে আমরা মুসলমান আবার কাফেরদের কাছে গিয়ে বলে আমরা তো মুসলমানদের সাথে উপহাস করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তাদের এ নীতিতে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশীর ক্ষতিগ্রস্থ হতো বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান

---

৯. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس فى جهنم مثوى للكافرين- (আল-কুরআন, ২৯:৬৮)

১০. انا انذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يليتنى كنت ترابا- (আল- কুরআন, ৭৮:৪০)

১১. ড. মুহাম্মদ রাউস কালয়াজী; ড. হামেদ সাদেক কায়নাবী, *মুজামু লুগাতুল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬২

১২. মুফতী আমীমূল ইহসান, *কাওয়ায়েদুল ফিকহ*, প্রাগুক্ত পৃ.৫৩০

১৩. *মাজমুয়াতু রাসায়েলেত তাওজিহাতুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত পৃ.২১১

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এ মুনাফিকরাই ইসলামের বিভিন্ন অপবাদে সম্পৃক্ত। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) এর ব্যাপারে অপবাদের ঘটনা ওহুদের ময়দান থেকে পলায়ন ইত্যাদি। তারা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের ক্ষতি করতো। এরা দু'মুখী সাপের চেয়ে ও বিপদজনক। এ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (স.), পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করে, নবী ও কুরআনকে ঘৃণা করে, ইসলাম অপমানিত হলে তারা খুশী হয়, দ্বীন ইসলাম প্রসারকে তারা অপছন্দ করে। তাদের শাস্তি কাফের ও মুশরিকদের চেয়েও ভয়াবহ। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা বাকারায় মাত্র দু'টি আয়াতে কাফেরদের আচরণ বর্ণনা করেছেন। আর মুনাফেকদের আচরণ ১৩টি আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত, অপমানিত আর পরকালীন জীবনে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না"।[১৪]

কর্তব্যে অবহেলার শাস্তির বিধান :

কর্তব্য অর্থ অবশ্য করণীয় দায়িত্ব, যা করতে হবে। যেসব দায়িত্ব পালন করা বা যেসব কাজ করা আমাদের অপরিহার্য, তাকে কর্তব্য বলে। আমাদের জীবন হচ্ছে কতগুলো কাজের সমষ্টি। যার উপর যে কাজের দায়িত্বভার থাকে, তা পালন করা হচ্ছে তার কর্তব্য। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করাকে বলা হয় কর্তব্যপরায়নতা। অর্থাৎ যার উপর যতটুকু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে, তা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার অনূভূতি নিয়ে সুষ্ঠ সুচারুরূপে পালন করার নামই কর্তব্যপরায়নতা। আরও ব্যাপকভাবে বলা যায়, মানুষ হিসেবে স্রষ্টার ও সৃষ্টির জন্য যা কিছু কল্যাণকর তা করার নাম কর্তব্যপরায়নতা।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর সেরা হিসেবে পৃথিবীতে তার কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। দায়িত্ব-কর্তব্য ঘাড়ে নিয়েই মানুষের পৃথিবীতে আগমন। মানুষকে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য আঞ্জাম দেয়ার জন্যই এ মাটির পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা-পরিসীমা নেই। তার সব কর্তব্য একজন মানুষ পালন করতে পারে না। একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সকল অঙ্গনে কর্তব্যপরায়নতার সীমাহীন সুফল রয়েছে। কর্তবে অবহেলা ব্যক্তি জীবনকে যেমন ধ্বংশ করে, জাতীয় জীবনেও বয়ে আনে ধ্বংশের অশুভ বার্তা। কর্তব্যপরায়নতার বদৌলতেই ব্যক্তি ও জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে পারে। কেননা, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "চেষ্টা-সাধনা ব্যতীত মানুষের কিছুই হয় না"।[১৫] চেষ্টা ও কর্তব্যপরায়নতার মাধ্যমেই জনমনে নিয়ম-শৃঙ্খলা আসে, কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দেশ ও জাতির অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসে। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "কোন জাতি নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যদি চেষ্টা না করে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা ভাগ্য পরিবর্তন করেন না"।[১৬]কর্তব্যপরায়নতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং নেতা যিনি জনগনের তত্ত্বাবধায়ক, যিনি অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেন। প্রত্যেক পুরুষ নিজ পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক এবং তিনি নিজের অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর প্রত্যেক স্ত্রীলোক তার স্বামীর পরিবারের লোকদের ও তাঁর সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক এবং তিনি তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত

---

১৪. ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النارولن تجد لهم نصير- (আল-কুরআন ৪:১৪৫)

১৫. ليس للانسان الا ما سعى (আল-কুরআন, ১৬:৪০)

১৬. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم-" (আল-কুরআন,১৩:১১)

Dhaka University Institutional Repository

হবেন। কোন ব্যক্তির চাকর স্বীয় মনিবের সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৭] কতর্ব্যে অবহেলার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আর তা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পরকালীন জীবনে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনে তা অকল্পনীয় বিপর্যয় এবং অশান্তি ডেকে আনে। রাষ্ট্রের জনগনের মৌলিক অধিকার ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এসব রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের জীবন, মান-ইজ্জত, সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেওয়া, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সরকার প্রধানের কর্তব্য। সরকার প্রধান যদি এ কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে দেশের স্বাধীনতা যেমন হুমকির সম্মুখীন হয়, তেমনি জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। ফলে সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং দেশের প্রচলিত আইনে তার শাস্তির নির্ধারিত হয়। পিতামাতার কর্তব্য হলো সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁরা এ কর্তবে অবহেলা করলে সন্তান বিপদগামী ও সন্ত্রাসী হিসেবে গড়ে উঠে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তানের অপরাধে পিতামাতাকেও শাস্তির মুখোমুখী হতে হয়। যেমন রানা প্লাজা এর মালিক সোহেল রানা বেপরোয়া ভাবে বেড়ে উঠেছেন। গড়ে তুলেছেন বৈধ-অবৈধ সম্পদ, অপরিপক্ক অট্টালিকা। আর তা ভেঙ্গে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। শত শত মানুষ নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এ অপরাধে সোহেল রানার সাথে তার পিতা আবদুল খালেককে আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এত মানুষের জীবন নিয়ে যে মৃত্যু খেলা খেলল, তার কি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে? বিচারের দীর্ঘ সূত্রীতার কারণে হাজারো সোহেল রানার জম্ম হয়। মৃত্যু কুপে পতিত হয় এদেশের সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় মানুষগুলো।

শিক্ষক হলেন সমাজ গঠনের কারিগর। এ শিক্ষকের কর্তব্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষা ও সৎচরিত্র ও আদর্শবান, দেশপ্রেমিক মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা। সে শিক্ষক কর্তব্যে অবহেলা করলে শিক্ষার্থী কুশিক্ষা পেয়ে সন্ত্রাসী, ডাকাত, ধর্ষক, খুনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা থাকলে তার পক্ষে উন্নতি লাভ সম্ভব হয় না। সে পড়াশুনা, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষকতায়, চাকরিতে বা অন্যকোন পেশাতে সফলতা লাভ করতে পারে না। ফলে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে একজন অপরাধী ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আইনের আওতায় এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখামুখী হতে হয়।

একজন ড্রাইভার একটি গাড়ীর পরিচালক। তাঁর গাড়ীর সকল যাত্রীর ভাল-মন্দের দায়িত্ব তার উপর। সে যদি দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে বেপরোয়া গাড়ী চালান তাহলে হতাহতের জন্য তাকে দায়ী করা হবে এবং তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্ঘটনা জনিত অপরাধী নিয়ন্ত্রিত হবে না। মানুষ কারণে অকারণে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসদের দ্বারস্থ হন। ভোজ্য ও ভোগ্য পণ্য চিকিৎসকের কর্তব্যে অবহেলা ভূল বা অপচিকিৎসার কারণে রোগী প্রাণ হারায়। এর দায় চিকিৎসক এড়াতে পারে না। তাই তাকে মৃত্যুজনিত কারণে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বি.এস.টি.আই এর অনুমোদন ছাড়া ভেজাল ও মানহীন পণ্য উৎপাদন করে। এতে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থের জন্য বিপুল হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থার দায়িত্বে অবহেলার কারণে তাকে জেল-জরিমানা সম্মুখীন হতে হয়।

---

১৭. الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته- فا لامام الذى ولى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والامراة رعيته على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته- (বুখারী ও মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্যে অবহেলাকারী পৃথিবীতে বিভিন্ন পর্যায়ে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয় এবং তার সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে পরকালের ব্যর্থতা। পৃথিবীতে যারা কর্তব্যে অবহেলা করে আল্লাহ তা'য়ালা পরকালে তাদেরকে কঠিন, লাঞ্ছনাপ্রদ ও চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন। তাদের স্থায়ী আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। সুতরাং দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের সার্বিক সাফল্য কর্তব্যপরায়নতার উপর নির্ভর করে।

হারাম উপার্জনের শাস্তির বিধান :

হালাল উপার্জনের বিপরীত হারাম উপার্জন। আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (স.) যে সব পন্থায় আয় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম। হালাল-হারাম নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (স.) ছাড়া আর কারো নেই। ন্যায়-নীতি বর্জিত মানবতা বিরোধী মানুষের জন্য ক্ষতিকর পন্থায় আয় উপার্জনকে হারাম উপার্জন বলা হয়। হারাম পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ ভোগ করাও হারাম। আর হারামের দ্বারা যে দেহ গঠিত হবে, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। মদ, গাঁজা, হিরোইন, আফিম, মৃতজন্তু, শূকরের মাংস বেচাকেনা হারাম। জুয়া, প্রতারণা ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে উপার্জন হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভেজাল, খাদ্য মওজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধি, পণ্য, ওজনে কম-বেশী করা হারাম। সুদ–ঘুষের মাধ্যমে উপার্জন হারাম। পরের সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, চাঁদাবাজির মাধ্যমে উপার্জন হারাম। বেশ্যা ও পতিতাবৃত্তির তথা দেহ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন হারাম। নিষিদ্ধ পন্য দ্রব্য ভোগ ব্যবহার ও বেচা-কেনা মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম। গান-বাজনা নৃত্য জাতীয় পেশার মাধ্যমে উপার্জন হারাম। অশ্লীলতার প্রসার ঘটে এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপার্জন হারাম। হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তি নিজের ও মানব সমাজের জন্য মারাত্মক পরিণাম বয়ে আনে। হারাম পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ ভোগ করা ও হারাম। আর হারামের দ্বারা যে দেহ গঠিত হবে তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। হারাম উপার্জন ভক্ষণ না করার বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।"[১৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "যে গোশত হারাম জীবিকা দ্বার গঠিত তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম জীবিকায় গঠিত প্রতিটি গোশতের জন্য উপযুক্ত আবাস হল জাহান্নাম"।[১৯] হারাম উর্পাজন একদিকে যেমন আল্লাহর নিদের্শের বিরোধীতা করা হয় তেমনি অনুসরণ করা হয় কুপ্রবৃত্তিরও। কেননা শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি সর্বদা মানুষকে হারামের প্রতি উৎসাহিত করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[২০]হারাম উপার্জন ব্যবহার করে ইবাদত করলে এ ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এরশাদ করেছেন- "মানুষ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে (কাবায় আসে) এবং (দোয়া কবুলের আশায়) অবিন্যস্ত চুলে ধুলি ধুসরিত অবস্থায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ধরে বারবার বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! (হে আমার রব!) অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, হারাম তার পোশাক এমনকি সে লালিত পালিত হয়েছে হারাম ভাবে। এমন ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হবে?"।[২১]হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হাশরের মাঠে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া কেউ এক কদম নড়তে পারবে

১৮. -يايها االذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (আল-কুরআন, ২:১৮৮)

১৯. -لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت كل جسد نبت من السحت كانت النار اولى به (বায়হাকী)

২০. -يايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (আল-কুরআন, ২:১৬৮)

২১. মুসলিম ইবনু হাজ্জা, *সহীহ আল-মুসলিম*; মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিজী*

Dhaka University Institutional Repository

না। (১) বয়স সম্পর্কে কিসে তা অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবন সম্পর্কে-কিসে তা ব্যয় করেছে? (৩) মাল সম্পর্কে-কোন পথে তা আয় করেছে? (৪) অর্জিত মাল কোন পথে ব্যয় করেছে? (৫) অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কতটুকু আমল করেছে? হারাম উপার্জনের ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ সম্পদ উপার্জন ও ভক্ষণ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির জন্য চরম ক্ষতিকর। এর ফলে অন্য যে কোন ব্যক্তির অধিকার খর্ব করা হয়। এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সমাজে লোকদের একে অপরের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হয়। মানুষের কাছে নিজেকে হীনমন্য ও অপমানিত হতে হয়। এমনকি পরকালেও অপমানের গ্লানি টানতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যায় পথে উপার্জনকারী ব্যক্তির দুঃশ্চিন্তার সীমা থাকে না। উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও ভয় তার মানসিক শান্তি নষ্ট করে। সর্বোপরি এসব উপার্জিত অর্থ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় না। এ হারাম উপার্জনকারীরা নির্দ্বিধায় অপচয় ও অপব্যয়ের নিষিদ্ধ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। তাই চাকরিজীবিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে চাকরিচ্যুতির সাথে সাথে জেল বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করতে হবে। যাতে কেউ আর এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হতে না পারে। আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তা'যীরী শাস্তি হিসেবে কঠোর শাস্তির মুখামুখী করতে হবে। যাতে কেউ এ ধরনের অপরাধ ও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে না যায়।

তাকওয়া বিহীন জীবন যাপনের শাস্তির বিধান :

তাকওয়া শব্দটি ওয়াকিউন শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। এর শাব্দিক অর্থ রক্ষা করা, বাঁচিয়ে রাখা,[২২]যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর"।[২৩]তাকওয়ার মূল অর্থ আত্মরক্ষা করা। এ শব্দটি আত্মশুদ্ধি লাভ করা, সংযত ও সর্তক হওয়া, অমঙ্গল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা বা কোন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে তাকওয়া বলতে বুঝায় আল্লাহ্ ভীতি। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহকে ভয় করে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ, সুদ-ঘুষ, লুণ্ঠন তথা সকল অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার নামই তাকওয়া। মোট কথা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সকল হুকুম আহকাম পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া। যিনি এ গুনাবলীর অধিকারী তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহ্র নিকট তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মাপকাঠি। একজন দিন মজুর রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী বা কোটি প্রতি থেকে ও শ্রেষ্ঠ যদি তিনি তাকওয়াবান হন। কেননা আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদা লাভের মানদন্ড হল ব্যক্তির তাকওয়া। আল্লাহ্ বলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তাকওয়াবান ব্যক্তিই অতি মর্যাদাবান।"[২৪]পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব, ভালবাসা, সম্মান ও সাফল্য লাভের জন্য যেমন তেমনি পরকালে ও সফলতা ও কল্যাণ পাওয়ার জন্য তাকওয়া বিকল্প নেই। প্রাণহীন দেহ, বিদ্যুৎহীন বাতি, ফলহীন বৃক্ষ যেমন, তেমনি তাকওয়াহীন ব্যক্তির জীবন। কোন ব্যক্তির বা সমাজের মানুষের মধ্যে তাকওয়া না থাকে তাদের পার্থিব জীবন লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অশান্তি ও ব্যর্থতার শিকার হয়, আর পরকালীন জীবনেও নেমে আসে অন্তহীন দুভার্গ্য ও অসাফল্য। তাকওয়া না থাকলে মানুষ পাপ প্রবণ হয়ে ওঠে। তার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে না। সে বিনাদ্বিধায় পাপকাজে লিপ্ত হয়। কেননা সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ যে সবকিছু দেখেন সেই ভয় তার মধ্যে সক্রিয় থাকে না। এক সময় অন্যায় করাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "নিশ্চয়ই প্রত্যেক

---

২২. ড. মুহাম্মদ রাউস কালজিয়া; ড. হামেদ সাদেক কুনাইবী, *মু'জামূ লুগাতুল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪১

২৩. ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الخرة حسنة وقنا عذاب النار- (আল-কুরআন, ২ : ২০১)

২৪. ان اكرمكم عند الله اتقاكم- (আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩)

Dhaka University Institutional Repository

মানব মনই মন্দ কাজের আদেশ দাতা।"[২৫]তাকওয়াহীন ব্যক্তির জীবনে জান্নাত লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, তাকাওয়াহীন মানুষ ঈমানহীন ও পাপাচারী হয়। তার মধ্যে ইসলামী আখলাক থাকে না এবং ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলে না। এ ব্যক্তির নিকট আখিরাতের জীবনের চেয়ে পৃথিবীর জীবনই বেশী কাম্য। সব সময় আখিরাতের ওপর সে দুনিয়াকে প্রধান্য দেয়। যে জন্য এমন ব্যক্তির চিরস্থায়ী ঠিকান হয় জাহান্নাম। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "তারপর যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে জাহান্নামই তার উপযুক্ত আবাস।"[২৬]তাকওয়া হল ইবাদতের প্রাণ। তাকওয়া ছাড়া কোন ইবাদতই যথার্থ হয় না। তা অন্তঃসারশূণ্য নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা একেবারেই মূল্যহীন। তিনি ইবাদতের বাহ্যিকরূপ কবুল করেন না। তার নিকট বিবেচ্য বিষয় হল তাকওয়া। সে জন্য তাকওয়া বিহীন ইবাদত কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "নিশ্চয়ই নিয়তের উপরেই কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল"।[২৭]তাকওয়াবিহীন পার্থিব জীবন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা পূর্ণ হয়। যা ব্যক্তিকে আইন ভাঙ্গতে ও ফিৎনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতি সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। মানুষ পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ পরিত্যাগ করে। বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি যে ভয়াবহ অন্যায় এবং এর ফলে যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ অনিবার্য হয়ে পড়ে তাকওয়াহীন মানুষ তা বিবেচনা করে না। ফলে জীবন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বিষবাষ্পে দুর্বিসহ হয়ে উঠে। তাকওয়া ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয়না। কেননা তাকওয়াই মূলতঃ ঈমান। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও নিয়ামতে দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তাকওয়া সৃষ্টি হয়। যে জন্য তাকওয়াহীনতার অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতা ও নিয়ামতে অবিশ্বাস, সে জন্য যার মধ্যে তাকওয়া নেই, প্রকৃত পক্ষে তার মধ্যে ঈমানও নেই। আর এ তাকওয়াহীনতা মানুষের মন-মানসিক ক্ষমতা, দৃঢ়তা ও শক্তি ধ্বংশ করে। ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় না থাকায় অন্য হাজারো ভয় স্থান করে নেয়। এমনকি যে সকল প্রাণী, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক বিষয় আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের ভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকেও সে ভয় করতে থাকে।

মিথ্যা কথা বলার শাস্তির বিধান :

মিথ্যাচারের আরবী প্রতিশব্দ আল-কিযব। সিদকের বিপরীত হল কিযব[২৮]অভ্যাসগতভাবে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা কাজ করা কিংবা মিথ্যা বা কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া হল কিযব বা মিথ্যাচার। সত্য কথা না বলে বা যে ঘটনা ঘটেছে বা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ না দিয়ে, পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনই হল মিথ্যাচার। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেনি,যার কোন অস্তিত্ব নেই, তা বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করাই মিথ্যাবাদীতা। মিথ্যাচার যার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাকে কাযিব বা মিথ্যাবাদী বলে। আর মিথ্যাবাদীতার চরমে যে পৌঁছে যায় তাকে কাযযাব বা চরম মিথ্যাবাদী বলে। দুনিয়া ও পরকালীন জীবন শান্তি পূর্ণ হওয়ার বড় অন্তরায়হল মিথ্যাচার। এর কুপ্রভাবে ঈমান থাকে না। মিথ্যাচার আর ঈমান একত্রে থাকতে পারে না। কেননা ঈমান পোষণের অর্থ হল সত্য মেনে নেওয়া। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদ"।[২৯]

---

২৫. ان النفس لامارة بالسوء- (আল-কুরআন, ১২ : ৫৩)

২৬. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى الماوى (আল-কুরআন, ৭৯ : ৩৭-৩৯)

২৭. انما الاعمال بالنيات – (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, খ.১ পৃ. ২

২৮. মুফতী আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়েদুল ফিকহ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪০

২৯. انما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بايات الله اولئك هم الكاذبون- (আল-কুরআন, ১৬ : ১০৫)

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যাচারিতা ইবাদত কবুলের অন্তরায়। সে জন্য আল্লাহ তার ইবাদত কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুসারে কাজ করা ত্যাগ করে না তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই"।[৩০]মিথ্যাচারিতা একটি ঘৃন্য ও অভিশপ্ত কাজ। যার মধ্যে এর অনুশীলন যত প্রবল তার জন্য ঘৃণা ও অভিশাপের ধারা ও তত প্রবল। আল্লাহ্ তা'য়ালা ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। ইহা এক ভয়ঙ্কর জুলুম। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে? কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নাম নয় কি?"[৩১]

মিথ্যাচারী ব্যক্তি নিজেই গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট। তার জন্য আল্লাহর রহমত ও ভালবাসা থাকে না বলে আল্লাহ্ তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন না। ফলে তার জীবন কাটে গুমরাহির মধ্যে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘণকারী মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না"[৩২]মিথ্যাচারের ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা শুধু মিথ্যাকেই বর্জন করার নির্দেশ দেননি বরং মিথ্যাবাদীকে বর্জনের নিদের্শ দিয়েছেন। কেননা তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ"।[৩৩]আল্লাহ এ মিথ্যাচারের জন্য পূর্ববর্তী জাতি সমূহকেও শাস্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে শাস্তিও তাদেরকে গ্রাস করল। তারা টেরও পেল না"।[৩৪] মিথ্যাচার পরকালে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "সে দিন মিথ্যাচারীদের জন্য ধ্বংশ ও দুর্ভোগ"।[৩৫]মিথ্যাবাদীদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তার উপর অহঙ্কার বশত অস্বীকার করবে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে"।[৩৬] এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাক। কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ নিয়ে যায়, জাহান্নামের দিকে।"[৩৭] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "ধ্বংশ বিনাশ সে ব্যক্তির জন্য যে লোকদেরকে হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য রয়েছে অনিবার্য ধ্বংশ এবং অমঙ্গল"।[৩৮]সীমালঙ্ঘন ও মিথ্যাচার একই রকম পাপ। একে শিরকের চেয়ে মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন। আর ইহা কবীরা গুনাহ্ সমূহের অন্যতম কবীরা গুনাহ্ । এর মাধ্যমে বাহ্যিক ও সাময়িক সুবিধা ভোগ করলেও চিরস্থায়ী ধ্বংশ ডেকে আনে। তাই এ মিথ্যা নীতি ও নৈতিকতার পরিপন্থী হওয়ায় মিথ্যাবাদিকে তা'যীরী শাস্তি হিসেবে জেল-জরিমানা বা উভয়বিদ দন্ড বা

---

৩০. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী

৩১. -فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس فى جهنم مثوى للكافرين (আল-কুরআন ৩৯ : ৩২)

৩২. ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب (আল-কুরআন, ২৩ : ২৮)

৩৩. -فنجعل لعنت لله على الكاذبين(আল-কুরআন, ৩ : ৬১)

৩৪.-كذب الذين من قبلهم فاتهم العذاب من حيث لايشعرون (আল-কুরআন, ৩৯:২৫)

৩৫. -وويل يومئذ للمكذبين (আল-কুরআন, ৮৩ : ১০)

৩৬. -والذين كذبوا بايتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (আল-কুরআন, ৭ : ৩৬)

৩৭. -اياكم الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار (মুহাম্মদ ইবনে ইমাঈল, *সহীহ আল- বুখারী*)

৩৮. -ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القول ويل له ويل له (তিরমিযী)

Dhaka University Institutional Repository

দেশান্তরের মত শাস্তি প্রদান করা জরুরী। অন্যথায় মানুষ সত্য বিমুখ হয়ে মিথ্যাকে চলার পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করবে।

কবর বা মাজার,বেদীতে ফুল দেওয়ার বিধান :

পৃথিবীতে কবরের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্নে হযরত আদম (আ.) এর সন্তান হাবিল কাবিল ও আকলিমা, লেওয়াজার মধ্যে বৈবাহিক দ্বন্ধের সৃষ্টি হয়। কাবিল তার জোড়ার বোন আকলিমা কে বিয়ে করার বিষয়ে অনড় থাকে। কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা তা ফয়সালা করে দেওয়ার পরও কাবিল তার দাবীতে অবিচল থাকে। এক পর্যায়ে কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে হত্যা জনিত অপরাধ সংগঠিত করে এবং এ লাশ নিয়ে সমস্যায় পড়ে যায়। আল্লাহ্ পাক এক জোড়া কাক পাঠিয়ে তার সামনে একটি কাক অপরটিকে হত্যা করে এবং পায়ের মাধ্যমে গর্ত সৃষ্টি করে অপর কাককে মুখ দিয়ে টেনে মাটি চাপা দেয়। তা দেখে কাবিল তার ভাইকে সমাহিত করার শিক্ষা লাভ করে এবং হাবিল কে সমাহিত করে। যা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় অনেক দীর্ঘ বর্ণনা এসেছে। আজো মুসলমান কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাকে সম্মানের সাথে কবরে সমাহিত করা হয়। এর মাধ্যমে মৃত দেহকে সম্মানের সাথে সমাহিত করা হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- "কবর একটি বেহেশতের বাগান অথবা আগুনের গর্ত সমূহের একটি গর্ত"।[৩৯]ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তখন মুসলমানরা ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল না। আশংকা ছিল যে যদি কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে মুসলমানরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত কবর পুজা শুরু করবে। পরক্ষণে যখন মুসলমানরা ইসলামী হুকুম আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স.) কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর তোমরা কবর যিয়ারত কর"।[৪০] অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "অতঃপর নিশ্চয়ই কবর যিয়ারত তোমাদেরকে পরকালকে স্মরণ করে দিবে।"[৪১] ফলে জীবিতরা এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত হবে। কবর পুজার উদ্দেশ্যে কবরের উপর বসা, কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়বে না এবং কবরের উপর বসবে না।"[৪২] নৈকট্য হাসিলের জন্য কবরের চারদিকে তাওয়াফ করা কখনো সমীচীন নয়। কেননা কা'বা ঘর ছাড়া কোন স্থানেই তাওয়াফ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "এবং তারা যেন এই সংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে"।[৪৩] কবরে গেলাফ, তৈল লাগানো এবং কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা সমীচীন নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসে এসেছে- "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কবরের উপর বসা এবং তার উপর কোন কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪]আমাদের দেশে হাজার হাজার মাজার রয়েছে। এসব

---

৩৯. القبرمن رياضى الجنة او حفرة من حفار النيران

৪০. -كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুসাইরী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত খ-২, পৃ.২৭২
৪১. -فانها تذكركم با لا خرة (আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত খ. ৫, পৃ. ৩৫০, ৩৫৫

৪২. -لا تصالوا الى القبور ولا تجلسوا عليها (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*)

৪৩. -وليطوفوا بالبيت العتيق (আল-কুরআন, ২২:২৯)

৪৪ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ; সহীহ আল-মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

মাজারে বহুলোক শ্রদ্ধা, ভক্তি এমনকি কবরকে সিজদা করছে। কবর ধোঁয়া পানি পান করছে। কিছু কিছু মাজারে গাজার ব্যবসা চলছে। কেউ কোন ধর্মীয়, বাধা-নিষেধ মানছে না। যে যেভাবে পারছে সেভাবে মাজার নির্মাণ করে খাদেম বনে যাচ্ছে। নিরীহ ও অশিক্ষিত মানুষগুলোকে প্রতারিত করছে। পীর ও মাজার প্রথাটা এক ধরনের ব্যবসা হিসেবে অনেকে গ্রহণ করেছে। হালালভাবে ব্যবসা করতে গেলে বড় ধরনের পুঁজি, মেধা ও সঠিক তদারকি প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে মাজার ব্যবসায় তেমন কোন পুঁজি, মেধা ও যথার্থ তদারকির প্রয়োজন হয় না। মাজার তৈরী করা যদি বৈধ ও শরী'আত সম্মত হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর রওজা মোবারক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মাজার হত (নাউযুবিল্লাহ)। কবরে বা মাজারে গেলাপ লাগানোর বৈধতা থাকলে মানুষ নিজের কলিজা চিড়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর রওজা মোবারকের গেলাপ বানিয়ে দিত। প্রাসাদ বা বিল্ডিং বানানোর সুযোগ থাকলে মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টাওয়ার নির্মাণ করতো। কিন্তু এসব কিছু রাসূলুল্লাহ্ (স.), খুলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনদের যুগে বৈধ বলে মত পাওয়া যায় না। ইসলাম তা কোন মতে সমর্থন করে না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও খোলাফায়ে রাশেদার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান পরবর্তীতে আর কেউ নেই। তাই তাঁদের রওজা মোবারকে এসব কিছু হয়নি। তাহলে আমাদের দেশে এসব কিছু অবৈধভাবে স্বার্থ হাসিলের জন্য হচ্ছে। সারা জীবন পাগল হয়ে পথে পথে হেঁটেছেন। শরী'আতের কোন রুকন পালন করেননি। অথচ মৃত্যুর পর পরই তিনি হয়ে যান বড় অলি বা দরবেশ। এই সুযোগে একদল লোক তার কবরকে মাজার বানিয়ে পুজা শুরু করে দেয়। যা ইসলামী শরী'আত কোন মতে সমর্থন করে না। আমরা একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, কবর পুজারী, ইয়াহুদী, নাসারা ও প্রতিমা পুজারীর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। মাটির তৈরী প্রতিমার যেমন কোন ক্ষমতা থাকে না তেমনি মৃত ব্যক্তি বা মাজারের সমাধিস্থ ব্যক্তিরও কোন ক্ষমতা থাকে না। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার সকল কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। তারা দুনিয়ার কোন জীবিত মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তারা দুনিয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মানুষ যখন মরে যায় দুনিয়ার কাজের সাথে তার সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে যায়। কেবল তিন রকমের কাজের সাথে সম্পর্ক থাকে। এগুলো হলো সদকায়ে জারিয়া বা অবিরত দান, কল্যাণ লাভ হয় এমন জ্ঞান এবং সৎ সন্তান যে তার জন্যে দোয়া করে"।[৪৫] কেউ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তি, নবী, অলি, দরবেশ, পীর-মাশায়েখের কবর বা মাজারে গিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি,কামনা-বাসনা ইত্যাদি যাবতীয় কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে বাঁচার ইচ্ছা কামনা করে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নিজের কামনা বাসনা প্রকাশ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না, অপকারও করতে পারবে না। বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ কর তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"[৪৬]কবরে ফুল দেয়া, কবরে ফুল বহন করে নিয়ে যাওয়া, বেদীতে বা স্মৃতিসৌধ বানিয়ে তাতে ফুল দেওয়া ইয়াহুদী, নাসারাদের অনুসরনীয় কাজ। কেননা তা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর কিছুই করতে পারে না। তাই এক মিনিট নীরবতা পালন ও ফুল দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ, যা তাদের পরকালীন জীবনের জন্য কোন উপকার বা কল্যাণ বয়ে আনে না। অথচ ইসলামী শরী'আতে ফাতিহা পাঠ ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্য উপকারী হয়। তাই ফুল দেওয়া ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা মুসলমানদের জন্য অনর্থক যা ইসলামে হারাম। তা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। এসব

৪৫. -اذمات الاسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الامن صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*,

৪৬. -ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك فان فعلت فانك اذامن الظالمين (আল-কুরআন, ১০:১০৬)

Dhaka University Institutional Repository

কাজে টাকা পয়সা নষ্ট হয়, কোন উপকার হয় না, যা অপচয়কারী হিসেবে অভিহিত হয়। যদি এ টাকা পয়সা গরীবদের মধ্যে দান সদকাহ্ করা হয় তাহলে মৃত ব্যক্তি ও গরীব সকলেই উপকৃত হয়। ভাবে লক্ষ্য করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা কারো মৃত্যুজনিত কারণে স্মৃতিসৌধ বা বেদী তৈরী করা রাসূলুল্লাহ্ (স.), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি ইসলামে তা বৈধ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ (স.) বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে শহীদদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতেন। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদার যুগে অনেক যুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁরাও কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেননি। ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০০ (সাত শত) হাফেজে কুরআন শহীদ হয়েছেন। আমিরুল মুমেনীন আবু বকর (রা.) তাঁদের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্মৃতিসৌধ বা ভাস্কর্য নির্মাণ করেননি। এসব কিছু প্রমাণ করে যে, ইসলাম কখনো ইয়াহুদী, নাসারাদের কাজকে সমর্থন করে না। যারা এরূপ করবে তারা মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে। তাই তারা দুনিয়ার জীবনে অপমান ও পরকালীন জীবনে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। যদি এ সব কবর বা মাজার পূজারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয় তাহলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে মসজিদ মুখী না হয়ে মাজার মুখী হবে। তাই এ সব অপরাধ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মানুষ শিরক, বিদয়াত থেকে মুক্ত হয়ে সুন্দর ঈমানী জিন্দেগী গহণ করতে পারবে।

সৎকাজে আদেশ না করা ও অসৎকাজে নিষেধ না করার শাস্তির বিধান :

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করে তাদেরকে এভাবে কোন দায়-দায়িত্বহীন ভাবে ছেড়ে দেননি। কেননা তারা হলেন সৃষ্টির সেরা। তাই মানুষ হিসেবে গুরু দায়িত্ব রয়েছে তা কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর তা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ। তার উপরই গোটা সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। অন্যায়-অবিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়া মুসলিম উম্মাহর প্রধান বৈশিষ্ট্য   সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দান করবে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে"।[৪৭] যখন মুসলিম উম্মাহ এ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দেবে তখন সমাজে বিপর্যয় নেমে আসবে, চরিত্র ধ্বংশ হবে, মানুষের লেনদেন ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে। যার ফলে পুরা সমাজ কলুষিত হয়ে উঠবে। আর এ দায়-দায়িত্ব কেবল কোন ব্যক্তির সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এটা পুরুষ, মহিলা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, সরকার-বিরোধীদল সকলের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "তোমাদের মধ্যে কেউ সমাজ বিরোধী অন্যায় ও গর্হিত কাজ করতে দেখলে সে যেন ইহা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে। যদি শক্তি প্রয়োগে সক্ষম না হয় তাহলে সদুপদেশ দ্বারা প্রতিবিধান করবে। যদি তাতে ও সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন আন্তরিক ঘৃণা করে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ[৪৮]কেউ যদি এ দায়-দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সে দুনিয়ার জীবনে তা'যীরী শাস্তি ভোগ করবে আর পরকালে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে। মৌলিকভাবে সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করার জন্য প্রয়োজন একটি কেন্দ্রিয় কর্তৃপক্ষ বা ইসলামী সরকার ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ মূলনীতির আলোকে রাসূলুল্লাহ (স.) স্বয়ং মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন এবং তাঁর অর্ন্তধানের পর খুলাফা ই-রাশিদীন তাঁর পদাংক অনুসরণ করে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হল, তারা মানব জাতির উপকারার্থে সমর্থিত হয়েছে। আর তাদের উপকার হচ্ছে, মানব জাতির

---

৪৭. كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤ منون بالله- (আল-কুরআন, ৩ : ১১০)

৪৮. من راى منكم منكر فليتغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه-فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان- । (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ: সহীহ মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণত্ব লাভ করেছে। সহীহ হাদীস সমূহ হতে বুঝা যায় যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মাধ্য জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারতো। মুসলিম সম্প্রদায় বহুকাল এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জেহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভূক্ত। এ ছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কর্তব্যটি ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর কর্তব্য পুরাপুরি পালন করে যাবে। আর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দায়-দায়িত্ব পালনে কিছু কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে :

প্রথমত রাষ্ট্র প্রধান মজলিশে শূরা বা জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যেমন সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি নিষিদ্ধ ও যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা ঘোষণা দিতে পারেন। মদ বা নেশা জাতীয় সকল বস্তু হারাম, তা নিষিদ্ধ করে ক্রয়-বিক্রয়ের লাইসেন্স বন্ধ করতে পারেন। খাদ্যে ভেজাল প্রদান মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ, তাই তা কঠোর হস্তে দমন করে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেক জুমু‘আ ও দুই ঈদের খুৎবায় খতীব মানুষকে বিভিন্ন অসৎ কাজে ভয় প্রদর্শন করবেন এবং মুসল্লিদেরকে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান দেবেন।

তৃতীয়ত ফরয ইবাদত তথা নামাজ, রোজা ছেড়ে দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করা, সকল কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সর্তক করবেন। যেমন মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া ও সাহায্যে চাওয়া।

ফরয ছেড়ে দেওয়ার শাস্তির বিধান :

ইসলামী শরী‘আতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ্, নফল ও মুস্তাহাব সহ বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফরয হল সবগুলোর মধ্যে সেরা। ফরয শব্দের অর্থ আবশ্যক, অবশ্যকরণীয়। তাই তো ইবাদত হউক বা কোন আদেশ-নিষেধ হউক। আল্লাহ পাক যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন তা পালন করা ফরয বা অত্যাবশ্যক। কেউ যদি ফরয অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কেউ অস্বীকার না করে অমান্য করলে তা কবীরা গুনাহ হবে। অস্বীকারকারী দুনিয়ার জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ভোগ করবে। আর পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি মুসলিম হওয়ার পর কুফরী করে তাহলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হবে। আর কবীরা গুনাহকারী খালেছ নিয়তে তওবা করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। ব্যক্তি যদি বার বার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তা বৈধ বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। যেমন সালাত একটি ফরয ইবাদত। পবিত্র কুরআনের ৮২টি স্থানে আল্লাহ্ তা‘য়ালা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এ নির্দেশ পালন ফরয। ব্যক্তি মুসলিম কিনা, সে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর প্রতি ঈমান পোষণ করে কিনা তা জানা যায় সালাত থেকে। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন- “তোমরা সালাত কায়িম কর এবং মুশরিকদের দলভূক্ত হয়ো না” ।[৪৯]সালাত কুফর ও ঈমানের মধ্যে

৪৯. واقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين- (আল-কুরআন, ৩০:৩১)

পার্থক্য রচনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত"[৫০]মুমিন সালাত কায়িম করে, কাফির তা বর্জন করে, এজন্য স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করা কুফরির মতো অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যায়"[৫১]সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "কি অপরাধে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে আসা হলো? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না"[৫২]যাকাত মালি ইবাদত সমূহের একটি ফরয ইবাদত। প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিম ব্যক্তি, যার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, সে সম্পদ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যার উপর মালিকানার মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর এমন ব্যক্তির উপর যাকাত দেওয়া ফরয। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। কোন মুসলিম ব্যক্তি বা দল যাকাত অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছেন- "রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর জীবদ্দশায় যাকাত হিসেবে আদায় করত বকরী বাঁধার এমন গাছি দড়ি ও তারা যদি এখন আদায় করতে অস্বীকার করে, আল্লাহর শপথ তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব"।[৫৩] যাকাত প্রদান করে মুমিন নিজের মালের পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যমে নিজের ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করে। মুশরিকরা যাকাত দেয় না। সে জন্য শিরকের নিদর্শন হলো যাকাত না দেওয়া। যাকাত আদায় না করার জন্য মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "মুশরিকদের জন্য ধ্বংশ, যারা যাকাত আদায় করে না এবং তারাই আখিরাত অস্বীকারকারী"।[৫৪] যাকাত ফরয হওয়ার পর তা আদায় না করলে আখিরাতে অত্যন্ত খারাপ পরিণতি বরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "আর যারা সোনা ও রূপা জমা রাখে কিন্তু তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের আযাবের সুসংবাদ দিন"[৫৫] মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা যে ইবাদত সমূহ ফরয করেছেন সাওম তার অন্যতম। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম পালন করা ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর"[৫৬]সে জন্যে চান্দ্রসনের রমজান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, স্থায়ী অধিবাসী (মুকীম) এবং বিবেকবান মুসলিমের উপর সিয়াম পালন করা ফরয। শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া সিয়াম ত্যাগ করা ভয়ানক অন্যায়। সঙ্গত কারণে সিয়াম পালন করতে না পারলে তা পরে যে কোন মাসে সুবিধা সময়ে কাযা করতে হবে। কেউ সাওম অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর অস্বীকার না করে আমলে শৈথিল্য হলে সে কবীরা গুনাহকারী হবে। এজন্য খালেছ নিয়তে তাওবা করে সিয়াম কাযা করতে হবে। আর যদি কেউ কাযা আদায় করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে তিনি কাফফারা প্রদান করে দায়মুক্ত হবেন। এমনিভাবে হজ্জ একটি অর্থনৈতিক ফরয ইবাদত। সুস্থ, সবল, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গতি আছে, এমন মুসলিমের উপর আল্লাহ্ তা'য়ালা সারা জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয করেছেন।

---

৫০. -الفرق بين الاسلام والكفر ترك الصلوة (*সুনান ইবনে মাজাহ*)

৫১. من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*)

৫২. -ما ساككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين (আল-কুরআন, ৭৪ : ৪২-৪৩)

৫৩. -والله لو منعو نى عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاتلتهم على منعه (*বুখারী ও মুসলিম*)

৫৪. -وويل للمشركين الذين لايؤتون الذكواة وهم بالاخرة هم كافرون (আল-কুরআন, ৪১ : ৬-৭)

৫৫. -والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم (আল-কুরআন, ৯ : ৩৪)

৫৬. -يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (আল-কুরআন, ২ : ১৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "আল্লাহর জন্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এমন মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে যার ঐ পর্যন্ত পথ অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে।"[৫৭]হজ্জ শুধু সওয়াব অর্জনেই নয় বরং আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা লাভের মাধ্যম হিসেবে ও গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথভাবে হজ্জ পালন করা হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যক্তির পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "যে ব্যক্তি হজ্জ করার জন্য বায়তুল্লাহ আগমন করে তারপর সব রকমের যৌনক্রিয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হয় না সে যেন সদ্যজম্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুর মতো প্রত্যার্বতন করে"[৫৮]

মান-সম্মান,ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করার শাস্তির বিধান :

মানুষের নিকট অত্যধিক প্রিয় তার জীবন ও সম্পদ। আবার সম্পদের চেয়ে মান-সম্মানের গুরুত্ব অনেক বেশি। সম্পদের ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু সম্মানের হানি ঘটলে তা কখনও পুষিয়ে নেয়া যায় না। তাই ইসলামী শরী'আত মানুষের মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে যে সকল কর্মকান্ড মানুষের মান-সম্মান ক্ষুন্ন করে এবং সমাজে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, সে সকল কর্ম ইসলামী শরী'আত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় নানা ভুল-ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে কিংবা অজ্ঞাতে অনেক অন্যায় কাজ করে ফেলে। কোন অবস্থাতেই অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের মান সম্পদ নষ্ট করা যাবে না কিংবা তাকে লাঞ্ছিত করা যাবে না। মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার্থে অপবাদ দেয়া বা কুৎসা রটনা হতে বিরত থাকা সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ এ সব অপবাদ ও কুৎসা রটনা একটি দুঃখজনক মারাত্মক অপরাধ। এটা ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারকে কলুষিত করে। এর দ্বারা মানুষের মানহানি ঘটে। ইসলাম কখনোই কোন মানুষের মান-সম্মান নষ্ট হোক তা কামনা করে না। তাই অন্যায়ভাবে কেউ কারো মান-সম্পদ-ইজ্জত নষ্ট করলে তা মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং ইসলামী দন্ডবিধিতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ সুবিচারের ব্যবস্থা করেছে। এ অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে যথার্থ প্রয়োগ হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ভঙ্গের শাস্তির বিধান :

মানব সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহঅবস্থান অপরিহার্য। সমাজের কিছু মানুষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আর কিছু মানুষ বঞ্চিত হলে স্বাভাবিক শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। বঞ্চিতরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে আর তাতেই শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা মহল যদি তা ভঙ্গ করে তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম এমন কর্মের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অশান্তি সৃষ্টি করার অধিকার আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে প্রদান করেননি। । যেমন মহান আল্লাহর বাণী "তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না"[৫৯]"ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[৬০]তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অবনতি ঘটতে পারে, এক্ষেত্রে অতি দ্রুত তা সংশোধন করে নেয়া কর্তব্য। যেমনটি

৫৭. وﷲ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا۔ (আল-কুরআন, ৩ : ৯৭)

৫৮. من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৫৯. لا تفسدوا فى الارض (আল- কুরআন,)

৬০. الفتنة اشد من القتل (আল-কুরআন, ২ : ১৯১)

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও"।[৬১]সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক নিষেধাজ্ঞা যদি কেউ অমান্য করে বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলামের কঠোর নির্দেশ হচ্ছে-"মুমিনদিগের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৬২]এ আয়াতটিতে এ নির্দেশ রয়েছে যে, যারা মানব সমাজের শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যে পর্যন্ত না তারা শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল আইন-কানুনই বিশ্বাবাসীর শান্তি ও কল্যাণের জন্য। বিশ্বাবাসীর সামগ্রিক শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

একে অপরকে উপহাস করার শাস্তির বিধান :

কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে উপহাস বা ঠাট্টা (سخرية) বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রুপ করার মাধ্যমেও হতে পারে।[৬৩]উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে মানুষকে হেয় ও অপমান করা হয় বিধায় আল-কুরআন এমন কর্মকান্ডকে হারাম ঘোষণা করেছে । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী হতে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে"।[৬৪]পবিত্র কুরআন এত গুরুত্ব সহকারে سخرية তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তির দেহ, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন প্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা তার জানা নেই যে, সম্ভবত এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে তার (উপহাসকারী) চাইতেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন এবং (এ বলে) তিনি আঙ্গুল দ্বারা নিজের বুকের প্রতি ইঙ্গিত করেন।"[৬৫]অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) উপহাস করা যে জঘন্যতম অপরাধ তা তিনি নিজের বুকের উপর হাতের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝিছেন।

---

৬১. فاصلحوا بين اخويكم لعلكم ترحمون- (আল-কুরআন, ৪৯ : ১০)

৬২. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى الى امر الله- (আল-কুরআন, ৪৯ : ৯)

৬৩. মুফতি মুহাম্মদ শফি, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮২

৬৪. يايها الذين امنوالا يسخر قوما من قوم عسى ان يكوموا خيرا منهم ولا نساء من يساء عسى ان يكن خيرا منهن (আল-কুরআন, ৪৯: ১১)

৬৫. ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى فلونبكم واشار باصابعه الى صدره- ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল- মুসলিম*, ফাযাইলুস সাহাবা অধ্যায়, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৪৬৫০

একে অপরকে দোষারোপ করার শাস্তির বিধান :

দোষারোপ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ لمز এর অর্থ কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না"।[৬৬]সুতরাং আয়াতের বক্তব্য হল আমরা যদি অন্যদের দোষ বের করি তাহলে অন্যরাও আমাদের দোষ বের করবে। এভাবে পরস্পরে দোষারোপ করার অর্থ পরস্পরের মান-সম্মান বিনষ্ট করা। ইসলামী শরী'য়াত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবার অধিকার দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে নিজেকে সংশোধন করে নেবে। এ কাজে ব্যক্তির পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।"[৬৭]অবশ্য ব্যক্তির যে দোষ-ত্রুটি দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ইসলামী শরী'আতে আবশ্যক। যারা সমাজে অন্যের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে এসব অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে।

মন্দ নামে ডাকার শাস্তির বিধান :

কোন ব্যক্তি একে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুণ সে অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া, লেংড়া, অন্ধ, টাকু, দাঁড়িওয়ালা, আটখোরা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোন গুনাহ অথবা মন্দ কাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে ডাকা। যেমন চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, হাইজাকার, স্মাগলার অথবা শারাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেওয়া ও হেয় প্রতিপন্ন করা হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচারণ থেকে নিবৃত্ত না হয় (তাওবা না করে) তারাই যালিম"।[৬৮]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গুনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে, তাকে সেই গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন।" তবে কোন লোকের যদি এমন মন্দ নামে খ্যাতি হয়ে যায়, ভাল নামে কেউ তাকে না চেনে, এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয়প্রতিপন্ন-লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এ নামে ডাকা বৈধ। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "এক মুমিন অপর মুমিনের উপর হক এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে।" এ কারণেই আরবে ডাক নামের প্রচল ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন যেমন হযরত আবূ বকর (রা.) কে আতীক, হযরত উমর (রা.) কে ফারুক, হযরত হামযা (রা.) কে আসাদুল্লাহ এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) কে সাইফুল্লাহ আবদুর রহমানকে আবু হুরায়রা পদবী দান করেছিলেন।

---

৬৬. ولا تلمزوا انفسكم (আল-কুরআন, ৪৯ : ১১)

৭৬. من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ২৫৩৪

৬৮. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظلمون (আল-কুরআন, ৪৯ : ১১)

Dhaka University Institutional Repository

অমূলক ধারণা করার শাস্তির বিধান :

ধারণা শব্দের আরবী ظن অর্থ প্রবল ধারণা। পবিত্র কুরআনে অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।"[৬৯]এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন ধারণা পাপ তা জেনে নেয়া ওয়াজিব। ইমাম আবূ বকর জাসসাস 'আহকামূল কুরআন' গ্রন্থে ظن বা ধারণাকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

ক. হারাম : হারাম ধারণা এই যে, মহান আল্লাহর প্রতি কু ধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দিবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্‌র ক্ষমা, মাগফিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমাদের কারো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।"[৭০]সুতরাং আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্ম পরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।" উল্লেখ্য যে, সকল আলিমের মতে এখানে ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলিমের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে।[৭১]

খ. ওয়াজিব : যেসব কাজের কোন একদিককে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যেমন ঃ পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকদ্দমার নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। কারণ যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় তার জন্য ফয়সালা দেয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমনভিাবে যে জায়গায় কিবলার দিক অজ্ঞাত থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

গ. জায়েয : জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাকাআত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাকাআত পড়া হয়েছে, না চার রাকাআত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি ব্যক্তি প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাকাআত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকআত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয।

ঘ. মুস্তাহাব : প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যায়।যেমন- কুরআনে এসেছে: "একথা শুনবার পর মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।"[৭২]

---

৬৯. - يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اث (আল-কুরআন, ৪৯:১২)

৭০. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن ইমাম মুসলিম ইবনু হুজ্জাজ, *সহীহ আল- মুসলিম*, প্রাগুক্ত, বাবু আল-আমরু বিহুসনিস যন্নি বিল্লাহি তা'আলা, হা.নং.-৫১২৪

৭১. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, বাবু মাজা'আ ফিল মাযাহের।

৭২. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين (আল-কুরআন, ২৪ : ১২)

Dhaka University Institutional Repository

দোষান্বেষণের শাস্তির বিধান :

দোষান্বেষণ এর আরবী প্রতিশব্দ হল ‘আত-তাজাচ্ছুস’ এর অর্থ সামনে যে দোষ-ক্রুটি দৃশ্য বা অদৃশ্যমান তা খুঁজে বেড়ান এবং তা প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হওয়া। এ দোষ-ক্রুটি ধরা অবৈধ নয়, কিন্তু কোন মুসলিমের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা বৈধ নয়।আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, “তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না”।[৭৩]সমাজে এমন লোক দেখা যায় যে, যাদের কাজ হচ্ছে গোপন দোষ সমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমানিত ও হেয়প্রতিপন্ন করা এবং সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট করা যা কোন মুমেন মুসলমানের জন্য কাম্য হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- “মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলামানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।”[৭৪] এ হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝ যায় যে, আল্লাহ তা‘য়ালা দোষ-ক্রুটি অনুসন্ধানকারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত, লাঞ্চিত এবং পরকালীন জীবনে জাহান্নামের শাস্তি ভোগকরবে। হবে। তবে যদি দোষ-ক্রুটি এমন পর্যায়ের হয় যে, যা প্রকাশ না করলে ইসলাম তথা সমাজ বা রাষ্ট্রের শান্তি ভঙ্গ বা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করে দেশকে অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এ সব দোষ-ক্রুটি অনুসন্ধানকারীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে জেল বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করলে কেউ আর এ ধরনের অপরাধ করার সাহস পাবে না। বয়ানুল কুরআনে এসেছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ যা তাজাচ্ছুস (تجسس) এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য কোন মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান বৈধ।

গীবত করার শাস্তির বিধান :

গীবত আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হল পরনিন্দা করা, অসাক্ষাতে কারো দূর্নাম করা, কুৎসা রচনা করা কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে যে কষ্ট পায়, যদিও সত্য কথা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) এ সম্পর্কে বলেছেন, “তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা শুনা সে অপছন্দ করে, তাই গীবত”।[৭৫] ইমাম আল-গাযালী (রহ.) বলেছেন, গীবত হচ্ছে তুমি তোমার ভাইয়ের দোষ-ক্রুটি এমনভাবে উল্লেখ করলে তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে তা অপছন্দ করবে। আর এ গীবত বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন গোপনে দোষ-ক্রুটি আলোচনা করা, প্রকাশ্য আলোচনা করা, লেখা লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইঙ্গিত বা ইশারার মাধ্যমে প্রকাশ করা ইত্যাদি। এ গীবত অত্যন্ত নিন্দনীয়ও গর্হিত কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন- “তোমরা একজন অন্যজনের গীবত কর না, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ কর? তোমরাতো তা অপছন্দ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা গ্রহনকারী ও দয়ালু”।[৭৬]অত্র আয়াতে কোন মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার মৃত ভাইয়ের গোশত

৭৩. لاتجسسوا (আল-কুরআন, ৪৯: ১২)

৭৪. لاتعتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عورا تهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته- ইমাম সুলায়মান আবু দাউদ, *আস-সুনান*, বাবু ফীল গীবাত, হা.নং. ৪২৩৬

৭৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *আল-জামি‘* প্রাগুক্ত,

৭৬. لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكر هتوه واتقوا لله ان الله تواب رحيم- (আর-কুরআন, ৪৯: ১২)

Dhaka University Institutional Repository

খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের গোশত টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। মূলত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের কথা বলে গীবতের নীচতা ও জঘন্যতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মুসলমানের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই। গীবত দ্বারা যেমন মানুষের মান-সম্মানের হানি ঘটে, তেমনি তা সমাজে ব্যাপক অশান্তিও সৃষ্টি করে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। গীবতকারীর নামাজ-রোযা সব বিফলে যায়। হাদিসে এসেছে, দুই রোযাদার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)সাথে যোহর ও আসরের নামাজ আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেকে বললেন, তোমরা উভয়ে পুনরায় যোহর ও আসরের সালাত আদায় কর এবং রোযা কাযা কর। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) ! আমাদের জন্য এ হুকুম কেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কারণ তোমরা রোজা অবস্থায় গিবত করেছিলে। (জামেউস সহীহ) গিবতের দ্বারা মানুষের সম্মান বিনষ্ট করা হয়। যার পরিণতি হবে জাহান্নাম। মহানবী (স.) বলেছেন-"মিরাজের রাতে আমি কতিপয় লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যারা তাদের নখ দ্বারা নিজের মুখমন্ডল আচড়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিব্রাঈল (আ.)! এরা কারা? জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এরা পৃথিবীতে থাকাকালীন গিবত করে মানুষের সম্মান বিনষ্ট করত।"[৭৭]গিবত করা ঈমানের পরিপন্থি কাজ। গিবতকারী মুখে ঈমানের কথা স্বীকার করলেও অন্তরে তাদের সত্যিকার ঈমান নেই। গিবতের কারণে গিবতকারীকে কবরে আযাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেকের; যে সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা করে।"গিবত সৎ কর্মশীল ও সত্যিকারের ধার্মিক হওয়ার পথে অন্তরায়। সে করণে রাসূলুল্লাহ (স.) তা বর্জন করার[৭৮] নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- "তোমরা একজনে অপরজনের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, একজন অপরজনকে ঘৃণা করবে না, একজন অপরজনের সাথে অশ্লীল আচরণ করবে না, একজনে অপরজনের ক্ষতি সাধন করবে না।"[৭৯] আর এ গিবতের কারণে পরকালীন জীবন ধ্বংশ হয়ে যায়। এ কারণে পরকালীন জীবনকে সুন্দর করার জন্য দুনিয়ার জীবনে গিবত পরিহার করতে হবে। গিবতকারীকে এমন দৃষ্টান্তমূলতক শাস্তি দিতে হবে যাতে শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করে কেউ আর যেন গিবত সাহস না পায়।

ইবাদাত আদায় না করার বিধান :

ক. বাধ্যতামূলক 'ইবাদাত তরক করার শাস্তির বিধান : শরী'আতের কোন বাধ্যতামূলক (ফরজ) ইবাদাত(যেমন নামায, রোযা, যাকাত, ও হজ্জ প্রভৃতি) কেউ গাফলতি বা ইত্যাকার অন্য কোন কারণে আদায় না করলে সে ফাসিক হবে এবং এ ধরনের কোন কোন ইবাদাতের জন্য সে শাস্তিযোগ্য হবে।

৭৭. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ

৭৮. আল-কুরআন, ১০৪ : ১

৭৯. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল- বুখারী*

Dhaka University Institutional Repository

সালাত ছেড়ে দেয়ার শাস্তির বিধান :

কেউ গাফলতি বা অলসতা করে নামায ছেড়ে দিলে তাকে প্রথম তা'যীরের আওতায় সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া হবে। যদি দেখা যায়, এরপরও সে দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়ছে না, তাহলে তাকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে; কাফির ও মুরতাদ হবার কারণে নয়। এটা মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। কারো কারো মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে এবং এ কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এটা সা'ঈদ ইবনু যুবায়র, ইব্রাহীম নাখ'ঈ, আওযা'ঈ, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক ও ইসহাক ইবনু রাওয়াইহ (রহ.) প্রমুখের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল, সে কুফরী করল।"[৮০] হানাফীগণের মতে, তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে নামায পড়া শুরু করে। তাকে হত্যা করা জায়িয নয়।[৮১]

যাকাত আদায় না করার শাস্তির বিধান :

কেউ কার্পণ্য করে যাকাত আদায় না করলে তার নিকট থেকে জোর করে যাকাত আদায় করে নেয়া হবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে তার সাথে লড়াই করতে হবে, যদি সে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে অস্ত্র ধারণ করে। বর্ণিত রয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে লড়াই করেছিলেন। হানাফীগণের মতে, তা'যীরের আওতায় তাকে বন্দী করে রাখতে হবে, যে যাবত না সে যাকাত আদায় করে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, বলপ্রয়োগ করে কঠোরতার সাথে যাকাত আদায় করা হবে এবং সরকার সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারবে।[৮২]

রোযা না রাখার শাস্তির বিধান :

কোন ব্যক্তি কোন শরয়ী ওযর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা না রাখলে সে শাস্তিযোগ্য হবে। হানাফীগণের মতে, তাকে তা'যীরের আওতায় বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে রোযা রাখা শুরু করে। কারো কারো মতে, তাকে বন্দী অবস্থায় প্রহারও করা হবে। 'আল্লামা শারানবিলালীর মতে, যদি কেউ রমযান মাসে প্রকাশ্যে কোন ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা রাখা ছেড়ে দেয়, তাকে হত্যা করা হবে। কেননা তার এ কাজ থেকে বোঝা যায়, সে হয়ত রোযাকে উপহাস করছে অথবা তার ফারযিয়্যাতকে অস্বীকার করছে। কারো মতে, এ রূপ ব্যক্তিকে বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাত, কিংবা কারাদন্ড অথবা উভয়বিধ শাস্তি দিতে পারবেন। শাফি'ঈগণের মতে, এ রূপ ব্যক্তিকে আটকে রাখা হবে এবং দিনে পানাহার থেকে বারণ করা হবে। মাওয়ার্দীর মতে, তাকে পুরো রমযান মাস আটক করে রাখা হবে।[৮৩]

---

৮০. من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر- আবু আবদুল্লাহ হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০, কিতাবুল ঈমান) হা.নং:১১; আবুল কাসিম আত তাবারানী, *আল-মু'জামূল আওসাত* (কায়রো:দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.) হা.নং; ৩৩৪৮

৮১. আশ- শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, খ. ১, পৃ.২৪৮ *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৯, খ. ১৬, পৃ. ৩০২-৩, খ. ২২, পৃ. ১৮৭, খ. ২৭, পৃ. ৫৩-৪; নববী, *আল-মাজমূ*, খ. ৩, পৃ. ১৮-৯

৮২. আবু বকর আল-জাসসাস, *আহকামূল কুরআন* (দারুল ফিকর), খ. ৩, পৃ. ১২৩; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ* (কুয়েত: ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ূন আল- ইসলামিয়্যাহ,১৯৯৫) খ. ২, পৃ. ৩৩৯, খ.৪. পৃ.২৬৯

৮৩. আল-জসসাস, *আহকামূল কুরআন*, প্রাগুক্ত খ.৩, পৃ.১২৩; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত খ.১৬, পৃ.৩০৩; মুহাম্মদ আমীন ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার* (রৈুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ.২), পৃ.৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি রমযান মাসে মদ্যপান করবে, তাকে মদ্যপানের হদ্দ হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করার পর রমযানের পবিত্রতা নষ্ট করার কারণে তাকে বন্দী করা হবে এবং আরো অতিরিক্ত বিশটি বেত্রাঘাত করা হবে। হযরত 'আলী (রা) থেকে এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে।[৮৪]

হজ্জ পালন না করার শাস্তির বিধান :

হজ্জ ফরয হবার পরেও কেউ হজ্জ না করলে তাকে হজ্জ আদায় করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, হজ্জের ফরযের ক্ষেত্রে সার্বিক সামর্থ্যের একটি ব্যাপার জড়িত রয়েছে। তাই হজ্জ না করার ক্ষেত্রে কারো এমন অভ্যন্তরীন সমস্যাও থাকতে পারে, যা বাইরের লোকদের জানার সুযোগ নেই। তদুপরি কেউ জীবদ্দশায় হজ্জ করে যেতে সমর্থ না হলে মৃত্যুর পরে তার নায়িবী হজ্জ করানোরও সুযোগ রয়েছে।[৮৫]

খ.বাধ্যতামূলক নয় এমন 'ইবাদাত তরক করার বিধান :

শরী'আতের বাধ্যতামূলক নয় এমন কোন ইবাদাত (ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল নয়) সাধারণত কেউ পালন না করলে তাকে ফাসিক বলা যাবে না এবং এজন্য সে শাস্তিযোগ্যও হবে না। তবে এ ধরনের যে সব ইবাদাত ইসলামের নিদর্শন রূপে বিবেচিত (যেমন নামাযের জামা'আত, আযান, ইকামত ও দু'ঈদের নামায প্রভৃতি) তন্মধ্যে কোন ইবাদাতকে যদি কোন এলাকার লোকজন সম্মিলিতভাবে পরিহার করে, তাহলে প্রথমত তাদেরকে তা করার জন্য বাধ্য করা হবে। প্রয়োজনে তাদের সকলের সাথে লড়াই করা ওয়াজিব হবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না; তবে তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং *প্রহার করা হবে।*[৮৬]

পরিবেশ দূষণের শাস্তির বিধান :

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই তা নিয়ে গড়ে উঠে পরিবেশ। এ পরিবেশ সকল প্রাণির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষ বা অন্য যে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণির জীবনের উদ্ভবও বিকাশ লাভ করে। এ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিটি জীব বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে। সে পরিবেশ যদি কোন কারণে দূষিত হয়ে উঠে তাহলে তা জীবের অস্বিস্তের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ, পরিবেশ শুদ্ধতা বা তার স্বাভাবিকতা হারালে জীব সে পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে পারে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণি সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ পরিবেশ দূষণের প্রধান নিয়ামক। আর মানুষের কৃতকর্মের কারণে এ পৃথিবী হয়ে উঠেছে বসবাসের অযোগ্য। এ কথা সবার জানা যে, দূষণের মাত্রা এভাবে ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকলে এ পৃথিবী এক সময় ধ্বংশ দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। আমাদের চারপাশের অবস্থাকেই বলা হয় পরিবেশ। অর্থাৎ আমাদের বাসস্থান, দালান-কোঠা, ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাটি, বায়ু, জলাশয় সবকিছু নিয়েই তৈরী হয় পরিবেশ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণ এ পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

---

৮৪. আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*,(বৈরুত: মা'য়ারিফাহ, খ.২৪), পৃ.৩৩; কমাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ* (দারুল ফিকর, খ.৫), পৃ.৩৪৯

৮৫. ইয়াহইয়া নববী, *আল-মাজমু* (শারহুল মুহায্যার,আল-মাতবা'য়াতুল মুনিরিয়্যাহ, খ.৭),পৃ.৩; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ২-৪

৮৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত খ.২, পৃ.৩৩৯, খ.২৬, পৃ. ৯৮-৯; যায়নুদ্দীন ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদ দাকাইক* (দারুল কিতাবিল ইসলামি,), খ. ১, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

কোন কারণে যখন পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারায়, সে পরিবেশ জীব-জগতের জন্য অস্বিত্বকর ও অসহনীয় হয়ে উঠে। এ অস্বাভাবিক পরিবেশই হল দূষিত পরিবেশ। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য অনেক আরাম-আয়েশের উপকরণ যুগিয়েছে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে অনেক দূর। কিন্তু এ বিজ্ঞানের কারণেই পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মানুষ যখন নির্বিচারে কেবল তার স্বার্থেই প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরভাবে কাজে লাগায়, ঠিক তেমনি নানা দূর্যোগ বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রকৃতি যেন মানুষের প্রতি হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ উঠে। পরিবেশ দূষণ মূলত দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা-

ক) প্রাকৃতিক উপায়ে : সাধারণত প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় পরিবেশে যে অবনতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে, তাই প্রাকৃতিক দূষণ। এ দূষণের মধ্যে রয়েছে সীসা, পারদ, সালফার-ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড ইত্যাদি। তাছাড়া আমাদের মলমূত্র এবং বিভিন্ন পচন থেকেও প্রাকৃতিক দূষণ হয়ে থাকে।

খ) কৃত্রিম উপায়ে : এ প্রকারের দূষণের নিয়ামক হচ্ছে নানা কীটনাশক, গুঁড়া সাবান, ওষুধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রী ও প্লাষ্টিক। এগুলো বহু দিন ধরে পরিবেশে টিকে থাকে। রোদ, বৃষ্টি, পানি, বাতাস এগুলোকে কিছুই করতে পারে না। তাই এগুলো মারাত্মক পরিবেশ দূষণ করে। এ দূষণের বহু কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম হলঃ ১. অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি; ২. বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যাপক ব্যবহার; ৩. বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও গাড়ির ব্যবহার এবং কালো ধোঁয়া; ৪. নির্বিচারে গাছ কাটা ও বন উজার করে দেওয়া এবং গাছ না লাগানো; ৫. বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং মারনাস্ত্রের ব্যবহার; ৬. বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার; ৭. জনগণের জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতনতা. ৮. গ্রীণ হাউজ এফেক্ট; ৯. ইটভাটার নির্গত কালো ধোঁয়া ও কল-কারখানার উৎপাদিত বর্জ্য; ১০.বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, কলেরা, টাইফয়েড, মহামারি ইত্যাদি। এ সব কারণে পরিবেশ চার প্রকারের দূষণের সম্মুখীন হয়।

প্রথমত পানি দূষণ : পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোন প্রাণি বাঁচতে পারে না। আর সে পানি মানুষ বিভিন্ন ভাবে দূষণ করে থাকে। মানুষ ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করে পানি দূষিত করে। কল-কারখানার উৎপাদিত বজ্র, ময়লা পানির লাইন নদী বা খালের সাথে সংযোগ দিয়ে, খাদ্য বজ্র পানিতে নিক্ষেপ করে, মল-মূত্র পুকুর বা নদীর সাথে সংযোগ দিয়ে, কৃষক জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে আর তা পানির সাথে মিশে পুকুর ও নদীর পানির সাথে মিশে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। পানি দূষণের কারণে বিভিন্ন রোগ বালাই বাড়ছে এবং মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য বিপন্ন হচ্ছে মানবতা ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমাদের দেশে যারা এ ধরনের দূষণের সাথে জড়িত, তাদের এ কৃতকর্মের জন্য কোন শাস্তি হয় না। যার ফলশ্রুতিতে পানি দূষণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই পানি দূষণকারীদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হলে পানি দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। অন্যথায় এ দূষণের ফলে পৃথিবী হারাবে জীব বৈচিত্র এবং ধ্বংশ প্রাপ্ত হবে প্রাণি জগত।

দ্বিতীয়ত বায়ূ দূষণ : বায়ূ মানব জীবনের অন্যতম উপাদান। বায়ূ ব্যতীত মানব জীবন বাঁচতে পারে না। এ বায়ূ থেকে মানুষ কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে নাইট্রোজেন ত্যাগ করে। মুক্ত বায়ূতে নিঃশ্বাস নিয়ে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। এ বায়ূ বিভিন্নভাবে দূষিত করে। কল- কারখানার ধোঁয়া, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টীমার, ট্রেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কালো ধোঁয়া, রাস্তা নির্মাণের জন্য আলকাতরা পুড়ানোর কালো ধোঁয়া, বিড়ি-

Dhaka University Institutional Repository

সিগারেটের ধোঁয়া, রান্নার কালো ধোঁয়া বায়ূকে দূষণ করে। এ সবের কালো ধোঁয়া পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। যে সমস্ত উৎস থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত সেগুলো বন্ধ করতে হবে।

তৃতীয়ত শব্দ দূষণ : যে শব্দ শ্রবণে তীক্ষ্ম বা কর্কষ বলে প্রতিয়মান হয় তাকে শব্দ দূষণ বলে। এ শব্দ দূষণের ফলে মানুষের শ্রবণ শক্তি কমে যায়। সাধারণত বাস, ট্রাক, ট্রেন, জাহাজের সুউচ্চ হরণের শব্দ, হাইড্রোলিক সাউন্ডের মাইক্রোফোন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সারারাত ব্যাপী হাইড্রোলিক সাউন্ডে কনসার্ট, সভা-সমাবেশ, পুজা অর্চনা কীর্তন ইত্যাদি করা হয়। এতে ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি, মানুষের নিদ্রাহীনতা, অসুস্থ রোগীদের সমস্যার সৃষ্টি করে। এজন্য প্রশাসনকে কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে যে, তারা এ সময়ের মধ্যে তাদের অনুষ্ঠান শেষ করবে। আরো সর্তক করতে হবে যে, তারা যেন হাইড্রোলিক সাউন্ড সিস্টেমের মাইক ব্যবহার না করে সাউন্ড বক্স ব্যবহার করবে। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে এসব অপরাধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে আইন ভঙ্গকারীদেরকে জেল বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করতে হবে। তা না হলে অপরাধীরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। গাড়ির হরণগলো নিয়ন্ত্রিত শব্দে তৈরী করতে হবে। যাতে হঠাৎ বিকট শব্দে হৃদরোগীদের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।

চতুর্থত গন্ধদূষণ : গন্ধ দু'ধরনের, একটি হল সুগন্ধ আরেকটি হল দূর্গন্ধ। মানুষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করার সময় তার অনুভূতিতে অশান্তি ও অস্বস্তিবোধ করলেই তাকে গন্ধদূষণ বলে। এ দূষণের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন কারণে এ ধরনের দূষণ হতে পারে। যেমন- যত্রতত্র ময়লা-আর্বজনা ফেলা, মৃত জীব-জন্তু মাটিতে ফুতে না ফেলে খালি জায়গায় ফেলে দেয়া, খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করা, বিভিন্ন কল-কারখানা, হোটেল-রেস্তোরা, পোল্ট্রি ও ডেইরী খামার বা ফার্মের ময়লা-আবর্জনা, খাদ্য-বর্জ্য ও উচ্ছিষ্ট খোলা জায়গায় বা মানুষের চলার পথের পাশে ফেলা, সর্বোপরি ডাষ্টবিনে ময়লা না ফেলে ডাষ্টবিনের বাহিরে ময়লা ফেলা এগুলো গুরুতর অপরাধ। এসব ময়লা আর্বজনার গন্ধ ও জীবানু পুরা পরিবেশকে বিষিয়ে তুলে। অনেকে এসব দূর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না বিধায় বিভিন্ন শারিরীক সমস্যাগ্রস্ত হয়। এ সব জীবানু থেকে বিভিন্ন রোগ-বালাই সৃষ্টি হয়। এমনকি কখনো কখনো এ সব রোগ বালাই মহামারি আকার ধারন করে। যারা এসব দূগন্ধ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী, তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা জরুরী । সমাজে যদি অপরাধের যথার্থ শাস্তি না হয় তবে মানুষ আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও আইন না মানার প্রবনতা সৃষ্টি হয়। যা কোন দেশ বা জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা হলে, কেহ এরূপ অন্যায় অপরাধ করার সাহস পেত না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবার, পারিবারিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান

- পরিবারের সংজ্ঞা
- ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা
- মুহাররমকে বিয়ে করার বিধান
- কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবীকে বিয়ে করার বিধান
- বদল বিয়ের বিধান
- বিয়ের পূর্বে দোষ-ত্রুটি গোপন করার বিধান
- দেন-মোহর প্রদানের বিধান
- দৃষ্টি অনিয়ন্ত্রণের বিধান
- পর্দা গ্রহণ না করার বিধান
- পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার বিধান
- ভিন্ স্ত্রী-পুরুষের গোপন সাক্ষাতকার বা পরকীয়া প্রেমের বিধান
- স্বামী-স্ত্রীর অধিকার খর্ব করার বিধান
- তালাক দানে সীমা লঙ্গনের বিধান
- হিলা বিয়ের বিধান
- যৌতুকের শাস্তির বিধান

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবার, পারিবারিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান

পরিবার রাষ্ট্রের প্রথম স্তর, যা সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। পরিবারেরই বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভূক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে গঠিত সমাজেরই অপর নাম রাষ্ট্র। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের মূলে নিহিত রয়েছে সুসংগঠিত সমাজ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার ওতপ্রোত এবং পারস্পরিকভাবে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনো একটির কল্পনা ও অসম্ভব। পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ সমাজের ফলশ্রুতি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবন সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়। তিন তলাবিশিষ্ট প্রাসাদের তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় তলা নিমার্ণের পরই সম্ভব, তার পূর্বে নয়। একটি প্রাসাদের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তার ভিত্তির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি এই পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও সমাজের সুসংবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তেমনি নির্ভরশীল। মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সোজা কথায় বলা যায়, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যে গুরুত্ব, প্রাচীনতম কালে মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা যখন শুরু হয়েছিল, মানবতার সেই আদিম শৈশবকালে পরিবার ছিল সেই গুরুত্বের অধিকারী। বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ এবং তার সাহায্য-সহায়তার লক্ষ্যে দুনিয়ার বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও চিরকাল সুনাম-সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর নীচ বংশে ও নিকৃষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ বা আত্মীয়তা লাভ হীনতা ও কলংকের চিহ্নরূপে গণ্য হয়েছে চিরকাল। যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের হেফাযত, উন্নতি বিধান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে চিরকালই বংশের গৌরব, হিরো রূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি মানুষের নিকট।

পরিবারের সংজ্ঞা :

পরিবার হল একান্নবর্তী সংসার। পরিজন, স্ত্রী, সন্তান প্রভৃতি পোষ্যবর্গ। গ্রিক সভ্যতায় পরিবার ছিল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা Oikonomia। সাধারণভাবে যারা এক চুলায় রান্না করে, একই হাঁড়ি থেকে একসাথে খায়, যাদের সরকারি কর ও অন্যান্য পাওনা একত্রে আদায় করা হয় এবং যাদের সাধারণ আয় ও ব্যয়ের অভিন্ন বাজেট থাকে, সর্বোপরি যারা একই খানায় বসবাস করে, তাদের নিয়ে পরিবার গড়ে ওঠে। সামনার ও কেলার এর মতে, “The family is a miniature organization, including at least two generations and is charcteristicaly formed upon the blood bond”[1]

---

1. Samuel Koeting, Ph.D, *Sociology an Introduction to the science of Society,* Barnes & Nobel Inc.New York,1965,129

Dhaka University Institutional Repository

অগবার্ন ও মেয়ার এফ. নিমকফ্ তাঁর Marriage and Family গ্রন্থে বলেছেন, The family is a more or less durable association of husband and wife with or without children "পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানদিসহ বা সন্তানহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।"[২]

বি.ম্যালিনস্কি এর মতে, The family is a contact for the production and maintenance of children. "পরিবার হচ্ছে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি"[৩]

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবার বলতে এমন একটা ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠনকে বোঝায় যেখানে বৈবাহিক ও রক্ত সম্পর্কীয় সূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিজনসহ বসবাস করে।

ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা :

ইসলামী পরিবার সাধারণ পরিবারের মতই জ্ঞাতিভিত্তিক অতিপ্রাচীন সামাজিক সংস্থা। প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর মিলিত জীবন যাত্রার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। কেবল পার্থক্য হল, ইসলামী পরিবার সব সময় এবং সব ক্ষেত্রে ইসলামের রীতি-নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে পরিবার ইসলামী ভাবধারা, ইসলামের নীতিমালা, অনুশাসন ও বিধি-বিধান অনুসরণে গড়ে ওঠে, যেখানে ইসলামের পারিবারিক আইনের পূর্ণ অনুশীলন হয় এবং যে পরিবার ইসলামী মূলনীতিতে পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী পরিবার বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশনা অনুযায়ী যে পরিবার গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী পরিবার বলে। আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধানই এ পরিবারের মূলমন্ত্র। ইসলামী পরিবারের সকল সদস্য হবেন ন্যায় নিষ্ঠাবান, ধর্মপরায়ণ মুসলিম। তারা সকল পাপাচার, অন্যায়-অপরাধ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতে নিয়োজিত থাকবে।

বিয়ে মানুষকে সভ্য করে। বস্তুত বিয়ে নারী ও পুরুষের মাঝে এমন এক একত্ব ও একাত্মতা স্থাপন করে, যা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হয়ে থাকে। এ ঐক্য ও একাত্মতার ভিত্তি হচ্ছে নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক। বিয়ের মাধ্যমেই নারী পুরুষের মাঝে এ একত্ব ও একাত্মতার বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তখন নারী-পুরুষের মাঝে কেবল দৈহিক মিলনই অনুষ্ঠিত হয় না, মন ও প্রাণের ও গভীর সূক্ষ্ম মিলন সূত্র গ্রথিত হয়। মন, প্রাণ ও দেহ এ তিনের মিলন ও একাত্মতা ব্যতীত 'বিবাহ' কিংবা পারিবারিক জীবন কল্পনাতীত। আর দৈহিক মিলন ব্যতীত মন ও প্রাণের একাত্মতা সৃষ্টি ও পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে না। অন্য কথায় দৈহিক মিলন অর্থ জীবনের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব। নারী ও পুরুষের যৌন-জীবন নির্ভুল রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী কায়েম না হলে পারস্পরিক যৌন ক্ষুধা ও পিপাসা অতৃপ্ত থাকায় দৈহিক মিলন সাফল্যমণ্ডিত হয় না, মানসিক ও আত্মিক মিলন হওয়ার কোনো সম্ভবনাও থাকে না। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান যার উৎপত্তি হয়েছে নাস্তিকতাবাদী ইউরোপীয় ও আমিরিকান সমাজে বিয়ের ও পারিবারিক জীবনের এক অদ্ভুত ইতিহাস উপস্থাপন করেছে। এ ইতিহাস

2. Ibid, 129

3. Ibid, 129

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী অতি প্রাচীনকালে মানব সমাজে বিয়ের আদৌ কোনো প্রচলন ছিল না। মানুষ নিতান্ত পশুর স্তরে ছিলএবং পশুদের ন্যায় জীবন যাপন করত। তখনকার সমাজে বিষয়-সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ছিল না, কোনো বিশেষ নারী বিশেষ কোনো পুরুষের স্ত্রী বলে নির্দিষ্ট ছিল না । ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্যে তাদের সম্মুখে ছিল খাদ্য পরিপূর্ণ বিশাল ক্ষেত্র, তেমনি যৌন প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্যে ছিল নির্বিশেষে গোটা নারী সমাজ। উত্তরকালে মানুষ যখন ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সামাজিকতার দিকে অগ্রসর হলো, বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক হতে থাকল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাশক্তি; তখন নারী পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের এবং বিশেষ পুরুষের যাবতীয় দায়িত্ব যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই নারীদের ওপর বর্তে সেজন্যে সে প্রাথমিক যুগে নারীর গুরুত্ব অনুভূত এবং সমাজ ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হলো। সেকালে সন্তান পিতার পরিবর্তে মা'র নামে পরিচিতি হতো। কিন্তু এ রীতি অধিক দিন চলতে পারেনি। নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের মনোভাব ক্রমে ক্রমে বদলে গেল। নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দখল করে যখন ক্রমবিবর্তনের ধারায় আরো কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে গেল, তখন পরিবার ও গোত্রের ভিত্তি স্থাপিত হলো। রাষ্ট্র ও সরকার সংস্থা গড়ে উঠল। আইন ও নিয়ম-নীতি রচিত হলো। তখন বিয়ের জন্যে নারীদের তার পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে কিংবা নগদ মূল্যের বিনিময়ে লাভ করার রীতি শুরু হল। যদিও মূল্যদানের সে আদিম রীতি আজকের সভ্য সমাজেও কোনো না কোনো রূপ নিয়ে চালু হয়ে আছে। বস্তুত পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বে মানুষকে পশুরই অধঃস্তন মনে করে নেয়া হয়েছে, তাই মানব জীবন ও সমাজের এই পাশবিক সূচনার ইতিহাসও সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে রচনা করে নিতে হয়েছে! কিন্তু তাই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হবে, এমন কথা সত্য নয়। একজন স্ত্রী স্বামীর প্রতি চরম মাত্রার অভিমানে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজ স্বামী ও সন্তানদের পরিত্যাগ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েও তার সেই স্বামী সন্তান ও সংসারের একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডলের মায়ায় সে সিদ্ধান্ত প্রত্যহার করা এবং পুনরায় স্বামী সন্তান নিয়ে স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এবং অনুরূপ কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় গৃহে ফিরিয়ে আনার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাবলী অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রকৃতিগতভাবে পারিবারিক জীবন যাপনে একান্তভাবে আগ্রহী। বাইরের অন্যান্য ব্যস্ততার আকর্ষণ যত তীব্র ও দুর্দমনীয় হোক, স্ত্রী বা স্বামীর সন্তান ও সংসারের বিনিময়ে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হওয়া কোনো সুস্থ প্রকৃতির নারী বা পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, চিন্তনীয়ও নয়। কিন্তু কুরআন মাজীদে মানব সৃষ্টি ও সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস যেমন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে পেশ করা হয়েছে, বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের সূচনা সম্পর্কেও তার উপস্থাপিত ইতিহাস চলেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায়। আধুনিক ইতিহাস যাকে সূচনা ও আদিম বলে ধরে নিয়েছে এবং যা কিছু ভালো ও কল্যাণময়, তাকে ক্রমবিবর্তনের ফল রূপে তুলে ধরেছে, ইসলামের পারিবারিক ইতিহাস যেহেতু তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এজন্যে সে সূচনা ও আদিকে পরবর্তী কালের কোনো মনুষ্যত্ববোধহীন এক স্তরের ব্যাপারে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই যে একমাত্র সূচনা ও আদি, তা স্বীকার করে নেয়া সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী প্রথম মানব আদম (আ.) তেমনি মানব জাতির পরিবার গড়ে উঠেছিল আদম ও হাওয়াকে কেন্দ্র করে। উত্তরকালে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এ পারিবারিক জীবন পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ মর্যাদা সহকারেই প্রচলিত ছিল। এই প্রথম পরিবারের সদস্যদ্বয় স্বামী ও স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছিলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে একত্রে বসবাস গ্রহণ করো এবং যেখান থেকে মন চায় তোমরা দুজনে অবাধে পানাহার কারো।"[৪] বস্তুত মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম পরিবার যেমন সর্বতোভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার ছিল, তেমনি তাতে ছিল পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এবং তার ফলে সেখানে বিরাজিত ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তি,

---

৪. يادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما- (আল-কুরআন, ৭ : ১৯)

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ। এ সূচনাকালের পরও দীর্ঘকাল ধরে এ পারিবারিক জীবন-পদ্ধতি ও ধারা মানব সমাজে অব্যাহত থাকে। অবশ্য ক্রমবিবর্তনের কোনো স্তরে মানব-সমাজের কোনো শাখায় এর ব্যতিক্রমে ঘটেনি, তেমন কথা বলা যায় না। রবং ইতিহাসে ধারাবাহিকতায় কোনো কোনো স্তরে জাতির কোনো কোনো শাখায় পতনযুগের অমানিশা ঘনীভূত এসেছে এবং সেখানকার মানুষ নানাদিক দিয়ে নিতান্ত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে শুরু করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে এসে তারা ভুলেছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানবীয় কর্তব্য। নবীগণের উপস্থাপিত জীবন-আদর্শকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে এবং একান্তভাবে নফ্সের দাস ও জৈব লালসার গোলাম হয়ে জীবন যাপন করেছে। তখন সব রকমের ন্যায়নীতি ও মানবিক আদর্শকে যেমন পরিহার করা হয়েছে, তেমনি পরিত্যাগ করেছে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকেও। এই সময় কেবলমাত্র যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থা ছিল সাময়িক। বর্তমান সময়েও এরূপ অবস্থা কোথাও না কোথাও বিরাজিত দেখতে পাওয়া যায়। তাই মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাস যে তা নয় যেমন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্‌রা পেশ করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। বর্ণিত অবস্থাকেই বড় জোর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই বলা যেতে পারে। অথচ এই ব্যতিক্রমের কাহিনীকেই ইউরোপীয় ইতিহানে গোটা মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অতএব বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা যায়, সেটা মানব সমাজের ইতিহাস নয়, তা হলো ইতিহাসের বিকৃতি, মানবতার বিজয় দৃপ্ত অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় নগণ্য ব্যতিক্রম মাত্র।

বস্তুত ইসলামী সমাজবিজ্ঞনের দৃষ্টিতে পরিবার এবং পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এখানেই সর্বপ্রথম ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্মিলন ঘটে এবং এখানেই হয় অবচেতনভাবে মানুষের সমাজিক জীবন যাপনের হাতে খড়ি। ইসলামের শারীর-বিজ্ঞানে ব্যক্তি দেহে 'কলব' قلب এর যে গুরুত্ব, ইসলামী সমাজ জীবনে ঠিক সেই গুরুত্ব পরিবারের, পারিবারিক জীবনের। তাই কল্‌ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা যখন সুস্থ ও রোগমুক্ত হবে, সমস্ত দেহ সংস্থাও হবে সুস্থ ও রোগশূণ্য। আর তা যখন রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন সমগ্র দেহ জগত চরমভাবে রোগাক্রান্ত ও বিষ-জর্জরিত। তোমরা জেনে রাখ যে, তাই হলো কল্‌ব বা হৃদপিণ্ড।"[৫] পরিবার সম্পর্কে একথা পুরোপুরি সত্য। তাই সমাজ জীবনে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে সুস্থ করে তোলা যাদের লক্ষ্য, পারিবারিক জীবনকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলা তাদের নিকট সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্যথায় সমাজ সংস্কার ও আদর্শিক জাতি গঠনের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। সুস্বাস্থ্য ও আয়ুর দৃষ্টিতে ও বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ১৯৫৯ সনের ৬ই জুনের পত্রিকায় জাতিসংঘের একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বিবাহিত নারী পুরুষ অবিবাহিতদের তুলনায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এ অবিবাহিতরা নারী বা পুরুষ, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত বা চিরকুমার যাই থাক না কেন। নদীর যে কেন্দ্রস্থল থেকে বহু শাখা-প্রশাখা নানাদিকে প্রবাহিত, সে সঙ্গম-স্থলের পানি যদি কর্দমাক্ত, বিষাক্ত ও পংকিল হয়, তাহলে সে পানি যত নদী উপনদী, ছোট নদী ও খাল-বিলে প্রবাহিত হবে তা সবই সে পানির সংস্পর্শে তিক্ত ও বিষাক্ত হবে অনিবার্যভাবে। অতএব পারিবারিক জীবন যদি আদর্শভিত্তিক, পবিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সমগ্র জীবনের দিক ও বিভাগও বিপর্যস্ত, বিষাক্ত ও অশান্তিপূর্ণ হবে, এটাই হওয়া স্বাভাবিক এবং এর সত্যতায় কোন সন্দেহ অবকাশ নেই।দুনিয়ার ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজ ও জাতির জীবনে

৫. ان فى الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب

ধ্বংস ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার যেসব কাহিনী লিখিত রয়েছে, তার যে-কোনোটিরই বিশ্লেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান করে দেখলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, পরিবার ও পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়-ই হচ্ছে তার মূলীভূত কারণ। মুসলিম জাতি সংগঠনকালীন ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সুস্থ ও সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং উত্তরকালে মুসলিম জাতির যে অভ্যুদয় ঘটে তার মূলে ও ছিল পারিবারিক দৃঢ় ভিত্তি ও পারিবারিক জীবনের সুস্থতা, পবিত্রতা। মুসলিশ জাতির বর্তমান দুর্বলতা ও অধোগতির মূল কারণ ও যে এই পরিবার ও পারিবারিক জীবনে সূচিত বিপর্যয়, তা দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীলের নিকট বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট নয়। তাই জাতীয় পূনর্গঠনের এ সন্ধিক্ষণে পরিবার পুনর্গঠনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম স্বীকৃতব্য। মুহূর্তের তরেও ভুলে গেলে চলবে না যে, পরিবার ও পারিবারিক জীবনই হলো ইসলামী সমাজের রক্ষাদুর্গ। এ দুর্গের অক্ষুণ্ন ও সুরক্ষিত থাকার ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করে ইসলামী সমাজ ও জাতীয় জীবনের পবিত্রতা, সুস্থতা এবং বলিষ্ঠতা ও স্থিতি। মুসলিম জাতির এ দুর্গ এখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি, যদিও ঘুণে ধরে একে অন্তঃসারশূণ্য করে দিয়েছে অনেকখানি। উপরন্তু পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদ, নগ্ন ও নীতিহীন সভ্যতার ঝঞ্জা বায়ু এর ওপর প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে প্রচণ্ডভাবে। আল্লাহ্ না করুন, এ দুর্গও যদি চূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম জাতির সামষ্টিক অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নেই। এ প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ের আলোচনা, গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক মানবীয় নয়, নিতান্ত পাশবিক। পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন-লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে তথায় সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। এর ফলে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার সম্মুখীন। অথচ নারী-পুরুষের মিলন ও একাত্মতাকে সভ্যতায় অগ্রগতির কারণ ও বাহনরূপে গণ্য করা হয়েছে চিরকাল। সেজন্যই দেখতে পাই, নারী-পুরুষের মিলনে জীবন যে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হওয়া বাঞ্ছনীয় বর্তমান মানুষ তা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। বর্তমান সভ্যতা পরিবারকে চূর্ণ করে, পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাষ্ট্রকে। অথচ পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। দ্বিতল বা চারতলা প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে যেমন দরকার প্রাথমিক তলাগুলোকে প্রথমে নির্মাণ করা এবং অধিকতর মজবুত করে গড়ে তোলা, ভিত্তি হিসেবে পরিবারকে গড়ে না তুলে সত্যিকারভাবে স্থায়ী কোনো সভ্যতা কিংবা মজবুত কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। সুস্থ চিন্তার অধিকারী প্রত্যেকটি মানুষের নিকট একথা অত্যন্ত প্রকট।

বর্তমানে ব্যক্তির কাছেও পরিবারের গুরুত্ব যেন অনেকখানিই কমে গেছে। পরিবারের প্রতি কোনো আকর্ষণই সে বোধ করে না। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, পুত্র পিতার, পিতা পুত্রের, ভাই ভাইয়ের, ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের প্রতি কোনো দরদ অনুভব করছে না। কেউ কারোর ধার ধারে না, পরোয়া করে না। অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে সমাজ জীবনের যে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা শুধু সভ্যতাকেই ধ্বংস করছে না, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকেও দিচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সরোকিন বর্তমান দুনিয়ায় পরিবারের গুরুত্ব কম হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন- আমরা বর্তমানে খাবার খাই হোটেল রেঁস্তোরায়, আমাদের রুটি বেকারী-কন্‌ফেকশনারী থেকে তৈরী হয়ে আসে আর আমাদের কাপড় ধোঁয়া হয় লণ্ড্রীতে। পূর্বে মানুষ আনন্দ লাভ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরে যেত পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ে; কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার জন্যে চলে যায় সিনেমা-থিয়েটার, নাচের আসর ও ক্লাব ঘরের গীতমুখর পরিবেষ্টনীতে। পূর্বে পরিবার ছিল আমাদের আগ্রহ ঔৎসুক্য ও আনন্দ-উৎফুল্লতার কেন্দ্রস্থল, পারিবারিক জীবনেই আমরা সন্ধান করতাম শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের নির্মলতা; কিন্তু এখন পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। কিছু লোক প্রীতি, মাধুর্য, অকৃত্রিমতা, আন্তরিকতা

Dhaka University Institutional Repository

ও পবিত্রতা পছন্দ করে। তাই দিনের বেশির ভাগ সময়ই মানুষ জীবিকার চিন্তায় অতিবাহিত করে, রাত্রিবেলা অন্তত পরিবারের সব লোক একত্রিত হতো। কিন্তু এখন তারা রাত্রি যাপন করে বিচ্ছিন্নভাবে, একটি গোটা রাত্রি এখন লোকেরা নিজেদের ঘরে যাপন করবে, কেউই তা পছন্দ করে না। সরোকিনের একথা কেবল পুরুষ ও যুবকদের সম্পর্কেই সত্য নয়, অবিবাহিতা যুবতী ও বিবাহিতা বয়স্কা নারীরাও এক্ষেত্রে কিছুমাত্র কম যায় না। একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত হয়ে যখন একসঙ্গে জীবন যাপন করতে শুরু করে, তখনি একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এখানে পুরুষ হয় স্বামী আর নারী হয় স্ত্রী। এ দুয়ের সম্মিলিত ভালোবাসাপূর্ণ যৌন জীবনকেই বলা হয় দাম্পত্য জীবন। নারী-পুরুষের এ দাম্পত্য জীবনের উদ্‌গাতা হলো বিয়ে। এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির অবাধ নিঃশংক চরিতার্থতা। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এ বন্ধনকে দুশ্ছেদ্য করে তোলে। এর দ্বিতীয় মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশের ধারা অব্যাহত রাখাতে উত্তরাধিকারী উৎপাদন। পূর্বে পুরুষের মৃত্যু ও উত্তর পুরুষের মধ্যবর্তীকালে নিজেকে জীবন্ত করে রাখার স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষকে এজন্যে সর্বতোভাবে উদ্যোগী ও তৎপর বানিয়ে দেয়। তখন এ হয় এক চিরন্তন সত্য, এক চিরস্থায়ী বংশ-প্রতিষ্ঠান। বিয়ে ও দাম্পত্যজীবন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান। এ এক চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা, যা কার্যকর হয়ে রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে, প্রত্যেকটি জীব ও বস্তুর মধ্যে! আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "প্রত্যেকটি জিনিসকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"[৬] বস্তুত সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্যই এই যে, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকাতেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সাধিত হবে, তখনই তা থেকে তৃতীয় এক জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিলোকের কোনো একটি জিনিসও এ নিয়মের বাইরে নয়; একটি ব্যতিক্রমও কোথাও দেখা যেতে পারে না। তাই কুরআনে মজীদে দাবি করে বলা হয়েছে, "মহান পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিলোকের সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব দৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।"[৭]এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিয়ে' ও 'সম্মিলিত জীবন যাপন' এবং তার ফলে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা কেবল মানুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ গাছপালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোনো একটি জিনিসও এ থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমনিভাবে রচিত যে, এখানে যত্রতত্র যেমন রয়েছে পুরুষ তেমনি রয়েছে স্ত্রী এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে টানছে। প্রত্যেকটি মানুষ-স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ তীব্র আকর্ষণ এবং এ আকর্ষণই স্ত্রী ও পুরুষকে বাধ্য করে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে সম্মিলিত ও যৌথ জীবন যাপন করতে। মানুষের অন্তর অভ্যন্তরে যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা, আকুলতাও সংবেদনশীলতা রয়েছে বিপরীত লিঙ্গের সাথে একান্তভাবে মিলিত হওয়ার জন্যে, তারই পরিতৃপ্তি ও প্রশমন সম্ভবপর হয় এই মধু মিলনের মাধ্যমে। ফলে উভয়ের অন্তরে পরম প্রশান্তি ও গভীর স্বস্তির উদ্রেক হয় অতি স্বাভাবিকভাবে। মানুষের অন্তর্লোকে যে প্রেম-ভালোবাসা, প্রীতি ও দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-বাৎসল্য ও সংবেদনশীলতা স্বাভবিকভাবেই বিরাজমান, তার কার্যকারিতা ও বাস্তব রূপায়ণ এই বৈবাহিক মিলনের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এজন্যে হাদীসে কুদসীতে এসেছে,আল্লাহ্ বলেছেন, "আমিই

---

৬. -ومن كل شئ خلقنا زوجين(আল-কুরআন, ৫১ : ৪৮)

৭. -سبحن الذى خلق الازواج كلها مم تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون (আল-কুরআন, ৩৬ :৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্, আমারই নাম রহমান, অতীব দয়াময়, করুণা নিধান, আমিই ‘রেহেম’ (রক্ত সম্পর্কমূলক আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নিজের নামের মূল শব্দ দিয়েই তার নামকরণ করেছি।”[৮] অন্যভাবে বলা যে, প্রেম-প্রীতি, দয়া-সংবেধনশীলতা ও স্নেহ-বাৎসল্য মানব-প্রকৃতিতে নিহিত এক চিরন্তন সত্য। আর এ সত্যের মুকুল পুষ্পাকৃতি লাভ করতে পারে না এবং এ পুষ্প উন্মুক্ত উদ্ভাসিত হতে পারে না মানব-মানবীর মিলন ব্যতিরেকে। এ মিলনই সম্ভব হতে পারে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে। পারিবারিক অপরাধগুলোই সবচেয়ে বেশী বিপদজনক। কেননা এ পরিবার থেকেই অপরাধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যে পরিবার যত সংযত ও ইসলামী ভাবধারায় গঠিত সে পরিবার ততবেশী শৃঙ্খলিত ও নিরাপদ। আর যে পরিবার যতবেশী অসংযত ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করে না, সে পরিবার ততবেশী ক্ষতিগ্রস্থ ও অনিরাপদ এবং দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ। পরিবারে যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত তার যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় তাহলে পারিবারিক অপরাধ অনেকাংশে কমে আসা সম্ভব। নিম্নে পারিবারিক অপরাধ সমূহের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আলোচনা হল-

মুহাররমকে বিয়ে করার বিধান :

যেসব মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে করা হারাম তারাই মুহাররম ও মুহাররমাহ। কেউ যদি এ সবের মধ্যে বিয়ে করে তাহলে সারা জীবন যিনা বা ব্যভিচারের পাপ বহন করে চলবে এবং দুনিয়ার জীবনকে চলমান অপরাধের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ করবে আর পরকালীন জীবনকে স্থায়ী জাহান্নামী হিসেবে তৈরী করবে। এ অবস্থায় তার উপর ব্যভিচারের হদ্দ কার্যকর হবে। মানব বংশের স্থিতি ও বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক প্রশান্তি ও স্বস্তি একান্তভাবে নির্ভর করে স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের ওপর। পবিত্র কুরআন এ মিলনকে সমর্থন করেছে এবং তাকে জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন। এ মিলন স্পৃহাকে অস্বীকার করা, উপেক্ষা করা কিংবা নির্মূল করে দেয়া কুরআনের দৃষ্টিতে মানবতার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ, এক অমার্জনীয় অপরাধ সন্দেহ নেই। কিন্তু যৌন মিলন সংস্থাপনের ব্যাপারে ইসলাম নারী-পুরুষকে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও বল্গহারা করে ছেড়ে দেয়নি। বরং এজন্যে জরুরী সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং নির্ধারিত করে দিয়েছে কতকটা বিধি-নিষিধ। কিছু কিছু নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে এ জন্যেই হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। এ সীমা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ বংশ, আত্মীয়তা-সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও পবিত্রতা, পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক উন্নত ও পবিত্র সমাজ, পরিবেশ গঠন করার জন্যে একান্তই জরুরী। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সর্ব প্রথম শর্ত হচ্ছে বিয়ে। কিন্তু সেই বিয়েকেও যথেচ্ছ হতে দেয়া যায় না কোনোক্রমেই। সমাজ-পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও স্থিতির জন্যে যেমন দরকার হচ্ছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন-মিলনের, তেমনি জরুরী হচ্ছে ইসলাম আরোপিত এই সীমা, বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণ মাত্রায় ও বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করে চলতে হয়। যে সকল লোকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তা বিবাহ হিসেবে গণ্য হয় না বরং তাদের মধ্যে যৌন মিলন ঘটলে তা যিনা হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তাদের উপর যিনার শাস্তি কার্যকর করা হবে। নিম্নে এ সবের আলোচনা করা হল-

প্রথমত বংশ সম্পর্কের কারণে মা-বাবার দিক দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হারাম করে দিয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে তিনটি তা হল বংশ সম্পর্ক, দুগ্ধপানের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন,

---

৮. يقول الله انا الله-------- وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى- (আবু দাউদ, তিরমীজি)

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের কন্যা এবং বোনের কন্যা।"[৯] মা বলতে এখানে এমন সব মেয়েলোককে বোঝায়, যার সাথে প্রকৃত মা এবং বাবার দিক দিয়ে জন্ম ও রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আর এ সম্পর্কের সূচনা হয় দাদিও নানি থেকে। অতএব তাদের বিয়ে করা ও হারাম। কন্যা বলতে এখানে এমন সব মেয়েও বোঝাবে, যাদের সাথে ঔরসজাত কন্যা বা পুত্রের দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে। আর বোনের মধ্যে শামিল সেসব মেয়েও, যার সাথের লোকও বোঝায়, যে বাবার কি তার বাবার–মানে দাদার বোন।। আর 'খালা'র মধ্যে এমন সব মেয়েলোকও শামিল, যার সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে মা কিংবা দাদার দিক দিয়ে। বোনঝি বলতে এমন সব মেয়েই বোঝায়, যাদের মায়ের সাথে রক্ষের দিক দিয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। এ মোট সাত পর্যায়ের মেয়েলোক ও পুরুষ লোক পরস্পরের জন্যে মুহাররম। এদের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। একথা সর্বজন সমর্থিত ও স্বীকৃত তাতে কোনো মতভেদ নেই। কেননা কুরআন حرمت عليكم বলে এদেরকেই স্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত দুধ পানের সম্পর্কেও কিছু সংখ্যক মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। ছেলে বা মেয়ে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় যদি অপর কোনো মহিলার দুধ পান করে, তবে সে মহিলা হবে তার দুধ-মা, তার স্বামী হবে এর দুধ-বাপ। এ দুধ-মা ও বাপের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন দুধ পানকারী পুরুষ বা নারীর জন্য হারাম, যেমন হারাম প্রকৃত মা বোনের সাথে বিয়ে। অনুরূপভাবে দুধ-বোনও হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং তোমাদের স্তন্যদায়িনী মায়েদের এবং তোমাদের দুধ-বোনদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।"[১০]মোটামুটিভাবে বংশ সম্পর্কের কারণে যাকে বিয়ে করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া সম্পর্কে সব ফিকাহ্‌বিদই সম্পূর্ণ একমত অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী আপন মায়ের সমান পর্যায়ে গণ্য হবে। অতএব বংশের দিক দিয়ে ছেলের প্রতি হারাম যাকে যাকে বিয়ে করা, দুগ্ধদায়িনীর পক্ষেও সে সে হারাম।[১১]দুধ বোন সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুধ-বোন সে, যাকে তোমার মা তোমার বাবার কাছে থেকে পাওয়া দুধ সেবন করেছে, তা তোমার সাথে এক সঙ্গেই সেবন করুক, কি তোমার পূর্বে বা তোমার পরে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক।[১২] হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "দুধ পানে সে সে হারাম হয়ে যায়, যে যে হারাম হয় জন্মগত সম্পর্কের কারণে।"[১৩] এজন্য হযরত আশেয়া (রা.) সব সময় বলতেন, "তোমার দুধ পানের কারণে তাকে তাকে হারাম মনে করবে, যাকে যাকে হারাম মনে করো বংশের কারণে।"[১৪] হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"রেহমী সম্পর্কের কারণে যে যে হারাম হয়, দুধ পানের দরুনও সে সে হারাম হয়।"[১৫] বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে ও কোনো কোনো আত্মীয়ের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যায়। এ হারাম দু'প্রকারের।

---

৯. حرمت عليكم امهتكم وبنتكم واخوتكم وعمتكم وخلتكم وتنت الاخ وتنت الاخت- (আল-কুরআন,৪ : ২৩)

১০. وامهتكم التى ارضعنكم واخو تكم من الرضاعة- । (আল-কুরআন, ৪ : ২৩)

১১. আল্লামা ইবনে রুশদ আল কুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ* , প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৩৫

১২. আল্লামা শাওকানী, *তাফসিরু ফাতহুল কাদির*, খ. ১, পৃ. ৪৯

১৩-يحرم من الزضاعة ما يحرم من الولادة (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ্ আল-মুসলিম* (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, তা বি. খ. ১), পৃ. ৪৬৬

১৪. حر موا من الرضا عة ما تحرمون من النسب- প্রাগুক্ত পৃ. ৮৬৭

১৫. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم- প্রাগুক্ত খ. ২,পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

এক, স্থায়ী যেমন স্ত্রীর মা, পুত্রের স্ত্রী, যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন স্ত্রীর কন্যা এবং পিতার স্ত্রী। পিতার স্ত্রী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের পিতারা যাকে যাকে বিয়ে করেছে, তাকে তাকে তোমরা বিয়ে করো না। পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে বিয়ে করা অত্যন্ত লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ, গুনাহের ব্যাপারে এবং বিয়ের খুবই খারাপ পথ।"[১৬] এ আয়াতে পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে পুত্রের বিয়ে করা সম্পর্কে নিষেধ বাণীর যে তিনটি কারণ উদ্ধৃত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এ কাজ অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের হারাম ও ঘৃণিত কাজ।[১৭] আর পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের আপন ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরও হারাম করা হয়েছে।"[১৮]স্ত্রীদের মা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমদের স্ত্রীদের মায়েদেরও হারাম করা হয়েছে।"[১৯] আর স্ত্রীর গর্ভজাত মেয়ে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং তোমাদের সেসব স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে গর্ভজাত মেয়েরা ও হারাম।"[২০] যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে তাদের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যদি বিয়ে করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না করে থাকে, তবে তার কন্যাকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই"।[২১] এ চারজনের মধ্যে দু'জন হারাম হয়ে যায় বিয়ের আক্‌দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা হচ্ছে পিতার স্ত্রী পুত্রের জন্যে ও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্যে, আর একজন হারাম হয় স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে পরে– সে হচ্ছে স্ত্রীর অপর এক স্বামীর নিকট থেকে নিয়ে আসা কন্যা।[২২]আর দ্বিতীয় অস্থায়ী ও সাময়িক। যেমন স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাইঝি-বোনঝি ইত্যাদি। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর এসব নিকটাত্মীয়কে বিয়ে করা ও একত্রে এক স্থায়ী স্ত্রীত্বে বরণ করা ইসলামে হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং দু'জন সহোদয় বোনকে একত্রে স্ত্রীরূপে বরণ করা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ"[২৩] এ আয়াতের ভিত্তিতে ওলামায়ে কিরামগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, যে দু'জন স্ত্রীলোকের পারস্পরিক আত্মীয়দের কারণে বিয়ে হারাম, তাদের দু'জনকে একজন স্বামীর স্ত্রীত্ব একত্রে বরণ করা হারাম।[২৪] এভাবে যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা একজন পুরুষের পক্ষে হারাম তাদের সংখ্যা দাঁড়াল নিম্নরূপ-(ক) বংশের ও রক্তের সম্পর্কের কারণে সাতজন। আর তারা হচ্ছে- মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও বোনঝি।(খ) বৈবাহিক ও দুগ্ধপানের কারণে মোট সাতজন। তারা হচ্ছে দুধ-মা, দুধ-বোন, স্ত্রীর মা, স্ত্রীর পূর্বপক্ষের কন্যা ও দুবোনকে একত্রে বিয়ে করা। এতদ্ব্যতীত পিতার স্ত্রী এবং ফুফু-ভাইঝিকে একত্রে বিয়ে করা। ইমাম তাহাভী বলেছেন, এ কয়েজনকে

---

১৬. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا -(আল-কুরআন, ৪: ২২)

১৭. আল্লামা শাওকানী, ফাতহল কাদির, খ. ১, পৃ. ৪০৬

১৮. حلائلا ابناءكم الذين من اصلابكم- (আল- কুরআন, ৪ : ২৩)

১৯. - وامهت نساءكم (আল-কুরআন, ৪ : ২৩)

২০. -وربائبكم التى فى حجور كم من نساءكم التى دخلتم بهن (আল-কুরআন, ৪: ২৩)

২১. -فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم আল-কুরআন, ৪ :২৩

২২. আবুল ওয়ালিদ ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ* (বৈরুত, ১৯৮১, খ. ৩), পৃ.৩৩

২৩. -وان تجمعو ا بين الاختين (আল-কুরআন, ৪ : ২৩)

২৪. ইবনু রুশদ, প্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে করা যে কোনো পুরুষের পক্ষে স্থায়ী ও সম্মতভাবে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।[২৫] এরপর সেসব স্ত্রীলোককে হারাম করে দিয়েছেন, যারা বিবাহিতা যাদের স্বামী জীবিত ও বর্তমান তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং স্বামীওয়ালী সুরক্ষিতা মহিলাদের বিয়ে করাও হারাম"।[২৬] এখানে 'মুহসানাত' মানে সেসব মেয়েলোক, যাদের স্বামী বর্তমান যারা বিবাহিতা। যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা নিষিদ্ধ, তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন,"এ হারাম মুহাররম-স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোকই বিয়ে করার জন্যে তোমাদের পক্ষে হালাল করে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্য যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল-মোহরানা দিয়ে সুরক্ষিত বিবাহিত জীবন যাপনের লক্ষ্যে গ্রহণ করবে, উচ্ছৃঙ্খল যৌন লালসা পূরণের কাজে নয়।"[২৭]উপরে উল্লিখিত মহিলাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোক বিয়ে করা জায়েয ও সম্পূর্ণ হালাল, তা এ আয়াতংশ স্পষ্ট প্রমাণ করছে।[২৮]এখানে মুহাররম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েলোকদের রীতিমতো মোহরানা দিয়ে তাদের বিয়ে করে শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করবে। কেবল উচ্ছৃঙ্খল যৌন পরিতৃপ্তি লাভ ও লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যেন কেউ বিয়ে বন্ধনের বাইরে কোনো নারীকে স্পর্শ পর্যন্তও না করে। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু কিছু বিবাহিতা নারী বিবাহ বন্ধনে থেকেই পূর্বের স্বামী থেকে তালাক গ্রহন এবং ইদ্দত পালন ছাড়া লোভের বসবতি হয়ে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ বিবাহ আসলে সত্যিকার বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে না। যদি তাদের মধ্যে দৈহিক মেলামেশা হয় তাহলে যিনা হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তাদের ওপর যিনার শাস্তি কার্যকর হলে কেউ আর এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে না। আবার কেউ কেউ আপন ভাগ্নি, আপন নাতনী, আপন শালী, আপন খালা বা ফুফুকে বিয়ে করে তা সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ। কেননা যারা এমন করে তারা দায়েমী বা চলমান গুনাহ তথা যিনা ব্যভিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এ সব অপরাধীদের সামাজিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যায় ও অপরাধ অনেকাংশে কমে যেত।

কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবীকে বিয়ে করার বিধান :

মুসলমান পুরুষদের জন্যে কাফির, মুশরিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে করা বৈধ নয়, তেমনি মুসলিম মেয়ে কাফির, মুশরিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া বৈধ নয়। দ্বীনের পার্থক্যের কারণে এ ধরনের বিয়ে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন "তোমরা মুসলমানরা কাফের মেয়েকে বিয়ের বন্ধনে বেধে রেখো না"।[২৯]এ আয়াতে সমস্ত কাফের, মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মুসলমানের স্ত্রী কাফির সে আর তার স্ত্রী থাকেনি। কেননা দ্বীন দুই হওয়ার কারণে এ দুয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। পূর্বে কাফিররা মুসলিম মেয়ে বিয়ে করত আর মুসলিমরা করত কাফির মেয়ে। এ আয়াত দ্বারা এ উভয় বিয়েকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "মুসলিম মেয়েরা কাফিরদের জন্যে হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষরাও অনুরূপভাবে হালাল নয় কাফির

---

২৫. কমাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদির*, প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৪০৮ ,

২৬. -والمحصنت من النساء (আল-কুরআন,৪ : ২৪)

২৭. -واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين (আল-কুরআন, ৪:২৪)

২৮. কমাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৪১৩

২৯ ولا تمسكوا بعصم الكوافر - (আল-কুরআন, ৬০ : ১০)

মেয়েদের জন্যে" ।[৩০] আর এর কারণ হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। বিপরীত ধর্মী দু'টি ধর্মের লোকের মধ্যে বিবাহ সংগঠিত হলে তা বৈধ নয় এবং তাদের সংমিশ্রণে যে সন্তান আসবে সেও অবৈধ, জারজ সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠবে। এমনকি সে কোন ধর্মের অনুসরণ করবে তাও অনিশ্চিত। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মুমিন-মুসলিম মেয়ে কাফির পুরুষের জন্যে হালাল নয়।[৩১] আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবের আযাদ বংশজাত বা জিম্মী মেয়ে হলে তাদের বিয়ে করা মুসলিম পুরুষের জন্যে জায়েয, এতে কোনো মতভেদ নেই। যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তা পছন্দ করেন না, মাকরুহ মনে করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আহলে কিতাবের খানা খাওয়ায় কোনো দোষ মনে করতেন না, তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করাকে মাকরুহ্ মনে করতেন। তাঁর সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ ইহুদী ও খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের জন্যে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দিয়েছেন। আর মেরি পুত্র ঈসা কিংবা অপর কোনো আল্লাহ্র বান্দাকে রব বলে মনে করা অপেক্ষা বড় কোনো শির্ক হতে পারে বলে আমার জানা নেই। আর ইহুদী-নাসারাদের বিশ্বাস ও আকীদা এমনিই, তাই তারাও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য। অতএব তাদের মেয়ে বিয়ে করাও জায়েয নয়। কেননা আহলে কিতাবও মুশরিক। এজন্যে ইহুদীরা বলেছে: উজাইর আল্লাহ্র পুত্র, আর খ্রিস্টানরা বলেছে: ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। যদিও বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন যে, এ আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে।[৩২]মায়মুন ইবনে মাহরান হযরত ইবনে উমর (রা.)- কে জিজ্ঞেসা করেছিলেনঃ আমরা এমন জায়গায় থাকি, যেখানে আহলে কিতাবের সাথে খুবই খোলা-মেলা হয়ে থাকি। এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের মেয়ে বিয়ে করতে পারি? এর জবাবে তিনি নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত পাঠ করেন, "এবং আহলে কিতাব বংশের সেসব চরিত্র-সতীত্বসম্পন্না মেয়ে" (বিয়ে করা তোমাদের জন্যে জায়েয)।[৩৩] "এবং মুশরিক মেয়ে যতক্ষণ না ইসলাম কবুল করছে, ততক্ষণ তোমরা তাদের বিয়ে করো না"।[৩৪] প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করা জায়েয বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। অন্য কথায় তিনি এ ব্যাপারে নিজস্ব কোনো ফয়সালা শোনালেন না। শুধু আয়াত পড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকলেন। একমাত্র হযরত ইবনে উমর ছাড়া সাহাবীগণের এক বিরাট জামা'আত যিম্মী আহলে কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা জায়েয মনে করতেন। তাঁদের মতে দ্বিতীয় আয়াতটি কেবলমাত্র মুশরিকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, সাধারণ আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নয়। হাম্মাদ বলেন, আমি হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা.) কে ইহুদী নাসারা মেয়ে বিয়ে করা জায়েয কিনা জিজ্ঞেসা করায় তিনি বললেন- তাতে কোনো দোষ নেই। তাঁকে উপরিউক্ত দ্বিতীয় আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি বললেন এ হচ্ছে মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক মেয়েদের সম্পর্কে নির্দেশ, তারা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) ফায়েলা বিনতে ফেরারা নাম্নী এক খ্রিস্টান মহিলা বিয়ে করেছিলেন। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-ও এক সিরীয় ইহুদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হাসান, ইবরাহীম নখয়ী ও শাবী প্রমুখ তাবেয়ী হাদীস-ফিকাহ্বিদও এ বিয়ে জায়েয বলে মনে করতেন।

---

৩০. আল-কুরআন, ৬০ : ১০

৩১. আল্লামা শাওকানী, *তাফসিরু ফাতহুল কাদির*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯

৩২. আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ১০০

৩৩. -والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم (আল-কুরআন)

৩৪. -ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (আল-কুরআন)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ পর্যায়ে হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর একটি নির্দেশ চমক লাগিয়ে দেয়। হযরত হুযায়ফা (রা.) এক ইহুদী মেয়ে বিয়ে করলে তিনি তাকে নির্দেশ পাঠালেন- 'তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে ত্যাগ করো। তখন হুযায়ফা (রা.) প্রশ্ন করে পাঠালেন- 'ইহুদী মেয়ে বিয়ে করা কি হারাম?'তার জবাবে হযরত উমর (রা) লিখলেন, হারাম নয় বটে, কিন্তু আমি ভয় করছি– আহলে কিতাব বলে তোমরা যদি তাদের বিয়ে করো তাহলে তোমরা তাদের মধ্য থেকে বদ্‌কার ও চরিত্র-সতীত্বহীনা মেয়েই বিয়ে করে বসবে।[৩৫]হযরত উমরের উপরোক্ত নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ এজন্যে যে, কুরআন মজীদে আহলে কিতাবের মধ্যে কেবলমাত্র মুহসিনাতদেরই বিয়ে করা জায়েয করা হয়েছে। আর তার জন্যে দুটি শর্ত অপরিহার্য। একটি হচ্ছে নাপাকীর জন্যে গোসল করা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যৌন অঙ্গকে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত রাখা। কিন্তু আহলে কিতাবের কোনো মেয়ে বিয়ের পূর্বে তার যৌন অঙ্গের পরিত্রতা রক্ষা করেছে, তা বাছাই করে নেয়া খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। আর দ্বিতীয়ত বিয়ের পর যৌন অঙ্গকে স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ব্যবহার করতে না দেয়ার প্রতি কোনো মেয়ের মনে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, তা জানবার কি উপায় হতে পারে? বিশেষত এ কারণে যে, আহলে কিতাব সমাজের লোকেরা এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করার খুব বেশি পক্ষপাতী নয়। বরং তাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে যৌন সংরক্ষণশীলতা নেই বললেই চলে। এ দুটি সম্পর্কে যদি নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহলেই একজন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে একজন আহলে কিতাব মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয হতে পারে। অন্যথায় তা সাধারণ কাফির মুশরিক মেয়েদের মতোই মুসলিমদের জন্যে চিরতরে হারাম। তিন আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী আহলে কিতাবরা মুশরিকদের মধ্যে গণ্য। তাই তাদের মেয়ে বিয়ে করাও হারাম।

বদল বিয়ের বিধানঃ

শেগার (বদল) বিয়ের কথাবার্তা হয় এভাবে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, তোমার মেয়েকে আমার নিকট বিয়ে দাও, আমি আমার মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দেবো। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বিয়েকে 'বদল বিয়ে' বলে। বদল বিয়ের নিষিদ্ধের ধরন এই যে, একজন তার বোন কিংবা মেয়েকে অপর ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেবে এ শর্তে যে, সেই অপর ব্যক্তি তার নিজের বোন কিংবা মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেবে এবং একজনের যৌন অঙ্গ অপর জনের বিয়ের মোহরানাস্বরূপ হবে। দুটি বিয়ের কোনোটিতেই আলাদাভাবে কোনো মোহরানাই ধার্য করা হবে না। এ ধরনের বিয়ে ইসলামী শরী'আতে সম্পূরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা স্বেচ্ছায় ও খুশিমনে দিয়ে দাও। তবে যদি সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানার অংশবিশেষ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।"[৩৬]অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন," তোমরা তাদের নির্ধারিত মোহরানা আদায় কর। মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতি সহকারে কোন সমঝোতা হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।"[৩৭] এ আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে মোহরানা বিবাহের পূর্বশর্ত। মোহরানা ছাড়া স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার অধিকার লাভ হয় না। তাই স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা ও নিজের সামর্থ অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আদায় করবে। কেউ এমন বিয়ে করলে তা বিয়ে হিসেবে গণ্য হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত মোহর বা মোহরে মিসাল নির্ধারণ করা না হয়। মোহর নির্ধারণের পূর্বে তাদের মধ্যে যৌন মিলন বা সহবাস সংঘটিত হলে তা যিনা হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যিনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রযোজ্য হলে এ ধরনের অপরাধমূলক

৩৫. আল্লামা জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৩৯৭

৩৬. আল-কুরআন, ৪ : ৪

৩৭. আল-কুরআন, ৪ : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে সংঘটিত হবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) 'শেগার' বিয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন।[৩৮]'শেগার' বিয়ের ব্যাখ্যা করে হাদীসের বর্ণনাকারী বলেছেন,'শেগার' বিয়ে হয় এভাবে যে, একজন অপরজনের নিকট নিজের মেয়ে বিয়ে দেবে এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে তার নিকট বিয়ে দেবে, আর এ দুটি বিয়েতে কোনো মোহরানা দেয়া নেয়া হবে না।[৩৯] ইমাম রাফেয়ী বলেছেন, এ ধরনের বিয়েতে একটি বিয়েকে অপর একটি বিয়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয়, একটির জন্যে অপরটি শর্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আর যৌন অঙ্গে পরস্পরকে শরীক করা হয়। এ কারণে এ বিয়ে জায়েয নয়।[৪০]কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একজনের মেয়ে কিংবা বোনকে অপর জনের নিকট বিয়ে দেয়া এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে কিংবা বোনকে তার নিকট বিয়ে দেবে যেন একটি বিয়ে অপর বিয়ের বদল হয় এ বিয়ে। এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদদের মত হচ্ছে, 'শেগার' বিয়ে নিষিদ্ধ শুধু এজন্যে যে, কেননা তাতে মোহরানা ধার্য করা হয় না। এ কারণে আমরা তাতে মোহরে মিসল ওয়াজিব মনে করেছি। তাহলে তা আর 'শেগার' থাকবে না অর্থাৎ তখন তা নিষিদ্ধ নয়।[৪১]

বিয়ের পূর্বে দোষ-ত্রুটি গোপন করার বিধান :

আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় যে, পারিবারিকভাবে বিবাহ সাদীর সময় পাত্র বা পাত্রীর কিছু ত্রুটি বা সমস্যা গোপন রাখা হয় যা প্রকাশ করা হলে বিবাহ সম্পাদনের সম্ভাবনাই থাকে না। তাই এ গোপনীয় ত্রুটি অবস্থায় যথারীতি বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী বা স্ত্রী যদি নিশ্চিতরূপে জানতে পারে কিংবা প্রত্যক্ষ করতে পারে স্বামী বা স্ত্রীর শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত এমন কোনো দোষ, যা বর্তমান থাকায় সে কিছুতেই স্ত্রীকে বা স্বামীকে খুশী মনে গ্রহণ করতে রাজি হতে পারে না, তাহলে স্বামী বা স্ত্রী কেবল এই অবস্থায় বিয়েকে প্রত্যাহার করতে পারে শরী'আত তাকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। চিরদিনের তরে এক দুর্বহ বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়ার ও চাপিয়ে রাখার পরিবর্তে প্রথম অবস্থায়ই তা প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। হযরত জায়েদ ইবনে কায়াব (রা.) বর্ণনা করেছেন,"রাসূলুল্লাহ (স.) বনী গিফার গোত্রের একটি মহিলাকে বিয়ে করে ফুলশয্যার সময় যখন তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং তার কাপড় সরিয়ে শয্যার ওপর বসলেন, তখন তিনি স্ত্রীলোকটির পাঁজরে শ্বেত রোগ দেখতে পেলেন। তিনি তখনই শয্যা থেকে উঠে গেলেন এবং বললেন- 'তোমার কাপড় সামলাও।' অতঃপর তিনি তার থেকে নিজের দেয়া কোনো কিছুই গ্রহণ করলেন না" ।[৪২] এ হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, শ্বেত, কুষ্ঠ, পাগল ও মতিচ্ছিন্ন হওয়া এমন সব প্রচ্ছন্ন রোগ, যা স্বামী-স্ত্রী কারোর পক্ষেই তার নিকট সাহচর্যে আসার পূর্বে জানতে পারা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই বিয়ের পরই এসব রোগ কারো মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হলে তাদের বিয়ে আপনা থেকেই ভেঙ্গে যাবে। হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, "স্ত্রীদের চারটি দোষে বিয়ে ফেরত যেতে

---

৩৮. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল- বুখারী*)

৩৯. প্রাগুক্ত والشغر ان يزوج الرجل ابنته على ان يزو جه الاخر ابنته ليس بينهما صداق.

৪০. আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ১০

৪১. *দুররুল মুখতার* , খ. ২, পৃ. ৪৫৭

৪২. ان رسول الله صلعم تزوج امراة من بنى غفار- فلما دخل عليها قوضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا فانجاز عن الفراش ثم قالخذى عليك ثيابك ولم ياخذ بما اتاها شيئا-. (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

Dhaka University Institutional Repository

পারে, তা হচ্ছে পাগলামী, মতিচ্ছিন্ন হওয়া, কুষ্ঠ রোগ, শ্বেত রোগ এবং যৌন অঙ্গের কোনো রোগ”।[৪৩] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ যেমন স্ত্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি স্বামীর ব্যাপারেও। যারই মধ্যে তা দেখা দিক না কেন, অপরজনের পক্ষে সে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া শরীয়তে জায়েয। শাফিয়ী ফিকাহ্‌বিদদের কারো কারো মতে, পরে-প্রকাশিত যে-কোনো ত্রুটির কারণে বিয়ে প্রত্যাহার করা ও স্ত্রীকে ফেরত দেয়া যেতে পারে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম এই মতই সমর্থন করেছেন। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, স্বামী কোনো কারণেই স্ত্রীকে প্রত্যাহার করতে পারে না। কেননা তার হাতেই রয়েছে তালাক দেয়ার ক্ষমতা। আর স্ত্রী স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কেবলমাত্র কোনো সংক্রামক রোগ ও সহবাসে অক্ষমতা, নপুংসতার দরুন। ইমাম মুহাম্মদের মতে কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগের কারণে ও প্রত্যাখ্যান করতে পারে।[৪৪]উপরিউক্ত চার ধরনের ত্রুটির কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ সম্পর্কে ইমাম মালিক ও শাফিয়ী সম্পূর্ণ একমত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত লোকের কারণে এ সমস্ত ত্রুটি গোপন থাকে তাদের দৃস্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া জরুরী। কেননা এ কারণে বর ও কনের পক্ষের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয়েছে। সমাজে তার মান সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ সমস্ত কারণে অধিকাংশ নারী বা পুরুষ আত্নহত্যা করে বা অনৈতিক ও অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয় যা সমাজকে কলুসিত করে তুলে। যেখান থেকে তাদেরকে আর কখনো ফিরানো যায় না। সর্বোপরি যদি এসব কুচক্রী মহলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় তাহলে এসব ঘটনার অবতারন হবেনা।

দেন-মোহর প্রদানের বিধান :

বিয়েতে দেন-মোহর বা ‘মোহরানা’ অবশ্য দেয় হিসেবে ধার্য করার এবং তা যথারীতি আদায় করার জন্যে ইসলামে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ‘এনায়া’ গ্রন্থে “দেনমোহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে”।[৪৫] বিয়ের ক্ষেত্রে মোহরানা দেয়া ফরয বা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে যৌন-স্বাদ গ্রহণ করো, তার বিনিময়ে তাদের ‘মোহরানা’ ফরয মনে করেই আদায় করো”।[৪৬] অর্থাৎ তোমরা পুরুষরা বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য মোহরানা পুরাপুরি তাদের নিকট আদায় করে দাও, আদায় করো এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে।[৪৭]অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “এবং মেয়েদের অলি-অভিভাবক অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো এবং তাদের ‘মোহরানা’ প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরই আদায় করে দাও”[৪৮]

৪৩. মুহাম্মদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার* (দারুত তুরাছ,), খ. ২, পৃ. ২৯৯

৪৪. প্রাগুক্ত খ. ৬, পৃ. ২৯৯

৪৫. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *দুররুল মুহতার ‘আলা রদ্দিল মুহতার* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ২), পৃ. ৪৫২

৪৬. فما استطعتم به منهن فاتو هو اجور هن فريضة- (আল- কুরআন, ৪ :২৪)

৪৭. মুহাসিনাত তা'বিল, খ. ৫, পৃ. ১১৮৭

৪৮. فانكحو هن باذن اهلهن واتو هن اجورهن بالمعروف- (আল- কুরআান, ৪ :২৫)

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতদ্বয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। এজন্যে মোহরানা' হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। প্রথম আয়াতে আজাদ ও স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করা সম্পর্কে নির্দেশ এবং দ্বিতীয় আয়াতে দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর দু'জায়গায়ই বিয়ের বিনিময়ে মোহরানা দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ মোহরানাকে বিনিময় স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময়সূচক ও একটা জিনিসের মুকাবিলায় আর একটা জিনিস দানের কারবারের মতোই ধরে দিয়েছেন।[৪৯] অতএব এটাকে স্বামীর 'অনুগ্রহের দান' মনে না করে একটার বদলে একটা প্রাপ্তির মতো ব্যাপারে মনে করতে হবে। অর্থাৎ মোহরানার বিনিময়ে স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহারের অধিকার লাভ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,"এবং মুহররম মেয়েদের ছাড়া আর সব মহিলাকেই তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে"।[৫০] এ আয়াতে আল্লাহ্ মহান হুকুমদাতা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহার হালাল করেছেন ধন-মালের বিনিময়ে ও বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতা রক্ষার্থে, যেনার জন্যে নয়। আর একথা প্রমাণ করে যে, বিয়েতে মোহরানা দেয়া ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয।[৫১] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং মুসলমান ও আহ্লি কিতাব বংশের সতীত্ব-পবিত্রতাসম্পন্না মহিলারা ও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিয়ে করবে"।[৫২]অন্যত্র এ কথারই পুনরাবৃত্তি করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"তোমরা যদি সে মহিলাদের বিনিময়ে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করো, তবে তোমাদের কোনো গুনাহ্ হবে না"। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোহরানা দেয়া সকল বিয়েতে ও সকল অবস্থায়ই ওয়াজিব (ফরয)। এমনকি আক্দ-এর সময় যদি ধার্য করা নাও হয় তবু ও সে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হওয়ার সাথে সাথে মোহরানা দেয়া ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যাবে।[৫৩]শুধু তা-ই নয়, মোহরানা আদায় করতে হবে অন্তরের সন্তোষ ও সদিচ্ছা সহকারে এবং মেয়েদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া এক নেয়ামত মনে করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং স্ত্রীদের প্রাপ্য মহরানা তাদের আদায় করে দাও আন্তরিক খুশীর সাথে ও তাদের অধিকার মনে করে"।[৫৪] আয়াতে উদ্ধৃত نحلة শব্দের অর্থ ব্যাপক। প্রথমত কোনো বিনিময় ও বদ্লা ব্যতিরেকেই কিছু দিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়ত মোহরানা দিয়ে মনকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ করে নাও, মোহরানা দেয়ার জন্যে মনের কুণ্ঠা কৃপণতা দূর করো। আর তৃতীয়ত আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ দান। কেননা জাহিলিয়াতের যুগে হয় মোহরানা ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যেত, নয় মোহরানা বাবদ যা কিছু আদায় হতো তা সবই মেয়েদের বাপ বা অলি-গার্ডিয়ানরাই লুটে পুটে খেয়ে নিত। মেয়েরা বঞ্চিতাই থেকে যেত। এজন্যে ইসলামে যেমন মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসকে একমাত্র মেয়েদেরই প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে বাপ বা অলী-গার্ডিয়ানের কোনো হক নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মোহরানা যখন মেয়েদের জন্যে আল্লাহ্র বিশেষ দান, তখন তা আদায়

---

৪৯. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ. ১, পৃ.৩১৭

৫০. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموا لكم- (আল-কুরআন, ৪ : ২৪)

৫১. (মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৩৮৭)

৫২. والمحصنات من المؤمنت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمو هن اجورهن- (আল-কুরআন)

৫৩. মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী : *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৭

৫৪. واتوا النساء صدقا تهن نحلة- (আল-কুরআন, ৪ : ৪)

Dhaka University Institutional Repository

করা স্বামীদের পক্ষে ফরয এবং স্বামীদের ওপর তা হচ্ছে স্ত্রীদের আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অধিকার। এখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই উভয়ের কাছে যৌন সুখ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু স্বামী অতিরিক্ত হিসেবে 'মোহরানা' দেয়ার কারণ হল, স্বামী বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর ওপর এক প্রকারের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব লাভ করে থাকে। স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর স্ত্রী নিজেকে নিজের দেহমন, প্রেম-ভালবাসা, যাবতীয় সম্পদ-ঐশ্বর্য একান্তভাবে স্বামীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। এর বিনিময়স্বরূপই মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতঃপর স্ত্রী স্বামীর মতামত ও অনুমতি না নিয়ে না নফল রোযা রাখবে, না হজ্জ করবে। আর না তার ঘর ছেড়ে কোথাও চলে যাবে। শাফিয়ী মাযহাবের আলেমগণ মোহরানা প্রদানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, বিয়ে হবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিনিময়মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপরজনকে নিজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। প্রত্যেক অপরজনের থেকে যেটুকু ফায়দা লাভ করে, তাই হচ্ছে অপর জনের ফায়দার বিনিময়ে বদল। আর মোহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলা তা স্বামীর ওপর অবশ্য দেয়া ফরয করে দিয়েছেন এজন্যে যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর ওপর খানিকটা অধিকারসম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে।[৫৫]অতএব বিয়ের আকদ্ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই মোহরানা নির্ধারণ এবং তার পরিমাণের উল্লেখ একান্তই কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত জোরের দিয়ে বলেছেন, "বিয়ের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্যে হালাল মনে করে নাও"।[৫৬]আর তা হচ্ছে মোহরানা বা দেন-মোহর। বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতেও রাসূলুল্লাহ (স.) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিয়ে করার পর তাঁর নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তাকে কোনো জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট যেতে তাঁকে নিষেধ করলেন"।[৫৭]রাসূলুল্লাহ (স.) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে কিছু না কিছু আগে ভাগে দেবার জন্যে স্বামীকে আদেশ করেছেন।[৫৮]প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, বিয়ের সময় দেন-মোহর ছাড়া অপর এমন কোনো শর্ত আরোপ করা শরী'আতের বিরোধী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যে বিয়েতে মোহর নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু তা প্রদান করা হয়নি, তা প্রকারান্তরে একজন নারীর সাথে প্রতারণা করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তার সাথে মেলামেশা করলে তা অবৈধ যৌন সম্পর্ক বা যিনা হিসেবে গণ্য করা হবে।এমনকি সন্তান সন্ততির বৈধতার প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে। এ জন্য প্রয়োজন বিবাহ শাদীর সময় এমন পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করতে হবে, যাতে ব্যক্তি বিয়ের বাসরেই তা আদায় করতে পারে। লোক দেখানো বা মজলিসের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বড় এমাউন্ট মোহর হিসেবে ধার্য করা সমীচীন নয়। কেননা এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিশ্চিত দায়েমী অপরাধে লিপ্ত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর যৌন মিলনের দাবি এক স্বাভাবিক দাবি। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সমান। কিন্তু এ ব্যাপারে নারী সব সময় নিষ্ক্রীয়, নিশ্চেষ্ট, অনাগ্রহী ও অপ্রতিরোধীও। পুরুষই এক্ষেত্রে অগ্রসর, সক্রিয় অর্থাৎ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেজন্যে যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর তরফ থেকেই আসে আমন্ত্রণ। তাই এ ব্যাপারে স্বামীর যে কোনো সময়ের এ দাবিকে সানন্দ চিত্তে, সাগ্রহে ও সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা মেনে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "স্বামী যখন নিজের যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রীকে আহবান জানাবে, তখন সে চুলার

---

৫৫. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* , খ. ১, পৃ. ৩১৭

৫৬. -ان احق الشروط ان يو فى به ماستحللتم به الفروج (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

৫৭. -منعه حتى يعطيها شيئا- (সুনান আবু দাউদ-)

৫৮. আল্লামা শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

কাছে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজে অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত”।[৫৯] তিনি আরো কঠোর ভাবে বলেছেন,“স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহবান করে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্য), তখন যদি সে সাড়া না দেয়- অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে”।[৬০] এ হাদীসের ব্যাখায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন, হাদীসটি থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ ঘটনা যখন রাত্রী বেলা হয়, তখনই ফেরেশতারা অস্বীকারকারী স্ত্রীর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে; কিন্তু আসলে কেবল রাতের বেলার কথাই নয়, দিনের বেলাও এরূপ হলে ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু যৌন মিলনের কাজ সাধারণত রাতের বেলাই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (স.) রাতের বেলার কথা বলেছেন। মূলত এ কথা রাত ও দিন উভয় সময়ের জন্যেই সমান প্রযোজ্য। অপর এক হাদীসে তিনি অধিকতর তীব্র ভাষায় বলেছেন, “যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী তা অমান্য করে– যৌন মিলনে রাজি হয়ে তার কাছে না যায়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে”।[৬১] অপর এক হাদিসে তিনি বলেছেন, “স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণ সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসবে, ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে”।[৬২] অপর এক হাদীসে তিনি আরো বলেন, “তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উত্থিত হয় না তাদের কোনো নেক কাজও। তারা হচ্ছে, পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসবে, নেশাখোর, মাতাল যতক্ষণ না সে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হবে এবং সেই স্ত্রী, যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে”।[৬৩]ইবনে জাওজীর ‘কিতাবুন নিসা’য় উদ্ধৃত অপর এক হাদীস আরো বিস্তৃত কথা বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ‘মুসবিফা’ ও ‘মুগ্‌লিসা’র ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। ‘মুস্‌বিফা বলতে বোঝায় সেই নারী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহবান জানালে সে বলে- ‘এই শীগ্‌গিরই আসছি।’ আর ‘মুগলিসা’ হচ্ছে সেই স্ত্রী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহবান জানালে সে বলে ‘আমার হায়েয হয়েছে’, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ঋতু অবস্থায় নয়।[৬৪] অবশ্য এ ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মানবিক অবস্থা ও ভাবধারার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী যদি নিতান্ত পশু হয়ে না থাকে, তার মধ্যে থেকে থাকে মনুষ্যত্বসুলভ কোমল গুণাবলী, তাহলে সে কিছুতেই স্ত্রীর মরজী-মনোভাবের বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে যৌন মিলনের পাশবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে যাবে না। সে অবশ্যই স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত মানবিক সুবিধা-অসুবিধার, আনুকূল্য-প্রতিকূলতা সম্পর্কে খেয়াল রাখবে এবং খেয়াল রেখেই অগ্রসর হবে। উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো প্রকার শরী‘আত সম্মত ওযর বা কারণ ছাড়া স্বামীর শয্যার স্থান

---

৫৯. اذا الرجل دعا زوجته لحاجته خلت له وان كانت على التنور- (মুহাম্মদ ইবনে ঈশা, *সুনান আত-তিরমীজি*)

৬০. اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*)

৬১. والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها- (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ : *সহীহ আল-মুসলিম*)

৬২. اذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*)

৬৩ ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السماء حسنة- العبد الابق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمراة

الساخط عليها زوجها حتى يرضى (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম;* ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান)

৬৪. আল্লামা আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর পক্ষে হারাম।[৬৫] স্ত্রীর কোনো শরী'আত সম্মত ওযর থাকলে স্বামীকে অবশ্যই এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ফিকাহ্‌বিদগণ এজন্য বলেছেন, অধিক মাত্রায় যৌন সঙ্গম যদি স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে তার সামর্থ্যের বেশি যৌন সঙ্গম করা জায়েয নয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (স.) নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর এ ধরনের কামনা-বাসনা বা দাবি যথাযথভাবে পূরণের জন্যে সবর্দা প্রস্তুত হয়ে থাকা। এ প্রস্তুত হয়ে থাকার গুরুত্ব নানা কারণে অনস্বীকার্য। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ফরমান অনুযায়ী স্বামীর বিনানুমতিতে নফল রোযা রাখাও স্ত্রীর পক্ষে জায়েয নয়। তিনি বলেছেন,"স্বামীর উপস্থিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না" ।[৬৬]কেননা রোযা রাখলে স্ত্রী স্বামীর যৌন মিলনের দাবি পূরণে অসমর্থ হতে পারে, আর স্বামীর এ দাবিকে কোনো সাধারণ কারণে অপূর্ণ রাখা স্ত্রীর উচিত নয়। ইসলামে এসব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেবলমাত্র এজন্যে যে, সমাজের লোকদের পবিত্রতা, অকলংক চরিত্র ও দাম্পত্য জীবনের অপরিসীম তৃপ্তি ও সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালোবাসা ও মাধুর্য রক্ষার জন্যে এ বিষয়গুলো অপরিহার্য। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কিরাম-এর যুগে স্ত্রীগণ তাঁদের স্বামীদের সন্তুটি বিধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। স্বামীদের একবিন্দু অসন্তুটি বা মনোকষ্ট তাঁরা সইতে পারতেন না। এমন কি, কোনো স্বামীর প্রত্যাখ্যানও তার স্ত্রীর কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করাতে পারত না। হাদীসে ও সাহাবীদের জীবন চরিতে এ পর্যায়ের অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দৃষ্টি অনিয়ন্ত্রনের বিধান :

স্বাভাবিক লজ্জা-শরমের অনিবার্য ফল হচ্ছে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ। চোখের দৃষ্টি এমন একটি হাতিয়ার, যার দ্বারা দুনিয়ার যেমন ভালকাজও করা যায়, তেমনি নিজের মধ্যে জমানো যায় পাপের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প। দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীক্ষ্ণ-শানিত তীর যা নারী বা পুরুষের অন্তর ভেদ করতে পারে। প্রেম-ভালবাসা তো এক অদৃশ্য জিনিস, যা কখনো চোখে ধরা পড়ে না, বরং চোখের দৃষ্টিতে ভর করে অপরের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। বস্তুত দৃষ্টি হচ্ছে লোভ লালসার বহ্নির দখিন হাওয়া। মানুষের মনে দৃষ্টি যেমন লালসাগ্নি উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি তার ইন্ধন যোগায়। দৃষ্টি বিনিময় এক অলিখিত লিপিকার আদান-প্রদান, যাতে লোকদের অগোচরেই অনেক প্রতিশ্রুতি অনেক মর্মকথা পরস্পরের মনের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত আখরে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামের লক্ষ্য যেহেতু মানব জীবনের সার্বিক পবিত্র ও সর্বাঙ্গীন উন্নত চরিত্র, সেজন্যে দৃষ্টির এ ছিদ্রপথকেও সে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে, দৃষ্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্রতাময়। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত" ।[৬৭] পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কেও আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মুমিন মহিলাদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে" ।[৬৮]দুটি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে যে, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ। কিন্তু এ একই কথা পুরুষদের জন্যে

---

৬৫. ইমাম ইয়াহইয়া নববী, *শরহু সহীহ মুসলিম* (বৈরুত: দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরবী, ১৩৯২ হি.), খ. ১, পৃ.৪৬৪

৬৬. لا تصوم المراة وبعلها شاهد الا باذنه- (মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*)

৬৭. قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم ونحفطوا فروجهم- ذلك ازكى لهم- ان الله خبير بما يصنعون- (আল-কুরআন, ২৪ :৩০)

৬৮. وقل للمؤمنت بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن- (আল-কুরআন, ২৪: ৩১)

Dhaka University Institutional Repository

আলাদাভাবে এবং মহিলাদের জন্যে তার পরে স্বতন্ত্র একটি আয়াতে বলা হয়েছে। এর মানেই হচ্ছে এই যে, এ কাজটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমানভাবে জরুরী। এ আয়াতদ্বয়ে যেমন রয়েছে আল্লাহ্‌র নৈতিক উপদেশ, তেমনি রয়েছে ভীতি প্রদর্শন। উপদেশ হচ্ছে এই যে, ঈমানদার পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীই, তাদের কর্তব্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। কাজেই আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক যার প্রতি চোখ তুলে তাকানো নিষিদ্ধ, তার প্রতি যেন কখনো তাকাবার সাহস না করে। আর দ্বিতীয় কথা, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের অনিবার্য ফল হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী পালনে উদ্যম-উৎসাহ। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ হলে অবশ্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা পাবে কিন্তু দৃষ্টিই যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পরপুরুষ কিংবা পরস্ত্রী দর্শনের ফলে হৃদয় মনের গভীর প্রশস্তি বিঘ্নিত ও চূর্ণ হবে, অন্তরে লালসার উত্তাল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়ে লজ্জাস্থানের পবিত্রতাকে পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কাজেই যেখানে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত নয়, দেখাশোনার ব্যাপারে যেখানে পর, আপন, মুহাররম-গায়র মুহাররমের তারতম্য নেই, বাছ-বিচার নেই, সেখানে লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষিত হচ্ছে তা কিছুতেই বলা যায় না। ঠিক এজন্যই ইসলামে 'দৃষ্টি'কে পরিভাষায় যাকে بريد العشق 'প্রেমের পয়গাম বাহক' বলা হযেছে, নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপদেশের ছলে বলা হয়েছে- ذلك ازكى لهم এ-নীতি তাদের মধ্যে খুবই পবিত্রতা বিধায়ক অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত রাখলে চরিত্রকে পবিত্র রাখা সম্ভব হবে। আর শেষ ভাগে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-পুরুষ যদি এ হুকুম মেনে চলায় রাজি না হয়, তাহলে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই এর শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে পুরোমাত্রায় অবহিত রয়েছেন।

এ ভীতি যে কেবল পরকালের জন্যেই, এমন কথা নয়। এ দুনিয়ায়ও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা রক্ষা না করা হলে তার অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখা দিতে পারে। আর তা হচ্ছে স্বামীর দিল অন্য মেয়েলোকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং স্ত্রীর মন সমর্পিত হওয়া অন্য কোনো পুরুষের কাছে। আর এরই পরিণতি হচ্ছে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আশু বিপর্যয় ও ভাঙ্গন। দৃষ্টিশক্তির বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,"তিনি দৃষ্টিসমূহের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে এবং তারই কারণে মনের পর্দায় যে কামনা-বাসনা গোপনে ও অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হয় তা ভালোভাবেই জানেন"।[৬৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসঘাতক দৃষ্টি গায়র-মুহাররম মেয়েলোকের প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মতোই, তার প্রতি চুরি করে তাকানো বা চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা দৃষ্টির কোনো বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ।[৭০]দৃষ্টি বিনিময়ের এ বিপর্যয় সম্পর্কে লিখেছেন, অতঃপর তোমার কর্তব্য হচ্ছে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা, গায়র-মুহাররমকে দেখা থেকে চোখকে বাঁচানো আল্লাহ্‌ তোমাকে ও আমাদের এ তওফিক দান করুন কেননা এ হচ্ছে সকল বিপদ-বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ।[৭১]দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ও পুরুষের প্রায় একই অবস্থা। বরং স্ত্রীলোকের দৃষ্টি পুরুষদের মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে থাকে। প্রেমের আবেগ-উচ্ছাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি অত্যন্ত নাজুক ও ঠুনকো। কারো সাথে চোখ বিনিময়ে হলে স্ত্রীলোক সর্বাগ্রে কাতর এবং কাবু হয়ে পড়ে, যদিও তাদের মুখ ফোটে না। এ তার

---

৬৯. يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور- (আল-কুরআন, ২৩ : ১৯)

৭০. ইমাম বায়যাবী, *আনোয়ারুত তানজিল ওয়া ইসরারুত তা'বিল*, খ. ২, পৃ. ২৬৫

৭১. ইমাম গাযালী, মিনহাজুল আবেদীন, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক দুর্বলতা বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে একে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এর শত শত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এ কারণে স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় যে, কোনো সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন যুবকের প্রতি কোনো মেয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, আর অমনি তার সর্বাঙ্গে প্রেমের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেলেও তার অন্তর্লোক পঙ্কিল হয়ে গেল। স্বামীর হৃদয় থেকে তার মন পাকা ফলের বৃন্তচ্যুতির মতো একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল, তার প্রতি তার মন হলো বিমুখ, বিদ্রোহী। পরিণামে দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখা দিলো, আর পারিবারিক জীবন হলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কখনো এমনও হতে পারে যে, স্ত্রীলোক হয়ত বা আত্মরক্ষা করতে পারল; কিন্তু তার অসতর্কতার কারণে কোনো পুরুষের মনে প্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তখন সে পুরুষ হয়ে যায় অনমনীয় ক্ষমাহীন। সে নারীকে বশ করবার জন্যে যত উপায় সম্ভব তা অবলম্বন করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। শেষ পর্যন্ত তার শিকারের জাল হতে নিজেকে রক্ষা করা সেই নারীর পক্ষে হয়ত সম্ভবই হয় না। এর ফলে ও পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে। দৃষ্টির এ অশুভ পরিণামের দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'য়ালা উপরাক্ত আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে বলেছেন,"চক্ষুদ্বয়ের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রী দর্শন। কর্ণদ্বয়ের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীর রসাল কথা লালসা উৎকণ্ঠিত কর্ণে শ্রবণ। রসনার জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীর সাথে রসাল কণ্ঠে কথা বলা, হস্তের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা হাত দিয়ে ধরা এবং পায়ের জ্বেনা হচ্ছে যৌন মিলনের উদ্দেশ্য পরস্ত্রীর কাছে গমন। প্রথমে মন লালসাক্ত হয়, কামনাতুর হয়, যৌন অঙ্গ তা চরিতার্থ করে কিংবা ব্যর্থ করে দিয়ে তার প্রতিবাদ করে"।[৭২]এ হাদীসে দেখা ও কথা বলাকে যিনা বলার কারণ এই যে, দুটো হচ্ছে যিনার ভূমিকা– যিনার মূল কাজের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জিহবা হচ্ছে বাণী বাহক, যৌন অঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার, সত্য প্রমাণকারী।৭৩ দৃষ্টিই হয় যৌন লালসা উদ্বোধক, পয়গাম বাহক। কাজেই এ দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌন অঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সব কিছুর মূল কারণ। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে, বাস্তবে ঘটনা করে। বাস্তবে যখন কোনো বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থায় সম্মুখীন না হয়ে কারো কোনো উপায় থাকে না।[৭৪] অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি চালনার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত বাণ বিশেষ"।[৭৫]এখানে দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীর, যা মানুষের হৃদয়ে বিষের উদ্রেক করে।

---

৭২. العينان زنا هما النظر والاذنان زنا هما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليدزنا هما البطش والرجل زنا هما الخطاء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه- (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ : সহীহ আল-মুসলিম)

৭৩. আল্লামা খাত্তাবী, *মুয়ালিমুস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২২৩

৭৪. হাফেজ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, *আল-জাওয়াবুল কাফী*, পৃ. ২০৪

৭৫. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس- (আল-হাদীস)

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,“তোমাদের দৃষ্টিকে নীচু করো, নিয়ন্ত্রিত করো এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করো”।[৭৬]এ দুটো যেমন আলাদা আলাদা নির্দেশ, তেমনি প্রথমটির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শেষেরটি অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হলেই লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ সম্ভব। অন্যথায় তাকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হতে হবে নিঃসন্দেহে।রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “হে আলী! একবার কোনো পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টিই ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয়বার দেখা নয়”।[৭৭]এর কারণ সুস্পষ্ট। আকস্মিকভাবে কারো প্রতি চোখ পড়ে যাওয়া আর ইচ্ছাক্রমে কারো প্রতি তাকানো সমান কথা নয়। প্রথমবার যে চোখ কারো ওপর পড়ে গেছে, তার মূলে ব্যক্তির ইচ্ছার বিশেষ কোনো যোগ থাকে না; কিন্তু পুনর্বার তাকে দেখা ইচ্ছাক্রমেই হওয়া সম্ভব। এ জন্যেই প্রথমবারের দেখায় কোনো দোষ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দিকে চোখ তুলে তাকানো ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষত এ জন্য যে, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির পেছনে মনের কলুষতা ও লালসা পংকিল উত্তেজনা থাকাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের দৃষ্টি দিয়ে পরস্ত্রীকে দেখা স্পষ্ট হারাম। তার মানে কখনো এ নয় যে, পরস্ত্রীকে একবার বুঝি দেখা জায়েয এবং এখানে তার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আসলে পরস্ত্রীকে দেখা মূলতই জায়েয নয়। এজন্যেই কুরআন ও হাদীসে দৃষ্টি নত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেসা করা হলো- ‘পরস্ত্রীর প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে আপনার কি হুকুম’? তিনি বললেন, তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, “তোমার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও”।[৭৮]দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া কয়েকভাবে হতে পারে। আসলে কথা হচ্ছে পরস্ত্রীকে দেখার পংকিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। আকস্মিভাবে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ও যদি কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নীচু করা, অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ঈমানদার ব্যক্তির কাজ। রাসূলুল্লাহ (স.) একবার দরবারে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েলোকদের জন্যে ভালো কি? সকলেই চুপ থাকলেন, কেউ কোনো জবাব দিতে পারলেন না। হযরত আলী এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাড়ি এসে ফাতিমা (রা.) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেসা করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন-ভিন্ পুরুষরা তাদের দেখবে না। (এটাই তাদের জন্যে ভালো ও কল্যাণকর)।[৭৯] বস্তুত ইসলামী সমাজ জীবনের পবিত্রতা রক্ষার্থে পুরুষদের পক্ষে যেমন ভিন্ মেয়েলোক দেখা হারাম, তেমনি হারাম মেয়েদের পক্ষেও ভিন্ পুরুষদের দেখা। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে পাশাপাশি উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, “পুরুষদেরকে দেখা মেয়েদের জন্য হারাম, ঠিক যেমন হারাম পুরুষদের জন্য মেয়েদের দেখা”।[৭০]এর কারণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন, কেননা মেয়েলোক মানব জাতিরই অন্তর্ভূক্ত একটা প্রজাতি। এজন্য পুরুষের মতোই মেয়েদের জন্য তারই মতো অপর প্রজাতি পুরুষদের দেখা হারাম করা হয়েছে। এ কথার যথার্থতা বোঝা যায় এ দিক দিয়েও যে, গায়র-মুহাররমের প্রতি তাকানো হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যৌন বিপর্যয়ের ভয়। আর মেয়েদের ব্যাপারে এ ভয় অনেক বেশি। কেননা যৌন উত্তেজনা যেমন মেয়েদের বেশি, সে পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা তাদের কম। আর পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের

---

৭৬. غضوا ابصاركم واحفظوا فرجكم-

৭৭. ياعلى لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة- (সুনান আবু দাউদ)

৭৮. اصرف بصر (সুনান আবি দাউদ)

৭৯. *জামেউল ফাওয়ায়েদ*, খ. ১, পৃ. ৩১৭

৭০. يحرم على المراة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المراة- আল্লামা শাওকানী,-*নাইলুল আওতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

কারণেই অধিক যৌন বিপর্যয় ঘটে থাকে।[৭১] নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে এ কথায় যথার্থতা প্রমাণিত হয়। একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলের কাছে বসে ছিলেন হযরত মায়মুনা ও উম্মে সালমা দুই উম্মুল মু'মিনীন। রাসূলুল্লাহ (স.) ইবনে উম্মে মাকতুমকে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার পূর্বে দুই উম্মুল মু'মিনীনকে বললেন: তোমরা দুজন ইবনে উম্মে মাততুমের কারণে পর্দার আড়ালে চলে যাও।তাঁরা দুজন বললেন: হে রাসূল, ইবনে মাকতুম কি অন্ধ নয়? তাহলে তো সে আমাদের দেখতে পাবে না আর চিনতে ও পারবে না, তাহলে পর্দার আড়ালে যাওয়ার কি প্রয়োজন? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সে অন্ধ, কিন্তু তোমরা দুজনও কি অন্ধ নাকি? সে তোমাদের দেখতে না পেলেও তোমরাও কি তাকে দেখতে পাবে না?[৭২]তার মানে একজন পুরুষদের পক্ষে ভিন্ মেয়েলোকদের দেখা যে কারণে নিষিদ্ধ, মেয়েলোকদের পক্ষেও ভিন্ পুরুষদের দেখায় ঠিক সে সে কারণই বর্তমান। অতএব তাও সমানভাবে নিষিদ্ধ। বস্তুত আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে সঠিক জীবন যাপন করার জন্যে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ জরুরী। যার দৃষ্টি সুনিয়ন্ত্রিত নয় ইতস্তত নারীর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে যার চোখ অভ্যস্ত, আসক্ত, তার পক্ষে আল্লাহ্র বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,"যে মুসলিম ব্যক্তি প্রথমবারে নারীর সৌন্দর্য দর্শন করে ও সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তার জন্যে তারই ইবাদাত-বন্দেগীর কাজে বিশেষ মাধুর্য সৃষ্টি করে দেবেন"।[৭৩] তাহলে যাদের দৃষ্টি নারী সৌন্দর্য দেখতে নিমগ্ন থাকে, তাদের পক্ষে ইবাদতে মাধুর্য লাভ সম্ভব হবে না। হাফেয ইবনে কাসীর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত চোখ ক্রন্দনরত থাকবে; কিন্তু কিছু চোখ হবে সন্তুষ্ট, আনন্দোজ্জ্বল। আর তা হচ্ছে সে চোখ, যা আল্লাহ্র হারাম করে দেয়া জিনিসগুলো দেখা হতে দুনিয়ায় বিরত থাকবে, যা আল্লাহ্র পথে অতন্দ্র থাকার কষ্ট ভোগ করবে এবং যা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বর্ষণ করবে।[৭৪] মূলকথা হল, গায়রে মুহাররম স্ত্রী-পুরুষের পারস্পারিক দৃষ্টি বিনিময়ে কিংবা একজনের অপরজনকে দেখা, লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে করে পারিবারিক জীবনে শুধু যে পংকিলতার বিষবাষ্প জমে উঠে তাই নয়, তাতে আসতে পারে এক প্রলয়ংকর ভাঙন ও বিপর্যয়। মনে করা যেতে পারে, একজন পুরুষের দৃষ্টিতে কোনো পরস্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী হয়ে দেখা দিল। পুরুষ তার প্রতি দৃষ্টি পথে ঢেলে দিল প্রাণ মাতানো মত ভুলানো প্রেম ও ভালবাসা। স্ত্রীলোকটি তাতে আত্মহারা হয়ে গেল,সেও ঠিক দৃষ্টির মাধ্যমেই আত্মসমর্পণ করল এই পর-পুরুষের কাছে। এর ফলে পুরুষ কি তার ঘরের স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাজন হবে না? হবে নাকি এই স্ত্রী লোকটি নিজের স্বামীর প্রতি অনাসক্ত, আনুগত্যহীনা। আর তাই যদি হয়, তাহলে উভয়ের পারিবারিক জীবনের গ্রন্থি প্রথমে কলংকিত ও বিষ-জর্জর এবং পরে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হতে বাধ্য। এর পরিণামই তো আমরা সমাজে দিনরাতই দেখতে পাচ্ছি।

---

৭১. প্রাগুক্ত

৭২. সুনান তিরমীজি, *সুনান আবি দাউদ*

৭৩. ما من مسلم ينظر الى محاسن المراة اول مرة ثم يغض بصرة الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها- (আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

৭৪. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর, *তাফসিরুল কুরআনিল আযীম* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০১), খ. ২, পৃ, ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

পর্দা গ্রহণ না করার বিধান :

ইসলামে পর্দা ব্যবস্থা পরিবারের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্য একান্তই অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হলে পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ স্থিতি ধারণাতীত। ইসলামের এই পর্দা ব্যবস্থার দুটি পর্যায়ে রয়েছে। একটি হচ্ছে ঘরের আর অপরটি বাইরের। ঘরের অভ্যন্তরে থাকাকালীন পর্দা ব্যবস্থা পালন করা যেমন মুসলিম নারীর পক্ষে কর্তব্য তেমনি ঘরের বাইরের ক্ষেত্রে। এ উভয় ক্ষেত্রের জন্যে যে পর্দা ব্যবস্থা, তাই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যবস্থা। নিম্মে পর্দার দু'টি পর্যায় বর্ণনা করা হল-

প্রথম পর্যায় :

এ পর্যায়ে ঘরোয়া জীবনে, ঘরের অভ্যন্তরে পালন ও অনুসরণের বিধান। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত কর্মকেন্দ্র হচ্ছে তার ঘর। ঘরকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করা বরং স্থায়ীভাবে ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থায় করাই হচ্ছে মুসলিম নারীর কর্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না"।[৭৫] আয়াটির দুটো অংশ। প্রথম অংশ পর্দা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় অংশ তার দ্বিতীয় পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আয়াতটির প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে, নারীর আসল স্থান হচ্ছে ঘর; অতএব ঘরে অবস্থান করাই তার কর্তব্য। আয়াতের শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতি প্রমাণ করছে যে, প্রত্যেক নারীর জন্যে একখানা ঘর থাকা উচিত, যেখানে তার বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট ও সর্বজন পরিচিত। দ্বিতীয়ত, তার এ ঘরই হবে তার অবস্থানের জায়গা ও কর্মকেন্দ্র। নারী-জীবনের যা কিছু করণীয়, তা প্রধানত এ ঘরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হবে এবং যে সব কাজ সে নিজের ঘরে বসে সম্পন্ন করতে পারে, তাই হচ্ছে তার পক্ষে শোভনীয় কর্মসূচী। অন্য কথায়, প্রধানত তার বসবাসের ঘরকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে তার জন্যে কর্মসূচী।আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, তোমাদের ঘরকে তোমরা আঁকড়ে থাকো এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে কখনো বের হবে না। এ আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, মেয়েরা ঘরকে আঁকড়ে থাকার জন্যে নির্দিষ্ট এবং বাইরে বের হওয়া থেকে নিষেধকৃত।[৭৬] ঘরেই বসবাস করো, বাইরে দৌড়াদৌড়ি করো না এবং ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে যেও না।[৭৭] এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, এতে মেয়েদেরকে তাদের নিজেদের ঘরে ধীরস্থিরভাবে বসবাসের আদেশ করা হয়েছে।৭৮'তোমরা তোমাদের মন তথা নিজেদের সত্ত্বাকে ঘরের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রাখ।[৭৯] আল্লামা আলুসী লিখেছেন,সকল প্রকার পাঠ-রীতিতেই এর মানে হচ্ছে এই যে, আয়াতে মেয়েদেরকে ঘরকে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সব মেয়েদের প্রতিই এ হচ্ছে ইসলামের দাবি।[৮০] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তাদের ঘরই তাদের জন্যে সুখ-শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের আকর"। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, কিছু সংখ্যক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে

---

৭৫. -وقرن فى بيوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الاولى (আল-কুরআন, ৩৩: ৩৩)

৭৬. আল্লামা আবূ বাকর আল-জাস্‌সাস, *আহকামুল করআন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৪৩

৭৭. আল্লামা ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৩৩

৭৮. আল্লামা শওকানী, *ফাতহুল কাদির*, খ. ৩, পৃ. ২৬৯

৭৯. আল্লামা আলুসী, *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৬

৮০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন করলেন, হে রাসূল, পুরুষরা তো আল্লাহ্র প্রদও বিশিষ্টতা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ প্রভৃতি দ্বারা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে গেছে। আমরা কি এমন কোনো কাজ করতে পারি, যা করে আমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা লাভ করব? এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন “যে মেয়েলোক তার ঘরে অবস্থান করল, সে ঠিক আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর কাজ সম্পন্ন করতে পারল”। রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা থেকে স্পষ্ট বুজা যায় যে, মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া বিশিষ্টতা মেয়েরা লাভ করতে পারে না কোনোক্রমেই। কেননা তা জন্মগত ব্যাপার। পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই তার এ বিশিষ্টতা। আর মেয়েরা তা পেতে পারে না এজন্যে যে, মেয়ে হয়েই তাদের জন্ম। আর পরুষও আল্লাহ্রই তো সৃষ্টি। তবে নৈতিক মান মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য নেই, মেয়েরাও তা লাভ করতে পারে পুরুষদের মতোই যদিও ঠিক একই কাজ দ্বারা নয়। কাজের স্বরূপ, ধরন, ক্ষেত্র বিভিন্ন হলেও কাজের ফল হিসেবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করার ব্যাপারে মেয়ে-পুরুষ সকলেই সমান। রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মেয়েদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর আর পুরুষদের কর্মক্ষেত্র বাইরে। জিহাদের সওয়াব পাবার জন্যে পুরুষদের তো যুদ্ধের ময়দানে যেতে হবে, দ্বীনের শত্রুদের সাথে কার্যত মুকাবিলা করতে হবে, জীবন-প্রাণ কঠিন বিপদের সম্মুখে ঠেলে দিতে হবে, ঘর-বাড়ি থেকে বহুদূরে চলে যেতে হবে। কিন্তু মেয়েদের জিহাদ তার ঘরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হবে এবং ঘরের দায়িত্ব পালন করলেই পুরুষদের জিহাদের সমান মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করতে পারবে। জিহাদ স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই করতে হবে। কিন্তু পুরুষদের করতে হবে তা বাইরের ক্ষেত্রে, যুদ্ধের ময়দানে। কেননা তা করার যোগ্যতা ক্ষমতা তাদেরই দেয়া হয়েছে, বাইরের জিহাদের নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘মেয়েদের নিজেদের ঘর’ কথাটির বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘরকে ‘স্ত্রীদের ঘর’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে ‘তোমাদের নিজেদের ঘরে’। তার মানে স্ত্রীর নিজস্ব ঘর থাকা আবশ্যক এবং এ ঘরই হবে তার কর্মকেন্দ্র, জীবনকেন্দ্র। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর এক একজন বেগমের জন্যে এক-একটি হুজরা ছোট কক্ষ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং যে বেগম যে হুজরায় বসবাস করতেন, তিনিই ছিলেন তার মালিক, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনার কর্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপস্থিতিতেও তিনিই তাতে মালিকানা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন।[৮১] এরই ভিত্তিতে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, যে লোক তার স্ত্রীর বসবাসের জন্যে কোনো ঘর নির্মাণ করবে এবং তার পরিচালনা অধিকার তারই হস্তে অর্পন করবে, সে যেন স্ত্রীকে একখানি ঘর সম্পর্ণ হেবা দিলো, তারই কাছে তা হস্তান্তর করে দিলো। ফলে সেই মালিকানা স্ত্রীর হয়ে যাবে।[৮২] উপরোক্ত আয়াতে এ ঘরকেই আশ্রয় হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্যে সমস্ত মুসলিম মহিলাকে আদেশ করা হয়েছে। এমন কি জামা‘আতে নামায আদায় ওয়াজিব করা হয়েছে কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যে, মহিলাদের পক্ষে সে নামাযের জামা‘আতের উদ্দেশ্যও ঘর থেকে বের হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “মেয়েদের ঘরের কোণই হচ্ছে তাদের জন্যে উত্তম মসজিদ”।[৮৩] মেয়েরা তাদের ঘরে নামাযের জন্যে এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেবে, যেখানে তাকে কেউ দেখতেও পাবে না, আর তার কোনো শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।[৮৪]উম্মে হুমাউদ নামে পরিচিতা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল,

---

৮১. আহলি সুন্নাত আল-জামায়াত-এর মতে এ মালিকানা এমন ছিল না, যার ওপর মিরাসের আইন কার্যকর হতে পারত এবং রাসূলের পরও তার মালিক হয়ে থাকতে পারতেন।

৮২. আল্লামা আলুসী, *রুহুল মা’য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৭ বিহাওলাতু তাহফাতুর উনছা আশরিয়াহ

৮৩. -خير مساجد النساء تعر بيوتهن (আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

৮৪. আল্লামা আহমাদুল বান্না, *বুলুগুল আমানী*, খ. ৫, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

হে রাসূল, আমি আপনার সাথে জামা'আতে মসজিদে নামায পড়তে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেলেন, "হ্যাঁ, আমি জানতে পারলাম তুমি আমার সাথে জামা'আতে নামায পড়া খুব পছন্দ করো। কিন্তু মনে রেখ, তোমার শয়নকক্ষে বসে নামায পড়া তোমার জন্য বৈঠকখানায় নামায পড়া অপেক্ষা ভালো, বৈঠকখানায় নামায পড়া ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়া অপেক্ষা ভালো, ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়া ঘরের কাছাকাছি মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা ভালো আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার এ মসজিদে এসে নামায পড়া অপেক্ষা ভালো"।[৮৫] অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে মেয়েলোকটির আদেশ তার ঘরের দূরতম ও অন্ধকারতম কোণে নামাযের জায়গা বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই নামায পড়েছিল।[৮৬] এ হাদীসে থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল ব্যাপারে এমন কি নামাযে ও আল্লাহ্র সব বন্দেগীর কাজে পূর্ণ মাত্রায় পর্দা গ্রহণ মেয়েদের জন্যে আবশ্যক। আর ঘরের সবচেয়ে গোপন কোণে নামায পড়ায় অধিকতর ও পূর্ণতার সওয়াব বলে নবী করীম (স.) মেয়ে লোকটিকে তার ঘরের অধিক গোপন ও লোকদৃষ্টি থেকে দূরবর্তী জায়গায় নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (স.) মেয়েলোকদের মসজিদে যেতে চাইলে নিষেধ করতে মানা করেছেন একথা ঠিক; কিন্তু তিনি যদি আজকের দিনের মেয়েদের অবস্থা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মেয়েদেরকে মসজদে যেতে নিষেধ করতেন।[৮৭] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন, "মেয়েরা তার ঘরে বসে আল্লাহ্র যে ইবাদত সম্পন্ন করে, সে রকম ইবাদত আর হয় না"। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে মেয়েলোকের সেই নামায সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়, যা সে তার ঘরের অন্ধকারতম কোণে পড়েছে। ঠিক এ দৃষ্টিতেই রাসূলুল্লাহ (স.) মেয়েদেরকে জানাযার সঙ্গে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছেন। হযরত উম্মে আতীয়াতা (রা.) বলেন, জানাযা অনুসরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও রাসূলুল্লাহ (স.) এ ব্যাপারে আমাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করেননি।[৮৮] অপর এক হাদীসে হযরত উম্মে আতীয়াতা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে জানাযার বের হতে নিষেধ করেছেন।[৮৯] হযরত উম্মে আতীয়তার প্রথমোক্ত কথা থেকে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (স.) মেয়েদেরকে জানাযায় বের হতে ও কবরস্থান পর্যন্ত গমন করতে নিষেধ করেছেন বটে; যদিও সে নিষেধ হারাম পর্যায়ে নহে। কেননা তিনি এ ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি দেখাননি, খুব তাগিদ করে নিষেধ করেননি। শুধু অপছন্দ করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেছেন, উম্মে আতীয়াতার হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ নিষেধ নৈতিক শিক্ষাদানমূলক, সব ইসলামবিদই এ মত গ্রহণ করেছেন।[৯০] ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেছেন, এ কাজ মেয়েদের শোভা পায় না। ইমাম শাফেয়ী এ কাজকে মাকরূহ মনে করেছেন হারাম নয়।[৯১] এখানে উল্লেখ্য যে, জামা'আতের সাথে

---

৮৫. قد علمت انك تحبين الصلاة معى وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدى- (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*

৮৮. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا- (বুখারীও মুসলিম)

৮৯. আল্লামা আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ৮, পৃ. ৬৩

৯০. প্রাগুক্ত

৯১. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

নামায পড়তে মসজিদে যাওয়া এবং জানাযার সাথে কবরস্থানে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীদের ইসলামী সমাজের সোনালী যুগে। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় সেকালেও যদি এ দুটো কাজে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, অপছন্দ করা হয়ে থাকে, তাহলে এ যুগে কি তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে । উপরন্তু ঠিক যে সমস্ত কারণে এ নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সে সমস্ত কারণ এ যুগে অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায় :

মানুষকে কারণে অকারণে বাড়ির বাহিরে যেতে হয়। ঘরের বাইরে বের হলেই বয়স্ক নারী পুরুষ সবাইকে পর্দা ব্যবস্থা পালন করে চলতে হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে মজবুত হয়ে স্থিতি গ্রহণ করো, স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং তোমরা প্রথম কালের জাহিলিয়াতের নারীদের মতো নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না"।[৯২]আয়াতের প্রথম অংশে মেয়েলোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের ঘরেই স্থায়ীভাবে দৃঢ়তা সহকারে বসবাস করে। আর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে, ঘরের বাইরে গিয়ে জাহিলী যুগের নারীদের মতো লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ভিন পুরুষদের সামনে হেসে গলে ঢলে পড়ো না, নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহের কান্তি দেখিয়ে বেড়িও না, আয়াতের প্রথমাংশ ঘর সম্পর্কে আর দ্বিতীয়াংশ ঘরের বাইরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আয়াতে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদের মতো নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে। এ আয়াতে মুসলিম নারীদের যে ঘর থেকে বের হতে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করা হয়নি, তার প্রথম প্রমাণ এই যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মুসলিম মহিলারা ঘরের বাইরে গিয়েছেন। মসজিদে নামায পড়তে, হজ্জ করার জন্যে, বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে, পিতামাতা-নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করতে এবং আরো অনেক অনেক কাজে। এ আয়াতে যদি ঘরের বাইরে যেতে নিষেধই করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স.) এসব কিছুতেই বরাদশ্ত করতেন না। কিন্তু রাসূলের জীবদ্দশায়, সাহাবীদের যুগে এ কাজ যখন অবাধে সম্পন্ন হয়েছে, তখন সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে সম্পূর্ণরূপে ও অকাট্যভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়নি। নিষেধ করা হয়েছে অন্য কিছু, যা শরী'আতে প্রকৃতই নিষিদ্ধ। বরং দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) মুসলিম মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের দরুন ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেয়া হয়েছে"।[৯৩]মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বের হবার কোনো অধিকারই রাখে না, তবে যদি কেউ খুব বেশি নিরুপায় হয়ে যায় বরং তার চাকরও না থাকে তবে সে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে বের হতে পারবে। ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ ও বাইরে যাওয়ার নিষেধ অকাট্য ও শর্তহীন নয়। তা যদি হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (স.) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহিলাদের নিশ্চয়ই হজ্জ, উমরা ইত্যাদির জন্যে কখনো ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না, যুদ্ধে জিহাদে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন না এবং বাপ-মার সাথে সাক্ষাতের জন্যে, রোগীকে দেখার জন্যে এবং নিকাটাত্মীয়দের শোকে শরীক হওয়ার জন্যে কখনো বাইরে যেতে তাদের অনুমতি দিতেন না।[৯৪] আল্লামা আলূসীর ভাষায় বলা যায়, মেয়েদেরকে ঘরে অবস্থান করতে

৯২. -وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى (আল-কুরআন, ৩৩:৩৩)

৯৩. -اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী)

৯৪. আল্লামা আলূসী, *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ করা হয়েছে, কেননা এরই দ্বারা তাদের মর্যাদা ও বিশিষ্টতা সাধারণত মেয়েদের ওপর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এর সঠিক অর্থ এই যে, তারা বেশিরভাগ সময় ও সাধারণত নিজেদের ঘরেই অবস্থান করবে এবং তারা খুব বেশি বাইরে গমনকারিণী, খুব বেশি লোকজনের ভীড়ে প্রবেশকারিণী এবং ঘাটে-পথে, হাটে-বাজারে, দোকানে-বিপনীতেও লোকদের ঘরে ঘরে যাতায়াতকারিণী হবে না।[৯৫] আয়াতে ঘর থেকে বের হতে একেবারে নিষেধ করে দেয়া হয়নি– যদিও নামায, হজ্জ কিংবা অপর কোনো মানবীয় জরুরী কাজে হোক না কেন।[৯৬] আয়াতে বলা হয়েছে 'তাবাররুজ' করো না। 'তাবাররুজ' মানে হাস্যলাস্য ও লীলায়িত ভঙ্গীতে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করা, ভিন্ পুরুষের মনে যৌন স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরা, যা মেয়েদের শরীর আবৃত করে না, গলাদেশ, কণ্ঠহার ও কানের দুল-বালার চাকচিক্য জাহির করা এবং এ ধরনেরই অন্যান্য কাজ। আয়াতে এসবকেই নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এরই ফলে আসে নৈতিক বিপর্যয় আর মহাগুনাহের দিকে পদক্ষেপ।[৯৭]আবু উবায়দা, মেয়েলোক যখন তাদের দেহের এমন সৌন্দর্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে, যা পুরুষদের যৌন স্পৃহা উত্তেজিত করে তুলে, তখন তারা 'তাবাররুজ' করেছে। জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা স্বামী ও প্রণয়ী যুগপতভাবে গ্রহণ করত। স্বামীর জন্যে তার দেহের নিম্নার্ধ নির্দিষ্ট রাখত, আর উর্ধার্ধাংশ ছেড়ে দিত পুরুষ বন্ধু ও প্রণয়ীর ব্যবহারে। তারা স্পর্শ, চুম্বন ও লেহন দিয়ে তাকে ভোগ করত।[৯৮]জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা তাদের দেহের অশ্লীল অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত ও অনাবৃত করে চলত। এমনকি এক-একজন মেয়েলোক তার স্বামী ও প্রণয়ীকে নিয়ে একসঙ্গে বসত। প্রণয়ী তার বস্ত্রের উপরিভাগ নিয়ে সুখ ভোগ করত আর স্বামী পরিতৃপ্ত হত তার দেহের বস্ত্রাবৃত নিম্নভাগ ব্যবহার করে। আবার কখনো একজন অপর জনের কাছ থেকে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ অদল-বদলে করে নিতেও চাইত।[৯৯] এ সব উদ্ধৃতি থেকে জাহিলিয়াতের নারী চরিত্র ও তদানীন্তন সমাজের বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে, আয়াতে তা নিষেধ করা হয়নি; নিষেধ করা হয়েছে বাইরে গিয়ে এসব কাজ করতে, যা উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে জাহিলিয়াত, জাহিলিয়াতের 'তাবাররুজ' যার সাথে এ যুগের সভ্যতা, সংস্কৃতিসম্পন্ন নারী সমাজের পূর্ণ মিল ও সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হাটে-বাজারে, দোকানে-বিপনীতে, পথে-পার্কে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ও ক্লাবে-মিটিং-এ। আর কুরআন মজীদে উপরোক্ত আয়াতাংশে এ সব কাজকেই নিষেধ করা হয়েছে, চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। ঘরের অভ্যন্তরেও নারী-পুরুষের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "বাবা, চাচা-মামা, নিজ সন্তান, সহোদর ভাই, ভাই-পো, বোন-পো, মুসলিম মহিলা ও দাস দাসীদের সাথে দেখা দেয়ায় কোনো দোষ নেই"।[১০০]

---

৯৫. প্রাগুক্ত

৯৬. সানাউল্লাহ্ পানিপত্তী, *আল-মাযহারী*, খ.৮, পৃ.৩৬৯

৯৭. আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, *মুহাসিনুত তা'বিল*, খ. ১৩, পৃ. ৪৮৪৯

৯৮. রুহুর মা'য়ানী, খ. ২২, পৃ. ৮

৯৯. আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদির*,খ.৪, পৃ. ২৬৯

১০০.-لا جناح عليهن فى اب ئهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن وال ابناء اخوتهن والا نيا ئهن ولا ملكت ايمانهن (আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতে যাদের থেকে পর্দা করা ওয়াজিব নয়, তাদের কথা বলা হয়েছে।[১০১]বাহ্যত এর অর্থ হচ্ছে এদের পর্দা না করলে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"এবং মেয়েলোকেরা তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, গর্ভজাত ছেলে-সন্তান, স্বামীর পুত্র, সহোদয় ভাই, ভাই-পো, বোন-পো, মেলা-মেশার মেয়েলোক, দাস, মেয়েদের প্রতি কোনো প্রয়োজন রাখ না এমন সব পুরুষ এবং যেসব ছেলেপেলে এখনও মেয়েদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সচেতন হয়নি, এদের ছাড়া আর কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না"।[১০২]আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। প্রথমত মেয়েরা তাদের নিজ নিজ স্বামীকে দেখা দিতে পারবে, নিজের রূপ-সৌন্দর্য দেখাতে পারবে। শুধু তাই নয়, স্বামীর পক্ষে তার সমগ্র দেহকে দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা সম্পূর্ণ জায়েয। নারী রূপ-সৌন্দর্য যৌবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চরম স্বামী বল প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। যদিও স্ত্রীর যৌন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কারো মতে অশোভন, কারো মতে মাকরূহ আর কারো মতে হারাম। দ্বিতীয়ত কেবল বাবাকেই নয়, বাবার বাবা, তার বাবার ভাই, মায়ের ভাই ইত্যাদিকেও দেখা দেয়া জায়েয। কেবল নিজের বাবা-দাদাই নয়, মায়ের বাবাকেও দেখা দিতে পারে। দুধ বাবাকেও দেখা দেয়া জায়েয। হযরত আয়েশার দুধবাপ ছিল আবূ কুয়াইস। সে হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন,"তাঁর সাথে দেখা দেয়ার ব্যাপারে রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার আগে আমি তাঁকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেব না"।[১০৩] পরে রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর কথা বলা হলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দাও, কেননা সে তো চাচা হয়। তৃতীয়ত সাধারণ মেলামেশার মেয়েলোক, যাদের সঙ্গে দিনরাত দেখা-সাক্ষাত হয়েই থাকে কিংবা যাদেরকে ঘরের ভিতরে কাজ-কর্ম করানোর উদ্দেশ্য নিযুক্ত করা হয়। কাফির ও ফাসিক মেয়েদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা মুসলিম মহিলাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা তাতে করে পর্দার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে যিম্মী ও গায়র যিম্মীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যিম্মী মেয়েলোক মুসলিম মহিলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। ইমাম গাযালীর মতে, অন্য মুসলিম মহিলার মতো যিম্মী মেয়েলোকও দেখতে পারে। আর ইমাম বগবীর মতে এ দেখা জায়েয নয়। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন- খেদমত করার সময় মুসলিম মহিলাদের দেহের যে অংশ সাধারণত প্রকাশ হয়ে পড়ে তা দেখা যিম্মী মেয়েলোকের পক্ষে হারাম, এ হচ্ছে অধিক সত্য ও সহীহ মত। তবে যিম্মী মেয়েলোকেরা নিজের মুনিব মহিলাকে দেখতে পারে। সহীহ হাদীসে উম্মুল মু'মিনীদের কাছে যিম্মী মেয়েলোকের অনুপ্রবেশের যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, খেদমতের জন্যে যে অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে তা দেখা জায়েয।[১০৪]সব মেয়েলোকদের সাথেই মুসলিম মেয়েরা দেখা-সাক্ষাত করতে পারে।[১০৫] চতুর্থত মেয়েদের প্রতি যেসব পুরুষ কোনো প্রয়োজন রাখে না এমন সব অধীনস্থ লোকের দেখা দেয়াও জায়েয। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা ঘরের বাড়তি খাবার খেতে আসে, কেননা তারা নিজেরা উপার্জন করতে অক্ষম। এরা মেয়েদের দিকে কোনো যৌন প্রয়োজন বোধ করে না, বরং কাজকর্ম করে দেয়, কথাবার্তা শোনে।

---

১০১. আল্লামা আলুসী, *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৭৪

১০২. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعو لتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخواتهن او نسائهن او ماملكت ايمانهن او التبعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورت اليساء- (আল-কুরআন,২৪ : ৩১)

১০৩. لا اذن له حتى استا ذن فيها النبى صلى الله عليه وسلم- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*)

১০৪. আল্লামা আলুসী, *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৪৩

১০৫. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

এরা হচ্ছে বিগত যৌবন বৃদ্ধ, আধাবৃদ্ধ লোক। পঞ্চমত সেসব ছেলেপেলে, যারা এখনো মেয়েলোকদের যৌনত্বের কোনো বোধ লাভ করেনি, যাদের মধ্যে যৌন বোধ এখনো জাগ্রত হয়নি, যে সব কিশোরের মনে নারীদের প্রতি এখনো কোনো কৌতুহল ও ঔৎসুক্য জাগেনি, তারাও এর মধ্যে শামিল। এসব পুরুষ লোকের সঙ্গে পর্দানশীল মেয়েরাও অবাধে দেখা-সাক্ষাত করতে পারে, এদের সামনে সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন করে ও আসতে পারে। শরী'আত তার পূর্ণ ও স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে। কেননা পর্দানশীল মেয়েদের এ ধরনের পুরুষদের সাথে দিন-রাত দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়ত এ ধরনের পুরুষদের কাছ থেকে মেয়েদের কোনো নৈতিক বিপর্যয় কোনো অঘটন ঘটার আশংকা নেই বললেও চলে। আর আশংকা না থাকারও কারণ এই যে, এরা হচ্ছে নিতান্ত আপন লোক। আত্মীয়তা, নৈকট্য, রক্ত সম্পর্ক ইত্যাদি বিপর্যয়ের পথের প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদের জন্যে সাধারণত খোলা থাকে মেয়েদের যেসব দেহাঙ্গ, তা দেখায় কোনো দোষ নেই, আর তা হচ্ছে মুখমন্ডল, মাথা, পা-হাটু, দুই হাত। কিন্তু এদের জন্যেও বুক, পিঠ ও পেট এবং নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এলাকার কিছু অংশ দেখা আদৌ জায়েয নয়। কেননা এসব অঙ্গ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে না, বস্ত্রাবৃত থাকাই স্বাভাবিক এবং এসব অঙ্গই প্রধানত যৌন আবেদনকারী। এ ব্যবস্থা দ্বারা মেয়েদের জন্যে একটি পরিবেষ্টনী নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো, সেখানে তারা স্বাধীনতাভাবে ও দ্বিধা-সংকোচহীণ হয়ে বিচরণ করতে পারে। বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে যেসব পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের পথে ইসলামী শরীয়তে কোনোই বাধা আরোপ করা হয়নি বরং অবাধ অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ বাইরের পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত নারী-পুরুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এজন্যে তা বর্জন করা প্রত্যেক ঈমানদার মহিলার কাছেই তার ঈমান ও ইসলামী বিধানের ঐকান্তিক দাবি। মেয়েদের যে একান্তভাবে ঘরের অভ্যন্তরেই বসে থাকতে হবে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা, সারা মাস বছর, সমগ্র জীবন, আর ঘর থেকে তারা আদৌ বাইরে বেরুতেই পারবে না, নিতান্ত প্রয়োজনেও নয়, এমন কথা আল্লাহ ত'য়ালা পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ (স.) হাদিসে বলেননি। সাহাবী, তাবেয়ীন ও পরবর্তীকালের মুজতাহিদীন কেউই সে মত প্রকাশ করেননি। তাঁরা সকলেই কুরআন থেকে এ কথাই বুঝেছেন যে, মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে যেতে নিষেধ নেই। তবে নিষেধ হচ্ছে বাইরে গিয়ে তাদের পর্দা নষ্ট করা, রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষদের মনে নিদ্রাতুর যৌন পশুকে প্রচণ্ড হুংকারে ক্ষিপ্ত করে দেয়া। এ না করলে তাদের বাইরে যেতে প্রয়োজন মতো ঘর থেকে বের হতে, এমনকি দোকানে-বাজারে যেতে, রাস্তাঘাটে চলতে কোনোই দোষ নেই। তবে শর্ত এই যে, তা অবশ্যই বিনা কারণে আর বিনা প্রয়োজনে হবেনা; শুধু ঘুরেফিরে হাওয়া খেয়ে গাল-গল্প করে উদ্দেশ্য হবে না। প্রয়োজনে আর জরুরী কাজে ঘর থেকে বেরুতে হলে মেয়েদের সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করা। কুরআনে মজীদে নিন্মোক্ত আয়াতে ঘরের বাইরে মেয়েদের অবশ্য পালনীয় হিসেবে বলা হয়েছে,"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম মেয়েলোকদের বলো, তারা যেন সকলেই ঘরের বাইরে বের হওয়াকালে তাদের মাথার ওপর তাদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়। এভাবে বের হলে তাদের চিনে নেয়া খুব সহজ হবে। ফলে তাদের কেউ জ্বালাতন করবে না। আল্লাহ্ প্রকৃতই বড় ক্ষমাশীল, দয়াবান"।[১০৬] উল্লেখিত আয়াতে 'জিলবাব' বলা হয়,যে কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা হয়। জিলবাব হচ্ছে কোর্তা ও ওড়না, যা দিয়ে শরীর ও মাথা আবৃত করা হয়।[১০৭] আল্লামা যামাখশারী লিখেছেন, 'জিলবাব' হচ্ছে একটি প্রশস্ত

১০৬. يايها النبى قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن – ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين- وكان الله غفورا رحيما- (আল-কুরআন, ৩৩: ৫৯)

১০৭. আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, *মুফরাদাত*, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

কাপড় তা ওড়না-দোপাট্টা থেকেও প্রশস্ত অথচ চাদরের তুলনায় ছোট। মেয়েরা তা মাথার উপর দিয়ে পরে, আর তা ঝুলিয়ে দেয়, তার দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত রাখে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জিলবার হচ্ছে এমন চাদর, যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢেকে দেয়।[১০৮]মুফাস্‌সিরদের মতে, মেয়েরা পরিধেয় কাপড়ের উপরে যা পরে তাই জিলবাব। এক কথায় এ কালের বোরকা।[১০৯]হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন মেয়েলোকের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যখন তাদের ঘর থেকে বের হবে, তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে চাদর দ্বারা মুখমণ্ডলকে ঢেকে নেবে এবং একটি মাত্র চোখ খোলা রাখবে এ অত্যন্ত জরুরী।[১১০]অপর এক বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, স্বাধীনা ক্রীতদাসী নয় এমন মেয়েলোক যখন ঘর থেকে বাইরে যাবে, তখন তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা আবৃত করে নেবে।[১১১]এ আয়াত বলে দিচ্ছে যে, যুবতী মেয়েদেরকে ভিন্ পুরুষ থেকে নিজেদের মুখমন্ডলকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১১২]হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবূ উবায়দা (রা.) বলেছেন, মুমিন মেয়েদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা পূর্ণ মাত্রায় ঢেকে রাখে, তবে একটি মাত্র চোখ খোলা রাখতে পারে। এ থেকে জানা যাবে যে, তারা স্বাধীন মহিলা ক্রীতদাসী নয়।[১১৩]মেয়েরা তাদের মুখমন্ডলকে এমনভাবে ঢাকবে যে, বাম চক্ষু ছাড়া তাদের শরীরের অপর কোনো অংশ দেখা যাবে না।[১১৪]পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এবং মেয়েরা তাদের অলংকার ভিন পুরুষের সামনে প্রকাশ করবে না, তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা প্রকাশ হতে দিতে নিষেধ নেই এবং তাদের বক্ষদেশের উপর ওড়না-দোপট্টা ফেলে রাখবে"।[১১৫] অর্থাৎ মেয়েরা তাদের অলংকারাদি ভিন পুরুষদের সামনে প্রকাশ করবে না, তবে যা লুকানো সম্ভব হবে না তার কথা ভিন্ন।[১১৬]জীনাত সম্পর্কে ইমাম কুরতবী ও আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেছেন, জীনাত দু'রকমের। একটি হচ্ছে সৃষ্টিগত আর অপরটি উপার্জনগত। সৃষ্টিগত সৌন্দর্য বলতে বোঝায় মুখমণ্ডল, চেহারা (Appearance)। কেননা তাই হচ্ছে সমস্ত রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস কেন্দ্র। নারী জীবনের মাহাত্ম, মাধুর্য এখানেই নিহিত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে উপার্জিত সৌন্দর্য। যা মেয়েরা তাদের সৃষ্টিগত রূপ-সৌন্দর্যকে অধিকতর সুন্দর করে তোলবার জন্যে কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করে, যেমন কাপড়, অলংকারাদি, সুরমা মাখা চোখ, রং, খেজাব, মেহেন্দি।[১১৭]এ দু'রকমের জিনাতকেই বাইরের লোক, ভিন্ পুরুষদের সামনে প্রকাশ করতে আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে, 'তবে যা'

---

১০৮. *মুহাসিনুত তা'বিল*, খ. ১৩, পৃ. ৪

১০৯. *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৮৮

১১০. আল্লামা ইবনে কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আ'জীম*, খ. ৩, পৃ. ৫১৮

১১১ আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮

১১২. প্রাগুক্ত

১১৩. *মুহাসিনুত তা'বিল*, খ. ১৩, পৃ. ৪৯০৯; *আল- মাজহারী*,খ. ৭, পৃ. ৪১৯

১১৪. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ৫৭৪

১১৫. -ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منه وليضربن بخمر هن على جيوبهن (আল-কুরআন, ২৪:৩১)

১১৬. ইমাম ইবনে কাসীর, *তাফসিরুল কুরআনিল আ'জীম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৮৩

১১৭. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

আপনা থেকে প্রকাশিত হয়। ইমাম ইবনে কাসীরের তরজমা অনুযায়ী ‘যা লুকানো সম্ভব হয় না’ যা জাহির হতে না দিয়ে পারা যায় নি। ইবনুল আরাবী বলেন, প্রথমে যা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরে যা প্রকাশ হতে না দিয়ে পারা যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এ দুটো এক জিনিস নয়। দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস হতে হবে, তাহলে পরবর্তী জীনাত কি, যা জাহির না করে পারা যায় না, যা গোপন রাখা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। এক তা হচ্ছে কাপড়। কেননা মেয়েরা বোরকা পরেও বাইরের বের হলে অন্তত তার বোরকার বাইরের দিকটি লোকদের সামনে প্রমাশমান হবেই; তা তো আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। দুই সুরমা ও অঙ্গুরীয়। এ হচ্ছে ইবনে আনাসের মত। তিন মুখমন্ডল ও দুই হস্ত। ইবনুল আরাবী বলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত আসলে একই। কেননা সুরমা মুখেরদিকে ব্যবহার করা হয়, আর অঙ্গুরীয় ব্যবহার করা হয় হাতের দিকে আঙ্গুলে। যাঁদের মতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় প্রকাশ নিষেধের আওতায় মধ্যে গন্য নয়, বরং দুটো ভিন্ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা যায় বলে মনে করেন, তাঁরাও সুরমা মাখা চোখ মুখ আর অঙ্গুরীয় পরা হাত ভিন্ পুরুষের সামনে জাহির করা জায়েয মনে করেন না। যে মুখে ও হাতে তা না থাকবে, তাই শুধু বের করা চলবে। যদি সুরমা ও অঙ্গুরীয় ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই ভিন্ পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকোতে হবে। তখন তা প্রথম পর্যায়ে অলংকারের মধ্যে গণ্য হবে, তা লুকানো ওয়াজিব। আর ভেতর দিকের জীনাত হচ্ছে কানবালা, কণ্ঠহার, বাজুবন্দ আর পায়ের মল ইত্যাদি। ইমাম মালিকের মতে মুখ, চুলের রং বাইরের দিকে ‘জীনাত’ নয়, হাতের চুড়ি-বালা ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, তা বাহ্যিক জীনাতের মধ্যে গণ্য, কেননা তা দুই হাতে পরা হয়। আর মুজাহিদ বলেছেন, তা লুকিয়ে রাখার মতো ভেতর দিকের জীনাত। কেননা, তা কব্জাদ্বয়ের বাইরের জীনাত।[১১৮]আর রং যদি পায়ে লাগানো হয়, তবে তা অবশ্যই গোপনীয় জীনাতের মধ্যে হবে। অতএব রং আলতা পরা পা ভিন্ পুরুষকে দেখানো যাবে না। উল্লেখ্য যে, এখানো এসব জীনাত ভিন্ পুরুষের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করার মানে কেবল জীনাত না দেখানোই নয়, বরং এসব জীনাত যেসব অঙ্গে দেহের যে সব জায়গায় পরা হয়, তাও ভিন্ পুরুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে হবে। আয়াতে কেবল জীনাতের (অলংকার) উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অঙ্গে তা পরা হয় তার উল্লেখ করা হয়নি, গোপনীয়তা ও সংরক্ষণের অধিক প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্যে মাত্র। কেননা এ অলংকারগুলো দেহের এমন সব অঙ্গে পরা হয়, যার দিকে কেবল মুহাররম পুরুষ ছাড়া আর কারো তাকানো হালাল নয়।[১১৯]এর অর্থ এই যে, এসব অলংকারের দিকেই যখন ভিন পুরুষের নজর পড়তে দেয়া নিষেধ, তখন তা যেসব অঙ্গে পরা হয়েছে, তার দিকে তাকানো বা তাকানোর সুযোগ দেয়া আরো বেশি নিষিদ্ধ হবে।কোন স্বাধীনা ক্রীতদাসী নয় এমন মহিলার পক্ষে নিজ স্বামী ও মুহাররম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সামনে তার মুখমণ্ডল প্রকাশ করা আদৌ জায়েয নয়। কেননা নারীর সাধারণ ও আসল সৌন্দর্যই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তার মুখমণ্ডলে। এ কারণে একজন নারীর সমগ্র দেহ অপেক্ষা তার মুখমণ্ডল দেখায় অনাচার ঘটার সর্বাধিক আশংকা বিদ্যমান।[১২০]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “নারীর আপাদমস্তক পূর্ণাবয়বই হচ্ছে গোপন করার জিনিস। এ কারণে সে যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন শয়তান তার সঙ্গী হয়ে পিছু লয়”।[১২১]এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, নারীর সমগ্র শরীরই হচ্ছে গোপন রাখার বস্তু। তবে নিতান্ত প্রয়োজনের সময় তা প্রযোজ্য নয়।

---

১১৮. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৫৭

১১৯. আল্লামা কাসেমী, *মুহাসিনুত তা‘বিল*, খ. ১২, পৃ. ৪৫১

১২০. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী : *আল-মাযহারী*, খ. ৬, পৃ. ৪৯৫

১২১. المراة عورة فاذا اخرجت استشر فها الشيطان- (আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা: *সুনান আত-তিরমিযী)*

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে সকল ইসলামবিদ সম্পূর্ণ একমত।[১২২]সে প্রয়োজন কি হতে পারে, যখন নারীর কোনো না কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন কোনো যুবতী নারীর এমন কোনো পুরুষ নেই, যে তার হাট-বাজারের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারে, জরুরী জিনিস ঘরে এনে দিতে পারে। তখন সে বোরকা পরে শুধু পথ দেখার কাজ চলে চোখের জায়গায় এমন ফাঁক রেখে ঘরের বাইরে যাবে এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় গিয়ে দরকারী জিনিসপত্র খরিদ করে ঘরে ফিরে আসবে। যদি তার বোরকা না থাকে, না থাকে তা যোগাড় করার সার্মথ্য, তাহলে সে যে কোনো একখানা কাপড় দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব আবৃত করে নিয়ে বের হবে। এছাড়া দুটো ক্ষেত্র আছে, যখন ভিন্ পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল কিংবা দেহের কোনো না কোনো অঙ্গ প্রকাশ করতে হয়, যেমন ডাক্তার-চিকিৎসকের সামনে অথবা আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে জবানবন্দী বা সাক্ষ্য দেয়ার সময়ে। তখন মুখমন্ডল উম্মুক্ত করা সর্ববাদী সম্মতভাবে বৈধ। তাহলে আল্লাহ্‌র বাণী 'তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে' কথাটির দুটো অর্থ দাঁড়াল। একটি এই যে, নারীর দেহের পূর্ণাবয়ব পর্দা, অতএব তা ভালো করে আবৃত করেই ঘরের বাইরে বের হবে। তখন সে বোরকা বা যে চাদর- কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা হলো, তার বাইরের দিক ভিন পুরুষ দেখলে কাবু হয়ে পড়ে, তবে তাকে 'পুরুষ' মনে করাই বাতুলতা। অন্তত তাতে নারীর কোনো ক্ষতি নেই, তার কোনো গুনাহ্ হবে না।

আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, দেহের যে অঙ্গ প্রকাশ না করে পারা যায় না, যা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই বিশেষ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে। যেমন ডাক্তারের কাছে দেহের বিশেষ কোনো রোগাক্রান্ত অঙ্গ প্রকাশ করা, ইনজেকশন দেয়া, অপারেশন কিংবা রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য তা দেখানো কোনো দোষ নেই, সে নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের সীমা পর্যন্ত- তার বাইরে নয়। অথবা যেমন সাক্ষ্য দেয়া বা জবানবন্দী শোনানোর জন্যে বিচারকের কাছে মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দুটোই আল্লাহ্‌র বাণী- الامظهرمنها 'তবে যা জাহির হয়ে পড়া'র মধ্যে শামিল এবং তা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ জায়েয। মেয়েলোক কোনো সৌন্দর্যই প্রকাশ করবে না। তার সৌন্দর্যের সব জিনিসই আবৃত করে রাখবে। প্রয়োজনের কারণে যা প্রকাশ না করে পারা যায় না, তাই বাদ পড়বে।[১২৩]বলা বাহুল্য, এসব আলোচনাই স্বাধীন রমনী সম্পর্কে, ক্রীতদাসীদের সম্পর্কে নয় এবং নয় বৃদ্ধা, বিগতা যৌবনা নারীদের সম্পর্কে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যেসব মেয়েলোক ঋতুশ্রাব ও সন্তান প্রসব থেকে চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করেছে, যারা বিয়ের বা স্বামী সহবাসের কোনো আশা পোষণ করে না, তাদের দেহাবরণ পরিত্যাগ করলে তাতে কোনো গুনাহ্ হবে না। তবে সে অবস্থায়ও তাদের সৌন্দর্য আর অলংকার প্রদর্শন করে বেড়ানো চলবে না। আর তারা যদি তা থেকেও পবিত্রতা অবলম্বন করে ও তা পরিহার না করে, তবে তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর, মঙ্গলজনক। আর আল্লাহ্‌র সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন"।[১২৪]রবী'আ বলেছেন, যে সব বৃদ্ধা, যাদের দেখলে পুরুষেরা ঘৃণা বোধ করে, তাদের জন্যে এ হুকুম। যাদের রূপ-সৌন্দর্য অধিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়েছে,

---

১২২. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী, *আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত খ. ৬, পৃ. ৪৯৫

১২৩. আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদির*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১

১২৪. والقواعد من النساء التى لايرجون نكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة- وان يستعففن خير لهن- والله سميع عليم- (আল- কুরআন, ২৪: ৬)

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জন্যে এ আয়াত প্রযোজ্য।[১২৫]আল্লামা পানিপত্তী লিখেছেন, বৃদ্ধাদের বাইরের আচ্ছাদন পরিহার করার ব্যাপারে পুরুষদের সৌন্দর্য দেখাবার ইচ্ছা না হওয়াকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা থেকে বোঝা গেল যে, যে বৃদ্ধা সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করে, তার পক্ষে বাইরের আচ্ছাদান পরিহার করা হারাম।[১২৬] পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হিসেবে মুজায়িদ সূত্রে নিম্মোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শরীক ছিল কিছু সংখ্যক সাহাবী। হযরত আয়েশা (রা.) ও তাঁদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তির হাত হযরত আয়েশার হাতে লেগে যায় এবং রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে ব্যাপারটি খুবই খারাপ বিবেচিত হয়। এর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়।[১২৭]পর্দার এ নির্দেশ মেয়েলোক ও পুরুষ লোকের মাঝখানে এক স্থায়ী অন্তরাল দাঁড় করে দিয়েছে। এ অন্তরাল ভাঙ্গতে পারা যায় প্রথমে মুহাররম সম্পর্কের দরুন আর দ্বিতীয় বিয়ের সম্বন্ধের দ্বারা। অন্যথায় এ অন্তরাল অন্য কোনভাবে ভঙ্গ করা শুধু ইসলামী শরীয়তের বিধানই নয়, মানব-মানবীর স্বভাব-প্রকৃতির ওপরও একান্তই অন্যায়-অনাচার বটে। ঘরের বাইরে পূর্ণাবয়ব আচ্ছাদিত করে বের হওয়া সংক্রান্ত উক্ত আয়াত ও আহকাম নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল- আরবের অবাধ নীতিতে চলতে অভ্যস্ত মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে গিয়ে তাদের মাথার ওপর কালো চাদর ফেলে তা দিয়ে সমস্ত মাথা, মুখমণ্ডল ও সমগ্র শরীর পূর্ণমাত্রায় আবৃত করে নিতে শুরু করে দিয়েছে। নারী সমাজে এক আদর্শিক বিপ্লবের প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ আর রূপ-যৌবন প্রকাশকারী পোশাক সাধারণভাবে বর্জিত হলো, কোনো মেয়েই তা পরে ঘরের বাইরে যেতে রাজি হচ্ছিল না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্লজ্জলতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হলো। এ আয়াত অনুযায়ী সে কালে মেয়েদের আদত ছিল একটা বড় আকারের চাদর দিয়ে মাথা, মুখমন্ডল ও সমস্ত দেহাবয়ব আবৃত করা। বলা যায়, এ চাদরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান সভ্যতায় এসে বোরকা'রূপ পরিগ্রহ করেছে। অতএব একালে কুরআনের এ নির্দেশ পালনের জন্যে মুসলিম মেয়েদেরকে বোরকা পরেই ঘর থেকে বের হতে হবে। অনাগত ভবিষ্যতে ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী কোনো স্তরে পৌঁছে বোরকা যদি এমন কোনো রূপান্তর গ্রহণ করে যা দিয়ে আরো উন্নত ও সুন্দরতরভাবে মাথা, মুখমণ্ডল ও সমগ্র দেহ আচ্ছাদিত করা যেতে পারে, তবে তাই হবে সে সমাজের জিলবাব এবং তা পরেই কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী মেয়েদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হবে। এক কথায়, বিগতা যৌবনা নয়-এমন সব মুসলিম মেয়েকেই সব সমাজে, সব দেশে, সব রকমের আবহাওয়ায় এবং ইতিহাসের সব পর্যায় ও স্তরেই মাথা, মুখমণ্ডল ও সমগ্র দেহাবয়ব আবৃত করা না হলে মুসলিম বলে অভিহিত হওয়ার কোনো অধিকারই তার থাকবে না এ আয়াত অনুযায়ী। বস্তুত যেসব মেয়ে বোরকা পরে সমস্ত শরীর, মুখ ও মাথা আবৃত করে ঘর থেকে বের হয়, তাদের দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এরা পর্দানশীল মহিলা। দুষ্ট চরিত্রের বখাটে চরিত্রের লোকেরা তাদেরকে চরিত্রবতী ও সতীত্বসম্পন্না মেয়ে মনে করে তাদের সম্পর্কে নৈরাশ্য পোষণ করতে বাধ্য হয়। ফলে কেউ তাদের পিছু নেবে না, তাদের আকৃষ্ট করার জন্যে কিংবা নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে চেষ্টাও করবে না। কিন্তু যারা উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে বোরকা ছাড়াই নিজেদের মাথা, গলা, বুক ও বাহুযুগল উম্মক্ত রেখেই রাস্তা-ঘাটে, দোকানে, পার্কে-হোটেল-রেস্তোরাঁয় চলাফেরা করে, তাদের সম্পর্কে দুষ্ট লোকদের মনে এর বিপরীত ধারণা জাগ্রত হবে। তারা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করবে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং তাদের সাথে অবাধ ও অবৈধ প্রণয় চর্চা করে ত চেষ্টা করবে

১২৫. *আল-মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৫৯

১২৬. প্রাগুক্ত

১২৭. আল্লামা আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ২৮৪; *বিহাওয়ালা তাফসিরু ইবনে জরীর তাবারী*

Dhaka University Institutional Repository

নিরতীশয় আগ্রহ সহকারে। কেননা তাদের উক্তরূপ অবস্থায় রাস্তার বের হওয়ার মানেই হচ্ছে তারা অপর যে কোনো পুরুষের কাছে ধরা দিতে কিছুমাত্র অরাজি নয়। অন্তত কেউ যদি তাদের পেতে চায়, তবে তারা কিছুমাত্র আপত্তি জানাবে না। বরং স্পষ্ট মনে হয়, তারা তাদের রূপ-যৌবনের মধুকেন্দ্রের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দুনিয়ার সব মধু মক্ষিকাকে। উলঙ্গভাবে চলাফেরাকারী মেয়েদের অধিকাংশের অবস্থাই যে এমনি, তা আজকের কোনো সমাজচরিত্রবিদই অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজবিদ আবূ হায়ান একথাই বলেছেন, পূর্ণমাত্রায় পর্দা ও শালীনতা রক্ষাকারী মেয়েলোক দেখলে তার দিকে কেউই অগ্রসর হতে সাহস পাবে না। কিন্তু উলঙ্গভাবে চলাচলকারী মেয়েদের কথা আলাদা। কেননা তাদের প্রতি তো লোকেরাই বড়ই আশা-আকাঙ্কা পোষণ করে।[১২৮]তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হাজার দু'হাজার, কি ছ' হাজার বছর আগেকার জাহিলিয়াত এবং এ যুগের অত্যাধুনিক জাহিলিয়াত একাকার হয়ে একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এ দুয়ের মাঝে মৌলিক কোনোই পার্থক্য নেই, না স্বভাব-প্রকৃতি, না বাহ্যিক প্রকাশে, অনুষ্ঠানে। আসল কথাও তাই জাহিলিয়াতের সে যুগে আর এ যুগে যেমন কোনোই তারতম্য নেই, ইসলামেও নেই তেমনি কোনো পার্থক্য সেকালে ও একালে। অন্য কথায় ইসলামও পুরাতন, যত পুরাতন মানবতা। আধুনিক জাহিলিয়াতও তেমনি পুরাতন, যত পুরাতন শয়তানের ইবলিশী ভূমিকা। কাজেই যারা উলঙ্গভাবে যত্রতত্র চলাফেরা অবাধ মেলা-মেশা ও যুব সম্মেলন করে ছেলে-মেয়েদের ফষ্টি-নষ্টির অবাধ সুযোগ করে দেয়া অত্যাধুনিক সভ্যতার অবদান বলে মনে করে, আর মনে মনে গৌরব বোধ করে, আমরা আর সেকেলে নই, মধ্যযুগের ঘুণেধরা সংস্কৃতি মেনে আমরা চলছি না, আমরা একান্তই আধুনিক। তারা যে কতখানি বোকা, নির্বোধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান বঞ্চিত তা জাহিলিয়াতের ইতিহাসই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। তারা অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে মোটেই বুঝতে পারছে না যে, তারা যা কিছু করছে, তার কোনোটাই নতুন নয়, নয় আনকোরা এবং এসব করে তারা মোটেই আধুনিক হওয়ার প্রমাণ দিতে পারছে না, বরং তারাও পুরাতন অতি পুরাতন-ঘুণে ধরা সংস্কৃতিরই অন্ধ অনুসারী, এতটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে পাশ্চাত্য নগ্নতার প্রতি আকর্ষণ ও ইসলামের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ পোষণের কারণেই মাত্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার বিধান :

সন্তান দুনিয়ায় আসার একমাত্র মাধ্যম হল পিতামাতার বৈধ বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলন। সে পিতামাতা অনেক কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে সন্তানকে লালন পালন করে বড় করেন। তারা নিজেদের সুখ শান্তি-ভাল খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আরাম আয়েশ, ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়ে সন্তানদের সুখের চিন্তা করেছেন। তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর হাদীসে বিস্তারিত তাগিদ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার পর যদি কাউকে সেজদা করার অনুমতি দে'য়া হতো তারা হতেন ব্যক্তির পিতামাতা। তা থেকে একথা বোঝা যায় যে, পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের মনে কষ্ট দেয়া ও তাদের নাফরমানী করা অত্যন্ত বড় গুনাহ, গর্হিত ও শাস্তিমূলক অপরাধ, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, যারা তা করে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যদি জমিনে বিপর্যের সৃষ্টি করো এবং রেহেম (রক্ত সম্পর্ক) ছিন্ন করো, তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপর অভিসম্পাত করবেন এবং

১২৮. *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২২, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তাদের বধির ও অন্ধ করে দেবেন"[১২৯]।'রেহেম' বা রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করার মানে অতি নিকটের আত্মীয়- মানে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে কথা ব্যবহার ও আর্থিক সাহায্যদান প্রভৃতির দিক দিয়ে ভালো ব্যবহার না করা। তাদের হক আদায় না করা সাধারণ নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কেই এত বড় কঠোর বাণী যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ্‌র অভিশাপ হবে এবং তার ফলে তারা সত্যের আওয়াজ শ্রবণে বধির হবে ও সত্য দর্শনে হবে অন্ধ। তাহলে দুনিয়ায় সবচেয়ে সেরা আত্মীয় সব আত্মীয়ের মূল আত্মীয় পিতামাতার সাথে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের অধিকার হরণ করে, তাহলেও যে আল্লাহ্‌র লা'নত হবে তাতে আর কি সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যে সব লোক আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি শক্ত করে বাধার পরে তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে, আর এরই ফলে দুনিয়ার বিপর্যের সৃষ্টি করে, তাদের অভিশাপ এবং তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ"।[১৩০] এখানেও আল্লাহ্‌র দেয়া অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র স্থাপিত সম্পর্ককে বিচ্ছিন্নকরণের পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,"রেহেমের সম্পর্ক কর্তনকারী কখনই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না"।[১৩১]রাসূলুল্লাহ (স.) সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমত উল্লেখ করেছেন,"আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা"।[১৩২]অপর এক হাদীসে তা কবীরা গুনাহ উল্লেখ করেছেন, "কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার পিতামাতাকে গালাগাল করাও কবীরা গুনাহ্"।[১৩৩]সাহাবীগণ একথা শুনে বলেন, পিতামাতাকেও কেউ কেউ গালাগাল করে নাকি হে রাসূল? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "এক ব্যক্তি অপর কারো বাপকে গাল দেয়, প্রত্যুত্তরে সে দেয় প্রথম ব্যক্তির বাপকে গাল, এমনিভাবে কেউ অপর ব্যক্তির মাকে গালাগাল করে সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মাকেই গাল দেয়"।[১৩৪]অর্থাৎ সরাসরিভাবে নিজের মা-বাপকে কেউ গালাগাল না করলেও প্রকারান্তরে– অপর লোক দ্বারা নিজ মা-বাপকে গাল খেতে বাধ্য করে। তাও তার নিজেরই গালাগালের সমান হয়ে দাঁড়ায়। অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ "কারো নিজের বাপ-মার অভিসম্পাত করাও সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ"।[১৩৫]পিতামাতাকে গালাগাল ও অভিসম্পাত করার কাজ ঔরসজাত সন্তান নিজেই করে, আবার কখনো অপরের দ্বারা গাল খাওয়ায়। এ দু'অবস্থায় ফল একই। এজন্যে এরূপ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পিতামাতাকে গালাগাল করাও অভিসম্পাত দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। কবীরা গুনাহের মধ্যেও সবচেয়ে বড়। একটি হাদীসে বিশেষভাবে মা'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

---

১২৯ -فهل عسيتم ان تو ليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامكم- اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم- (আল-কুরআন, ৪৭ : ২২-২৩)

১৩০. -والذين ينقضون عهد الله من تعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض لا اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار (আল-কুরআন, ১৩ : ২৫)

১৩১. -لايدخل الجنة قاطع (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী; মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ আল-মুসলিম)

১৩২. -الاشراك بالله وعقوق الوالدين

১৩৩. -من الكبائر شتم الرجل والديه

১৩৪. -يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী ; মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ আল-মুসলিম)

১৩৫. -ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والدين (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী; মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ,সহীহ আল মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মা'দের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করাও তাদের হক নষ্ট করাকে চিরদিনের তরে হারাম করে দিয়েছেন"।[১৩৬]উপরে পিতামাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের হক্ আদায় করা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে কুরআনে-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তার বিপরীত দিক সম্পর্কে যে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে পিত্মাতার সাথে তো বটেই, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে,"প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার করাও অতি উত্তম নেক কাজ"।[১৩৭]অপর এক হাদীসের শেষ কথাটি হচ্ছে, পিতামাতার বন্ধুদের সম্মান করাও সেলায়ে রেহমীর কাজ। যে সমস্ত সন্তান পিতামাতার সাথে অসচারণ করবে তাদেরকে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। যাতে তারা শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করে সমাজের সকল সন্তান নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। তাই পিতামাতার উচিত, নিজের সন্তানকে প্রাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না করে তাদেরকে ইসলামী আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যাতে তাদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের উম্মেষ ঘটে।

ভিন্ স্ত্রী-পুরুষের গোপন সাক্ষাতকার বা পরকীয়া প্রেমের বিধান :

মেয়ে পুরুষের অবাধ দেখা-সাক্ষাতের জন্যে একটা পরিসর রয়েছে এবং সে পরিসরের বাইরে মেয়ে পুরুষের দেখা-সাক্ষাত করা, কথাবার্তা বলা ও গোপন অভিসারে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে আয়াতে ঘরের মেয়েলোকদের কাছে কোনো জরুরী জিনিস চাইতে হলে পর্দার আড়ালে থেকে বাইরে বসে চাইতে হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্যে একটি নীতি শিক্ষা দেয় এবং গায়র-মুহাররম মেয়েলোকদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া ও পর্দার অন্তরাল ছাড়াই পরস্পরে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।[১৩৮]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে সব মহিলার স্বামী বা নিকটাত্মীয় পুরুষ অনুপস্থিত, তাদের কাছে যেও না। কেননা তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি ধমনীতে শয়তানের প্রভাব রক্তের মতো প্রবাহিত হয়"।[১৩৯]অন্যত্র আরো কঠোর ভাষায় বলেছেন, "আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোনো ব্যক্তিই যেন এমন মেয়েলোকদের সাথে গোপনে মিলিত না হয়, যার সাথে তার আপনা মুহাররম কোনো পুরুষ নেই। কেননা গোপনে মিলিত এমন দুজন স্ত্রী পুরুষের সাথে শয়তান তৃতীয় হিসেবে উপস্থিত থাকে"।[১৪০]ঠিক এ কারণেই সতী সাধবী স্ত্রী হওয়ার জন্য অপরিহার্য গুন হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া কোনো লোককেই প্রবেশ করতে দেবে না"।[১৪১]অর্থাৎ স্ত্রী তার

---

১৩৬. ان الله حرم عليكم عقوق الامهات- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী; মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ আল-মুসলিম

১৩৭. ان ابر البر ان يصل الرجل ودابيه- (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ:সহীহ আল-মুসলিম)

১৩৮. আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদির*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৮

১৩৯. لا تلجوا على المغيبات فان الشيطن يجرى من احدكم مجرى الدم- (আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈশা, আল-জামি')

১৪০. من كان يؤ من بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراة ليس معها ذومحرم منها فان ثالثهما الشيطان- (আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ; মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল : সহীহ আল-বুখারী; মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহী্হ আল-মুসলিম)

১৪১. لا تاذن فى بيته الا باذنه- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী)

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর ঘরে স্বামীর পছন্দ নয়- এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। কেননা এতে করে খারাপ খারাপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে স্বামীর মনে আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়ে উঠে দাম্পত্য সম্পর্ককেই ছিন্ন করে দিতে পারে।[১৪২]স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ তার স্ত্রীর কাছে গায়র-মুহাররম পুরুষের উপস্থিতি এবং তার ঘরে প্রবেশ করা ইসলামী শরীয়তে বড়ই গুনাহের কাজ, নিষিদ্ধ এবং অভিশপ্ত। হাদীসে এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একদা বাইরে থেকে এসে তাঁর ঘরে তাঁর স্ত্রীর কাছে বানু হাশিম বংশের কিছু লোককে উপস্থিত দেখতে পান। তিনি গিয়ে নবী করীম (স.) এর কাছে বিষয়টি বিবৃত করেন এবং বলেন যে, ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখতে পাইনি; তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন,"খারাবী থেকে আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করেছেন"। অতঃপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন,"আজকের দিনের পর কোনো পুরুষই অপর কোনো ঘরের স্ত্রীর কাছে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনো প্রবেশ করবে না, যদি না তার সাথে আরো একজন বা দুইজন পুরুষ থাকে"।[১৪৩]হযরত ফাতিমা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করার জন্যে হযরত আমর ইবনে আ'স (রা.) একদিন বাইরে থেকে অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ওখানে আলী উপস্থিত আছে কি? বলল ঃ 'না, তিনি নেই।' একথা শুনে হযরত আমর ফিরে চলে গেলেন। পরে আবার এসে অনুমতি চাইলে হযরত আলী উপস্থিত কিনা জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো তিনি ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। অতঃপর হযরত আমর প্রবেশ করলেন। হযরত আলী জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে এখানে অনুপস্থিত পেয়ে তুমি ঘরে প্রবেশ করলে না কেন- কে নিষেধ করেছিল? তখন হযরত আমর বললেন, যে মেয়েলোকের স্বামী উপস্থিত নেই, তার ঘরে প্রবেশ করতে রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের নিষেধ করেছেন।[১৪৪]এ পর্যায়ে অধিকতর কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে পুরুষ লোক স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো মেয়েলোকের শয্যায় বসবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার উপর (তার শাস্তির জন্যে) একটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করে দিবেন"।[১৪৫]এ পর্যায়ের সমস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কাছে কোনো একজন পুরুষের প্রবেশ করা এবং ভিন-গায়র মুহাররম মেয়েলোকের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম এবং এ সম্পর্কে সকল ইসলামবিদ সম্পূর্ণ একমত।[১৪৬]ইমাম নববী লিখেছেন, দুইজন-তিনজন পুরুষের প্রবেশ জায়েয প্রমাণিত হয় যে হাদীস থেকে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এ জন্যে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে কোনো দুষ্কৃতির কল্পনা করা যায় না। অন্যথায়, তা সত্ত্বেও যদি দুষ্কার্য সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে তাও হারাম।[১৪৭]স্বামীর উপস্থিতিতেও যেমন এ কাজ করা যেতে পারে না, তেমনি তার অনুপস্থিতিতেও করা যেতে পারে না। বরং স্বামীর অনুপস্থিতিতে এ কাজ এক ভয়ানক অপরাধে পরিণত হয়ে যায়। বস্তুত স্বামীর নিকটাত্মীয় বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর নিকটাত্মীয় বান্ধবীদের সাথে স্বামীর,

---

১৪২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, খ. ২, পৃ. ১৫৮

১৪৩. لا يدخلن رجل بعد بومى هذا على مغيبة الا ومعه رجل اواثنان- (আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম)*

১৪৪. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها نا ان ندخل على المغيبات- ما منعك ان تدخل حين لم تجد نى ههنا (আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

১৪৫. من قعد على فناش مغيبة قيض الله له يوم القيامة ثعبانا- (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ)*

১৪৬. আল্লামা আহমাদুল বান্না, *বুলুগুল আমানী*, খ. ৫, পৃ. ৮৪

১৪৭. *বুলুগুল আমানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মুহাররম নয় এমন সব মেয়ে পুরুষের,গোপন সাক্ষাতকার বড়ই বিপদজনক হয়ে থাকে। উপরোক্ত হাদীসে মেয়েদেরকে যেমন সর্তক করে দেয়া হয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলবার জন্যে, তেমনি সাবধান করে দেয়া হয়েছে পুরুষদের। রাসূলুল্লাহ (স.) কড়া ভাষায় বলেছেন, "তোমরা পুরুষেরা গায়র-মুহাররম মেয়েলোকের কাছে যাওয়া আসা থেকে দূরে থাকো, সাবধান থাক"।[১৪৮]এ হাদীস থেকে যে দুটি কথা প্রমাণিত হয়, তার একটি হচ্ছে, ভিন্ মেয়েলোকদের সাথে পুরুষের নিরিবিলিতে গোপনভাবে মিলিত হওয়া নিষেধ; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামী বা ঘরের পুরুষ উপস্থিত নেই এমন মেয়েলোকের ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ।[১৪৯]রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশের ফলে এ দুটো কাজই হারাম। এ পর্যায়ে দেবর-ভাসুরদের সাথে মেয়েদের একাকীত্বের সাক্ষাত সর্বাধিক বিপদজনক এবং এ ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে স্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপরোক্ত কথা শুনে একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল, দেবর-ভাসুর প্রভৃতি স্বামীর নিকটাত্মীয় পুরুষদের সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন, "স্বামীর এসব নিকটাত্মীয়রাই হচ্ছে মৃত্যুদূত"।[১৫০]'হামো' সম্পর্কে মুহাদ্দিসের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, 'হামো' মানে স্বামীর ভাই- স্বামীর ছোট হোক কি বড়। ইমাম লাইস বলেছেন, 'হামো' হচ্ছে স্বামীর ভাই, আর তারই মতো স্বামীর অপরনাপর নিকটবর্তী লোকের যেমন চাচাত, মামাত, ফুফাত ভাই ইত্যাদি।[১৫১]ইমাম নববীর মতে, স্বামীর নিকবর্তী লোক আত্মীয়, স্বামীর বাপ ও পুত্র সন্তান- এর মধ্যে শামিল নয়। কেননা তারা তো স্ত্রীর জন্যে মুহাররম। এদের সঙ্গে একাকীত্বে একত্রিত হওয়া শরীয়তে জায়েয। কাজেই এদেরকে মৃত্যুদূত বলে অভিহিত করা যায় না। বরং এর সঠিক অর্থে বোঝা যায়, স্বামীর ভাই, স্বামীর ভাইপো, স্বামীর চাচাতো ভাই, ভাগ্নে এবং এদেরই মতো অন্যসব পুরুষ যাদের সাথে এ মেয়েলোকের বিয়ে হতে পারে, যদি না সে বিবাহিত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.) এদেরকে মৃত্যু বা মৃত্যুদূত বলে কেন অভিহিত করেছেন? এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে,সাধারণ প্রচলিত নিয়ম ও লোকদের অভ্যাসই হচ্ছে এই যে, এসব নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। (এবং এদের পারস্পরিক মেলা-মেশায় কোনো দোষ মনে করা হয় না) ফলে ভাই ভাইয়ের বউর সাথে একাকীত্বে মিলিত হয় এ কারণেই এদেরকে মৃত্যু সমতুল্য বলা হয়েছে। আল্লামা কাযী ইয়ায বলেছেন, স্বামীর এসব নিকটাত্মীয়ের সাথে স্ত্রীর (কিংবা স্ত্রীর এসব নিকটাত্মীয়ের সাথে স্বামীর) গোপন মেলামেশা নৈতিক ধ্বংশ টেনে আনে। ইমাম কুরতুবী বলেছেন, এ ধরনের লোকদের সাথে গোপন মিলন নৈতিক ও ধর্মের মৃত্যু ঘটায় কিংবা স্বামীর আত্মসম্মানবোধ তীব্র হওয়ার পরিণামে তাকে তালাক দেয় বলে তার দাম্পত্য জীবনের মৃত্যু ঘটে। কিংবা এদের কারোর সাথে যদি জ্বেনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে সঙ্গেসার কারার দন্ড দেয়া হয়, ফলে তার জৈবিক মৃত্যু ঘটে।[১৫২]স্বামী বা স্ত্রীর নিকটাত্মীয়-আত্মীয়াদের ব্যাপারে শরী'আতে যখন এক কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন স্বামীর পুরুষ বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে স্বামীর অবাধ মেলামেশা, বাড়িতে-পার্কে, হোটেল-রেস্তোরায় আর পথে ঘাটে কি অফিসে-ক্লাবে গোপন অভিসার কিভাবে বিধিসঙ্গত হতে পারে!

---

১৪৮. -اياكم والدخول على النساء (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল,সহীহ আল-বুখারী)

১৪৯. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ২১৩

১৫০. - افرايت الحمو يارسول الله الحمو الموت

১৫১. নাইলুল আওতার,প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৪

১৫২. আল্লামা আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ২১৩-২১৪

Dhaka University Institutional Repository

অথচ তাই চলছে বর্তমান সমাজের সর্বস্তরে। এখনকার সমাজে শালার বউ আর বউর বোন অর্ধেক বধু। স্ত্রীর বান্ধবী আর স্বামীর বন্ধুরাই হচ্ছে নিঃসঙ্গের সঙ্গী- আসর বিনোদনের সামগ্রী, আনন্দের ফল্গুধার। ভাবীর বোন আর বোনের ননদও এ ব্যাপারে কম যায় না। বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুর স্ত্রীর আদর-আপ্যায়ন ও খাবার টেবিলে পরিবেশনা না করলে বন্ধুত্বই অর্থহীন। শ্বশুর বাড়িতে শালার বউ আদর-যত্ন না করলে শ্বশুর বাড়িতে আর মধুর হাঁড়ির সন্ধান পাওয়া যায় না। বোনের সহপাঠিনী আর সহপাঠির বোনেরা তো নিত্য সহচরী, গোপন অভিসারের মধু-মল্লিকা। কিন্তু এর পরিণামটা কি হচ্ছে? নৈতিক পবিত্রতা বিলীন হচ্ছে। বিয়ের আগেই যৌন কার্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে; আর যুবক-যুবতীরা হারাচ্ছে তাদের মহামূল্য কুমারিত্ব। নর-নারীর অবাধ মেলামেশা এ মারাত্মক পরিণতি অনিবার্য বলেই আল্লাহ্ তা'আলা তা চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। অন্যথায় এর মূলে নারী-পুরুষের প্রতি কোনো খারাপ ধারণার স্থান নেই। মানব চরিত্র ও মানুষের স্বভাবই এমন যে, তার জন্যে এরূপ নিয়ম বিধান না থাকলে মানুষের জীবনই দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। শুষ্ক খড় কুটোর স্তুপের কাছাকাছি আগুন নিয়ে খেলা করতে দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে সে আগুন লেগে সব জ্বলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে, তাতে আর সন্দেহ কি। ইসলামে যেহেতু মানুষের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং পারিবারিক স্থায়িত্বই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ও সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোনো মূল্যে তা রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এ জন্যেই ইসলাম এমন কিছুই বরদাশত করতে রাজি নয়, যার ফলে এক্ষেত্রে ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা গায়র-মুহাররম মেয়েলোকদের সাথে গোপনে ও একাকীত্বে মিলিত হবে না। আল্লাহ্র শপথ, যেখানেই একজন পুরুষ একজন ভিন্ মেয়েলোকের সাথে গোপনে মিলিত হবে, সেখানেই তাদের দু'জনার মধ্যে শয়তান অবশ্যই প্রবেশ করবে ও প্রভাব বিস্তার করবে"।[১৫৩] ব্যাপারটিকে আমরা এভাবেও বুঝতে পারি যে, ইলেকট্রিক লাইনের দুটো করে তার থাকে, একটি 'পজিটিভ' আর অপরটি 'নেগেটিভ'। এ দুটোই অপরিহার্য, একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন। কিন্তু এ দুটো থেকে সত্যিকার আলো জ্বলা বা পাখা চলার কাজ পাওয়া যেতে পারে তখন, যখন উভয় তারকে বিশেষ এক ব্যবস্থাধীন পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হয়। কিন্তু দুটো পাশাপাশি চলতে গিয়ে চলাবস্থাতে যদি পারস্পরিক ব্যবচ্ছেদ ছিন্ন করে দিয়ে মিলিত হয়ে পড়ে তাহলে তাতে আলো জ্বলবে না, পাখা চলবে না, বরং এমন আগুন জ্বলে উঠবে, তার ফলে গোটা ঘর-সংসার জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। নারী-পুরুষও নেগেটিভ-পজিটিভ দুই বিপরীতমুখী, বিপরীত গুণ-সম্পন্ন শক্তি। এ দু'য়ের সমন্বয়ে যদি মানবতার কল্যাণ লাভ করতে হয়ে তাহলে অবশ্যই এক নির্দিষ্ট নিয়মে উভয়ের মিলন সম্পন্ন করতে হবে। পথে- ঘাটে, মাঠে- হাটে,পার্কে-ক্লাবে আর হোটেল-রেস্তোরায় যদি এদের অবাধ মেলামেশাকে সম্ভব করে দেয়া হয়, তাহলে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু অনিবার্য; দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা আর পারিবারিক সুস্থতা ও শান্তি-তৃপ্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার সমাজে এ কথাই অকাট্য হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। বস্তুত যে সমাজে একটি কুমারী মেয়েও সন্ধান করে পাওয়া যায় না সে সমাজে যে মানুষের সমাজ নয়, নিতান্ত পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতম জীবনের সমষ্টি, তাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই বলেছেন, "আমি মানুষের অতীব উত্তম মানদন্ডে সৃষ্টি করেছি বটে; কিন্তু অতঃপর তাদের অমানবিক কার্যকলাপের দরুনই তাদের নামিয়ে দিয়েছি চরমতম নিম্ন পংকে"।[১৫৪]

---

১৫৩. ايا كم والخلوة بالنساء والذى نفسى بيده ماخلا رجل بامراة الا دخل الشيطان بينهما-

১৫৪. لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم- ثم رددنه اسفل سفلين- (আল- কুরআন, ৯৫: ৪-৫)

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার খর্ব করার বিধান :

মানব সমাজে বৈধভাবে নর-নারী একত্রে বসবাস করাকে দাম্পত্য জীবন বলে। এ দাম্পত্য জীবনে পুরুষ হয় স্বামী আর নারী হয় স্ত্রী। একজনের অভাবে অপরজন অসম্পূর্ণ ও অর্ধাঙ্গ। এ কারণেই স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী। আর স্বামী স্ত্রীর জন্য জীবন সঙ্গী ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। স্বামী স্ত্রীর প্রতি আর স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনেক অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। উভয়ের এ কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি। যখন স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের অধিকারের প্রতি উদাসীন হয়, মানামানি না থাকে, বেপরোয়া জীবন যাপন করে তখন তাদের অধিকার খর্বের ঘটনা ঘটে। আর যখনই তাদের কেউ কারো অধিকার রক্ষা করে না, তখনই তাদের মধ্যে কলহের দানা উঠে। বিয়ের সাথে সাথে স্বামীর উপর কিছু গুরু দায় দায়িত্ব বর্তায়। তাহল স্বামী তার স্ত্রীর সাথে একত্রে বসবাস করবে, রাত্রি যাপন করবে, যৌন চাহিদা পূরণ করবে, তার সকল প্রয়োজন মেটাবে এক কথায় স্ত্রীকে প্রিয়তমা সঙ্গী করে নেয়া। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের অধিকার আছে, তেমনি স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে"।[১৫৫] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা স্ত্রীদেরকে জীবনের প্রিয়তমা সাথী হিসেবে গ্রহন করে নিজের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনার সমানাধিকার দেয়ার কথা বলেছেন। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই বাস কর, স্ত্রীদেরকেরও সেখানেই বসবাস করতে হবে।"[১৫৬] এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তার সকল ব্যয়ভার নির্বাহ করা স্বামীর ওপর অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- "তুমি যা খাবে, স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং তুমি যা পরবে স্ত্রীকেও তা পরতে দিবে।"[১৫৭]এসব বিধি-বিধানের পরও যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার অধিকার সংরক্ষণ করে না, ক্লাবে, পার্টিতে, হোটেলে ড্রিংক করে, পর-নারীদের সাথে দৈহিক মেলামেশার মাধ্যমে আনন্দ ফূর্তি করে বেড়ায়, খবর রাখে না স্ত্রী- কন্যাদের, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া জরুরী। কেননা তার এ বেপরোয়া জীবন যাপনে দুনিয়ার জীবনকে নষ্ট করছে এবং পরকালীন জীবনকে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করছে। তার দেখাদেখি অন্যান্যরা এ ধরনের খারাপ অভ্যাসে যোগ দিয়ে সমাজকে কলুষিত করে তুলবে। তাই তাকে মদ পানের হদ্দ ও পর নারীর সাথে যিনার শাস্তি আরোপ করতে হবে। পাশাপাশি ক্লাব, হোটেল, পার্টিতে এ ধরনের অপরাধ করার সকল সুযোগ বন্ধ করতে হবে। বাহিরের জগতে যখন কোন স্বামী তার জৈবিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ পাবে না, তখন সে ঘর মুখী হবে এবং স্ত্রীর প্রতি মনযোগী হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বামীর পরিপূরক, সুখ-দুঃখের সাথী। সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য মেনে চলবে। সৃষ্টিগতভাবে নারীরা দুর্বল, কোমল, নাজুক প্রকৃতির। দৈহিক কোমলতা ও কর্মক্ষমতা ভিন্নতার কারণে নারীরা সংসারের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য সকল কাজ করতে হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-" আমি যদি স্ত্রীকে আর কারো উদ্দেশ্যে সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে আদেশ করতাম"।[১৫৮]স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার মধ্যেই স্ত্রীর কল্যাণ ও পরকালের সফলতা নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (স.)

---

১৫৫. আল-কুরআন, ২: ১২৭

১৫৬. আল- কুরআন, ৬৫: ২

১৫৭. সুলাইমান আবি দাউদ, *আস-সুনান* হাদিস নং ২১৪২

১৫৮. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা, *জামেউত তিরমিজি*, হা. নং. ১১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন- "যে স্ত্রীলোক এ অবস্থায় মারা যায় যে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট তাহলে সে জান্নাতে যাবে"।[১৫৯] এসব হাদিস থেকে প্রতিয়মান হয় যে,স্ত্রী তার স্বামীর সকল অধিকার সংরক্ষণ করবে। কিন্তু স্ত্রী যদি তার স্বামীর অধিকার রক্ষা না করে, অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে, স্বামীর সকল অধিকার খর্ব করে অনৈতিক ও উৎশৃঙ্খল জীবন যাপন করে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে তা সংরক্ষণ না করে বেপরোয়া জীবন যাপন করে, নগ্নদেহ প্রদর্শন করে অবাধ মেলামেশা করে সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট করে, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি স্বামীকেও স্ত্রীর সকল অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। বেগানা মহিলার সাথে অবাধ মেলামেশা, যিনা-ব্যভিচার, ক্লাব, হোটেল বা রেস্তোরায় রাত্রিযাপন সহ অন্যান্য অনৈতিক গর্হিত কাজ করা যা একজন স্ত্রীর মৌলিক অধিকারসমূহকে খর্ব করা হয়। এবং স্বামীর অভাব পূরণে একজন সত্বী নারীকেও অপরাধের প্রতি অনপ্রাণিত করে। এসব ক্ষেত্রে তাদের অনৈতিক কর্মকান্ডের সাক্ষী প্রমাণ সাপেক্ষে তাদের উপর আবশ্যক সকল শাস্তি কার্যকর করতে হবে। কেননা যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা না হয়, তাহলে তাদের দেখাদেখি আরো অনেক নারী-পুরুষ এসব খারাপ পথে পা বাড়াবে এবং সমাজকে কলুষিত করে তুলবে।

তালাক দানে সীমা লঙ্গনের বিধান :

তালাক শব্দের আভিধানিক অর্থ বন্ধন খুলে দেয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় 'তালাক' মানে বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া। এ শব্দটি ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগের ব্যবহৃত পরিভাষা। ইসলামও এক্ষেত্রে এ শব্দটিই ব্যবহার করেছে।[১৬০]এ যুগের মিসরীয় পন্ডিত বলেছেন, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া। অথবা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী একত্রিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক-রশি ছিন্ন করা।[১৬১]ফিকাহ্ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তালাক মানে বিয়ের বাধনকে তুলে ফেলা আর বাধন তুলে ফেলার মানে বিয়ের বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়া।[১৬২]ইসলামে তালাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে- স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যখন এতদূর খারাপা হয়ে যাবে যে, তারা পরস্পর মিলেমিশে ও ঐক্য সৌহার্দ্য সহকারে জীবন যাপন করার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পায় না, এমনকি এরূপ অবস্থায় সংশোধন বা পরিবর্তনের শেষ আশাও বিলীন হয়ে গেছে- যার ফলে বিয়ের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন উভয়ের ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও তিক্ততা-বিরক্তির বিষাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য উভয়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া। কিন্তু তাই বলে ইসলামে তালাক বা বিচ্ছেদ কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়। এ কাজকে কোনো দিক দিয়ে কিছুমাত্র উৎসাহিতও করা হয়নি। বরং এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি। দাম্পত্য জীবনে মিলেমিশে রক্ষার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তখন এ ব্যবস্থার সাহায্যে উভয়ের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা- আসন্ন ধ্বংশের হাত থেকে উদ্ধার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। 'তালাক' যে ইসলামে কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়, একথা হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্র কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণার্হ ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক"।[১৬৩]তালাক ঘৃণ্য হওয়ার অর্থ আসলে সেই মূল কারণটির ঘৃণা হওয়া,

---

১৫৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা, *জামেউত তিরমিজি*, হাদিস নং ১১৬১

১৬০. ইমামুল হারামাইন, *সাবলুল ইসলাম*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭

১৬১. আল-খাওলী, *আল-মিরয়াতু বাইনাল আবইয়াতে ওয়াল মুজতামে*, পৃ. ৫৭

১৬২. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭

১৬৩. ابغض الحلال الى الله الطلاق- (সুনান আবি দাউদ; ইবনে মাযাহ; হাকেম)

Dhaka University Institutional Repository

যার দরুন একজন তালাক দিতে বাধ্য হয়। আর তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়া মিলমিশের অভাব হওয়া। মূল তালাক কাজটিই ঘৃণ্য নয়। কেননা এ কাজটিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুবাহ্ করে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে 'রাজয়ী' তালাক দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত।[১৬৪]এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালালের মধ্যেও কতক কাজ এমন রয়েছে, যা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। আর এসব হালাল কাজের মধ্যে 'তালাক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য।[১৬৫]ফিকাহ্বিদদের মতেও তালাক মূলত নিষিদ্ধ। তবে তালাক না দিয়ে যদি কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে তা অবশ্যই জায়েয হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ভাব যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, একত্র জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, একত্র জীবনে আল্লাহ্র নিয়ম-বিধান রক্ষা করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে তখন এ তালাকের আশ্রয় নিতে হবে। ফিকাহ্বিদদের মতে তালাক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায়, জুলুম ও নিদারুণ কষ্ট, জ্বালাতন ও উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা। ফিকাহের পরিভাষায় বলা হয়েছে, তালাকের সৌন্দর্য হলো কষ্টকর অশান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তালাককে শরী'আত সম্মত করেছেন। কেননা পারিবারিক জীবনে এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে । তবে বিনা প্রয়োজনে-স্ত্রীর কোনো গুরুতর দোষ-ত্রুটি ব্যতীতই তালাক দেয়া একান্তই মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে ইসলামের মনীষীগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ফিকাহের আলোচনায় এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত সাধারণ নীতি হলো 'না নিজে ক্ষতি স্বীকার করবে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।' অথচ অকারণ তালাকের দরুন স্ত্রীকে অপূরণীয় ক্ষতি ও অপমান-লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রখ্যাত ফিকাহ্বিদ ইবনে আবেদীন বলেছেন, তালাক মূলত নিষিদ্ধ, মানে হারাম; কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সম্পর্ক যখন এতদূর বিষ জর্জর হয়ে পড়ে যে, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন তা অবশ্যই জায়েয হবে। পক্ষান্তরে বিনা কারণেই যদি তালাক দেয়া হয়; স্ত্রীকে তার পরিবার-পরিজনকে, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাত, ভাই-বোনদেরকে কঠিন কষ্টদান করা ও বিপদে ফেলাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ তালাক একেবারেই বৈধ নয়। যারা তালাক দানের ব্যাপারে সীমা লঙ্গণ করবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে। এ জন্য যে, তা অবলোকন করে কেউ যেন আর এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের সাহস না পায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা কেবলমাত্র তখনই সঙ্গত হতে পারে, যখন তাদের উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতিতে এতদূর পার্থক্যের সৃষ্টি হবে, আর পরস্পরের মধ্যে এতদূর শত্রুতা বেড়ে যাবে যে, তারা মিলিত থেকে আল্লাহ্র বিধানকে পালন ও রক্ষা করতে পারেই না। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হলে তালাক তার মূল অবস্থায়ই থাকবে, কারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারামই বিবেচিত হবে। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "স্ত্রীরা যদি স্বামীদের কথামতো কাজ করতে শুরু করে, তাহলে তখন আর তাদের ওপর কোনো জুলুমের বাহানা তালাশ করো না তালাক দিও না"।[১৬৬] বাস্তবিকই, কোনো প্রকৃত কারণ না থাকা সত্ত্বেও যারা স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারা মহা অপরাধী, সন্দেহ নেই। এদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের এক-একজনের অবস্থা কি হয়েছে? তারা কি আল্লাহ্র বিধান নিয়ে তামাসা খেলছে? একবার বলে তালাক দিয়েছি, আবার বলে পুনারায় গ্রহণ করেছি" ।[১৬৭]

---

১৬৪. আল্লামা খাত্তাবী, *মু'য়ালিমুস সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৩১

১৬৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল কাহলানী ছানআনী, *সুবলুস সালাম*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭

১৬৬. فان الطعنكم فلا تبغو عليهن سبيلا- (আল-কুরআন, ৪ :৩৪)

১৬৭. ما بال احدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قدراجعت- (সুনান ইবনু মাযাহ; ইবনু হাব্বান)

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেছেন, “তারা কি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে তামাসা খেলছে, অথচ আমি তাদের সামনেই রয়েছি”।[১৬৮]রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওপরে উল্লিখিত বাণীসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট বোজা যায় যে, ‘তালাক’ কোনো সাধারণ জিনিস নয়, মুখে এল আর তালাকের শব্দ উচ্চারণ করে ফেললাম, তা এরূপ সহজ ও হালকা জিনিস নয় আদৌ। বরং এ হচ্ছে অতি সাংঘাতিক ও মারাত্মক কাজ। মানুষের জীবন, মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাজ হচ্ছে এটা, ইসলামে তার অবকাশ রাখা হয়েছে নিষ্কৃতির সর্বশেষ উপায় হিসেবে মাত্র। হযরত মুয়ায থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষা থেকেও এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “আল্লাহ্ তা’আলা তালাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণার্হ জিনিস আর একটিও সৃষ্টি করেন নি”।[১৬৯]তালাকের ভয়াবহতা ও ভয়ংকরতা স্পষ্ট বুঝা যায় হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, তোমরা বিয়ে করো, কিন্তু তালাক দিয় না, কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে।[১৭০]সমাজে এমন লোকের অভাব নেই, যারা মৌমাছির মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর অভ্যাসের দাস। এদের কাছে না বিয়ের কোনো মূল্য আছে, না আছে নারীর জীবন, মান-সম্ভ্রমের এক কড়া-ক্রান্তি দাম। এরা বিয়েকে দুটি দেহের একই শয্যায় একত্রিত হওয়ার মাধ্যম মনে করে এবং একটি দেহের স্বাদ আকণ্ঠ পান করার পর নতুন এক দেহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়াই তাদের সাধারণ অভ্যাস। এদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তোমরা বিয়ে করো; কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা সেসব স্ত্রী-পুরুষকে (ভালোবাসেন না) পছন্দ করেন না, যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত”।[১৭১]স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে সূত্রের অধিকারী। এ সূত্র ছিন্ন করার কিংবা রাখার ব্যাপারে তার অধিকারই স্বীকৃত। এ অধিকার অনুযায়ী বিয়ে সূত্রকে ছিন্ন করে দেয়ার নামই হলো শরী‘আতের পরিভাষায় তালাক। এ তালাক কয়েক প্রকারে হতে পারে, তালাক দেয়ার পরও নতুন বিয়ে-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার অধিকার থাকে তবে তা হবে রিজ্‌য়ী তালাক। আর যদি সে অধিকার না থাকে, তবে তাকে বলা হবে বায়েন তালাক। প্রথমত রিজয়ী তালাক হচ্ছে সে তালাক, যার পরও স্বামী তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন আক্‌দ অনুষ্ঠান না করেই ইদ্দতকালের মধ্যেই- রাজি হোক আর নাই হোক- ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার পায়।[১৭২] দ্বিতীয়ত ‘বায়েন তালাক’ দুপ্রকারে হতে পারে। একটি ছোট বায়েন আর অপরটি বড় বায়েন। ‘ছোট’ বায়েন তালাক হচ্ছে, সে তালাক, যার পর স্বামী তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন বিয়ে অনুষ্ঠান না করে ফিরিয়ে নিতে পারে না। তার মানে এ তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে নতুন করে বিয়ের আক্‌দ হতে হবে। [১৭৩] আর বড় বায়েন তালাক হচ্ছে, সে তালাক, যার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। পারে কেবল একটি অবস্থায়। আর তা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকটি অপর এক স্বামী গ্রহণ করবে সহীহ পন্থায় এবং সে তার সাথে প্রকৃতভাবেই সহবাস ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে। এরপর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হবে কিংবা সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে রেখে যাবে ও তার পরে এ মৃত্যুর ইদ্দত পালিত হবে[১৭৪]তালাক ব্যবস্থায় এরূপ বিভিন্ন পন্থার অবকাশ রাখার মূলে

---

১৬৮. -ايلعب بكتاب الله وانا بين اطهركم (সুনান আন-নাসায়ী)

১৬৯. -وما خلق الله شيئا ابغض اليه من الطلاق (দারু কুতনী)

১৭০. তাফসিরু কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ২৪৯

১৭১. -نزوجوا ولا تطلقوا- فان الله لايجب الذواقين الذواقات (আল্লামা জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৩)

১৭২. জকি উদ্দীন শওবান : *আজ-জেওয়াজ ওয়াত তালাক*, পৃ. ১০২

১৭৩. প্রাগুক্ত

১৭৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আতের এক বিশেষ কল্যাণময় উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে, শরী'আতের বিধানদাতার একমাত্র কামনা হলো পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের অক্ষুন্নতা ও স্থায়ীত্ব বিধান অর্থাৎ স্বামী যদি কোনো জটিল মুহূর্তে বা বিশেষ কারণে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন ঠিক সেই পন্থায়ই তালাক দেয়, যে পন্থায় তালাক দিলে পরে তার স্ত্রীকে পুনর্বহাল করার শরীয়তসম্মত ও সম্মানজনক উপায় বর্তমান থাকে। হয় এমন অবস্থা হবে যে, ইদ্দতের মধ্যেই তাকে অবাধে ও নির্ঝঞ্ঝাটে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে আর তা যদি নাও হয় তবুও অন্তত পক্ষে যেন এরূপ হয় যে, নতুন করে বিয়ের অনুষ্ঠান করে ফিরিয়ে নিতে পারবে; কেননা এ দু'ধরনের তালাক স্ত্রী সম্পূর্ণরুপে হারাম হয়ে যায় না। রাগের বশবর্তী হয়ে কিংবা স্ত্রীকে শাসন করার উদ্দেশ্য কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিতেই চায় তাহলে সে যেন এ পর্যায়ের কোনো তালাক দেয়। তাহলে এর পর তাকে আফসোসও করতে হবে না, আর চরমভাবে লজ্জিত ও লাঞ্ছিতও হতে হবে না। কিন্তু যদি রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একসঙ্গে তিন তালাকই দিয়ে দেয়, তাহলে এর পর যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, যে দুঃখ ও দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয় স্ত্রীকে, স্বামীকে, সন্তান-সন্ততিকে, গোটা পরিবারকে, তা ভাষায় বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। এর পর যে দুঃখ ও অনুতাপ জাগে স্বামীর অন্তরে, তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই থাকে না তার হাতে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, তিন তালাক দেয়ার পরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা বসবাস করতে থাকে। আর এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে জ্বেনার অবস্থা, নিঃসন্দেহে তা হারাম। তাই কোন লোকেরই একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া উচিত নয়। এর পরিণাম তালাকদাতা স্বামীকেই ভোগ করতে হয়। আর সে পরিণাম অত্যন্ত দুঃখময়, নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক। এ থেকে বাঁচার জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত সব মানুষেরই। তালাক দেয়ার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার মাত্র দুটো উপায় উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। তার কারণ এই যে, এ দুটো উপায়ই চুড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে গোটা পরিবারকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট। আর তিন তালাক দেয়ার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে না পারা এবং ফিরিয়ে রাখার সুযোগ না থাকাও অত্যন্ত বিজ্ঞাসম্মত ব্যবস্থা। এ হলো সীমালংঘনকারীর জন্যে শরী'আতের তরফ থেকে একটি শাস্তি। যে লোক এ কাজ করবে, তার শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে। তাতে করে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী এ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর না করারই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে। অতএব সে পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। কেননা যদি কেউ বাস্তবিকই নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাহলে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ তাকে দেয়াই সমীচীন। তাই শরী'আতের এ ব্যবস্থা এ দৃষ্টিতে সত্যিই কল্যাণময়।

হিলা বিয়ের বিধান :

স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে কিংবা সুন্নতী নিয়মে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার কোনো উপায় থাকে না। সে তার জন্য চিরতরে ও সম্পুর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে শরী'আত একটি মাত্র উপায়ই উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। তা হল, "সে স্ত্রীলোকটি অপর স্বামী বিয়ে করবে।' তারপর সে দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তারপরে যদি তারা পুর্নমিলিত হতে চায় এবং আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে, তাহলে তাদের দু'জনের পুনরায় বিবাহিত হতে কোনো দোষ নেই"।[১৭৫]অর্থাৎ সে স্ত্রীলোকটিকে অপর এক স্বামীর সাথে বিবাহিত হতে হবে এবং সে তার সাথে সহবাস করবে। এ দৃষ্টিতে শুধু বিয়ের আকদ হওয়াই এ আয়াতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট হবে না।[১৭৬] তিনি আরও লিখেছেন- এ আয়াত থেকে একসঙ্গে

---

১৭৫. حتى تنكح زوجا غيره۔ فان طلقها فلا جناح عليهما ان يترا جعا ان ظنا ان يقيما حدود الله۔ (আল-কুরআন, ২:২৩)

১৭৬. আল্লামা আলুসী, *রুহুল মা'য়ানী*, খ. ২, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

দুটো কথা জানা গেল।একটি এই যে, অপর এক পুরুষের সাথে বিয়ের ‘আকদ হতে হবে তা বোঝা গেল زوجا শব্দ থেকে। আর দ্বিতীয় এই যে, সে পুরুষের সাথে তার যৌন সঙ্গম অনুষ্ঠিত হতে হবে। এ কথা জানা গেল تنكح শব্দ থেকে। আর تنكح শব্দ থেকে যদি শুধু ‘বিয়ের আকদ’ই অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে বলতে হবে যে, কুরআনের আয়াত থেকে যদিও শুধু বিয়ের আকদই বোঝায়, কিন্তু এর পরে হাদীস থেকেও বোঝায় যে, শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, স্বামী-স্ত্রীর মধুমিলনও অপরিহার্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাফায়া নামক এক ব্যক্তির প্রাক্তন স্ত্রী এসে রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে আরয করল- আমি বর্তমানে আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর-এর স্ত্রী; কিন্তু তার পুরুষত্ব নেই। এজন্যেই আমি আমার প্রথম স্বামীর সাথে আবার বিবাহিতা হতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ(স.) বললেন, “না, তা পারবে না যতক্ষণ তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর মধু পান করবে এবং সে পান করবে তোমার মধু” ।[১৭৭]ইকরামা তাবেয়ী বলেছেন, এ আয়াতটি আয়েশা নাম্নী একটি মেয়েলোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তার বর্তমান স্বামীর সাথে যদি তার যৌন সঙ্গম সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় তাহলে সে প্রাক্তন স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহিতা হতে পারবে। এ হাদীসের বর্ণনা উল্লেখ করে আল্লামা আলূসী লিখেছেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিবাহকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই যথাথভাবে স্বামী হতে হবে। অর্থাৎ শুধু বিয়ের আকদ হলেই চলবে না, যৌন সঙ্গমও হতে হবে। আর শুধু আকদ ও যৌন সঙ্গম হলেই চলবে না, দ্বিতীয় বিবাহকারীকে পুরাপুরিভাবে স্বামী হতে হবে। তার মানে, তার সাথে এ স্ত্রীলোকটির স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করতে হবে। অস্থায়ী বা এক রাত্রির স্বামী-স্ত্রী নয়, সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মে যেরূপ স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করা হয়, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তেমনি হতে হবে। তার পরে যদি সে তালাক দেয়, তবেই তার পক্ষে প্রথম স্বামীর নিকট যাওয়ার ও বিবাহিতা হওয়ার সুযোগ হবে।

কিন্তু বর্তমান কালে যেমন সাধারণ রীতি হিসেবে দেখা যায়, কেউ তার স্ত্রীাকে রাগের বশবর্তী হয়ে একসঙ্গেই তিন তালাক দিয়ে দিলো, পরে অনুতাপ জাগল, ঘর-সংসারের বিধক্ষস্ত রূপ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, তখন কোনো বন্ধু-বান্ধব, খালাত ভাই, মামাত ভাইকে ডেকে আকদ করিয়ে এক রাত একত্রে থাকতে দিলো। পরের দিন সকাল বেলায় তার কাছে থেকে তালাক নিয়ে পরে সে নিজেই আবার তাকে বিয়ে করল। এ রীতি কুরআনের পূর্বোক্তি আয়াত থেকে প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত নয় কোনো হাদীস থেকে। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া, নিজেদের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত এক জঘন্য পন্থা। পরিভাষায় এরূপ বিয়েকে বলা হয় ‘হিলার বিয়ে’। এ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু অপর একজনের জন্যে স্ত্রী লোকটিকে হালাল করে দেয়ার বাহানা করা। তার মানে এই যে, দ্বিতীয়বারে যে লোক বিয়ে করে তার মনে এ ভাব জাগ্রত থাকে যে, সে এ স্ত্রী-লোকটিকে দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্য বিয়ে করছে না। সে শুধু এক রাতের স্বামী। রাত শেষ হওয়ার পরই সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, যেন অপর একজন তাকে স্থায়ীভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার জন্যে বিয়ে করতে পারে। ঠিক স্ত্রীলোকটির মনেও এ অবস্থা- এ কথাই জাগ্রত থাকে। আর প্রথম স্বামী- যার জন্যে এত কিছু করা হচেছ- সেও জানে যে ও মেয়ে লোকটি আসলে তারই স্ত্রী, মাত্র এক রাতের জন্যে তাকে অপর এক পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তার অঙ্গশায়িনী হবার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত এ চিন্তা ও এরূপ কথা যে কত লজ্জাকর, কত জঘন্য, বীভৎস, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কাজ কুরআন হাদীস সমর্থিত হতে পারে না, হতে পারে না ইসলামের উপস্থাপিত বিধান। অথচ তাই আজ নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমাজের যত্রতত্র, শরীয়তসম্মত বিধান রূপে। হাদীসের পরিভাষায় এরূপ বিয়ে যে করে, তাকে বলা হয় محل যে অপরের

---

১৭৭. لا حتى تذوقى عسيله و يذوق عسيلتك- (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*; আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ)*

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে হালাল করে দেয়ার জন্যে বিয়ে করে। হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, “যে লোক এভাবে হালালকারী হয় এবং যার জন্যে সে হালালকারী হয় এ উভয়ের ওপরই রাসূলুল্লাহ (স.) লা’নত করেছেন”।[১৭৮]হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ (স.) কে হালালকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ না, এরূপ বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে হবে শুধু তা-ই, যা অনুষ্ঠিত হবে পারস্পরিক আগ্রহে, যাতে কোনোরূপ ধোঁকাবাজি থাকবে না, যা করলে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে করা হবে না কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপপূর্ণ আচরণ। আর তার পরে পরস্পরের মধু মিলন হতে হবে”[১৭৯]ইবনে শায়বা ও আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,“আমার কাছে এরূপ হালালকারী ও যার জন্যে হালাল করা হয় তাকে পেশ করা হলেই আমি তাদের দুজনকেই ‘রজম’ বা সঙ্গেসার করব”। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে দুজনকে শাস্তি দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন- هلاهمازان ‘কেননা এরা দুজনই যিনাকার’ অর্থাৎ যে হালাল করে সেও যিনা করে; আর যে এরূপ তাকে বিয়ে করে, সেও তার সাথে যিনাই করে। এজন্য যে, এ উপায়ের জন্য মেয়েলোকটি হালাল হয়ে যায়নি। আর এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি একটি মেয়েলোককে বিয়ে করেছি এ উদ্দেশ্য যে, আমি তাকে তার স্বামীর জন্যে হালাল করে দেব, সে আমাকে কিছুই আদেশ করেনি এবং কিছুই জানা যায়নি। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন জবাবে হযরত ইবনে উমর (রা.) বললেন, “না, এরূপ বিয়ে জায়েয নয়। বিয়ে শুধু তাই হবে, যা হবে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে। তোমার পছন্দ হলে তাকে রেখে দেবে আর পছন্দ না হলে তাকে আলাদা করে দেবে যদিও এরূপ বিয়েকে আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর যমানায় সুস্পষ্ট যিনার মধ্যেই গণ্য করতাম”।[১৮০]হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তোমাদেরকে ধার করা খাসির বিষয়ে বলব? সাহাবাগণ বললেন- হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তখন তিনি বললেন- সে হলো হালালকারী। আর হালালকারী ও যার জন্যে হালাল করা হয়- এ দুজনের ওপরই আল্লাহ্ তা’আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন”।[১৮১]হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন। অতঃপর সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি তো আল্লাহর নাফরমানী করেছে, এ জন্যে তিনি তাকে লজ্জিত করেছেন। সে শয়তানের আনুগত্য করেছে, ফলে তার জন্যে মুক্তির কোনো পথ রাখা হয়নি। ইমাম মালিক, আহমদ, সওরী এবং আরো অনেক ফিক্‌হবিদের মতে ‘হালাল’ করার শর্তে কোনো বিয়ে শুদ্ধ হবে না। পূর্বোদ্ধৃত দলীলসমূহের ভিত্তিতেই তাঁরা এ মত প্রকাশ করেছেন। তবে হানাফী মাযহাবের লোকদের মতে এরূপ বিয়ে মাকরূহ। কিন্তু প্রথমোক্তদের মত যে এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী এবং অকাট্য দলীলভিত্তিক তাতে সন্দেহ নেই। যে ‘তাহলীল’ বিয়ে এবং ‘হালালকারী’ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) লা’নত ঘোষণা করেছেন, তাকে শুধু মাকরূহ বলে ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। বস্তুত এ ‘তাহলীল’ বিয়ের সুযোগ নিয়ে সমাজে যে অশ্লীলতার বন্যা প্রবাহিত হয়েছে, তাতে গোটা সমাজটাই পংকিল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। দ্বিতীয়ত এতে করে তিন তালাকের পর স্ত্রীর হারাম হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিন তালাকের পর এত

---

১৭৮. - ان رسول الله (صلعم) لعن المحلل والمحلل له

১৭৯. سئل رسول الله (صلعم) عن المحلل قال لا- الا نكاح رغبة لا دلسة ولا استهزا بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العسيلة-

১৮০. لا الا نكاح رغبة ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا نعد هذا سناحا على عهد رسول (صلعم)-

১৮১. الا اخبر كم بالتيسن المستعار؟ قالوا بلى يارسول الله قال هو المحلل- لعن الله المحلل والمحلل له- (ইবনে মাযাহ; হাকেম; বায়হাকী)

সহজে স্ত্রী লাভের সুযোগ থাকলে কেউই তিন তালাক দিতে একবিন্দু পরোয়া করবে না। তাই তো দেখা যায়, সমাজের লোকেরা তালাক দিতে গেলেই একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলে। এর পরে যে স্ত্রীকে চিরদিনের তরে হারাতে হবে এমন কোনো আশংকা বোধও তাদের মনে জাগে না। অথচ শরী'আতের এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, লোকেরা যেন তিন তালাক না দেয়। যদি দেয়ই, তাহলে যেন বুঝে–শুনেই দেয় এবং দিয়ে যেন তাকে আবার ফিরিয়ে পাওয়ার কোনো আশা না করে। কুরআন এবং হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে। অতএব এর ব্যতিক্রম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যৌতুকের শাস্তির বিধান :

যৌতুক হলো এমন একটি সামাজিক ব্যাধি যাতে কন্যা পাত্রস্থ করার সময় কনে ও বর পক্ষের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধাদানে কন্যা পক্ষকে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের দাবীকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর পাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যৌতুকের লোভে বাংলাদেশের প্রায়ই অসামঞ্জস্য বিয়ে হয়ে থাকে এবং আত্মহত্যার পেছনে যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দায়ী। বাস্তবিক পক্ষে বরপক্ষ যখন কনে পক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠায় তখন এ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে, এই জিনিষ পত্র বা নির্দিষ্ট পরিমান টাকা পয়সা না দিলে বিয়ে হবেনা। এ প্রস্তাবের শর্তে হতবিহবল কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতা সন্তানের সুখের কথা ভেবে সকল শর্ত পূরণ করার নামই যৌতুক। যার ফলশ্রুতিতে একজন বাবাকে পথে নামতে বাধ্য করে। কিন্তু এসব কিছুতে কম বেশী হলেই শুরু হয় বরপক্ষের থেকে সকল ধরনের অমানবিক নির্যাতন। আর এ নির্যাতনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অসহায় কনে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে অথবা পিতামাতার বাড়তি বোঝা না হয়ে সকল মায়া ত্যাগ আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়। যৌতুক প্রথার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের বিধান হচ্ছে বর মোহর প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রী গ্রহণ করবে এবং তা আদায় করার মাধ্যমে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের স্বাদ উপভোগ করবে। আল্লাহ তা'য়ালার বিধানও তাই। ইসলামে যৌতুকের কোন স্থান নেই। কেননা মুসলিম সমাজে নারীরা বিয়ের পর বাবা মায়ের সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হয়। সনাতন বা হিন্দু ধর্মের মেয়েরা বিয়ের পর বাবা মায়ের সম্পত্তিতে মালিক হয় না। তাই তাদের ধর্মে যৌতুক থাকাটা স্বাভাবিক। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, প্রাচীন সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে এ যৌতুক প্রথার উদ্ভব হয়েছে। কারণ তারা যখন তাদের মেয়েদের বিয়ে প্রদান করেন, তখন তারা তাদের মেয়েকে একবারে সব কিছু দিয়ে বিয়ে দেন। এ ধর্মাবম্বী মেয়েদের বিয়ের পর আর কোন পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয় না। তাই সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিকট এ যৌতুক প্রথা বা কন্যাদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকেই এ দেশের মুসলমানদের নিকট যৌতুক প্রথা প্রবেশ করেছে। বিত্তবানরা তাদের মেয়ের বিয়েতে উপঢৌকন হিসেবে বরপক্ষকে বিভিন্ন জিনিস প্রদান করত। এ প্রথা মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনে পক্ষ বর পক্ষকে প্রদান করা হত। একটু নিচু বংশের মেয়েকে একটু উচু বংশে বিয়ে দিতে মেয়ের বাবা আনন্দচিত্তে ছেলেকে বিভিন্ন জিনিস উপঢোকন দিত, তাকে উপহার বলা হত। বর্তমান এ অবস্থায় চলতে চলতে তা যৌতুকের বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। এখন উচু-নিচু সকল স্তরে তা যৌতুক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ইহা এমন এক মহামারি আকার ধারণ করেছে যে, যৌতুক ছাড়া এখন উঁচু-নিচু কোন স্তরেই বিয়ে সম্পাদিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গরীব বাবা যৌতুকের টাকা দিতে পারে না বিধায় মেয়ের বিয়ে হয় না। অনেকের বিয়ের বয়স পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আমাদের সমাজ জীবনে বিভিন্ন কারণে যৌতুকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তা

Dhaka University Institutional Repository

হল- ১. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত ও নতজানু অর্থনীতি; ২. অর্থনৈতিক অক্ষমতা বা অসমতা ও দৈন্যতা; ৩. অত্যধিক দারিদ্রতা ও অভাব অনটন; ৪. অন্যের সম্পদের প্রতি অতিমাত্রার লোভ ও লালসা; ৫. রাতারাতি বড়লোক বা সম্পদশালী হওয়ার দুঃস্বপ্ন; ৬. বেকারত্ব ও কর্মহীনতা; ৭. কারিগরি ও হাতের কাজের শিক্ষার অভাব; ৮. মেয়েদের অশিক্ষা, অদক্ষতা ও কর্মহীনতা; ৯. অপর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র ও স্বল্প মজুরি; ১০. চাহিদার চেয়ে আয় কম; ১১. পরনির্ভরশীল ও শ্রমহীন মন- মানসিকতা; ১২. অধিক লোভ ও সস্তা আয়ের মাধ্যম; ১৩. শিক্ষার সাথে কর্মের বা কর্মের সাথে শিক্ষার অসমন্বয়; ১৪. সনাতন ধর্মাবল্বীদের দেখাদেখী মুসলিম ধর্মাবল্বীদের মাঝে এর কুপ্রভাব; ১৫. আত্মসম্মানবোধহীনতা, নির্লজ্জতা অপমানবোধহীনতা প্রভৃতি। তবে ধনীদের কাছে যৌতুক যদিও বিলাসিতা কিন্তু দরিদ্র পিতার কাছে তা মরণ ফাঁদ। সামর্থ্য থাক বা না থাক মেয়ে বিয়ে দিতে হলে যৌতুক দিতেই হবে। এটা আমাদের সমাজের একটা বিষাক্ত ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। এ ব্যাধির শিকার নারী সমাজ ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। মেয়ে হিসেবে জন্ম নেওয়াই যেন আজন্ম পাপ। এ ব্যাধিতে কত সহজ সরল নারী কত স্থানে যে নিগৃহীত হচ্ছে তার হিসেব মিলানো মুশকিল। যদিও প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ায় যৎসামান্য প্রকাশিত হয়। তবে মান-সম্মান, ইজ্জত ও সামাজিকতার কারণে এ সব ঘটনার অধিকাংশই রয়ে যায় অপ্রকাশিত। বর্তমান সময়ে যৌতুকের দায়ে নারী নির্যাতন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দেশে যৌতুক বিরোধী আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় এর ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত ২৫১৮ জন নারী যৌতুকের শিকার হয়েছেন।[১৮২]

১৮২. দৈনিক দিনকাল. ১২ মার্চ ২০১৪ বুধবার, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ, সামাজিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান

- ইসলামী সমাজের সংজ্ঞা
- চুরির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান
- ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তির বিধান
- ডাকাতি ও সন্ত্রাসে সহযোগীদের শাস্তির বিধান
- অপহরণের শাস্তির বিধান
- মানব অপহরণ ও গুমের শাস্তির বিধান
- যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান
- নাবালিগা, পাগল মেয়ে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যিনার বিধান
- ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে যিনার বিধান
- ভূলবশত সঙ্গমের শাস্তির বিধান
- পুরুষদের সমকামিতার শাস্তির বিধান
- মহিলাদের সমকামিতার শাস্তির বিধান
- পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান
- কায্ফ বা যিনার অপবাদের শাস্তির বিধান
- স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি
- মদ্যপানের শাস্তির বিধান
- ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তির বিধান
- রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতার শাস্তির বিধান
- হত্যার প্রকারভেদ
- হত্যার শাস্তির বিধান
- আঘাতের শাস্তির বিধান

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ, সামাজিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান

মানুষ সামাজিক জীব। তারা একা একা বাস করতে পারে না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সর্বদাই দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করছে। কারণ দলবদ্ধ জীবন যাপন ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশাঙ্কা থাকে। তাই সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা মানুষের একটা স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষের সংস্পর্শে মানুষ না থাকলেও দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন না করলে সে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ মানুষ সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই বেড়ে উঠে। জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন যাপনে প্রয়াসী হয়। এ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভিতর দিয়েই মানব সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। এ সমাজ প্রত্যয়টি হলো সাধারণ স্বার্থপ্রণোদিত এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যরা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে। বুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে যা বুঝায়, তা হল একত্রে গমন, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। মানব আবির্ভাবের সে আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ হল জোটবদ্ধ। সমাজবদ্ধতার মূলভিত্তি হল জোটবদ্ধতা বা দলবদ্ধতা। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন রকম কাজ-কর্মের স্বার্থে এবং আশা-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকে। পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক হল অধিকতর জটিল প্রকৃতির, সমতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং অসমতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এই সামাজিক সম্পর্ক ক্রমশ বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করে। যেভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিচিত্র ও জটিল সামাজিক সম্পর্ককেই সাধারণভাবে বলা হয় সমাজ।

১. সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেগ বলেছেন, ”সমাজ হল মানুষের আচার ও কার্যপ্রণালী, কর্তৃক বা পারস্পারিক সাহায্য, বিভিন্ন সংঘ ও বিভাগ, মানব আচারন নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত সদা পরিবর্তনশীল একটি জটিল ব্যবস্থা । সমাজ হল সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক সর্ম্পকে একটি প্রবাহমান ধারা” ।[১]

২. পিয়ারসন (Pearson) এর ভাষায়, æSociety may be defined as the total complex of human relationships in so far as they grow out of action, it terms of means and relationship, intrinsic or symbolic.”[2]

৩. সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (F. H. Giddings) এর মতে, “সমাজ হল সম-মনোভাবাপন্ন এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন মানসিকতা সর্ম্পকে জানে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে” ।[৩]

---

1. R.M. Maclver and C.H. Page, *Society,* 1967, P.5

২. Pearson, *Family-Socialization and Interaction Process* (London, 1965), P.5

৩. F.H. Giddings, *Principles of Sociology* (3rd ed.) P.5

Dhaka University Institutional Repository

৪. সমাজ বিজ্ঞানী পি. জিসবার্ট (P.Gisbert) মতে, " সাধারণভাবে সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের এমন একটি জটিল জাল বুঝায় যার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ তার অপর সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত থাকে।"(Society,in general consists in complicated network of social relationships by which every human being is interconnected with his fellowmen.)[4]

৫. অধ্যাপক জিনসবার্গ (Morris Ginsberg) এর মতে, æThe term society may be used to include all or any dealings of man with man, whether these be direct or indirect, organised or unorganised, conscious or unconsious, co-operative or antagonistic. Society is universal and pervasive and has no definite boundary or assignable limits. A society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behaviour which mark them in behaviour.[5]

সুতরাং সমাজ হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যার দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তি তার আপন ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং যে ক্ষমতা অবশ্যই কতগুলো রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। মানাবগোষ্ঠী যখন একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কতগুলো আর্দশ অনুসরন করে তখন তাকে সমাজ বলে ।

সমাজ মানব জীবনের আদি ও প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানেও মানুষ নিজেদের পারস্পারিক প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করেছে। তবে একাধিক উদ্দেশে ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং সমাজে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় যাতে সুষ্ঠ নীতি ও সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে সেজন্য সমাজ কতগুলো উদ্দেশ্যে সাধন করে।

ইসলামী সমাজের সংজ্ঞা :

ইসলামী সমাজ হল ইসলামী আদর্শ, রীতিনীতি, বিধি বিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা মানব সমাজ। এ সমাজের বিকাশ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। এর অধিকাংশ সদস্যকে ইসলামী অনুশাসনের অনুসারী হতে হয়। হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ইসলামী সমাজ ছিল। পরবর্তীতে তা বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন রকম সমাজে রূপ লাভ করে। মানব সমাজ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে দুনিয়াতে সমস্ত মানুষই এক আদমের সন্তান। ইসলামী সমাজের ভিত্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "হে মানব জাতি! তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পার। অবশ্যই আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।"[৬] কাজেই সকল মানুষ সমানভাবে পরস্পর ভাই ভাই। জাতি, বর্ণ, গোত্র,

4. P. Gisbert, *Fundamentals of Sociology*, (Orient Longman Ltd. Third edition,1973) P.10

৫. Morris Ginsberg, *Sociology* (London: Oxford University Press, 1987), P.7

৬. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চল, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবন ধারনের বিভিন্নতার কারণে মানব সমাজকে ইসলাম বিভক্ত করে না বরং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ দুটো সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর একটি ইসলামিক সমাজ অপরটি অনৈসলামিক সমাজ। মানুষ মূলত প্রথমে একই সমাজভুক্ত ও জাতিভুক্ত ছিল। মানুষের জীবনের গতিধারা, মৌলিক চাহিদা ও হৃদয়ের অনুভূতি এক অভিন্ন। মানুষ পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের অধিবাসী হোক না কেন তাদের সব কিছুতেই যেন একটা মিল ও ঐকতান রয়েছে। তাই পৃথিবীর সকল মানুষই ছিল একটি সমাজভুক্ত।

ইসলাম বড় বড় কয়েকটি অপরাধের জন্য হদ্দের বিধান ফরয করে দিয়েছে। এগুলো হল : চুরি, ডাকাতি, ও সন্ত্রাস, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ এ চারটির শাস্তির পরিমাণ কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চম মদ্যপান, এর শাস্তি হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। অনেকের মতে, ধর্মান্তর এবং রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতার শাস্তিও হদ্দের শামিল। এগুলোর শাস্তিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে এ হদ্দগুলোর সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হলো -

চুরির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান :

ধন-সম্পদ মানব জীবনের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। মানব দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, মানব জীবনের জন্য অর্থ-সম্পদও ঠিক ততোখানি গুরুত্বপূর্ণ। মানব জীবনের চাঞ্চল্য ও চাকচিক্য বলতে গেলে ধন-সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামও ধন-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পকে হালাল ঘোষণা করেছে আর অন্যায় পথে অর্জিত ধন-সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর কোন ব্যবস্থাই না থাকলে মানুষ নিরুপায় হয়ে চুরি করতে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে থাকে, যাতে কেউ না খেয়ে বা অভাব-অনটনে আক্রান্ত হয়ে না করে। এ সব মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ হলে ইসলামী রাষ্ট্রে চুরি করার প্রয়োজন পড়ে না। এ রূপ সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেবল সে লোকই চুরি করতে পারে, যে অন্যায়ভাবে অধিক সম্পদ অর্জন করার অভিলাষী মনোভাব কিংবা যে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা অপব্যয় করতে অভিপ্রায়ী হয়। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের পক্ষে এ ধরনের চুরি খুবই মারাত্মক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধ। এ কারণে ইসলাম চুরি নিষিদ্ধ করেছে, চুরির যাবতীয় পথ ও উপলক্ষ্যকে সর্বাত্মকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

চুরি বলতে সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে বোঝানো হয়।[৭] শরী'আতের পরিভাষায় কোন মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভূক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে 'চুরি' বলে।[৮] এ চুরি সাব্যস্ত করার জন্য কিছু প্রমাণের প্রয়োজন তা হল যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণ করা যেতে পারে।

৭. আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ খ.৯), পৃ. ১৩৩

৮. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৩৫৫; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৯৩ (আরবী ভাষ্য হল : السرقة هي اخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ملكا للغير اوما قيمته لا شبهة فيه على وجه الخفية-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: চুরি প্রমাণের জন্য দু'জন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দুজনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তের ওপর চুরির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৯]

দ্বিতীয়ত: চোরের অভিযোগ অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি[১০]যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে চুরির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে চুরি প্রমাণিত হবে। অধিকাংশের মতে, মালিকের দাবীর প্রেক্ষিতেই যদি চোর স্বীকারোক্তি করে, তবেই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। এ কারণেই অজ্ঞাত কিংবা অনুপস্থিত কোন লোকের মাল কেউ চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। পক্ষান্তরে মালিকীগণের মতে, স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবার জন্য মালিকের মাল কেউ চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[১১] এবং তাকে চুরির হদ্দ ভোগ করতে হবে।[১২] এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশদের মতে, একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। তবে হাম্বলীগণ এবং হানাফীগণের ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, দু'এজলাসে দুবার স্বীকৃতি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। যদি একবার স্বীকারোক্তি দেয়, তাহরে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাবে তা'য়ীরী শাস্তি দেয়া হবে এবং চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।[১৩]স্বীকারকারী যদি নিজের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং বলে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।[১৪] তবে বিচারকের কাছে যদি বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিই অপরাধী। তা হলে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে পরবর্তীকালের অনেক মুফতীই চাপের মুখে চোরের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মত দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, চোরের স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেবে এ ধরনের ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না।[১৫]

তৃতীয়ত: যখন চুরিকৃত সম্পদের মালিকের দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত না থাকে, আর চোরও স্বীকার না করে, তখন চোরকে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবীর পক্ষে শপথ করে বলে, তাহলে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে এবং চোরের হাতও কাটা যাবে। তবে হানাফী, মালিকী

---

৯. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৮৬-৮৭; আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনাই*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ৭), পৃ. ৮১

১০. হানাফীগণের মতে স্বীকারোক্তিদানকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। কোন বোবা ব্যক্তির স্বীকৃতিমূলক ইঙ্গিত দ্বারা কার্যকর করা যাবে না।

১১. ইমাম মালিক ইবনু আনাছ (রা.), মুদাওয়ানাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪৯

১২. আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সানাই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৮১; ইবনুল 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৬-৮৭

১৩. শামসুদ্দীন আল-মাকদিসি ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ* (আলমুল কুতুব) খ. ৬, পৃ. ২২; মুয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, বৈরুত: দারু-ইহইয়াইত তুরাছিল আরবী), খ. ৯, পৃ.১১৮

১৪. সুলায়মান আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা শারহুল মুয়াত্তা* (দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ.৭, পৃ. ১৬৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪১; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১১৭-২০

১৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ও হাম্বলী ইমামগণের নিকট এ রূপ অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না।[১৬]

চতুর্থতঃ কারো কারো মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে চোরের হাতও কাটা হবে এবং তাকে মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। ইবনুল কাইয়েম বলেন, মুসলিম খলীফা ও শাসকগণ চুরির অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কাটতে নির্দেশ দিতেন, যদি তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া যেত। কেননা সাক্ষ্য ও চোরের স্বীকারোক্তির চাইতে চুরি সাব্যস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষণ অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি যেহেতু এক প্রকার সংবাদ দান, তাই এগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যার একটা অবকাশ সবসময় বিদ্যমান্ থাকে। পক্ষান্তরে চুরিকৃত মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে তাতে চুরির ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।[১৭] তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবেই হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণ করা যাবে না।[১৮] কোন লোক চুরি করলেই তার হাত কাটা যাবে না। তবে কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[১৯] মালিকীগণের মতে, চুরির নিসাব তিন দিরহাম। তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (স.) এবং হযরত 'উছমান (রা.) দুজনেই তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরিতে হাত কেটেছেন।(হযরত 'ইবনু 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন "রাসূলুল্লাহ (স.) তিন দিরহাম মূল্যের বর্মের চুরিতে হাত কেটেছেন।"[২০]শাফি'ঈগণের মতে, এক দীনারের [২১] এক চতুর্থাংশ।[২২] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা যাবে।"[২৩] অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, "বর্মের মূল্যের চাইতে কম মূল্যের বস্তুর চুরিতে হাত কাটা যাবে না।" রাবী বলেন, হযরত 'আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, বর্মের মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ।[২৪] তবে এক দীনারের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর মতে তিন দিরহাম,[২৫] ইবনু আবী লায়লা (রহ.) এর মতে

---

১৬. উসমান যায়ল'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক*, (দারুল কিতাবিল ইসলামী খ.৪), পৃ.২৯৭; পৃ.১২২; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব* (দারুল কিতাবিল ইসলামী), খ. ৪, পৃ. ১৫০

১৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়্যা, *'ইলামুল মু'আক্কি'ঈন* (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ. ২, পৃ. ৭৬-৭৭

১৮. মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১১৮

১৯. আলী আয-যাহিরী ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা* (দারুল ফিকর, খ.১২), পৃ.৩৪৪-৫; আস-সারাখসী, আল-মাবসূসত, খ.৯, পৃ.১৩৬-৯; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৭৭-৯

২০. ইমাম মালিক ইবনু আনাছ, *আল-মুদাওয়ানাহ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), খ.৪, পৃ. ৫২৬; ان رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلثة دراهم (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, *সহীহ আল-বুখারী* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৬৪১১, ৬৪১২, ৬৪১৩)

২১. দীনার : ২০ কীরাত ওযনের স্বর্ণের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা ৪.২৫ গ্রামের সমান।

২২. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম* (বৈরুত: দারুল মায়ারিফাহ, খ.৬), পৃ.১৪০

২৩. تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ১৬৮৪

২৪. لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن- আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯৪৯; আহমদ নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত (কিতাবুর হুদূদ), হা.নং.৭৪২২

২৫. এ ভিত্তিতে তাঁর মতের সাথে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতের মিল রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ দিরহাম।[২৬] হানাফীগণের মতে, নুন্যতম দাশ দিরহাম[২৭] বা তার সমূল্যের কোন বস্তু চুরি করা হলে তবেই চুরির হদ্দ কার্যকর করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "এক দীনার বা দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না।"[২৮] তাঁদের বক্তব্য হল মালিকী ও শাফি'ঈগণের বর্ণিত হাদীসমূহের সুনির্দিষ্ট পরিমানের কথা উল্লেখ নেই। এগুলোতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.)থেকে তিন দিরহাম বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ আবার চার দিরহাম এবং পাঁচ দিরহামের কথাও উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে হযরত 'আয়িশা (রা.)এর মতে, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ সমান দশ দিরহাম। হানাফীগণের মতে, যেহেতু বর্মটির মূল্য কত তা নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যেও মত পার্থক্য রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণের বর্ণনা সম্বলিত রেওয়ায়েতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ তার চাইতে কম পরিমাণের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর সন্দেহযুক্ত অবস্থায় হদ্দ কার্যকর না করাই হল ইসলামী শাস্তি আইনের একটি বৈশিষ্ট্য[২৯] বর্তমানে দশ দিরহামের সমপরিমাণ প্রায় ২৯.৭৫ গ্রাম রৌপ্য বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে। এটা হানাফী ইমামগণের মতানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে প্রাধান্য দেন। পক্ষান্তরে শাফি'ঈগণ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণকে প্রাধান্য দেন। তাই তাঁদের মতানুযায়ী .২৫ দীনারের সমপরিমাণ প্রায় ১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গন্য হবে। তদুপরি চুরি করার সময় চুরিকৃত বস্তুর যা দাম ছিল মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে তা-ই বিবেচ্য হবে। তবে হানাফীগণের মতে, হাত কাটার সময় চুরিকৃত বস্তুর মূল্য হ্রাস পেয়ে নিসাবের চাইতে কমে গেলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩০]এর কম মূল্যের কোন বস্তু চুরি করলে তা হদ্দের আওতায় পড়বে না; তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। যদি একসাথে একাধিক ব্যক্তি চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল চুরিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ চুরির নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়, তা হলেই সকলের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে। অন্যথায় তা'যীরের আওতায় সাধারন শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৩১] চুরির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হল হাত কাটা। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।"[৩২]এ আয়াত থেকে জানা যায়, এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সম্পূর্ণ একমত।[৩৩] তবে হাত কতটুকু কাটতে হবে, কিভাবে কাটতে হবে এবং কোন হাত কাটতে হবে এ সকল বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণের মতে প্রথমবারের চুরিতে ডান হাত কবজি থেকে কাটতে হবে। কেননা, এ ডান হাত দিয়ে সাধারণত চুরির কাজ সম্পন্ন হয় এবং ধরা

---

২৬. দাউদ আয-যাহিরীর মতে, কম-বেশি যা চুরি করুক তার জন্য হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাঁর বক্তব্য হল- جزاء بما كسبا (অর্থাৎ যা তারা রোজগার করেছে তারই শাস্তি স্বরূপ)-এ আয়াতে শব্দটি কম-বেশি সব পরিমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খ.৯, পৃ.৯৪-৫)

২৭. দিরহামঃ রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা হল ৯৭৫ গ্রামের সমান।

২৮. لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৪৪৬

২৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৬-৯; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, খ.৭, পৃ.৭৭-৯

৩০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৪০৭; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'উল আনহুর*..., খ. ১, পৃ. ৬২৬

৩১. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২০; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪৩

৩২. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نطالا من الله والله عزيز حكيم- (আল-কুর'আন, ৫ : ৩৮)

৩৩. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

-ছোঁয়ার কাজেও ডান হাতের ব্যবহার হয় বেশি। তাই চুরির অপরাধে ডান হাত কর্তন করাটাই অধিকতরযথার্থ শাস্তি। দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে।[৩৪] এতে প্রসিদ্ধ ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই। তবে তৃতীয়বার চুরি করলে কি শাস্তি দেয়া হবে-তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফীও কতিপয় হাম্বলী ইমামের মতে তৃতীয় বারের চুরির শাস্তি হল কারাগারে আটক রাখা। তাঁদের বক্তব্য হল তৃতীয়বারও যদি তার হাত পা কেটে ফেলা হয়, তাহলে জীবনে তার চলার ও বেঁচে থাকার আর কোন শক্তিই থাকবে না। এটা প্রকারান্তরে তাকে ধংশ করারই নামান্তর। হদ্দের উদ্দেশ্য কাউকে ধবংশ করা নয়; বরং অপরাধের প্রতি ভীতি তৈরি করাই হল হদ্দের একান্ত উদ্দেশ্য।[৩৫] মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত, আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারপরও যদি চুরি করে, তবেই তাকে তা'যীরের আওতায় কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে।[৩৬] তাঁদের দলীল হল- রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন, "যখন চোর চুরি করে, তার হাত কেটে দাও। যদি পুনরায় চুরি করে তা পা কেটে দাও। যদি আবারচুরি করে, তাহলে তার হাত কেটে দাও। ফিরে আবারো চুরি করলে তার পা কেটে দাও।"[৩৭]হানাফীগণ এ হাদীসের জবাবে বলেন, মুসলিম খলীফাদের অনেকেই এ হাদীসের ওপর আমল করেন নি; তাঁরা কেউ তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতেন। সম্ভবত বর্ণনায় বিভিন্নতার কারণে তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করেন নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় এবং তার পরবর্তী চুরিগুলোর শাস্তি হদ্দ হিসেবে নয়; তা'যীরের আওতায় কার্যকর করা হবে। তাই এ সব ক্ষেত্রে বিচারক কারাদন্ড কিংবা তাঁর স্ববিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। বর্ণিত আছে যে, একসময় হযরত 'আলী (রা.) এর দরবারে হাত-পা কাটা এক চোরকে আনা হল। তখন হযরত আলী (রা.) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তাঁরা বললেন, তাঁর অঙ্গ কর্তন করুন, হে আমীরুল মুমিনীন! উত্তরে 'আলী' (রা.) বললেন, তা করলে তো তাকে ধ্বংশই করে ফেললাম। সে কি দিয়ে আহার করবে, কিভাবে নামাযের ওযু করবে, কিভাবে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা হাসিল করবে? তাকে কয়েকদিন কারাগারে রেখে দাও। এর কিছু দিন পর তাকে কারাগার থেকে বের করে পুনরায় তিনি সাহাবীগণের সাথে পরার্মশ করলে তাঁরা প্রথমবারের মতোই জবাব দিলেন। অতঃপর 'আলী' (রা.) তাকে কঠিনভাবে বেত্রাঘাত করলেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন।[৩৮]চোরের ডান হাতের কব্জি থেকে কাটতে হবে। আয়াতে কোন হাত কাটতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তবে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এ فاقطعوا ايديهما এর পরিবর্তে فاقطعوا ايمانهما প্রসিদ্ধ

---

৩৪. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত খ. ৯, পৃ. ১০৫-৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله- "চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। এরপর ফিরে আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও।" (আলী দারু কুতনী, *আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং : ২৯২)

৩৫. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনাই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৮৬-৭; আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১৪০-১

৩৬. ইমাম মালিক ইবনু আনাছ, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৫৩৯; মুহাম্মদ ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৩৭১;; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ.৮, পৃ. ৪১৪;

৩৭. اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله- فان عاد فاقطعوا رجله- দার কুতনী, *আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ২৯২

৩৮. আস-সরাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১৪০-১; *আল-কাসানী*, *বদা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৮৬-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

কিরা'আত[৩৯]দ্বারা জানা যায় যে, চোরের ডান হাতই কাটতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেও ডান হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন।তাছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল ও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কব্জি থেকে হাত কাটতে হবে। পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণও কব্জি থেকে কেটেছেন। কারো কারো মতে, শুধু আঙ্গুলগুলোই কাটতে হবে। কেননা ধরা, নেওয়া ইত্যাদি কাজ আঙ্গুল দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এতে হাত কাটার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। খারিজীদের মতে, ডান হাতের কাঁধের জোড়া থেকে কাটা হবে। কেননা হাত বলতে সবটারই নাম। আবার কারো মতে, হাতের মধ্যখান থেকে কাটতে হবে। তবে এ মতগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। অধিকন্তু, সাহাবা কিরামের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত নয়।[৪০]দ্বিতীয়বার চুরির ক্ষেত্রে বাম পা গোড়ালি থেকে কাটা হবে। তবে কারো কারো মতে, পায়ের গোড়ালি বরাবর ঠিক রেখে বাকী অংশ কেটে ফেলতে হবে, যাতে সে পায়ের ওপর ভর করে চলাফেরা করতে পারে।[৪১] হাত-পা কাটার পর সাথে সাথে বেন্ডিজ করে দিতে হবে, যাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। প্রচন্ড শীত বা গরমের সময় কর্তন করা সমীচীন নয়। তদুপরি যতটুকু সম্ভব অতি দ্রুত ও সহজভাবে কাটার কাজ সেরে ফেলতে হবে।[৪২] চোরের হাত কাটার পর হাতকে তার গলায় লটকিয়ে রাস্তায় কিংবা বাজারে প্রচারের উদ্দেশ্য ঘুরাতে হবে কিনা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে,এটা সুন্নাত।[৪৩] কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৪] হানাফীগণের মতে, রাসূলুল্লাহ (স.) সকল চুরির ঘটনায় এ রূপ করেছেন- তা প্রমাণিত নয়। ব্যাপারটি প্রশাসক কিংবা বিচারকের সুবিবেচনার ওপর ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা প্রয়োজন কিংবা কল্যাণকর মনে করলে তা করতে পারেন।[৪৫] চুরি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শর্তে ত্রুটি দেখা দেয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তা হলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী তা'যীরের শাস্তি ভোগ করবে। আর তা হল- চুরিকৃত মাল যদি মজুদ থাকে, তা হলে চোর অবস্থাসম্পন্ন হোক কিংবা দারিদ্র ক্লিষ্ট, চাই চোরের হাত কাটা হোক না হোক, চাই চুরিকৃত মাল চোরের কাছে থাকুক বা অন্যের কাছে সর্বাবস্থায় মাল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত।[৪৬] বর্ণিত রয়েছে, হযরত সাফওয়ান (রা.) এর চাদর চুরির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) চোরের হাত কাটার পর চাঁদর তাকে ফিরিয়ে

৩৯. মুহাম্মদ ইবনু জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বয়ান আত-তাবিলিল আল-কুরআন* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি., খ. ৬), পৃ. ২২৮; জাসসাস, *আহকামূল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৬৪;

৪০. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২২৪-২২৫; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১০৬

৪১. আবু বকর আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়্যাহ* (আল-মাতবা'তুল খায়রিয়্যাহ), খ. ৩, পৃ. ১৭০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৬

৪২. হানাফীগণের নিকট এটা ওয়াজিব। তাঁদের বক্তব্য হলঃ যদি রক্ত বন্ধ করা না হয় তাহলে এতে অন্য অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীদের নিকট বেন্ডিজ করা ওয়াজিব নয়; তবে মুস্তাহাব। (আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৭০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১০৬)

৪৩. শাফি'ঈদগণের মতে, এক ঘন্টার জন্য লটকানো যাবে। তবে হাম্বলীগণ এজন্য কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নি।

৪৪. ফাদালা ইবনে 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, "একবার এক চোরকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট উপস্থিত করা হল। রাসুলুল্লাহ (স.) প্রথমে তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁর নির্দেশ চোরের কর্তিত হাতটি তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হল। " (আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত্ তিরমিযী*, (কিতাবুল হুদুদ), হা.নং : ১৪৪৭; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা. নং : ৪৪১১

৪৫. ইবনে হাজর হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, খ. ৯ (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী) পৃ. ১৫৬- ৭ পৃ.১০৭; সাবিক সাইয়িদ, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ.২, পৃ.৪২৬

৪৬. আবু মুহাম্মদ গানিম, *মাজমা'উদ দিয়ানাত* (দারুল কিতাবিল ইসলামী), পৃ. ২০৩; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৯-৯০

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন।[৪৭]তদুপরি চুরি প্রমাণিত হবার পর কোন কারণে যদি চোরের হাত কাটা সম্ভব না হয় এবং চুরিকৃত মাল নষ্ট বা খরচ হয়ে যায়, তাহলে চুরিকৃত মালের মূল্য কিংবা তার সমতুল্য মাল মালিকের পরিশোধ করে দিতে হবে। তবে চুরির শাস্তি হিসেবে যদি চোরের হাত কাটা হয়, তাহলে চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা খরচ হয়ে গেলে তার মূল্য কিংবা তার সমতুল্য মাল পরিশোধ করতে হবে না। আল-কুরআনের আয়াতে শুধু হাত কাটার শাস্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সে যে অপরাধ করেছে তার সবটুকুর শাস্তি হল হাত কাটা। অতএব, এর সাথে আর কোন শাস্তি যুক্ত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "চোরের হাত কাটা হলে তাকে কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।"[৪৮]এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, চোরের হাত কাটা ও চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শাস্তি একসাথে দেওয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত। মালিকীগণের মতে, চোর যদি চুরি করার সময় থেকে হাত কাটা পর্যন্ত সময় অবস্থাসম্পন্ন ছিল, তাহলে নষ্ট বা ব্যয় হয়ো যাওয়া মালের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে চুরি প্রমাণিত হলে চোরকে সর্বাবস্থায় চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে এবং চোরের হাত ও কাটতে হবে। তাঁদের যুক্তি হল, হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে আল্লাহর হুকম লঙ্ঘন করার কারণে আর ক্ষতিপূরণ বান্দাহর হক নষ্ট করার কারণে।[৪৯]এ চুরির চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। এগুলো হল : চোর, মালের মালিক অর্থাৎ যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে , চুরিকৃত সম্পদ ও গোপনে সম্পদ হস্তগত করা। এ উপাদানসমূহের প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্ত রয়েছে যেগুলো পাওয়া গেলেই হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে। চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটতে হলে চোরের মধ্যে আটটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ শর্তগুলো হল-

১. চোরকে বালিগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা চুরি করলে তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। অনুরূপভাবে চোরকে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও হতে হবে। কোন পাগল চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, যদি সে পুরো পাগল হয়। যদি সে মাঝে মাঝে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে এরূপ অবস্থায় চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৫০] অনুরূপভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং মতিভ্রম ব্যক্তিদের ওপরও হদ্দ কার্যকর করা হবে না, যদি তারা ঐ অবস্থায় চুরি করে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তিন শ্রেণীর মানুষকে (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।...মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত...।"[৫১]তবে কোন মাতাল ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় চুরি করলে এর জন্য সে হদ্দযোগ্য হবে। কারণ সে নিজেই তার মতি বা বোধশক্তি নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ করা স্বয়ং একটি দন্ড যোগ্য অপরাধ। এরূপ অবস্থায় শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ করতে দুঃসাহসী হবে।[৫২]

---

৪৭. আহম্‌দ আন-নাসাঈ, আস-সুনান (কিতাবুল কত'ইস সারিক), হা.নং. ৭৩৬৯

৪৮. اذا قطع السارق فالا غرم عليه- আবু বাকর জসসাস, *আহকামূল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৪; ইউচুপ ইবনু 'আবদিল বারর, *আত-তামহীদ* (আল-মাগরিব, ওয়াযারাতুল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.) খ.১৪, পৃ. ৩৮৩;

৪৯. আবু মুহাম্মদ গানিম, *মাজমা'উদ দিয়ানাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩; আলা উদ্দীন আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ ফি মা'য়ারিফাতির রাজিহ* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরবী), খ. ১০, পৃ. ২৮৯

৫০. মালিক, ইমাম, *আল-মুদাওয়ানাহ*, (দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ) খ.৪, পৃ. ৫৩৪

৫১. رفع القلم عن -------- عن المعتوه حتى يصح/يعقل- (আল হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৮১৭০, ৮১৭১)

৫২. আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনা'ঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৫৮৩

Dhaka University Institutional Repository

২. চুরির শাস্তি কার্যকর করার জন্য চোরকে মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুলিম নাগরিক হতে হবে অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে যদি কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম নাগরিকের কোন মাল চুরি করে, তা হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে কি না তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকী ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) প্রমুখের মতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। কেননা নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান স্বীকার করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখের মতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা সে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের বাধ্যগত অনুবর্তী নয়। তাঁদের মতে, সে চুরিকৃত সম্পদের জন্য দায়ী থাকবে।[৫৩]

৩. হস্তগতকৃত মাল অন্যায়ভাবে দখল বা মালিকানাভুক্ত করে নেওয়ার অভিপ্রায় থাকতে হবে। কোন মাল হস্তগত করা চুরি কিনা তা হস্তগতকারীর নিয়াতের ওপর নির্ভর করে। যেখানে অন্যায়ভাবে গ্রহণের নিয়াত থাকে না, সেখানে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। যেমন কেউ যদি কারো কোন মাল ব্যবহার করে পরে ফিরিয়ে দেবে- এ উদ্দেশ্যে বা এই মনে করে হস্তাগত করল যে, মালিক নাখোশ হবে না, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যদি তার কথার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৪]

৪. অপরের মাল জেনে-শুনে তার কোন রূপ অবগতি কিংবা সম্মতি ছাড়া হস্তগত করলেই তা চুরি হিসেবে ধর্তব্য হবে। তাই কেউ যদি কোন মালকে মুবাহ (বৈধ) বা পরিত্যক্ত মনে করে হস্তগত করে, তা হলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না[৫৫]

৫. কোন চোর যদি একেবারে অনন্যোপায় হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয় যেমন দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করল, তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৫৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।"[৫৭] অনুরূপভাবে কারো একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে চুরি করলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না, যদি কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ প্রমাণিত হয়।[৫৮]

৬. চোর ও মালিক যদি পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় ঊর্ধ্ব বা অধঃস্তন জাতীয় আত্মীয় হয় (যেমন-পিতামাতা ও পুত্রকন্যা এবং তাদের ঊর্ধ্ব ও অধঃস্তন পুরুষগণ), তা হলেও চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না। উপর্যুক্ত আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অপরাপর আত্মীয়-স্বজন (যেমন ভাইবোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফী, মামা-মামী, খালা–খালু বা তাদের ছেলেমেয়ে, দুধ মা ও ভাইবোন, সৎ পিতামাতা, শ্বাশুড়-শ্বাশুড়ি ও স্ত্রীর অপর ঘরের ছেলেমেয়ে প্রভৃতি) একে অপরের মাল চুরি করলে অধিকাংশ ইমামের মতে হাত কাটা হবে। তবে হানাফীগণের মতে,

৫৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৯৬; আস-সারাখ্সী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.১৭৮

৫৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২৪, পৃ. ২৯৮

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. যায়নুদ্দীন ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক* (দারুল কিতাবিল ইসলামী) খ. ৫, পৃ.৫৮; আস-সারাখসী, আল-মাবসূত,প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.১৪০

৫৭. لا قطع في مجاعة مضطر (আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪০-১)

৫৮. মুহাম্মদ 'উলায়শ, *মিনহুল জলীল* (দারুল ফিকর), খ. ৯. পৃ.৩২৯; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*,প্রাগুক্ত, খ.৯. পৃ.১৫০;

Dhaka University Institutional Repository

রক্তসম্পর্কীয় মুহরাম আত্নীয়-স্বজনরা (যেমন ভাইবোন, চাচা, মামা, ফুফী, খালা প্রভৃতি) একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তাঁদের বক্তব্য হল- তারা প্রায়শ একে অপরের কাছে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে। এর ফলে তাদের চুরির ক্ষেত্রে একটি সন্দেহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। অধিকন্তু চুরির কারনে তাদের হাত কাটা হলে তাতে তাদের আত্নীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। তবে রক্তসম্পর্কীয় অমুহরাম আত্নীয়-স্বজনরা (যেমন-চাচাতো ভাইবোন, ফুফাতো ভাইবোন, মামাতো ভাইবোন প্রভৃতি) একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। কেননা তাদের সচরাচর একে অপরের কাছে বিনা অনুমতি প্রবেশ করার রেওয়াজ ও বিধান নেই। রক্তসম্পর্কীয় নয় এমন মুহরাম আত্নীয়স্বজন (যেমন-দুধ মা ও বোন) একে অপরের মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে কিনা তা নিয়ে হানাফীগণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখের মতে, হাত কাটতে হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে দুধ মা থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।[৫৯]স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মাল চুরি করলে ও হদ্দ কার্যকর হবে না, যদি তারা এক সাথে থাকে। যদি তারা এক সাথে কিংবা একসাথে ও তারা নিজেদের মাল যদি একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের একান্ত হিফাযতে রাখে, তাহলেও অধিকাংশ ইমামের মতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে কারো কারো মতে, এমতাবস্থায় কার্যকর করতে হবে। এটা মালিকী স্কুলের ইমামগণের অভিমত এবং শাফি'ঈগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত।[৬০]

৭. চোর যদি চুরিকৃত মালের অংশীদার হয় এবং তার নিজের অংশ বাদ দেবার পর চুরিকৃত অবশিষ্ট মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তা হলেও অপরাধীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। হ্নাফী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, চোর চুরিকৃত মালের অংশীদার হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৬১] তবে মালিকীগণের মতে, দুটি শর্তে তার হাত কাটা যাবে না। আর শর্ত দুটি হল : ক. চুরিকৃত মালটি যদি তার অপর অংশীদার থেকে চুরি করে। যদি মাল অংশীদার ছাড়া বাইরের কারো দায়িত্বে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তা হলে হাত কাটতে হবে। খ. তার অংশটি তার শরীকদারের অংশের চাইতে বেশি হতে হবে।[৬২] ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার মাল থেকে চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল থেকে প্রাপ্তব্য পরিমাণ বাদ দেয়ার পর 'নিসাব' পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। হানাফী ইমামগণের মতে চুরিকৃত মাল যদি তার পাওনার আন্দাজ মত টাকাকড়ি হয়, তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা ঋণগ্রহীতা থেকে টাকাকড়ি গ্রহণের অধিকার তো তার রয়েছে। তবে চুরিকৃত মাল যদি টাকাকড়ি না হয়ে আসবাব পত্র হয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করতে হবে। যেহেতু আসবাবপত্রের মূল্যের মধ্যে তফাৎ হয়ে থাকে, তাই বিনিময় নেয়ার ক্ষেত্রে দুজনেরই পারস্পরিক সম্মতি থাকা আবশ্যক। তবে সে যদি দাবী করে যে, সে তা বন্ধক হিসেবে তার পাওনার আন্দাজ মত নিয়েছে, তাহলে হাত কাটা যাবে না।[৬৩]

৫৯. আল-হাদ্দাসী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৬৭; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুর মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৯৭; ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১৬৩

৬০. আবু বকরআল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.১৬৮; ইমাম মালিক ইবনু আনাছ (রা.), *আল-মুদাওয়ানাহ*, খ.৪, পৃ . ৫৩৫

৬১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর) , খ.৭, পৃ.৪৪৫; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ.৪, পৃ.১৪০-১

৬২. মুহাম্মদ আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল* (দারুল ফিকর), খ. ৮, পৃ. ৯৭

৬৩. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৭৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

যদি কোন বায়তুল মাল বা গনীমতের মাল থেকে চুরি করে, তবে তার ওপরও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তাঁদের বক্তব্য হল- যেহেতু বায়তুল মালে প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার রয়েছে, তাই বায়তুল মাল থেকে কেউ কিছু চুরি করলে হদ্দযোগ্য হবে না। তবে মালিকীগণের মতে, সে হদ্দযোগ্য হবে।[৬৪] অনুরূপভাবে ওয়াক্‌ফকৃত মাল থেকে যদি কেউ চুরি করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা তা যদি সর্বসাধারণ্যের জন্য ওয়াকফকৃত হয়, তাহলে তার হুকম বায়তুল মালের মত্যেই । আর যদি তা বিশেষ কোন কাওমের জন্য ও ওয়াকফকৃত হয়, চাই চোর ওয়াকফকৃত কাওমের মধ্যে শামিল থাকুক আর না থাকুক, তাহলে ও হদ্দ কার্যকর হবে না। কেননা কার সুনির্দিষ্ট কোন মালিক নেই। এটা শাফি‘ঈগণেরও অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে, ওয়াক্‌যকৃত মাল চুরি করলে যে কোন অবস্থায় চোরের হাত কাটতে হবে।[৬৫]

৮. অধিকাংশ ইমামের নিকট চুরি প্রমাণিত হলে চোরের হাত কাটা হবে, চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।[৬৬] পক্ষান্তরে শাফি’ঈগণের মতে চুরিকর্মের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে চোরের জ্ঞান থাকতে হবে। সুতারাং তাঁদের মতে, যার চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান নেই- এ ধরনের কেউ চুরি করলে তার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। হযরত ‘উমার (রা.) ও ‘উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, “হদ্দের শাস্তি বর্তাবে না তবে যারা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত কেবল তাদের ওপর।” তবে কেউ যদি জানে যে চুরি নিষিদ্ধ, তা হলে এর নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকলে ও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞান না থাকা হদ্দ রহিতকরণের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।[৬৭]

আর চুরির দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হল চুরিকৃত মালের মালিক বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি চুরিকৃত মাল কারো মালিকানাধীন না হয় (যেমন তা যদি সকলের ব্যবহার জন্য উন্মুক্ত হয় কিংবা পরিত্যক্ত হয়), তা হলে এ রূপ মাল হস্তগত করার কারণে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণের জন্য ইমামগণ মালের মালিকের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তগুলো হল-

১. চুরির হদ্দ কার্যকর করার জন্য চুরিকৃত মালের মালিক জানা থাকতে হবে। যদি চুরি প্রমাণিত হল; কিন্তু মালিক কে তা জানা যাচ্ছে না বা তার কোন সন্ধান নেই, এরূপ অবস্থায় হদ্দ কার্যকর হবে না। কেননা হদ্দ কার্যকর করতে হলে মালিক বা হকদারের পক্ষ থেকে দাবী থাকা চাই। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু মালিকের কোন খবরই নেই, তাই চুরিকৃত মালের জন্য কোন দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে চোরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা যাবে, যে যাবত না মালিক উপস্থিত হয়ে দাবী পেশ করবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে, চুরি প্রমাণিত হলেই হদ্দ কার্যকর করতে হবে। চাই মালিক জানা থাক বা না থাক। তাঁদের দৃষ্টিতে হদ্দ কার্যকর করার জন্য মালিকের দাবী থাকা শর্ত নয়।[৬৮]

---

৬৪. মুস্তফা রুহায়বানী, *মাতালিবু উলিন নুহা* (আল-মাকতাবুল ইসলামী), খ. ৬, পৃ. ২৪৩; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৭; আল-হাদ্দসী, *আল-জাওহারাহ...*, খ.২, পৃ.১৬৮

৬৫. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা’ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬০-১

৬৬. *আল-মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৯৭; ইয়াহইয়াউন নববী, *আল-মাজমূ*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৩৬২

৬৭. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ রামালী, *নিহায়তুল মুহতাজ*,প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৪৬২; ইবনু হাজর আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.১৫০

৬৮. আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *বদা‘ইয়ুস সনা‘ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৭; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩১;

Dhaka University Institutional Repository

২. যার থেকে মাল চুরি করা হয়েছে তাকে চুরিকৃত মালের যথাযথ মালিক অথবা যে কোন রীতিসিদ্ধ উপায়ে[৬৯] মালের বৈধ অধিকারী হতে হবে। যদি কেউ কোন অপহরণকারীর অপহৃত বস্তু কিংবা অন্য চোরের বস্তু চুরি করে, তাহলে তার ওপর ও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে এ বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ইমামগণের মতে অপহরণকারী থেকে কেউ তার অপহৃত বস্তু চুরি করলে, তবেই হদ্দ কার্যকর হবে। কিন্তু অন্য চোরের চুরিকৃত বস্তু চুরিতে দ্বিতীয় চোরের ওপর হদ্দ বর্তাবে না। তাঁদের বক্তব্য হল, অপহরণকারীকে যেহেতু অপহৃত মাল কিংবা তার মূল্য মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই অপহরণকারীকে ক্ষেত্রে মালের ওপর তার হস্তগতকরণকে একজন জামিনের হস্তগতকরণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর জামিন হিসেবে মালের হস্তগতকরণ একটি রীতিসিদ্ধ ব্যাপারে। পক্ষান্তরে চোর যেহেতু চুরিকৃত মালের আমানতদারও নয়, জামিন ও নয়, তাই চুরিকৃত মালের ওপর তার কোনরূপ হস্ত গতকরণের ন্যায্য অধিকার আছে বলে ধর্তব্য হবে না। মালিকীগণের মতে, অপহরণকারী থেকে চুরি করুক কিংবা অন্য চোর থেকে চুরি করুক, উভয় অবস্থায় চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা সে সুরক্ষিত স্থান থেকে মাল হস্তহত করেছে। উপরন্তু, চুরি কিংবা অপহরণের পরও মালের ওপর মালিকের মালিকের স্বত্ব বহাল থাকে। প্রথম চোর কিংবা অপহরণকারী কর্তৃক উক্ত মাল অবৈধ উপায়ে হস্তগতকরণের ফলে তার মালিকানা স্বত্বের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। হাম্বলীগণের মতে এ দু'অবস্থার কোন অবস্থাতেই হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাঁদের মতে মালিক কিংবা প্রকৃত হকদারের নিকট থেকে কোন মাল চুরি হলেই তাই যথার্থ চুরি হিসেবে ধর্তব্য হবে। যদি অন্য কারো থেকে কোন মাল সে নেয়, তা হলে মনে হবে করা যে, সে যেন কারো কোন হারানো মাল পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে।[৭০]

৩. মালের মালিক মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম হলে তবেই চোরের হাত কাটা হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করল-এমনতাবস্তায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিক তার মাল চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবের ইমামগণের মতে, হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে তা'যীবের আওতায় সাধারন শাস্তি দেয়া হবে। আর মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের মতে, হদ্দ প্রযোজ্য হবে।[৭১]

চুরির তৃতীয় মৌলিক উপাদান হল চুরিকৃত মাল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা যাবে। শর্তগুলো হল-

১. চুরিকৃত বস্তু 'মাল' হওয়া কার্যকর হবে না। তবে তার সাথে যদি নিসাব পরিমান বা তার অধিক মূল্যের দামী কাপড়-চোপড় বা অলঙ্কার হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবের ইমামগণের মতে, চুরিকৃত জিনিস যদি মাল না হয় (যেমন মানব, শিশু), তাহলে চুরির হদ্দ থাকে, তাহলেও অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে হাত কাটা হবে না। তাঁদের বক্তব্য হল, এ ক্ষেত্রে কাপড়-চোপড় বা অলঙ্কার শিশুর অনুকর্তী হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে ইমাম

---

৬৯. যেমন আমানত, মুদারবাহ, কিফালাহ, ওয়াকলাহ, জামানত, ইরতিহান, ইজারা ও এ'আরা প্রভৃতি।

৭০. শামসুদ্দীন আল-মাকসিদী ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৩৪; আহমদ আস্-সাভী, *বুলগাতুস সালিক লি আকরাবিল মাসালিক*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৪৬৯

৭১. ইবনু 'আবেদীন, *রাদ্দুস মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৩; আবু বকর আল-হাদ্দাসী, *আল-জাওহারাতুলন নাইরিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৩; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে চোরের হাত কাটা হবে। তাঁর কথা হল : শিশু ছাড়াও যদি কেউ নিসাব পরিমাণ বস্তু চুরি করে, তাতে হদ্দ প্রযোজ্য হয়। তা হলে কেউ শিশুসহ নিসাব পরিমাণ বস্তু চুরি করলে তাতে তো আরো অধিক কঠোরভাবে হদ্দ প্রযোজ্য হবার কথা।[৭২] ইমাম মালিকের (রহ.) মতে, যদি কোন ঘরে সংরক্ষিত অবস্থা থেকে কোন শিশু চুরি করা হয়, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। তাঁর দলীল হল- বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে জনৈক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যে শিশুদের চুরি করে নিয়ে অন্য জায়গা বিক্রি করে দিত। রাসূলুল্লাহ (স.) তার হাত কাটতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৩] অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, পবিত্র কুরআন বা অন্য কোন ধর্মীয় বই-পুস্তক যদিও তার গাত্রে নিসাব পরিমাণ মূল্যের সাজসরঞ্জাম থাকে-চুরি করলে চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা পবিত্র কুরআন কিংবা ধর্মীয় বই-পুস্তক হস্তগতকারী এরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে যে, সে তা পড়ার জন্য নিয়েছে। তবে মালিকী ও শাফি'ঈগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, যেহেতু লোকেরা সচরাচর কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় বই-পুস্তককে উৎকৃষ্ট মাল হিসেবে গণ্য করে, তাই কেউ এগুলো চুরি করলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে, যদি ঐগুলোর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়।[৭৪]

২. বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকার অর্থ হল তা এমন হওয়া যা কেউ নষ্ট করলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অতএব শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব বস্তুর কোন মূল্য নেই (যেমন- শূকর, মাদকদ্রব্য, মৃতপ্রাণী, বাদ্যযন্ত্র, অশ্লীল বই-পুস্তক, ক্রস চিহ্ন ও মূর্তি তা কেউ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের মতে ক্রসের চুরিতে হাত কাটা হবে না, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণ ও হয়। তবে মালিকীগণ এবং হানাফী ইমামগনের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, যদি ক্রসের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা যদি কারো হিফাযতে থাকে, তা চুরি করলে এবং পাত্রের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হাত কাটা হবে। শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, ক্রস, মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র ও মদের পাত্র প্রভৃতি বস্তু ভেঙ্গে ফেলার পর মূল্য যদি নিসাব পরিমানে পৌঁছে, তা হলে হাত কাটা হবে।[৭৫]

৩. তুচ্ছ বস্তু বলতে এমন মালকে বোঝানো হয় যা সচরাচর লোকেরা গুরুত্বের সাথে হিফাযত করে না (যেমন-মাটি, ঘাস, ভুষি, বাঁশ ও লাকড়ি প্রভৃতি)। এ ধরনের কোন মাল চুরি করা হলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে শিল্পজাত করে যদি এ সব মালকে দামী সামগ্রীতে পরিণত করা হয়, তবেই হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে মাল তুচ্ছ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ যে ধরনেরই হোক না কেন, তা যদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং নিসাব পরিমাণ হয়, তা চুরি করা হলে হাত কাটা হবে। কেননা যা বেচাকেনা করা বৈধ এবং যা নষ্ট করা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তা চুরি করা হলে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে।[৭৬]

---

৭২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯-৭০; ইবনু হাজর আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১৪৭-৮;; ইব্‌নু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.৬৩৮

৭৩. সুলাইমান আল- বাজী, *আল-মুন্তকা শারহুল মুয়াত্তা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮০; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩৮

৭৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ৯, পৃ. ১৫২; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪০

৭৫. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৮; ইব্‌নু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.১২৬; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, ক. ৪, পৃ. ৫৩০

৭৬. আদ-দাসূকী, *আলহাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ২৩৪; সাভী; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪৩, ১৫৩, ১৮০;

Dhaka University Institutional Repository

৪. চুরিকৃত মাল যদি অসংরক্ষণযোগ্য দ্রুত পচনশীল দ্রব্য হয়, তা হলেও হদ্দ কার্যকর হবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। তবে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, দ্রুত পচনশীল দ্রব্যও যদি নিসাব পরিমাণে চুরি করা হয়, তাতেও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে গাছে ঝুলন্ত ফল চুরির জন্যও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। এমন কি যদিও হিফাযত করার উদ্দেশ্যে তাকে মাচায় বেঁধে রাখা হোক কিংবা ঘেরা দেয়া হোক। কেননা ফল যে যাবত গাছে থাকে, ততক্ষণ নষ্ট হবার আশঙ্কা লেগেই থাকে। তবে আড়তে সংরক্ষিত ফল চুরি করা হলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে, যদি তা ভালভাবে শুকিয়ে যায়। কেননা এমাতবস্থায় তা সংরক্ষণের উপযোগিতা লাভ করেছে এবং তা সহজেই নষ্ট হবে না। যদি তা ভালভাবে না শুকায়, তাহলে যেহেতু এমতাবস্থায় তা সংরক্ষণ করে রাখার পূর্ণ উপযোগিতা অর্জন করেনি, তাই তা চুরি করা হলেও হাত কাটা যাবে না।[৭৭]

৫. চুরিকৃত মাল যদি এমন কোন বস্তু হয় যা ব্যবহার করা সকলের জন্য সাধারণভাবে বৈধ (যেমন- পানি, আগুন বা ঘাস প্রভৃতি), তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না। এমন কি তা যদি কারো অধীনে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি করে, তাহলেও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) এম মতে, এ ধরনের মাল যদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং মূল্যবান হয়, তাহলে চুরির জন্য হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমানে পৌঁছে।[৭৮]

৬. হস্তগততকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত অর্থাৎ মালিকানাভুক্ত কিংবা আমানত বা দায়িত্বধীন থাকতে হবে। দখলবিহীন বা মালিকানাহীন কোন মাল কেউ হস্তগত করলে তার এ কাজ চুরি বলে গণ্য হবে না। কারণ এতে কারো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই।[৭৯]

৭. করায়ত্তকৃত মাল সযত্নে বা পাহারা বা কারো তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। অযত্নে কিংবা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মাল কেউ হস্তগত করলে তাকে চুরির শাস্তি প্রদান করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- "প্রাচীরের বাইরে ঝুলন্ত ফল কিংবা রাতের বেলা পাহাড় থেকে ধরে নেয়া কোন মেষের জন্য হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে মেষ খোঁয়াড়ে আবদ্ধ থাকলে এবং ফল শুকাবার খোলায় বা গোলায় থাকাবস্থায় হস্তগত করলে হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য একটি বর্মের সমান হয়।"[৮০] উল্লেখ্য যে, সংরক্ষণ দুভাবে হতে পারে। ক. কোন নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা ও খ. সংরক্ষণকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করা। স্থানের সংরক্ষণ হল- সম্পদ এমন স্থানে সংরক্ষণ করা, যা সম্পদের হিফাযতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মালিকের নির্দেশ ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা নিষেধ। যেমন- গুদাম, দোকান, ঘর, তাবু, পশুর আস্তাবল, গোশালা ইত্যাদি। তাতে হিফাযতকারী থাকা জরুরী নয়। চাই ঘরের দরজা খোলা থাকুক কিংবা বন্ধ। ময়দানে হোক কিংবা জনপদে। সংরক্ষণকারী কর্তৃক সংরক্ষণ এমন স্থানে হয়ে থাকে, যে স্থান কোন কিছু সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়নি এবং সবসাধারণ সেখানে অবাধে প্রবেশ করতে পারে। যেমন- মসজিদ, সাধারণ জনপথ, খোলা ময়দান

---

৭৭. দাসূকী, *আলহাশিয়াতু 'আলাশ শারহিল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৪; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩১

৭৮. ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১২৪; ; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাভ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৫৬ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৫৩, ১৮১

৭৯. রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত,খ. ৭, পৃ. ৪৪৩; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৫৪

৮০. لا قطع في تمر معلق- ولا في حريسة جبل- فاذا اوله المراح والجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن- ইমাম মালিক, *আল-মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা. নং. ১৫১৭ বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (কিতাবুল হুদূদ), হা. নং. ১৭০০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি স্থান।এ সব স্থানে সংরক্ষণের অর্থ হল মালের পার্শ্বে ব্যক্তি এমনভাবে বিদ্যমান থাকবে, যেখান থেকে সে তার মাল দেখতে পায়। চাই সে ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায় থাকুক আর সম্পদ তার শরীর কিংবা মাথার নিচে কিংবা পার্শ্বে থাকুক। মালটি চাই তার পরিধেয় বস্ত্র হোক কিংবা নগদ অর্থ হোক বা অন্য কোন বস্তু। অতএব কারো পকেট থেকে কিংবা কারো কাপড় কেটে গোপনভাবে টাকা-পয়সা কিংবা কোন মূল্যবান বস্তু নিয়ে যাওয়া হলে এবং তার মূল্য যদি চুরির নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তা চুরি ধর্তব্য হবে।[৮১]মেহমান যদি মেজবানের বাড়ি থেকে কোন মাল চুরি করে তা হলে চুরির শাস্তি কার্যকর হবে না। কেননা মেহমানের ঘরে প্রবেশের অনুমতি থাকার কারণে চুরির ধারণায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে কোন চাকর বা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি তার মনিবের বা নিয়োগকর্তার মাল নিরাপদে সংরক্ষিথত স্থান থেকে চুরি করে, যেখানে তাকে প্রবেশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা তার এ অশুভ আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়; চুরি নয়। আর শরী'য়াতে বিশ্বাঘাতকের শাস্তি হাত কর্তন নয়। এ জন্য তাকে তা'যীরের আওতায় অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে।৮২ অনুরূপভাবে দোকানে যে সময় সর্বসাধরণের প্রবেশের অনুমতি থাকে তখন কেউ দোকানে ঢুকে চুরি করলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে যে সময় সর্বসাধারণের প্রবেশানুমতি নেই, সে সময় ঢুকে চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।৮৩

কোন ব্যক্তি চারণভূমি থেকে পশু চুরি করলে তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; বরং সে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। চারণভূমিতে রাখাল থাকুক বা না থাকুক, তাতে হুকুমে কোন পার্থক্য হবে না। এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, রাখালের দৃষ্টিসীমাতে অবস্থিত চারণভূমি থেকে বিচারণরত পশু চুরি করা হলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা হবে।৮৪

কোন ব্যক্তি কবর থেকে কাফন চুরি করলে তাকেও চুরির শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা সংরক্ষিত মাল চুরি না করলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। কাফন নিরাপদে হিফাযতে রাখা মাল নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) প্রমুখের মত। মালিকী ও হাম্বলী এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) প্রমুখ ইমামগণের মতে, কাফন চোরদের হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়।৮৫

৮. চুরিকৃত মাল সম্পূর্ণরূপে চোরের দখলে যেতে হবে। চোর কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান থেকে মাল সরিয়ে নিলে হবে না, সম্পূর্ণরূপে তার দখলভুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তা চুরি বলে গণ্য হবে না।৮৬

৯. চুরিকৃত মালের নিসাব পরিমাণ মূল্য হতে হবে। অন্যথায় হদ্দ কার্যকর হবে না; তবে তা'যীরের আওতায়

---

৮১. যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮-৯

৮২. ইবনুল-হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৭; ইমাম মালিক *আল-মুদাওয়ানাহ,* , প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩২

৮৩. ইবনুল-হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৭

৮৪. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৭-৮; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০

৮৫. আল-বহুতী, *দকা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪; রুহায়বানী, *মাতলিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৯

৮৬. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯৮ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৯, ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি কার্যকর করা হবে।

১০. করায়ত্তকৃত মাল স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। এটা চুরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ চুরির অর্থ হল অন্যের সম্পদ সরিয়ে নিজের দখলে নিয়ে যাওয়া। এটা কেবল স্থানান্তরযোগ্য মালের বেলায় সম্ভব। যে সব মাল এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নেওয়া যায় না, তা চুরি করা যেতে পারে না।[৮৭]

চুরির চতুর্থ হল গোপনে মাল হস্তগত করা অর্থাৎ মালিকের সম্মতি বা অবগতি ছাড়া কিংবা তার অনুপস্থিতিতে অথবা নিদ্রিতাবস্থায়তার তার দখলভূক্ত কোন মাল হস্তগত করে নেয়া। এ ক্ষেত্রে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হতে হবে।[৮৮]সম্পূর্ণরূপে হস্তগতকরণ বোঝাতে নিম্নের তিনটি শর্থ পূর্ণ হতে হবে। ১. চোর চুরিকৃত বস্তুনিরাপদ সংরক্ষিত স্থান হতে বের করে আনতে হবে। অধিকাংশ হানাফীর মতে, হদ্দযোগ্য চুরির জন্য চোরের সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করতে হবে, যদি সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব হয় যেমন-ঘরও দোকান। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কারো সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ না করেই গোপনে কারো মাল হস্তগত করে তা চুরি বলে ধর্তব্য হবে না। এ অবস্থায় হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাঁদের দলীল হল হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -"চোর যদি বিচক্ষণ হয়, তা হলে তার হাত কাটা যাবে না।" এ কথা বলার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, তা কি করে হয়? তিনি উত্তর দিলেন - চোর ঘরে সিদ কাটবে; কিন্তু তাতে প্রবেশ না করেই আসবাবপত্র বের করে নিয়ে আসবে।"[৮৯] ২. চুরিকৃত মাল মালিকের দখলভূক্ত হতে হবে। ৩. তা সম্পূর্ণরূপে চোরের দখলে আসতে হবে। এ তিনটি শর্তের কোন একটি পূর্ণ না হলে হস্তগতকরণ পূর্ণাঙ্গ বলে পরিগণিত হবে না এবং সে ক্ষেত্রে চুরিরর হদ্দও প্রযোজ্য হবে না। হস্তগত হবার ব্যাপারটি যদি অপূর্ণ থাকে[৯০] তাহলে চুরি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না; বরং চুরি শুরু হয়েছে বলে ধরা হবে। এ অবস্থায় হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। এর প্রমাণ হল- হযরত 'আমর ইবন শু'আয়ব (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক চোর মুত্তালিব ইবন আবি ওয়াদা'আর গুদামে সিদ কেটে ঢুকে মাল জমা করল; কিন্তু মাল বের করে নেয়ার আগেই ধরা পড়ে গেল। তাকে লোকেরা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) এর নিকট নিয়ে আসল। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। ইত্যবসরে ঘটনাটি জানতে পেরে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) এর বললেন, হ্যাঁ। তখন আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বললেন, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হল কেন? তিনি উত্তর দিলেন, রাগের বশে। এরপর আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বললেন, তার হাত কাটা যাবে না, যে যাবত না সে ঘর থেকে মাল বের করে

---

৮৭. ; Siddiqi, Mohammad Iqbal, *Penal of Islam* (New Delhi, 1988), p. 38; বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (সংকলন), (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), খ. ১, পৃ. ৩২১

৮৮. আল-কাসানী, *বদা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৫-৬; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৯, ১৪৭-৮

৮৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪৭-৮ তবে অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে, সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করেই মাল হস্তগত করতে হবে-তা চুরির জন্য শর্ত নয়। যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে হাত কিংবা কোন কিছুর সাহায্যে মাল বের করে নিয়ে আসে তা চুরি হবার জন্য যথেষ্ট। (ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯৮-১০৩; ইমাম মালিক, *মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩) বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি তার বাঁকানো লাঠির সাহায্যে হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করত। তাকে বলা হল- তুমি কী হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করছ? সে বলল, আমি তো না; লাঠিই চুরি করছে। রাসূলুল্লাহ (স.) তার খবর জানতে পেরে বলেছেন -يجر قصبه في النار "আমি তাকে জাহান্নামে তার নাড়িভূড়ি টানতে দেখেছি।" (মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল- মুসলিম*, (কিতাবুল কসূফ), হা. নং : ৯০৪

৯০. যেমন-কেউ তালা ভেঙ্গে বা খুলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল কিংবা দরজা বা জানালা ভাঙ্গল অথবা ছাঁদে বা দেয়ালে সিদ কাটল কিংবা কারো পকেটে হাত ঢুকাল; কিন্তু কোন কিছু হস্তগত করার আগেই মালিকের গতিবিধি আঁচ করতে পেরে পালিয়ে গেল অথবা ধরা পড়ল।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আসে। আপনার কি অভিমত, যদি আপনি কোন পুরুষকে কোন মহিলার দুপায়ের মাঝখানে দেখতে পান; কিন্তু সে আদৌ যৌনসঙ্গম করেনি, এমতাবস্থায় তার ওপর কি আপনি হদ্দ প্রয়োগ করবেন? তিনি বললেন, না।[৯১] কেউ জোরপূর্বক কিংবা প্রকাশ্যে দ্রুতবেগে কারো থেকে কোন বস্তু ছিনিয়ে নিলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে কারো কোন মাল নিয়ে নিলে তাও চুরি বলে ধর্তব্য হবে না।[৯২]এর জন্য হাত কাটার পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "কোন বিশ্বাঘাতক, জোরপূর্বক অপহরণকারী ও প্রকাশ্যে ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না।"[৯৩] যদি একসাথে একাধিক ব্যক্তি চুরি করতে যায় এবং তাদের মধ্যে কেউ সরাসরি চুরিকর্মে অংশগ্রহণ করে (যেমন- ঘরের সিদ কেটে মাল নিজের করায়ত্তে নিয়ো আস প্রভৃতি) আর কেউ চুরিকর্মে সহায়তা করে (যেমন চুরিকৃত মালের স্থান দেখিয়ে দেয়া, মালিকের সাহায্যে এগিয়ে আসা লোকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বাইরে দাঁড়ানো, ভেতর থেকে বেরকৃত মাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলা প্রভৃতি), তাহলে সরাসরি চুরিকর্মে অংশগ্রহণকারীদের জন্য হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে এবং সাহায্যকারীদেরকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[৯৪]

এ চুরির শাস্তি অবস্থার পেক্ষাপটে ও বিভিন্ন কারণে রহিত হয়ে যায়। তম্মধ্যে কিছু বিষয় চোরের সাথে যেমন তাওবা, আর কিছু বিষয় চুরিকৃত বস্তুর মালিকের সাথে যেমন- ক্ষমা, সুপারিশ আর কিছু বিষয় চুরিকৃত মালের সাথে যেমন চুরিকৃত বস্তুতে চোরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কখনো কখনো আদালতে নালিশ পেশ করতে দেরী হয়ে গেলেও তামাদি দোষে শাস্তি রহিত হয়ে যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে চোরের শাস্তি রহিত হয়ে যায়-

ক. সুপারিশ মত আদালতে চুরির দাবী উত্থাপিত হওয়ার আগে চোরকে ক্ষমা করে দিতে অসুবিধা নেই। তদুপরি তা উত্তম হবে, যদি সে কুখ্যাত ও পেশাদার চোর না হয়। তবে আদালতে নালিশ দায়েরের পর তাকে ক্ষমা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর এক অপরকে হদ্দ ক্ষমা করে দাও। তবে যে মাত্র আমার কাছে হদ্দের নালিশ আসবে, তখন হদ্দের কার্যকারিতা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে।"[৯৫]

খ. মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন এবং তাওবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে আদালতে চুরির দাবী উত্থাপিত হওয়ার আগে চোরের জন্য সুপারিশ করা জাযিয়, যদি সে কুখ্যাত ও পেশাদার চোর না হয়। তবে আদালতে নালিশ দায়েরের পর তার জন্য সুপারিশ করা হারাম। বর্ণিত রয়েছে, হযরত উসামা (রা.) যখন মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চোরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি রাগত স্বরে বলেছিলেন, "তুমি কি আল্লাহর একটি হদ্দের প্রসঙ্গে আমাকে সুপারিশ করছ?"[৯৬] এ হাদীস থেকে

৯১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩২৯

৯২. যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৭; *আল-গুরারুল বহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, খ. ৮৯-৯০ বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ*, খ.৫, পৃ.৩৮৯-৯০

৯৩. ليس على خائن و لا منتهب ولا مختلس قطع- (মুহাম্মদ ইবনু ঈশা, *সুনান আত-তিরমিযী* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৪৪৮)

৯৪. ইব্‌নুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৯-৯০; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৬৭-৬৯;

৯৫. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من فقد وجب- ইবনু 'আবদিল বারর, *আত-তামহীদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২২৪

৮৬. انشفع في حد من حدود الله؟ (মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৩৮৬, ৪৩৮৭; মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আম্বিয়া), হা.নং. ৩২৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, বিচারকের নিকট দাবী উত্থাপিত হবার পর হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়িয নয়। তবে বিচারকের নিকট দাবী উত্থাপিত হবার আগে হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করতে কোন অসুবিধা নেই।[৯৭] বর্ণিত আছে, একবার হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে একজন চোরকে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত যুবায়র (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু লোকটি বললেনঃ না, আমি তাকে খলীফার কাছে নিয়ে যাব। তখন হযরত যুবায়র (রা) বললেন : "যদি খলীফার কাছে বিষয়টি পৌঁছে যায়, তা হলে সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকারী দুজনের ওপরই আল্লাহর লানত হবে।"[৯৮]

গ. চোরের স্বীকারোক্তি মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হবার পর হাত কাটার আগে সে যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ এমতাবস্থায় অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে কারো কারো মতে, চোর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং হদ্দও রহিত হবে না। যেমন কারো প্রাপ্যের কথা স্বীকার করার পর যদি কেউ তার কথা থেকে ফিরে আসে তা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি চুরির ক্ষেত্রেও স্বীকারোক্তি করার পর তা প্রত্যাহার করে নিলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।[৯৯]

ঘ. চোর যদি তাওবাহ করে চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করে, তা হলেও হদ্দ রহিত হবে না। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত।[১০০]বর্ণিত আছে, হযরত 'আমর ইবনু সামূরা (রা.) উষ্ট্র চুরির ঘটনায় তাওবা করে পবিত্র হবার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আসলে তিনি তার হাত কেটে দেন।[১০২]এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলেও হদ্দ রহিত হবে না। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলী মতাবলম্বী কারো কারো মতে, চোর যদি তাওবাহ করে চুরিকৃত মাল মালিকে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করে, তা হলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১০৩]

ঙ. হদ্দের শাস্তিযোগ্য নয় (যেমন- অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল) এমন লোকদের সাথে মিলে কেউ চুরি করলে কারো জন্য হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা এখানে চুরিকর্ম হল একটিই। অতএব একটি অপরাধে জড়িত বিভিন্নজনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শাস্তি দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এটা অধিকাংশ হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে এ রূপ অবস্থায় হদ্দযোগ্য লোকদের হদ্দ রহিত হবে না। তবে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগলরা নিজেরাই চুরির মাল বের করে নিয়ে আসে এবং অন্যান্য লোকেরা কেবল বাইরে অবস্থান করে তাদের সহযোগিতা করে, তাহলেই তারা হদ্দযোগ্য হবে না। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে চুরিতে শরীক হদ্দযোগ্য লোকদের জন্য হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে।[১০৪]

৯৭. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৩৬

৯৮. اذا بلغ الامام فلعن الله الشافع والمشفع- আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৩

৯৯. আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪১

১০০. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪; আস-সাভী, *বুলগাতুস সালিক*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯

১০২. ইবনু মাজাহ, *আস- সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা. নংঃ২৫৮৮

১০৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩৪৩; আল-বাহুতী, *কাশফুল কিনা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫৩-১৫৪;

১০৪. ইমাম মালিক ইবনু আনাছ , *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৬.	হদ্দের রায় ঘোষণা দেবার আগেই যদি যে কোন উপায়ে চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যায় (যেমন- চোর চুরিকৃত বস্তুটি মালিক থেকে কিনে নিল কিংবা মালিক বস্তুটি তাকে দান করে দিল), তা হলেও চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা চুরির রায় দেবার আগে চোরের চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যাওয়া দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে চুরির ব্যাপারে কারো কোন আর্জিই নেই। তবে মালিকীগণের মতে এ রূপ অবস্থায় হদ্দ রহিত হবে না। তবে রায় ঘোষণা পর এবং হাত কাটার আগে যদি চোর কোনভাবে চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যায়, তা হলে অধিকাংশদের মতে হদ্দ রহিত হবে না। তবে কতিপয় হানাফী মতাবলম্বীর মতে, এ রূপ অবস্থায়ও হদ্দ রহিত হবে।[১০৫]

৭.	চুরির রায় দেবার পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তামাদি দোষে বারিত হয়ে হাত কাটার বিধান রহিত হয়ে যাবে। এটাই অধিকাংশ হানাফী ইমামের অভিমত। তবে অন্যান্য সকল ইমামের মতে, চুরির রায় দেবার পর যত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হোক না কেন হাত কাটার বিধান রহিত হবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় হদ্দ রহিত হয়ে গেলে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ করার পর পালিয়ে হদ্দ থেকে রেহাই পাবার প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে।[১০৬]

৮.	প্রথমবার চুরিতে চোরের ডান হাত কাটতে হবে, এটাই হল ইসলামী শাস্তি আইনের বিধান। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, চুরি করার আগে ডান হাত দুর্ঘটনায় পড়ে বা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি (যেমন কিসাস) হিসেবে কেটে ফেলা হয়েছে, তা হলে চুরির শাস্তি (যেমন কিসাস) হিসেবে কেটে ফেলা হয়েছে, তা হলে চুরির শাস্তি হিসেবে তার বাম পা কাটতে হবে। যদি তা চুরি করার পরে কেটে ফেলা হয়, তা হলে হাত কর্তনের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, চাই এ হাতকর্তন চুরির পরে বিচারকের কাছে আর্জি পেশ করার আগে হোক কিংবা পরে, চুরির রায় ঘোষণা দেবার আগে হোক বা পরে, চাই তার হাত কোন বিপদে কাটা যাক কিংবা কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে কাটা যাক- সর্বাবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা প্রথমবার চুরিতে কর্তনের নির্দেশ চোরের ডান হাতের সাথে জড়িত। অতএব, চুরির পর যেহেতু তা ধ্বংসই হয়ে গেল, তাই কর্তনের বিধানটিও রহিত হয়ে যাবে। এটি হল অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মতে আর্জি পেশ করার পরে রায় দেবার পরেই যদি তার ডান হাত কেটে ফেলা হয়, তবেই চুরির শাস্তি হিসেবে হাত র্কতনের বিধান রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে চুরির আগে কিংবা চুরির পরে মালিকের আর্জি পেশ করার আগেই যদি ডান হাত কেটে ফেলা হয়, তা হলে ডান হাতের পরিবর্তে বাম পা কাটতে হবে।

অনুরূপভাবে যদি দেখা যায় যে, তার ডান হাত সুস্থ আছে; কিন্তু বাম হাত বেকার কিংবা কর্তিত, তাহলে তার ডান হাত কর্তন করা যাবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় তার ডান হাত কাটা হলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় তার ডান হাত কাটতে হবে। অনুরূপভাবে পায়ের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, তার বাম পা সুস্থ আছে; কিন্তু ডান পা বেকার কিংবা কর্তিত, তাহলে তার বাম পা কর্তন করা যাবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় তার বাম পা কাটা হলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় তার বাম পা কাটতে হবে।[১০৭]

১০৫.	আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৯, ১৮৬; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৩

১০৬.	আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১৮৩

১০৭.	মুহাম্মদ ইদ্রিস শাফি'ঈ, *কিতাব আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪২-৩; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৫৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তির বিধান :

ধন-সম্পদের নিরাপত্তা লাভ ব্যক্তি জীবনের উন্নতির প্রধান চাবিকাঠি। তদুপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্যও এটি মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যের সম্পদের ওপর যে কোন ধরনের সীমালঙ্ঘনকে ইসলাম চরমভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারো অগোচরে তার সম্পদ হরণ করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি শক্তি প্রদর্শন করে দাপটের সাথে কারো সম্পদ লুট করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চুরিতে মানুষের জান ও ইজ্জত-আব্রুর ওপর আক্রমণ করা হয় না; কিন্তু ডাকাতির সময় মানুষের জান ও ইজ্জত আব্রু দুইয়ের ওপরেই নগ্ন হামলা করা হয়। তাই এর শাস্তিও স্বাভাবিকভাবে কঠোর হওয়া চাই। তাই ইসলামও এ অপরাধের জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তি বিধান দিয়েছে। তদুপরি এ ধরনের অপরাধীকে পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধকারী' ও 'যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ' রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীসে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমার উম্মাতের অর্ন্তভুক্ত নয়।"[১০৮]সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে আরবীতে হিরাবাহ (حرابة) বলা হয়।[১০৯]এর আভিধানিক অর্থ হল যুদ্ধ কিংবা লুণ্ঠন ও অপহরণ[১১০]। শরী'য়াতের পরিভাষায় এর অর্থ হল, কারো সম্পদ অর্জন করা, কিংবা কাউকে হত্যা করা বা কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা। হাম্বলীগণের মতে, কেবল সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে কারো ওপর সশস্ত্র চড়াও হওয়াকে 'হিরাবাহ' বলা হয়। তবে শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণের মতে, সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি; বরং কাউকে হত্যা করা কিংবা কারো ইজ্জত আব্রু নষ্ট করা অথবা পথ-ঘাট বন্ধ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ত্রাস সৃষ্টি করা প্রভৃতি অপরাধও 'হিরাবাহ' এর পর্যায়ভুক্ত। পরবর্তী কালের হানাফীগণও সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি। অথবা ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে দাপটের সাথে কারো ওপর চড়াও হওয়া[১১১] অধিকাংশ ইমামের মতে, এ রূপ আক্রমণ যেখানেই চাই তা শহর-নগর-গ্রাম-জনপদে কিংবা নির্জন পথে-ঘাটে কিংবা মাঠে-ময়দানে হোক তা ডাকাতি হিসেবে ধর্তব্য হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, কেবল জনপদের বাইরে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতিই কেবল হদ্দযোগ্য অপরাধ[১১২] উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, নিম্নে বর্ণিত যে কোন অপরাধ ডাকাতি ও লুণ্ঠন রূপে গণ্য হবে। ডাকাতির মূল উপাদান হল প্রকাশ্যে অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন করে কারো ওপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ হরণ করা। এ অস্ত্র ও শক্তি প্রদর্শনকারী চাই এক ব্যক্তি হোক কিংবা একদল। অতএব, প্রকাশ্য অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন করে সম্পদ লুণ্ঠন করা না হলে তা ডাকাতি হবে না; চুরি হবে। আর যদি সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে ছিনতাইকারী বলা হবে। তাদের অপরাধ ডাকাতির আওতায় আসবে না।[১১৩]দুটি উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে।

প্রথমত চুরির মত ডাকাতির অভিযোগেও অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত

---

১০৮. من حمل السلاح علينا فليس منا- আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত (বাবঃ তাহরীমূল কাতল...), হা. নং. ১৫৬৩৩

১০৯. আরবীতে غصب (লুটতরাজ) ও قطع الطريق (ডাকাতি) প্রভৃতি শব্দও এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১১০. এটি حر ب শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর 'রা' বর্ণ সাকিন হলে শান্তির বিপরীত অর্থাৎ যুদ্ধ অর্থে । এবং 'রা' বর্ণ যবরযুক্ত হলে লুণ্ঠন ও অপহরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৪)

১১১. আল-মরদাভী, *আল- ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৯১; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আল-গরর আল-বহিয়্যাহ*, খ.৫, পৃ. ১০১

১১২. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৪; আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০১,২

১১৩. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৪; আল-বহুতী, *কাশ্‌শাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে বিচারকের সামনে ডাকাতির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে ডাকাতি প্রমাণিত হবে এবং তাকে ডাকাতির হদ্দ ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে-তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে, একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। তবে হাম্বলীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, দু' এজলাসে দুবার স্বীকৃতি দ্বারা ডাকাতি প্রমাণিত হবে। যদি একবার স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে এবং লুটকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে। স্বীকারকারী যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে, যদি সে সম্পদ নেয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে। কেননা অপর কোন মানুষের কোন অধিকার একবার স্বীকার করার পর তা প্রত্যাহার করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না; যদিও অপরাধ সংঘটনে সন্দেহ সৃষ্টির কারণে হদ্দের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে।[১১৪]

দ্বিতীয়ত দু'জন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে। অনুরূপভাবে ডাকাতদের হাতে আক্রান্ত দলের দু' ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও ডাকাতি প্রমাণিত হবে, যদি তারা নিজেদের ব্যাপারে আক্রান্ত হবার সাক্ষ্য না দেয়। অতএব যখন আক্রান্ত দলের দুজন ব্যক্তি দলের অন্যান্যদের আক্রান্ত হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে, তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। বিচারকের জন্য এটা জানতে চাওয়ার প্রয়োজনও নেই যে, তারাও আক্রান্ত হয়েছিল কিনা। বিচারক জানতে চাইলে তাদের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি তারা বলে যে, ডাকাত দল আমাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমাদের মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, তা হলে তাদের সাক্ষ্য না তাদের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে, না অন্যদের বেলায়। কেননা এমতাবস্থায় তারা ডাকাতের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়ে গেল। তবে ইমাম মালিকের মতে, এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এমন কি তাঁর দৃষ্টিতে, কারো থেকে শুনে ডাকাতির সাক্ষ্য দিলেও তাও গ্রহণযোগ্য হবে। যদি দুজন ব্যক্তি আদালতে বিচারকের সামনে এসে কোন কুখ্যাত ডাকাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে একজন ডাকাত, তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ডাকাতি প্রমান করা যাবে, যদিও তারা তাদেরকে ডাকাতি করেতে দেখেনি।[১১৫] ইসলামী শরী'আতে সশস্ত্র ডাকাত ও লুটেরাদের সুনির্দিষ্টভাবে চার ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল : হত্যা করা, শূলবিদ্ধকরণ, হাত ও পা বিপরীত দিক কেটে ফেলা ও দেশ থেকে চির নির্বাসন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের হাত বা পা বিপরীত পরস্পরায় কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসন করা হবে। এই অপমান তো তাদের জন্য দুনিয়ার আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[১১৬]উপর্যুক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ ও রাসূল তথা তাঁদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামী এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের চার ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইমামগণের মধ্যে তাদেরকে এ শাস্তিগুলো দেয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে এ চারটি শাস্তি অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে, না কি বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী এ শাস্তি গুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি শাস্তিদেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে এ শাস্তি

---

১১৪. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৪৩১-২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭

১১৫. আল-বহুতী, *আল-কাশ্শাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫০; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪০

১১৬. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ار جلهم من خلاف اوينفوا من الارض- ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم- (আল-কুরআন, ৫:৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

সমূহের কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন হত্যাকাণ্ডও ঘটাল, ধন-সম্পদও অপহরণ করল তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। আর যে হত্যা করল; ধন-মাল অপহরণ করল না, তাকে শুধু হত্যা করা হবে। আর যে ধন-মাল অপহরণ করল, হত্যাকান্ড ঘটাল না, তার ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে। আর যে লোক ত্রাস সৃষ্টি করল; হত্যা বা ধন-মাল অপহরণ কিছুই করল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে। পক্ষান্তরে হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, বিচারক এ চারটি শাস্তির যে কোন একটি এ পর্যায়ের যে কোন অপরাধে প্রয়োগ করতে পারেন। কৃত অপরাধের দৃষ্টিতে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তা নিধারণ করবেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, হত্যাকান্ড ঘটানোর কিংবা কারো ধন-মাল ছিনিয়ে নেয়ার আগে কোন ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলে তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দেবার পর তাকে কারাবন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে বিশুদ্ধ তাওবাহ করবে এবং তার প্রমাণ মিলবে। তাঁর মতে, আয়াতের মধ্যে نفي দ্বারা তাই বোঝানো হয়েছে। যদি নিসাব পরিমান কারো ধন-মাল অপহরণ করে, তবেই তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে নেয়া হবে। যদি কেউ নিরাপরাধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল; কিন্তু কোন ধন-মাল অপহরণ করল না, তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কেউ হত্যাকাণ্ডও ঘটাল এবং ধন-মালও অপহরন করল, তা হলে তার ব্যাপারে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি নিম্নের তিনটি শাস্তির যে কোন একটি প্রয়োগ করতে পারবেন।

ক. প্রথমে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে ফেলবে, তারপর হত্যা করবে।

খ. শুধু হত্যাই করবে।

গ. শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলবে। তাঁর মতানুযায়ী এ ধরনের গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কেবল হাত-পা কেটে দেয়াই যথেষ্ট হবে না; বরং এর আগে হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধকরণকে যোগ করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখের মতে, এমতাবস্থায় শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে; হাত-পা কাটা যাবে না। তবে সরকার যদি মনে করে যে, তাকে হত্যা করার চাইতে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই অধিকতর কল্যাণকর হবে, তবেই তাকে হত্যা থেকে রেহাই দেয়া যাবে। ইমাম মালিক (রহ) এর মতে, যদি কেউ হত্যাকান্ড ঘটায়, তা হলে তো তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তবে সরকার যদি মনে করে যে, তাকে হত্যা করার চাইতে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই অধিকতর কল্যাণকর হবে, তবেই তাকে হত্যা থেকে রেহাই দেয়া যাবে। তাঁর দৃষ্টিতে, এ পর্যায়ের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীদের হাত-পা কর্তন এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়ার ইখতিয়ার বিচারকের থাকবে না; তবে তাকে শূলে চড়ানো ও হত্যা করার মধ্যে যে কোন একটি কার্যকর করার ইখতিয়ার তাঁর থাকবে। যদি কেউ ধন-মাল অপহরণ করে; কিন্তু হত্যাককাণ্ড ঘটায়নি, তাহলে তাকে নির্বাসিত করার ইখতিয়ার বিচারকের নেই; হত্যা করা কিংবা শূলে চড়ানো বা হাত-পা কর্তন এ তিনটি দণ্ডের মধ্যে যে কোন একটি শাস্তি দেয়ার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে। আর যে লোক কেবল ত্রাস সৃষ্টি করল; হত্যা বা ধন-মাল অপহরণ কিছুই করল না, বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে হত্যা করতেও পারবে কিংবা শূলেও চড়াতে পারবে বা হাত-পাও কেটে দিতে পারবে বা নির্বাসন দণ্ডও দিতে পারবে। বিচারকের ইখতিয়ার থাকার তাৎপর্য হচ্ছে, এই পর্যায়ে বিচারকে দেখতে হবে যে, সশস্ত্র বিপর্যয়সৃষ্টিকারী যদি গভীর বিবেক-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে হত্যা কিংবা শূলবিদ্ধ করাই হবে যুক্তিযুক্ত। কেননা তার হাত-পা কাটা হলেও তার ক্ষতি থেকে জনগণকে আশঙ্কা মুক্ত করা যাবে না। আর যদি সে গভীর বুদ্ধি সম্পন্ন না হয়, তবে স্বাস্থ্যবান ও দৈহিক শক্তিসম্পন্ন, তাহলে তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে। আর এ দুটি বিশেষত্বের কোন একটিও তার না থাকলে তার জন্য হালকা শাস্তি নির্ধারণ করলেই চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ডাকাতির শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে তার কারণ হল এতদসংশ্লিষ্ট আল-কুর'আনের আয়াতটির বর্ণনা পদ্ধতি। অধিকাংশ ইমামের মতে, এখানে أو (অথবা) শব্দটি ইখতিয়ার বোঝানোর জন্য নয়; বরং অপরাধ অনুপাতে শাস্তির বিভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে শাস্তির মাত্রা কম-বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মন্দ কাজের প্রতিফল তদসদৃশই হবে।" অতএব, ছোট অপরাধের জন্য বড় শাস্তি দেয়া, অনুরূপ বড় অপরাধের জন্য ছোট শাস্তি দেয়া শরী'আহ আইনের পরিপন্থী। তদুপরি এ বিষয়ে সকলেই এক মত যে, ডাকাতরা যদি হত্যাকান্ড ঘটায় এবং ধন-মালও হরণ করে, তাহলে তাদের শাস্তি কোনভাবেই কেবল নির্বাসন দন্ড নয়। এ থেকে জানা যায়, আয়াতে ইখতিয়ার বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। অতএব, ডাকাতির প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।[১১৭]তাই শাস্তির মাত্রাও ভিন্ন হবে-এটিই যুক্তিযুক্ত। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, এখানে আরবী লিখা হবে أو (অথবা) শব্দটি ইখতিয়ার বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে; অপরাধ অনুপাতে শাস্তির বিভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় নি। কেননা আরবীতে আরবী লিখা হবে أو (অথবা) শব্দটির ব্যবহার এ অর্থেই বহুল প্রচলিত। হযরত সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যেব, মুজাহিদ, হাসান বসরী ও 'আতা ইবনু রিবাহ (রহ.) প্রমুখ তাবি'ঈগণ এ মত পোষণ করেন। উল্লেখ্য যে, ডাকাতির উপর্যুক্ত শাস্তি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। মহিলা ডাকাতকে শূলে বিদ্ধ করা কিংবা নির্বাসন দন্ডে করা বিধেয় নয়। তাদের ডাকাতির শাস্তি হল, বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া অথবা হত্যা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ডাকাতি করতে গিয়ে কাউকে শুধু হত্যা করলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। এতে সকলে একমত। তবে এ মৃত্যুদন্ড কি হদ্দের দিকটি প্রাধান্য পাবে কিনা কিসাসের দিকটি প্রাধান্য পাবে- তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য দেখা যায়। হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, হদ্দের দিকটি প্রাধান্য পাবে। এ কারণে তাঁদের দৃষ্টিতে অসর্তকতামূলক হত্যার জন্যও ডাকাতকে হত্যা করতে হবে। তদুপরি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা শাস্তি ক্ষমা করে দিলেও তার মৃত্যুদন্ড মওকুফ হবে না। তা ছাড়া হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তির সমান অবস্থান ও মর্যাদা বিষয়টি ও ধর্তব্য হবে না। এ কারণে গোলামের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং যিম্মীর পরিবর্তে মুসলিমকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে। অপরদিকে শাফি'ঈ মাযহাবের বিশুদ্ধতম মত হল, যেহেতু হত্যা ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের সাথে জড়িত অপরাধ, তাই এ ক্ষেত্রে কিসাসের দিকটি প্রাধান্য পাবে। এ কারনে ডাকাতকে কিসাসের ভিত্তিতেই হত্যা করতে হবে। যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাবেই হদ্দের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা যাবে। অধিকন্তু, এ কারণে তাঁদের দৃষ্টিতে হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তির সমান অবস্থান ও মর্যাদা বিষয়টিও ধর্তব্য হবে। তাই যিম্মীর প্রতিশোধ হিসেবে কোন মুসলিমকে এবং গোলামের প্রতিশোধ হিসেবে কোন আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। যিম্মীর হত্যার জন্য তাকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং গোলাম হত্যার জন্য তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে।[১১৮]

ক. কারো সম্পদ ছিনতাই, কিংবা কাউকে হত্যা বা কারো ইজ্জত আব্রু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হওয়া। যদিও কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বা ইজ্জত আব্রু নষ্ট করতে কিংবা কাউকে হত্যা

---

১১৭. যেমন কেউ শুধু ধন-মাল ছিনিয়ে নিল, আবার কেউ ধন-মালও ছিনিয়ে নিল, হত্যাকান্ডও ঘটাল, আবার কেউ শুধু হত্যাকান্ড ঘটাল, আবার কেউ শুধু ত্রাস সৃষ্টি করল।

১১৮. মুহাম্মদ ইদ্রিস শাফি'ঈ, *কিতাব আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৪-৫; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৯৬-৮

Dhaka University Institutional Repository

করতে সমর্থ হয়নি।

খ. কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যা করেছে কিংবা মারধর করেছে; কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেয়নি।

গ. সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কারো সম্পদও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কাউকে হত্যা করেছে কিংবা মারধর করেছে।[১১৯]'হিরাবাহ' কে বড় চুরিও বলা হয়। চুরি এ জন্য বলা হয় যে, দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ডাকাতি ও অপহরণকারীরা সরকারের অগোচরেই মানুষের সম্পদ নষ্ট করে। বড় চুরি বলার কারণ হল, এর অপকারিতা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সর্বসাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১২০]এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০০৯- ২০১৪ এর ১১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ৭৮,৯০৫টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।[১২১]আর এ ডাকাতরা নদী-নালা,খাল, বিল ও বঙ্গপোসাগরে জলদস্যু হিসেবে কাজ করে। জেলেদের ধরা মাছ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি তারা অসহায় জেলেদেরকে জিম্মি হিসেবে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করে। যারা মুক্তিপণ আদায় করতে পারে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা ব্যর্থ হয় তাদের ভাগ্যে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার জঙ্গলে রয়েছে বনদস্যু । তারা প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট সহ অন্যান্য যেসব বনভূমি রয়েছে সেখানে তারা গাছ কেটে উজাড় করে ফেলে এবং অবৈধ অর্থ উপার্জন করে। পাশাপাশি পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। তারপরই আসে ভূমি দস্যুতা। এ ভূমিদস্যুরা ভারী অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে অন্যের ভূমি দখল নিয়ে নিজে মালিক বনে যায়। মূল মালিককে গুলি করে হত্যা বা আহত করে বিতাড়িত করে। সুন্দরবনের উপকূলে অসহায় জেলেরা পানিতে জলদস্যু, জঙ্গলে বনদস্যুর শিকার হয়।[১২২]এ ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ডাকাতের সাথে, আর কিছু যাদের ওপর হানা দেয়া হয় তাদের সাথে, আর কিছু উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া ডাকাতিকৃত সম্পদ এবং যে স্থানে ডাকাতি করা হয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্তও রয়েছে। ডাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ:

ক. ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করতে হলে ডাকাতকে মুসলিম হতে হবে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। রাষ্ট্রের কোন অস্থায়ী অমুসলিম নাগরিকের ওপর ডাকাতির জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে দেশীয় আইনে তাদের বিচার করা যাবে।[১২৩]

খ. হদ্দ প্রয়োগের জন্য ডাকাতকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমতিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা কোন পাগল ডাকাতি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে কোন পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা কোন পাগলের সাথে মিলে ডাকাতি করে, তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে, তার হদ্দ রহিত হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, তাদের কারো ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না, চাই সে অপরাধে লিপ্ত হোক বা না হোক। তাঁর কথা হল, এখানে অপরাধ যেহেতু একটা, তাই একটা অপরাধের জন্য অপরাধীদের কাউকে হদ্দ

---

১১৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, খ. ৪২৩-৪; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২৪-৬

১২০. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৫

১২১. দৈনিক দিনকাল, ১২ মার্চ ২০১৪, পৃ. ১,৭

১২২. দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, সোমবার পৃ. ১২

১২৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৯৫; মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ করা হবে, আবার কাউকে হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া তা সমীচীন নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে, সে অপরাধে লিপ্ত হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[১২৪]

গ. হানাফীগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করতে হলে ডাকাতকে পুরুষ হতে হবে। কোন নারী ডাকাতের ওপর ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ, নারীরা যেহেতু স্বভাবগতভাবে কোমল ও নরম এবং দৈহিকভাবে দুর্বল হবার কারণে কারো ওপর দাপটের সাথে চড়াও হতে পারে না, তাই 'ডাকাতি' শব্দটি তাদের জন্য পুরো প্রযোজ্য নয়। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি তাদের সাথে মিলে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করে, তার ওপরও হদ্দ কার্যকর যাবে না, চাই সে নিজে অপরাধে লিপ্ত হোক কিংবা না হোক। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, যদি কোন মহিলা সরাসরি কারো ওপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তার সহযোগী পুরুষদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে। তাঁর কথা হল, মহিলাদের ওপর ডাকাতির হদ্দ কার্যকর করা বিধেয় না হবার কারণ তাদের নিজস্ব কোন অযোগ্যতার কারণে নয়; বরং সচরাচর তাদের থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না, তাই বলে তাদেরকে এ হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া হয়। কিন্তু তার সহযোগী পুরুষের বেলায় তো আর এ অজুহাত নেই। তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতে কোন বাধা নেই।[১২৫]অন্যান্য তিন মাযহাবের ইমামগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য ডাকাতদের সাথে ডাকাতির হদ্দ কার্যকর করা যাবে। তাঁদের মতে, কয়েকজন নারী যদি মিলিত হয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে অপরের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তাদের অপরাধ ডাকাতির হদ্দের আওতায় ধর্তব্য হবে।[১২৬]

ঘ. হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য ডাকাতদের সাথে যে কোনরূপ অস্ত্র থাকতে হবে। তা ধারালো অস্ত্রও হতে পারে কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রও হতে পারে। লাঠি-সোটা ও পাথর ইত্যাদি ও অস্ত্রের মধ্যে গণ্য হবে। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণ কোনরূপ অস্ত্রের শর্ত আরোপ করেননি। তাঁদের মতে, ডাকাতির জন্য ডাকাতদের নিজস্ব শক্তি ও অঙ্গ ব্যবহার করতে (যেমন- কিল, ঘুষি ও লাথি) প্রভৃতি সামর্থবান হওয়াই যথেষ্ট। উপরন্তু, ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে , প্রতারণা করতে সক্ষম হওয়া, ঘায়েল করা, মাদক দ্রব্য সেবন করোনো যথেষ্ট হবে। শক্তি ব্যবহার না করেও চাতুর্যের সাথে যদি এগুলো করতে পারে সেও ডাকাত রূপে গণ্য হবে।[১২৭]ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) রাত ও দিনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। দিনের বেলা হলে তিনি ডাকাতির জন্য অস্ত্রের শর্তারোপ করেছেন আর রাতের জন্য অস্ত্রের শর্তারোপ করেননি । তাঁর মতে, শুধু লাঠি ও পাথর দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই যথেষ্ট হবে।[১২৮]হানাফীগণের মধ্যে পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ঘরে-বাইরে নিরীহ ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণের জন্য ডাকাতির বহু প্রকারের আধুনিক পদ্ধতি[১২৯]আবিষ্কৃত হয়েছে। দিন ও রাতে সমানভাবে বিনা অস্ত্রে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাকাতদের নিত্যনতুন কৌশলের হাতে যিম্মী লোকদের পক্ষে কারো সাহায্য চাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমান অবস্থায় ডাকাতদের নির্মূল করার প্রয়োজনে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতের

১২৪. রু'য়ানী, *মাওয়াহিবুল জলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৪; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫৫

১২৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৯৭-৮; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯০-১

১২৬. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১২; আল-বহুতী, *কাশ্‌শাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫২

১২৭. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৪; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৭৪

১২৮. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯২

১২৯. যেমন নেশাজাত কিংবা অজ্ঞানকারী কোন বস্তু সেবন করানো কিংবা ঘ্রাণ ছড়ানো, গামছা জড়িয়ে অজ্ঞান করে হত্যা করা প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

চাইতে মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতই অধিকতর বাস্তবধর্মী ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। আবার আক্রান্ত ব্যক্তির সাথেও সংশ্লিষ্ট কিছু শর্তাবলী রয়েছে। তা নিম্নরূপ :

১. আক্রান্ত ব্যক্তি মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হলেই কেবল ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[১৩০] যদি আক্রান্ত ব্যক্তি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কিংবা কোন চুক্তির ভিত্তিতে সাময়িকভাবে অনুপ্রবেশকারী অমুসলিম হয়, তা হলে ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যাবে।

২. লুটকৃত সম্পদের ওপর আক্রান্ত ব্যক্তির বিশুদ্ধ মালিকানা থাকতে হবে কিংবা তার আমানতদার বা দায়িত্বশীল হতে হবে। যদি লুটকৃত সম্পদের ওপর আক্রান্ত ব্যক্তির মালিকানা বা দখল স্বত্ব বিশুদ্ধ না হয় (যেমন চুরিকৃত মালের ওপর চোরের অধিকার), তা হলেও ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৩১] আর ডাকাত ও আক্রান্ত ব্যক্তি-দুপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ : ডাকাত যদি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (যেমন-পিতা, দাদা, ছেলে, নাতি ও ভাই প্রভৃতি) হয়, তা হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৩২] কারণ, এ সব আত্মীয়ের মধ্যে যেহেতু একে অপরের কাছে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এবং পরস্পরের সম্পদ ভোগ করার বেলায় বাড়তি কিছু সুযোগ পেয়ে থাকে, তাই এর ফলে তাদের ডাকাতির ক্ষেত্রে একটি সন্দেহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। অধিকিন্তু ডাকাতির কারণে তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর হলে তাতে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ডাকাতদের মধ্যে কোন একজন আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলে অবশিষ্ট ডাকাতদের ওপরও হদ্দ কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে না। এটা হানাফী স্কুলের অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে অবশিষ্ট ডাকাতদের ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[১৩৩] আবার লুটকৃত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ: ইতঃপূর্বে চুরির হদ্দ কার্যকর করার জন্য চুরিকৃত সম্পদের জন্য যে সব শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব শর্ত ডাকাতির মালের জন্যও প্রযোজ্য হবে।[১৩৪]

ক. আর্থিক মূল্য সম্পন্ন বস্তু হওয়া।

খ. কারো মালিকানা বা বৈধ দখলভুক্ত হওয়া।

গ. মাল সংরক্ষিত থাকা।

ঘ. নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া অর্থাৎ দশ দিরহামের সমপরিমাণ কিংবা তাতোধিক হওয়া। ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ আল-হানাফী (রহ.) এর মতে ডাকাতির নিসাব চুরির দ্বিগুণ অর্থাৎ বিশ দিরহাম। তাঁর বক্তব্য হল চুরিতে যেহেতু একটা হাত বা পা কর্তন করা হয় আর ডাকাতিতে দুটি অঙ্গই কর্তন করা হয়, তাই এর জন্য

---

১৩০. মুহাম্মদ ইদ্রিস শাফি'ঈ, *কিতাব আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৪; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯১

১৩১. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯১

১৩২. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯২

১৩৩. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩১

১৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

বিশ দিরহামের নির্ধারণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।[১৩৫]যদি ডাকাতরা ভাগে প্রত্যেকেই নুন্যতম দশ দিরহামের সমপরিমাণ সম্পদ না পায়, তা হলে সম্পদ লুঠের জন্য তাদের কারো ওপর ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[১৩৬]আবার ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ :

ক. ডাকাতি ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হলেই হদ্দ কার্যকর করা হবে। অমুসলিম কিংবা অ-ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত কোন ডাকাতির জন্য কোন ডাকাতের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১৩৭]

খ. হানাফী ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমামের মতে, শহর-নগর-গ্রাম-জনপদের বাইরে দূরে পথে-ঘাটে, নির্জন মাঠে-ময়দানে, নদীতে-মুরুভূমিতে ডাকাতি হলেই তার জন্য হদ্দ কার্যকর করা হবে। কোন শহর বা জনপদে ডাকাতি হলে সে জন্য ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। তাঁদের বক্তব্য হল- যারা শহর বা জনপদে বাস করে, তারা আক্রমণের সময় চিৎকার করতে পারে এবং চিৎকার শুনে খুব কাছাকাছি থেকে লোকজন এসে জড়ো হতে পারে কিংবা নিরাপত্তা কর্মীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবে হামলাকারীদের দাপট খতম হয়ে যায়। তাই এ ধরণের কর্মকে ডাকাতি নয়; ছিনতাই বলা হয়। এ জন্য হদ্দ নয়; তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি নির্ধারিত হবে।[১৩৮]

শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণের মতে শহর-জনপদ এবং দূরের পথ–ঘাট ও নির্জন মাঠে-ময়দানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে তাঁরা আক্রান্তদের ফরিয়াদের সাড়া দেয়ার মত কারো না থাকার শর্ত আরোপ করেছেন।[১৩৯]অতএব তাঁদের মতে, যারা কোন শহর বা জনপদের বাড়িতে ঢুকে অস্ত্রের মুখে বাড়ির সদস্যদেরকে যিম্মী করে রাখে, তারাও ডাকাতরূপে গণ্য হবে। তাঁদের বক্তব্য হল- প্রথমত কুর'আনের আয়াতে يحاربون শব্দটি ব্যাপক। এটি সকল প্রকারের মুহারিব-সশস্ত্র আক্রমণকারীকে শামিল করে। দ্বিতীয়ত শহর বা জনপদের মধ্যে এ ধরনের আক্রমণ অধিক ভয়ের কারণ ও বেশি ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। কেননা জনপদ হচ্ছে শান্তি-নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার ক্ষেত্র। এখানে লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়ার ও পাওয়ার পরিবেশ বিদ্যমান। এ ধরনের স্থলে সশস্ত্র আক্রমণ স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক প্রস্তুতিসহ তীব্র ও প্রচন্ডরূপে হয়ে থাকে। উপরন্তু, তারা লোকদের ঘরে বা দোকানে আক্রমণ চালিয়ে যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দূরের পথে–ঘাটে, নির্জন মাঠে-ময়দানে আক্রমণ খুব প্রচন্ড হয় না, আর সর্বস্ব হারাবার ও ভয় থাকে না। কেননা সেখানে লোকেরা পথযাত্রী। আর পথযাত্রী অবস্থায় তার সাথে খুব সামান্য সম্পদ থাকাই স্বাভাবিক।[১৪০]পরবর্তীকালের অধিকাংশ হানাফী ইমাম প্রয়োজনের তাকিদ এবং মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিবেচনা করে মত দিয়েছেন যে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য ডাকাতি শহরের বাইরে সংঘটিত হওয়া শর্ত নয়। তেমনি ডাকাতদের সাথে অস্ত্র থাকা এবং সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য থাকাও শর্ত নয়। ইবনু নুজায়ম

১৩৫. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনাই*, প্রাগুক্ত, , খ. ৭, পৃ. ৯২

১৩৬. আল-হাদ্দাসী, *আল-জাওাহারাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭২; যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৬

১৩৭. আল-কাসানী, বদা'ই, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯২

১৩৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০১-২; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৪

১৩৯. হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং হাম্বলীগণের মধ্যে ও অনেকেই এ মত পোষণ করেন। (আস–সারাখসী, আল-মাবসূত, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০১)

১৪০. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩৪, ৫৫৫; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, এর ওপরই হানাফীগণের ফাতওয়া। তাঁরা বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাঁর সময়ের লোকদের অভ্যাস-আচরণের ওপর ভিত্তি করেই এ সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছিলেন। কেননা তখন লোকেরা প্রায়শ জনপদের বাইরেই সশস্ত্র ডাকাতির সম্মুখীন হত। এ কারনে লোকেরা শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াত করার সময় তাদের সাথে অস্ত্র রাখত। আর বর্তমানে শহর-নগর-গ্রাম-জনপদেও সশস্ত্র, এমনকি বিনা অস্ত্রেও নানা নিত্য নতুন কৌশলে ডাকাতির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। তাই পথে-ঘাটে ও নির্জন মাঠে-ময়দানে ডাকাতি হলে যেমন হদ্দ কার্যকর করতে হবে, তেমনি বর্তমানে শহর-নগর জনপদের মধ্যে সংঘটিত যে কোন ডাকাতিও হদ্দের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ রূপে বিবেচিত হবে।[১৪১]আর ডাকাতির শাস্তি যেহেতু হদ্দের পর্যায়ভুক্ত এবং এর সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত, তাই ডাকাতকে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অথবা সরকারের ক্ষমা করে দেয়ার ইখতিয়ার নেই। তবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ার আগেই যদি সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিশুদ্ধ তাওবা করে ভাল হয়ে যায় এবং এর প্রমাণও মিলে, তবেই এ তাওবা তাকে নির্ধারিত শাস্তি থেকে রেহাই দেবে। তবে মানুষের অধিকারের সাথে যা কিছু জড়িত তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবীর ওপর নির্ভরশীল হবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "কিন্তু যারা তোমাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করবে, জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"।[১৪২]এ আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, ঐ অপরাধের দরুন আল্লাহর অবাধ্যতা যতটা করেছে, তার জন্য। এ কারণে ডাকাতির হদ্দ হিসেবে হয়ত তার হাত-পা কাটা যাবে না বা হত্যার হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু জনগণের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন প্রাণ নাশ, যখমও ধন-মাল লুট ইত্যাদি তা কখনো ক্ষমা পাবে না। আল্লাহ মা'ফ করবেন না। সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে জড়িত। তারা ইচ্ছে করলে দাবী পেশ করবে, ইচ্ছে করলে দাবী প্রত্যাহার করতে পারে। ওরা কাউকে হত্যা করে থাকলে উত্তরাধিকারীদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার দন্ড রহিত হবে বটে; কিন্তু তারা চাইলে দিয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে আর তারা তাও ক্ষমা করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে কারো নিকট থেকে ধন-মাল ছিনিয়ে নিলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অনুরূপভাবে ডাকাতি করাকালে কোন নারীকে ধর্ষণ করলে কিংবা মদ পান করলে তা চুরি করলে অথবা কাউকে যিনার অপবাদ দিলে এবং ধরাপড়ার আগে তাওবা করলেও তার হদ্দ রহিত হবে না। এটাই মালিকী ও অধিকাংশ শাফি'ঈ ও হানাফী ইমামের অভিমত। তবে হাম্বলীগণের মতে, ধরাপড়ার আগে তওবা করলেও এগুলোর হদ্দ রহিত হয়ে যাবে; কিন্তু অপবাদের হদ্দ রহিত হবে না।[১৪৩]

ডাকাতি ও সন্ত্রাসে সহযোগীদের শাস্তির বিধান :

ডাকাতি ও সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদের শাস্তিও ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তির অনুরূপ হবে। কেননা তারা আন্ডার ওয়ার্ল্ডের ডন হিসেবে কাজ করে। ডাকাতদের রক্ষায় সকল ধরনের সহযোগিতা করে।এমনকি তারা অর্থ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়ার সার্বিক ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা যদি তাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডের সম্মুখীন হয়, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীরাও সে একই ধরনের শাস্তি ভোগ করবে। যদিও তারা সরাসরি ডাকাতি ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়নি। কেননা ডাকাতি ও সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো প্রায়শ দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয়ে থাকে। কেউ সরাসরি অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়, আবার কেউ তাদেরকে রক্ষা করার

---

১৪১. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩১-২

১৪২. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم- (আল-কুরআন, ৫ : ৩৩-৩৪)

১৪৩. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৯৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৯-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

কাজে রত হয়। ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদেরকে যদি তাদের মত একই রূপ হদ্দের শাস্তি দেয়া না হয়, তাহলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পথ দিন দিন বেড়েই চলবে। এটাই হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণ সহ অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে শাফি'ঈগণের মতে, যারা ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসীদের সাহায্য-সহযোগীতা করে কিংবা তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের দল ভারী করে কিংবা তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে তাদের ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় তাদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা যেতে পারে বা তাদেরকে দণ্ডও দেয়া যেতে পারে।[১৪৪]

অপহরণের শাস্তির বিধান :

মানুষের জীবন ও ইজ্জত-আব্রুর মত সম্পদও একটি পবিত্র বস্তু। রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,"তোমাদের জীবন, ইজ্জত-আব্রু ও সম্পদ পবিত্র বস্তু, যেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করা হারাম।"[১৪৫] ইসলামে কারো সম্পদ সামান্য পরিমাণ হলেও অন্যায়ভাবে দখল করা, ছিনিয়ে নেয়া ও ভোগ করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ইমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। তবে ব্যবসার মাধ্যমে পরস্পরের সম্মতিতে খেতে পার।"[১৪৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কারো সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ভোগ করা মোটেই বৈধ নয়।"[১৪৭]জোর করে অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে আরবীতে গসব (غصب) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ কোন কিছু অন্যায়ভাবে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় কোন বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের অধিকারভুক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে অপহরণ করাকে غصب বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে غصب হল "কারো প্রকাশ্যে জবরদস্তি মূলক হস্তক্ষেপের ফলে আর্থিক মূল্য বিশিষ্ট সম্পদ থেকে মালিকের দখলস্বত্ব অপসারিত হওয়া"[১৪৮]মালিকী ইমামগণের মতে, "বিনা অস্ত্রে কেবল জোর খাটিয়ে কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া।"[১৪৯]শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে নেয়াকে غصبবলা হয়।[১৫০]কোন প্রকৃতির অপহরণ ইসলামি শরী'আতে غصبরূপে গণ্য হবে তা নিয়ে ইমামগণের দু'টি মত দেখা যায়।

প্রথমত অধিকাংশ ইমামের মতে, কারো সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া কেবল জোর করে করায়ত্ত করলেই غصبসাব্যস্ত হবে। চাই তাতে মালিকের দখলস্বত্ব বজায় থাকুক বা না থাকুক।

দ্বিতীয়ত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে, কারো সম্পদ অপহরণকারীর ছিনিয়ে

---

১৪৪. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩১; ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৪

১৪৫. ان دماءكم و امو الكم و اعراضكم حرام عليكم- আবুল কাশেম তাবারানী, *আল-মু'জামূল কবীর*, প্রাগুক্ত, হা. নং. ৫৩৮; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হা. নং. ২৩৫৩৬

১৪৬. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا امو الكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم- (আল-কুরআন, : ২৯)

১৪৭. لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه দারু কুতনী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল বুয়ূ), হা. নং:৯১; ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হা. নং. ২৩৫৩৬

১৪৮. ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة و المغالبة بفعل في المال- (আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৩)

১৪৯. اخذ مال قهرا تعديا بال حرابة - (আস-সাভী, *বুলগাতুস সালিক*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৮১)

১৫০. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৬; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

নেবার পর যদি মালিকের দখলস্বত্বও চলে যায়, তাহলেই غصب সাব্যস্ত হবে।[১৫১] এ মতবিরোধ প্রেক্ষিতে অপহৃত সম্পদ থেকে উৎপন্ন বস্তু (যেমন- বাগানের ফল) ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংশ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অপহরণকারীকে আদায় করতে হবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। হানাফীগণের মতে অপহরণের ফলে যেহেতু মালিকের দখলস্বত্ব চলে যায়, তাই অপহরণকারীকে উক্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে অন্য ইমামগণের দৃষ্টিতে অপহরণের জন্য যেহেতু মালিকের দখলস্বত্ব চলে যায় না, তাই অপহরণকারীকে উক্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[১৫২]অপহরণকারীর অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনা করে বিচারক অপহরণকারীকে কারাদন্ড কিংবা বেত্রাঘাত উভয়বিধ শাস্তি দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, অপহরণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার যেমন খর্ব হয়, তেমনি জনস্বার্থও বিঘ্নিত হয়। তাই অপহরণের মামলা আদালতে উপস্থাপিত হবার পর সম্পদের মালিক যদি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তা হলেও বিচারক জনস্বার্থ বিবেচনা করে এবং সমাজে সার্বিক ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে শাস্তি কার্যকর করবে; তাকে ক্ষমা করে দেবে না।[১৫৩]উপরন্তু, অপহৃত বস্তু যদি অপহরণকারীর দখল থাকে, তাহলেও তাও মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোন বস্তু গ্রহণ না করে, খেলাচ্ছলেও নয় এবং বাস্তবিকভাবে তো নয়ই। যদি কেউ তার ভাইয়ের ছড়িও নেয়, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।"[১৫৪]অপহৃত বস্তু যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হারিয়ে যায়, তাহলে অপহৃত বস্তুর হুবহু সমজাতীয় ও সমমানের বস্তু পাওয়া গেলে মালিককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাই দিতে হবে। আর যদি অপহৃত বস্তুর মূল্য ফেরত দিতে হবে।[১৫৫]মূল্য ফেরত দেবার ক্ষেত্রে অপহরণের দিনে বস্তুর যে মূল্য ছিল তাই বিবেচনায় নিতে হবে। এটা হানাফী ও মালিকীগণের অভিমত। শাফি'ঈগণের মতে, সম্পদ অপহরণের দিন থেকে ধ্বংশ হবার সময় পর্যন্ত যে চড়া দামটি ছিল, তাই পরিশোধ করতে হবে। হাম্বলীগণের মতে, সম্পদ নষ্ট হবার দিনের মূল্যকে বিবেচনায় নিতে হবে।[১৫৬]উল্লেখ্য যে, সম্পদ যে জায়গা থেকে অপহরণ করা হয়েছে, তা ঠিক সে জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। কেননা অনেক সময় স্থানভেদে জিনিসের মূল্যের মধ্যে তফাত হয়ে থাকে। আর পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যয়ভার অপহরণকারীকেই বহন করতে হবে।[১৫৭]চুরির মত অপহরণও একটি গুরুতর সামাজিক অপরাধ। চুরির জন্য ইসলামে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অথচ অপহরণের কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ নেই। এটা অবশ্যই একটা দুর্বোধ্য বিষয়। এর উত্তর হল, চুরি ও অপহরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অপহরণের ব্যাপারটি প্রায়ই প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। তাই সাবধান হলে এ ধরনের অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা অনেকটা সহজ হয় এবং তার প্রমাণ উপস্থিত করাও তেমন কঠিন ব্যাপার হয় না। পক্ষান্তরে চুরির ঘটনা ঘটে গোপনে, লোক চক্ষুর আড়ালে। ফলে তা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অধিকন্তু, চোর থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সে ঘরে সিঁদ কাটে, তালা ভাঙ্গে, গ্রিল

---

১৫১. মূল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩; 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮৭

১৫২. মূল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩

১৫৩. ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাহ* খ. ২, পৃ. ২০৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ২৩৫

১৫৪. لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا ومن اخذ عصا اخيه فليردها- সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হা. নং. ৫০০৩; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং. ১১২৭৯, ১১৩২৪

১৫৫. আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩২২-৩; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৮-১৫১

১৫৬. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৭

১৫৭. আস-সারখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কাটে। এ রূপ অপরাধে কঠোরতর শাস্তি দেয়া না হলে সমাজে চুরির মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাবে এবং এর ফলে লোকেরা কঠিন বিপদে পড়ে যেতে পারে। তাই গোপনে সংঘটিত অপরাধটি যদি অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে তা অন্যরা দেখে শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সর্তক হবার প্রয়োজন অনুভব করে। অপরদিকে অপহরণ প্রায়শ জনগণের চোখের সামনে প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। জনগণ সর্তক হলে অপহরণকারীকে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব এবং অপহৃত বস্তুটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া যায়। তদুপরি লুটকারীর বিরুদ্ধে সরকারের নিকট মামলাও দায়ের করা যায় কিন্তু চোরের ব্যাপারটি সে ধরনের নয়।[১৫৮]চুরি ও ডাকাতির মত সাধারণত যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা অপহরণকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা অপহরণ প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও অপহরণ প্রমাণ করা যেতে পারে।[১৫৯]

প্রথমত অপহরণ প্রমাণের জন্য দুজন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দুজনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দুজন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে অপহরণের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে অপহরণ প্রমাণিত হবে।

তৃতীয়ত যখন অপহরণকৃত সম্পদের মালিকের দাবীর পক্ষে কোন সাক্ষী থাকে না, আর অপহরণকারীও স্বীকার করে না, তখন অপহরণকারীকে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবীর পক্ষে শপথ করে বলে, তাহলে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা অপহরণ প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য অপহরণকারী শাস্তিযোগ্য হবে। তবে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের নিকট এ রূপ অবস্থায় অপহরণ প্রমাণিত হবে না এবং এ জন্য অপহরণকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

চতুর্থত কারো কারো মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও অপহরণ প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে অপহরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে অপহরণকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে এবং তাকে মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। কেননা সাক্ষ্য ও অপহরণকারীর স্বীকারোক্তির চাইতে অপহরণ সাব্যস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষণ অধিকতর শক্তিদানী প্রমাণ। কারণ, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি যেহেতু এক প্রকার সংবাদ দান, তাই এগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যার একটা অবকাশ সবসময় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে অপহরণকৃত মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে তাতে অপহরণের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়। যে সব সম্পদে অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে তা নিম্নরূপ-

ক. অপহরণকৃত সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য হলে তাতে অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেলেই অপহরণের শাস্তি কার্যকর করা যাবে। শর্তগুলো হল-

১. বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকার অর্থ হল তা এমন হওয়া যা কেউ নষ্ট করলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার মূল্য

১৫৮.   মওলানা আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধ ইসলাম*, পৃ. ২৪৭; ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামূল মুআক্কি'ঈন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭

১৫৯.   আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অতএব যে সব বস্তুর কোন মূল্য নেই (মৃত প্রাণী ও রক্ত প্রভৃতি)তা কেউ অপহরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

২. শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব বস্তু ভোগ করা বা ব্যবহার করা হারাম (যেমন-শূকর, মাদক দ্রব্য, মৃত প্রাণী ও অশ্লীল বই-পুস্তক) তা কেউ অপহরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৩. অপহরণকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত অর্থাৎ মালিকানাভুক্ত কিংবা আমানত বা দায়িত্বাধীন থাকতে হবে। দখলবিহীন বা মালিকানাহীন কোন মাল কেউ অপহরণ করলে তার এ কাজ শাস্তিযোগ্য অপহরণ বলে গণ্য হবে না। কারণ এতে কারো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা নেই।

৪. অপহরণকৃত মাল যদি এমন কোন বস্তু হয় যা ব্যবহার করা সকলের জন্য সাধারণভাবে বৈধ (যেমন-পানি, আগুন বা ঘাস প্রভৃতি), তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

খ. অধিকাংশ ইমামের মতে স্থাবর সম্পদ (যেমন জমি-জমা ও বাড়ি-ঘর) জোর করে ছিনিয়ে নেয়া হলে তাতেও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে এবং এর কোন রূপ ক্ষতি সাধিত হলে, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অপহরণকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাঁদের মতে, অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবার জন্য অপহরণকৃত বস্তুর ওপর অপহরণকারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ায় যথেষ্ট। যেমন ঘর-বাড়ি তৈরি করে কিংবা আসবাবপত্র জমা রেখে স্থাবর সম্পদের ওপর অপহরণকারী নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর ফলে স্থাবর সম্পদ থেকে মালিকের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। তাঁদের দলীল হল: রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক বিগত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে করায়ত্ত করবে, কিয়ামতের দিন শাস্তিস্বরূপ তার গলায় সাত তবক জমি বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেয়া হবে।"[১৬০] এ হাদীস থেকে জানা যায়, স্থাবর সম্পদের বেলায়ও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু হাজর বলেছেন, "এ হাদীসে জমি-জমা অপহরণে উপযোগী হবার প্রমাণ রয়েছে।"পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) প্রমুখের মতে, অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবার জন্য সম্পদের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব শূণ্য হয়ে যেতে হবে। সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য হলেই কেবল সম্পদের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব শূণ্য হতে পারে। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি যেহেতু স্থানান্তরযোগ্য নয়, তাই তাতে অপহরণের বিধানও প্রযোজ্য হবে না।

অতএব ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) প্রমুখের দৃষ্টিতে যে কেউ কারো স্থাবর সম্পদ ছিনিয়ে নেবার পর যদি ছিনতাইকারীর হাতেই কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেই (যেমন-বন্যা, বজ্রপাত ও অগ্নিকান্ড প্রভৃতি) তা ধ্বংশ হয়ে যায়, তাহলে অপহরণকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ, তাঁদের মতে যেহেতু স্থাবর সম্পদে অপহরণের পরও মালিকের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয় না, তাই এ ক্ষেত্রে অপহরনের বিধান কার্যকর হবে না। তবে অপহরণকারীর কারণেই যদি তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ধবংশপ্রাপ্ত হয়, (যেমন সে নিজেই ঘর ভেঙ্গে ফেলল) তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর এ ক্ষতিপূরণ অপহরণের কারণে নয়; বরং অপরের মাল ধ্বংশ বা ক্ষতি করার কারণেই ওয়াজিব হবে।[১৬১]

---

১৬০. من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضين- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল মাযালিম), হা. নং. ২৩২১

১৬১. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১২৩; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

মানব অপহরণ ও গুমের শাস্তির বিধান :

মানুষ তথা নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে বাসা-বাড়ি,স্কুল-কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, কর্মস্থল বা আশা যাওয়ার পথে কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়াকে অপহরণর বলে। আর এ অপহরণের পর কাউকে নির্যাতন করে মোবাইল ফোনে চাঁদা দাবী করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা দিতে অপারগ হলে তাকে হত্যা করা হয়। কাউকে জীবন্ত বা মৃত মাটিতে ফুতে ফেলা হয় আবার কাউকে টুকরো টুকরো করে বস্তায় বন্দি করে নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা এমন কি সাগরে ভাঁসিয়ে দেওয়া হয়। আবার কাউকে ইটের ভাটায় বা আগুনে পুড়ে ফেলা হয়। আবার কারো হদিসই পাওয়া যায় না। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, জানতে পারে না স্বজনরা। নারীদেরকে অপহরণের পর শারিরীক নির্যাতন করা হয়। আবার সার্বক্ষনিক আটকিয়ে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণের পর শ্বাস রোধ বা জবাই করে হত্যা করে। এমনকি অনেককে বর্ডার ক্রস করে পাচার বা বিক্রি করে দেওয়া হয়। শিশুরা আজ স্কুলে যেতে ভয় পায়। কে, কখন অপহরণের শিকার হয় কেউ জানেনা। শিশুদের অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায় করা হয়। মুক্তিপণ সময় মত প্রদান করতে না পারলে হত্যা করা হয় এমনকি বিক্রি বা পাচার করে দেওয়া হয়। গত ১১ নভেম্বর ২০১৩ পরাগ মন্ডল সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা পশ্চিম পাড়ার বাড়ির সামনে থেকে মা লিপি মন্ডল, বোন পিনাকী মন্ডল ও গাড়ি চালক নজরুলকে গুলি করে পরাগ মন্ডলকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। পরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে উদ্ধার করে।[১৬২]

ঢাকার চৌধুরী আলম গুম হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোথায় আছে কেউ জানেনা। সিলেটের ইলিয়াছ আলীকে ২২ এপ্রিল ২০১২, রবিবার ঢাকা থেকে অপহরণ করা হয়। তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে, তিনি কোথায় আছেন, কেউ জানেনা। ফিরে পাবে কী ইলিয়াছ আলীর স্ত্রী তার প্রিয় স্বামীকে, সন্তানরা তাদের বাবাকে।[১৬৩] ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে ন্যাশনাল কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ আলী মহাব্বতকে অপহরণ করে । তাঁর পরিবারের সদস্যরা বলেছেন তারপর থেকে তিনি কোথায় আছেন তারা জানেন না। ১৫ মে ২০১২ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সাক্ষী সুখরঞ্জন বালি 'দ্য নিউ এজ' পত্রিকাকে বলেন, ২০১২ সালে আদালত থেকে তাকে সাদা পোশাকের পুলিশ অপহরণ করে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন। উল্টো প্রসিকিউশন তাকে অপহরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সুখরঞ্জন দাবি করেছেন, তাকে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ উপায়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার আগে কয়েক সপ্তাহ রাখা হয়েছে নিরাপত্তা হেফাজতে। বছর শেষেও তিনি কলকাতার দমদম কারাগারে বন্দি ছিলেন।[১৬৪]এ ধারাবাহিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গুম বা নিখোঁজ হয়ে লাশ হওয়ার ঘটনা। পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই এসব ঘটনা ব্যাপকহারে লক্ষ্য যায়। কেউ গুম হয়ে যাওয়ার পর লাশ হয়ে ফিরে আসে আবার কেউ ফিরে আসে না। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারকে উদ্ধৃত করে মার্কিন প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর (২০১৩) পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ১৪ জন গুম হয়েছে। ২০১২ সালে ওই সংখ্যা ছিল ২৪ জন। আসকের তথ্যানুযায়ী ২০১৩ সালে গুম হয়েছেন ৩৩ জন।[১৬৫] অপহরণ ও গুম মানে এক ভয়ানক আতঙ্ক, দুঃচিন্তা, হতাশা ও

১৬২. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১২ নভেম্বর ২০১৩ মঙ্গলবার, পৃ. ১

১৬৩. দৈনিক যুগান্তর , ঢাকা ২৩ এপ্রিল ২০১২ সোমবার, পৃ, ১

১৬৪. দৈনিক যুগান্তর,ঢাকা ১ মার্চ ২০১৪, শনিবার,পৃ. ১৪

১৬৫. দৈনিক যুগান্তর, ১ মার্চ ২০১৪ শনিবার, ঢাকা, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

নিরাশার জীবন। কে, কখন, কোথায় অপহরণ ও গুমের শিকার হবে কেউ জানে না। বাসা-বাড়ি হতে চাকুরী বা প্রয়োজনে বের হলেও নিরাপদে ফিরে যাওয়া সুদূর পরাহত। বিভিন্ন কারণে মানুষের ঘরে ফেরা বিলম্বিত বা বিঘ্নিত হতে পারে। কাজ কর্মে কেউ বেশী রাত অবধি আটকে যেতেই পারেন বাইরে। মোবাইল ফোনটি সচল ও স্বছল নাও থাকতে পারে তখন। এ রকম পরিস্থিতিতে স্বজনদের উৎকন্ঠার সীমা থাকে না। কেননা স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যূনতম গ্যারান্টি নেই । রাতে না ফেরা মানুষটির লাশ হয়ে ঘরে ফেরাই যেন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। রাত গড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে আপন মানুষের লাশ উদ্ধারের খবর। ১৭ মার্চ ২০১৪ চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর চাটখিল ও হাতিয়া, খুলনার ফুলতলা, বাঘেরহাটের ফকিরহাট, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও ঝিনাইদহ জেলায় নিখোঁজ ১০ ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ ও হাত পায়ের রগকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। চট্রগামে রাতে ছাত্রলীগ নেতা সহ দুই বন্ধুর লাশ উদ্ধার করা হয় সেপটিক ট্যাংক থেকে। চাটখিলে পুকুরে ও খালে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতার গুলিবিদ্ধ লাশ। খুলনার ফুলতলায় শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় নিখোঁজ স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে। রাজধানীর পাশ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জেই শুধু গত এক বছরে অপহরণ বাণিজ্যের শিকার হয়ে খুন হয় ১৪ জন স্কুল ছাত্র। তাদের মধ্যে ছিল মেধাবী ছাত্র তানবীর মুহাম্মদ ত্বকী ও ইমন অন্যতম।[১৬৬] বেসরকারী সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ২৬৮ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৪৩ জনের লাশ উদ্ধার ও ২৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় ১৪ জনকে। কিন্তু ১৮৭ জনের কোন খোঁজই মেলেনি। নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র ডায়েরি (জিডি) হয়েছে। তবে লাশ পেলে হত্যা মামলা হয়। ২০১১ ও ২০১২ সালে মুন্সিগঞ্জ থানা এলাকার মেঘনা নদী থেকে পুলিশ ৩০টির মতো অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার করে। এগুলোর বেশির ভাগই গুলি করে, শরীরে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১৬৭]আমাদের দেশে এ সব অপহরণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এ দণ্ড সংবিধানে থাকলেও তা প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তেমন কার্যকর আইন হিসেবে প্রয়োগ হয় না। এ অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নজির খুজে পাওয়া বিরল। শাস্তির শৈতল্যের কারণে অপহরণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। অপহরণের পর যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে তাকে ধর্ষণের শাস্তিও প্রদান করতে হবে। আর যদি হত্যা করা হয় তাহলে তাকে হত্যার শাস্তি প্রদান করতে হবে। যদি কেউ অপর কোন মানুষকে ছোট হোক বা বড় অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কোন কাজে খাটায়, তা হলে তাকে তার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক আদায় করে দিতে হবে। আর যদি কোন কাজে না খাটিয়ে কেবল আটকে রাখা হয়, তাহলেও যেহেতু অপহরণকারী তার উপার্জনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে, তাই তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। [১৬৮] যদি অপহৃত ব্যক্তি অপহরণকারীর কাছে থাকা কালে কোন কারণে নিহত হয় কিংবা হিংস্র কোন প্রাণির আঘাতে বা সাপের দংশনে মারা যায় অথবা দেয়াল বা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তাহলে অপহরণকারীকে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে না।[১৬৯] যদি কেউ কোন মহিলাকে

১৬৬. দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা, বুধবার ১৯ মার্চ ২০১৪, পৃ. ৪

১৬৭. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, বুধবার ৩০এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ২)

১৬৮. তবে শাফি‘ ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (; ইবনু কুদামাহ, আল- মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৫)

১৬৯. এটা হানাফী ইমামগণের অভিমত। শাফি‘চঈগণের মতে, এ ধরনের কোন অবস্থায় রক্তপণ আদায় করতে হবে না। (যায়ল‘ ঈ, তাবয়ীন, খ. ৬, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, তাহলে অপহরণকারীর ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অধিকন্তু তাকে মহিলাটির যথাযোগ্য মোহর সমপরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে। [১৭০]

যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান :

যিনা বা ব্যভিচার একটি অত্যন্ত জঘন্য ও কুৎসিত অপরাধ, যা সমাজে চরম নৈতিক বিপর্যয় ও চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এটা ব্যাপকভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে যুবক-যুবতীরা সনাতন বিবাহ পদ্ধতিতে জড়িত না হয়ে পশুদের মত চরম পাশবিক যৌনতায় মেতে ওঠবে। বর্তমানে পশ্চিমা (ইউরোপ,আমেরিকা)সমাজে যৌন স্বাদ আস্বাদনের কোন সীমা ও নৈতিক বিধি-নিষেধের পরোয়া করা হয় না। যে যার সাথে ইচ্ছা সম্মতিক্রমে যৌন সম্ভোগ করতে পারে। আবার সন্তানও জন্ম গ্রহণ করতে পারে। যিনা বা ব্যভিচার সে সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার রূপে গণ্য। এ কারণেই সেখানে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তদুপরি এ অবৈধ যৌনকর্ম এইডস নামক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। এর ফলেই আজ বিশ্বের সচেতন জনসমাজ যিনা পরিহার করে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে যৌনকর্ম সমাধার জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে। সকল ধর্মেই অভিন্নভাবে যিনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে; তবে ইসলামী আইনে এর বীভৎস কদর্যতাকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে। এর নিকটে যেতেও কঠিন ভাষায় নিষেধে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, - "তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব বেশি খারাপ পথ।"[১৭১] একজন ঈমানদারের জন্য তা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়।"[১৭২]

যিনা বা ব্যভিচারের আভিধানিক অর্থ হল পাপকর্ম করা। সাধারণ অর্থে যিনা বলতে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন মিলনকে বোঝানো হয়। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালিগ ও সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন দুজন নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যিনা বলা হয় (হানাফী ইমামগণের অভিমত)।[১৭৩]

শাফি'ঈগণের মতে, যিনা হল "স্বভাবগতভাবে যৌনকামনাময়ী নিষিদ্ধ কোন লজ্জাস্থানের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়াই পুরুষাঙ্গ কিংবা তার মাথা প্রবেশ করা।"[১৭৪]

হাম্বলীগণের মতে, "সামনে কিংবা পেছনের দিকে অশ্লীল কাজ করাকে যিনা বলা হয়।"[১৭৫]

---

১৭০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ১৪৮

১৭১. - ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا (আল-কুর'আন, ১৭ : ৩২)

১৭২. اذا زنى الرجل خرج منه الايمان- (সুলায়মান আবূ দাউদ, *আস- সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল সুন্নাহ), হা.নং. ৪৬৯০; আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৫৬

১৭৩. আল্লামা কাসানী বলেন, اما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المراة الحية في حالة الاختيار العغاري عن حقيقة النكاح وشبهته

(আল-কাসানী, *বদাইউস সানা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩-৪)

১৭৪. ايلاج حشفة او قدرها من ذكر في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبه (আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫)

১৭৫. فعل الفاحشة في قبل او دبر (আল-বহুতী, *দকা'ইক...*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের এক জরীপে দেখা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ এর ১১ মার্চ পর্যন্ত কিশোরী, যুবতী, প্রতিবন্ধী যুবতী, বিধবা সহ ৩,৫৭৭ জন ধর্ষণ বা ব্যভিচারের শিকার হয়েছেন।[১৭৬]ইসলামে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হল রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা। কিন্তু এ শাস্তির নতুনভাবে ইসলামে প্রবর্তন করা হয়নি; বরং তাওরাতেও এ শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারীর যিনা করার অপরাধের শাস্তির কথা জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের তাওরাতে রজমের শাস্তি দেখতে পাও কি? জবাবে তারা বললো, এরূপ অপরাধে আমরা তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করি এবং তাদের দুররা ও মারা হয়। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে তো বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার অপরাধে রজমের কথা বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর তাওরাত আনা হলো ও খুলে ধরা হলে একজন রজমের নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রাখল ও তার পূর্বের ও অপরের অংশ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) বললেন, তোমরা হাত তুলে ফেল। হাত তুলে নিতেই আয়াতটি সকলে দেখতে পেলেন। তখন ইয়াহুদীরা স্বীকার করল যে, তাওরাতে রজমের নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিত রয়েছে। অতঃপর তদানুযায়ী রজম করার নির্দেশ জারী করা হলো।[১৭৭]আর তাওরাতের যে বিধানগুলো রহিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তীতে অবতীর্ণ ইঞ্জিলের বিধান রূপেও গণ্য হয়ে থাকে। তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, তা সত্ত্বেও আজকের তাওরাতে সেই রজমের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।[১৭৮]তবে বর্তমানে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা এ শাস্তি কার্যকর করে না। তাতে অবশ্য এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

ইসলামের আর্বিভাবের সময় আরব সমাজে যিনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ অবৈধ যৌনচর্চায় কলুষিত সমাজকে সফলভাবে সংশোধন করার দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে প্রথমবারেই তার চূড়ান্ত শাস্তির বিধান জারি করা হয়নি; বরং তা ক্রমে ক্রমে জারি হয়েছে, যাতে জনগণের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ হয়। ইসলামের প্রথম দিকে বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি ছিল গৃহবন্দী করে রাখা। আর অবিবাহিতের শাস্তি ছিল কথা ও কাজের সাহায্যে কিংবা বেত্রাঘাত করে কষ্টদান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমাদের যে সব মহিলা নির্লজ্জতার কাজ করবে, তোমাদের মধ্য থেকে তাদের এ অপকর্মের চারজন সাক্ষী কায়িম কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ, যতক্ষণ না তারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন উপায় বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দুজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদেরকে কষ্ট দাও। তবে তারা যদি তাওবাহ করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে আর কষ্ট দিওনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে তাওবাহ কবুলকারীর ও অতিশয় মেহেরবান।”[১৭৯] এখানে প্রথম আয়াতে من نسائكم বলে বিবাহিতাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে والذان يأتيانه দ্বারা অবিবাহিত নারী-পুরুষদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ দু'আয়াতে দু'ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ দু'ধরনের শাস্তির মধ্যে একটি ছিল অধিকতর কঠোর। আর তা বিবাহিতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

---

১৭৬. দৈনিক দিনকাল ১২ মার্চ ২০১৪, বুধবার, পৃ. ৮

১৭৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল মানাকিব),হা. নং. ৩৪৩৪

১৭৮. পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, সূত্র-২১, ২২ ও ২৩

১৭৯. والاتي ياتين الاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدو افامسكو هن في البيوت حتى يتو فاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا- واللذان ياتيانه منكم فاذو هما فان تاباو اصلحا فاعر ضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما- (আল-কুরআন, ৪ : ১৫-১৬)

অপর শাস্তিটি ছিল হালকা। আর তা অবিবাহিতের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এ আয়াতে ব্যভিচারিণীদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ বিষয়ে অচিরেই একটি চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হবে। পরে সে বিধান নাযিল হয়েছে। হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা হল, অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।"[১৮০]এ হাদীস থেকে জানা যায়, যিনাকারীর অবস্থার পার্থক্যের কারণে যিনার শাস্তির মধ্যেও তারতম্য হবে। বিবাহিতের যিনার শাস্তি অবিবাহিতদের হালাল পথে যৌনস্পৃহা পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপারে মনে করা যায় না। অপরদিকে বিবাহিত নারী-পুরুষের যেহেতু হালাল পথেই তাদের যৌন বাসনা পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে, তাই সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে বাইরে গিয়ে যিনা করার মানে হল তাদের মনের মধ্যে অন্যায় প্রবণতা বাসা বেঁধেছে, যা মূলোৎপাটন করা একান্তই জরুরী। তদুপরি তারা নিজেদের মান-মর্যাদা এবং তা লঙ্ঘনের পরিণতি ও বীভৎসতা সম্পর্কে অবহিত। এ কারণেই তাদের শাস্তি তুলনামূলক অধিকতর কঠিন হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

অবিবাহিত বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম-নারী হোক বা পুরুষ যদি যিনা করে, তার শাস্তি হল একশতটি বেত্রাঘাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী- তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।"[১৮১]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,"অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে একশত বেত্রাঘাত।"[১৮২]এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে শাস্তির অংশ হিসেবে ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বেত্রাঘাত করার পরও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে কি না- তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য রয়েছে।

হানাফীগণের মতে, ব্যভিচারীকে নারী হোক বা পুরুষ এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বিচারক যদি রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজণীয় ও কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে হদ্দের অংশ হিসেবে নয়; তা'যীরী শাস্তির আওতায় এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে পারেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, পবিত্র কুরআনে তাদের শাস্তি হিসেবে কেবল বেত্রাঘাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় খবরে ওয়াাহিদের ভিত্তিতে এক বছরের নির্বাসন দন্ড দেয়ার মানে হল কুর'আনের অকাট্য দলীলের ওপর অতিরিক্ত বৃদ্ধি সাধন, যা যুক্তিযুক্ত নয়।[১৮৩]

শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, ব্যভিচারী- পুরুষ হোক বা নারী তাকে এক বছরের জন্য অবশ্যই নির্বাসিত করতে হবে। তাঁদের প্রধান দলীল হল, ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) এর হাদীস, যা

---

১৮০. خذوا عنى خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا-البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة و الرجم- ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯০; সুলাইমান আবূ দাউদ,*সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪১৫

১৮১. الزانية و الزاني فاجدو اكل واحد منهما مائة جلدة- (আল-কুর'আন, ২৪ : ২)

১৮২. البكر بالبكر جلد مائة- মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ আল- মুসলিম, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হূদূদ), হা.নং. ১৬৯০, সুনান আবি দাউদ, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হূদূদ), হা.নং. ৪৪১৫

১৮৩. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অবিবাহিত ব্যভিচারী- নারী হোক বা পুরুষ প্রত্যেককে এক বছরের জন্য নির্বাসন দন্ড দিতে হবে।[১৮৪]

মালিকীগণের মতে, কেবল ব্যভিচারী পুরুষকেই এক বছরের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দেয়া ওয়াজিব। মহিলাদের জন্য নির্বাসনের দন্ড প্রযোজ্য নয়। তাঁদের বক্তব্য হলো, মহিলাদেরকে দূরে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোতায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তদুপরি তাকে একাকী অবস্থায়ও পাঠানো সম্ভব নয়। কোন অমুহরামের সাথে নির্বাসনে পাঠানো হলে, তাকে চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলা দেয়া হবে। আর কোন মুহরামকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে, তা হবে যে অপরাধী নয় তাকে শাস্তি দান করা।[১৮৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিচারক প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে পারবে- এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের যো পরিবেশ- তাতে তাদেরকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠানো হলে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের আরো অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে বেশি। যদি একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে তাদেরকে নির্বাসনের পরিবর্তে এক বছরের জন্য কারাগারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা যেতে পারে। এতে নির্বাসনের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে। সম্ভবত এ ধরনের অবস্থা বিবেচনা করেই হযরত আলী (রা.) দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষ যখন যিনা করল, তখন রায় দিলেন যে, তাদেরকে বেত্রাঘাত করতে হবে, নির্বাসন দেয়া যাবে না। কেননা তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে।[১৮৬]আর বেত্রাঘাত দন্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় তা নিম্নরূপ-

ক. প্রহারের ছড়িটি মাঝারি আকারের হতে হবে। অর্থাৎ বেশি মোটাও হবে না এবং বেশি সরু হবে না। তদুপরি তাতে কোন গিরা থাকতে পারবে না।[১৮৭]

খ. প্রহার ও মধ্যম মানের হতে হবে। বেশি জোরেও মারা যাবে না, যাতে তার প্রাণ নাশ কিংবা কোন অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে এবং এমন হালকাভাবেও মারা যাবে না, যাতে সে কোন কষ্ট অনুভব করবে না।[১৮৮]

গ. শরীরের এক জায়গায় প্রহার করা যাবে না; বরং বিভিন্ন অঙ্গে ভাগ করে করে প্রহার করতে হবে, যাতে ত্বক ফেটে না যায় এবং কোন অঙ্গের ভীষণ ক্ষতি সাধিত না হয়।[১৮৯]

---

১৮৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৭১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৯

১৮৫. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫০৪

১৮৬. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৫

১৮৭. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩০-১; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৯-১৭০

১৮৮. প্রাগুক্ত

১৮৯. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩১-২

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. মাথা, চেহারা, বক্ষ, পেট, গুপ্তাঙ্গ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্পর্শকাতর অঙ্গে প্রহার করা বৈধ নেই।[১৯০]

ঙ. প্রহার করার জন্য মাটিতে শোয়ানো যাবে না। অনুরূপভাবে কোন কিছুর সাথে বেঁধে কিংবা গর্তে খুড়েঁ সেখানে দাঁড় করে প্রহার করাও বিধেয় নয়। পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং নারীকে বসা অবস্থায় প্রহার করতে হবে।[১৯১]হযরত আলী (রা.) বলেন, "পুরুষদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং নারীদেরকে বসা অবস্থায় হদ্দের বেত্রাঘাত করতে হবে।"[১৯২]তবে ইমাম মালিকের মতে, মহিলাদের মতো পুষদেরকেও বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে।[১৯৩]

চ. প্রহার করার জন্য সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা যাবে না। হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, পুরুষের ইজার বা শরীরের নিম্নাংশ আবৃতকারী বস্ত্র ছাড়া অন্যান্য কাপড় খুলে নেয়া হবে। তবে মহিলার কাপড় খোলা যাবে না। তবে তার গায়ে যদি কোন অতিরিক্ত কাপড় কিংবা চামড়ার কোন বস্ত্র থাকে, তাহলে তা খুলে নিতে হবে।[১৯৪] শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, পুরুষ হোক বা নারী- কারো স্বাভাবিক বস্ত্র খুলা যাবে না। তবে চামড়ার কোন বস্ত্র থাকলে কিংবা মোটা কাপড়ের জুব্বা থাকলে তা খুলে নিতে হবে।[১৯৫]

ছ. বেত্রাঘাত করার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।[১৯৬]কেননা হদ্দের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল- লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা, যাতে তারা অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। আর এ উদ্দেশ্য তখনই অতীব উত্তমভাবে অর্জিত হতে পারে, যখন তা প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এক দল ঈমানদার যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[১৯৭]

জ. ব্যভিচারী গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাসের পর নিফাস[১৯৮] শেষে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করা হবে।[১৯৯]

---

১৯০. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩২

১৯১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪০; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫৯-৬০

১৯২. বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা. নং. ১৭৩৬০

১৯৩. সুলাইমান আল-বাজী, আল-মুন্তকা শারহুল মুয়াত্তা প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪২

১৯৪. যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৯; আল-বাজী, আল-মুন্তকা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪২

১৯৫. আল-হায়তমী, *তুজফাতুল মুহতাজ*, খ. ৯, পৃ. *১৭৪; আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩১*

১৯৬. মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, ন্যুনতম চারজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হবে। তবে হাম্বলীগণের মতে, এক দল লোক উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৫৬০)

১৯৭. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين- (আল-কুর'আন, ২৪ : ২)

১৯৮. স্ত্রীলোকদের সন্তান প্রসবের পর তার যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নিফাস বলে। নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন।

১৯৯. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

আর বিবাহিতদেরকে বলা হয় ‘মুহসান’[২০০] পুরুষ হোক বা নারী- যিনা বা ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হল ‘রজম’ বা প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। এ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা ও কাজ উভয় দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া গেছে। ইতঃপূর্বে হযরত ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, “বিবাহিতের শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজম।”[২০১] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যিনার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত উনায়স আল-আসলামী (রা.) কে নিদের্শ দিয়েছিলেন, “যদি মেয়েটি স্বীকার করে, তাহলে তুমি তাকে রজম কর।” (মেয়েটি যিনার কথা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।[২০২] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই যে কয়েকটি রজমের দণ্ড প্রদান করেছেন,[২০৩]তাও বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত।[২০৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি রজম; কিন্তু তার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।[২০৫] তবে চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বস্বীকৃত মত হল- বিবাহিতদেরকে শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়।[২০৬] রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফা রাশিদূনের যুগে বিবাহিতদের যিনার কিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফা রাশিদূন রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন,এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিবাহিতদের শাস্তি রজমের ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারো কারো মতে, বিবাহিতদের যিনার শাস্তি রজম নয়; বেত্রাঘাই।[২০৭]তাদের বক্তব্য হল, পবিত্র কুরআনে রজমের কথা নেই। তদুপরি তা খুবই কঠোর ও নির্মম শাস্তি। তা যদি বাস্তবিকই শরী’আতের বিধান হতো, তাহলে তার উল্লেখ কুরআনে অবশ্যই থাকতো। তাদের কারো কারো মতে, ‘রজম’ তা’যীরী শাস্তির

---

২০০. এখানে محصن বলতে বোঝানো হয়েছে বালিগ, বুদ্ধিমান, মুসলিম ও স্বাধীন ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ নিয়মে বিয়ে করল এবং একবার হলেও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল। সুতরাং নাবালেগ, পাগল ও কাফির বিয়ে করলেও ‘মুহসান’ রূপে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে অশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাও মুহসান গণ্য হবে না। বিশুদ্ধ বিয়ের পর যৌনসঙ্গম না হলেও ‘মুহসান’ বিবেচিত হবে না। কোন ব্যক্তি বিবাহিত কি না তা প্রমানের জন্য অন্ততপক্ষে দুজন সাক্ষী লাগবে। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতে, দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা কোন ব্যক্তি বিবাহিত কি না তা প্রমাণিত হবে। তবে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে, চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। (ইবনু ‘আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪, পৃ.১৭-১৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৪১-৪২)

২০১. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:১৬৯০; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান* (কিতাবুল হূদূদ), হ.নং:৪৪১৫

২০২. فان اعترفت فارجمها মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল শুরূত), হা.নং:২৫৭৫; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:১৬৯৭

২০৩. হযরত মা’ইয ইবন মালিক আল-আসলামী, গামিদ গোত্রের জকৈা মহিলা ও দু ইয়াহুদীকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কর্তৃক রজমের দন্ড প্রদান করার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২০৪. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল- কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:১৬৯৫; সুলাইমান আবূ দাউদ, আস সুনান, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪৩৪, ৪৪৪৬

২০৫. যাহিরী ও যায়দিয়্যা শি’য়া ইমামগণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত ‘উবাহাদ ইবনুস সামিত (রা.) এর হাদীসের ভিত্তিতে বলেন যে, রজমের আগে বেত্রাঘাত করাও জরুরী। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এক ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (আল-মুরতদা, আল-বাহরুয যখখার, খ. ৬, পৃ. ১৪১; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৭)

২০৬. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস আশ-শাফি’ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৭

২০৭. এটা খারিজীদের অভিমত। (আস-সারাখসী, *মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৩৬-৭) বর্তমানে পাশ্চত্য চিন্তার অনুসারী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউও এ কথা বলে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আওতাভুক্ত, হদ্দ নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) তা'যীরী শাস্তি হিসেবেই বিভিন্ন ঘটনায় রজমের দন্ড দিয়েছিলেন।এ আপত্তির জবাব হল, তাদের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কুরআনে কোন বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় কিছু উল্লেখ না থাকলেই যে তা শরী'আতের দলীল হতে পারবে না, তা ঠিক নয়। কারণ, কুরআনের মতো সুন্নাতও শরী'আতের একটি প্রধান উৎস। সুন্নাতে স্পষ্টভাবে রজমের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীনও এ বিধান কার্যকর করেছেন। 'রজম হদ্দ নয়; তা'যীরী শাস্তি তাদের এ কথাও ঠিক নয়। কেননা বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে যে, যিনার হদ্দ প্রমাণ করতে সাক্ষ্যের নিসাব পূরণের প্রয়োজন পড়ে। অথচ তা'যীর প্রমাণ করতে চার জন সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে না। এ প্রসঙ্গে হযরত উমার (রা.) এর বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স.) কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সে অবতীর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল। আমরা তা পড়েছি এবং তা সংরক্ষণ করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) রজমের দণ্ড দিয়েছিলেন। পরে আমরাও তা করিয়েছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সময়ের ব্যবধানে লোকেরা হয়ত বলবে, আল্লাহর কিতাবে আমরা রজমের আয়াত পাচ্ছি না। এভাবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মনে রেখো, রজম আল্লাহর কিতাবেরই বিধান। বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলেই এবং তা সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হলেই, অথবা গর্ভ হয়ে গেলে কিংবা কেউ স্বীকার করলেই তা কার্যকর হবে।"[২০৮]তিনি আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! 'উমর (রা.) আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে লোকেরা এ কথা বলে বেড়াবে। এ আশঙ্কা না হলে আমি অবশ্যই কুরআনে আয়াতটি লিখে দিতাম।"[২০৯]

আবার কেউ মনে করেন যে, সূরা আন নূরের যিনা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর রজমের বিধান রহিত হয়ে গেছে। এ কথাও ঠিক নয়। কেননা এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সূরা আন নূর নাযিল হবার পরও রাসূলুল্লাহ (স.) স্বয়ং রজমের দণ্ড কার্যকর করেছেন। সুরা আন- নূরে বর্ণিত বেত্রাঘাতের হুকম থেকে রজমের বিধানকে খাস করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা এরূপ খাস করা জায়িয। হানাফীগণের মতে, মাশহুর ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আয়াতকে খাস করা বৈধ। যেহেতু রজমের হাদীসসমূহ অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, তাই বেত্রাঘাতের বিধান থেকে রজমের বিধানকে খাস করা অধিকাংশ ইমামের মতে সঠিক হয়েছে।[২১০]এ রজম কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে-

ক. রজমের দণ্ড প্রাপ্ত পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তাকে শক্তভাবে বাঁধার কিংবা গর্ত খুড়ে তার মধ্যে তাকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। হযরত 'আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) যখন হযরত মা'ইয (রা.) কে রজম করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা তাকে বাকী'র দিকে নিয়ে গেলাম। তাঁর জন্য আমরা গর্তও খনন করিনি, তাঁকে

---

২০৮. ان الله بعث محمدا (ص) بالحق و انزل عليه الكتاب- فكان فيما انزل عليه اية الرجم- فقر اناهو وعيناه- و رجم رسول الله (ص)- ورجمنا من بعده- واني خشيت ان طال بالناس الزمان ان يقول قائل: مانجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنسائ اذا كان محصنا اذا قامت البينة او كان حمل او اعتر اف- মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল- মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯১; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪১৮

২০৯. সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস- সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪১৮

২১০. আল-জাসসাস, *আহকামূল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধিনি।[২১১]রজমের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মেয়ে হয়, তাহলে তাকে বসা অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তার জন্য গর্ত খনন করা জরুরী কিনা তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, গর্ত খনন করা আর না করা বিচারক কিংবা শাসকের ইখতিয়ার। বিচারক কিংবা শাসক অবস্থানুপাতে যা ভাল মনে করবেন, তা-ই করতে পারবেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও অন্যান্যের মতে, তাকে গর্তের মধ্যে দাঁড় করানোই উত্তম। কেননা গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলে, তা হবে মহিলাদের পর্দার জন্য অধিকতর উপযোগী। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) গামিদিয়্যাকে রজম করার জন্য তার বুক পর্যন্ত একটি গভীর গর্ত খনন করেছিলেন।[২১২]তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমেদ (রহ.) প্রমুখের মতে, গর্ত খনন না করাই উত্তম। তবে তার দেহ যাতে কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে না যায়, এ জন্য কাপড় দিয়ে শরীরকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা প্রয়োজন।[২১৩]যিনা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে শাস্তিদানের অনুষ্ঠানে সাক্ষীদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং তারাই সর্বাগ্রে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করবে। যদি তারা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, তা হলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। অন্যান্যদের মতে, সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী নয়।[২১৪]

গ. প্রস্তর নিক্ষেপের সময় কেউ পালিয়ে যেতে থাকলে তার পচাঁদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করতে হবে। কারো কারো মতে, যদি পালানোর আশঙ্কা থাকে, তা হলে তাকে কোন কিছুর সাথে বেঁধে রেখে কিংবা গর্ত খুঁড়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যাবে। তবে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী ব্যভিচারী হলে তার পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না; তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ স্থগিত রাখতে হবে। কেননা তার এ পলায়ন তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম দেয়।[২১৫]

ঘ. বিশাল খোলামেলা জায়গায় রজম কার্যকর করা দরকার, যাতে কারো গায়ে কোন চোট লাগা ছাড়াই সহজে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়। এ সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। শাসক কিংবা তাঁর কোন প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত থাকবেন। লোকজন নামাযের কাতারের মতো বিভিন্ন সারিতে ভাগ করে দাঁড়াবে। একদল প্রস্তর নিক্ষেপ করার পর পেছনে সরে যাবে আর অন্য দল এগিয়ে এসে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। হাম্বলী ও শাফি'ঈগণের মতে, যিনা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে তারা অপরাধীকে বৃত্তাকার চারদিকে থেকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে, যাতে সে কোনভাবে পালাতে না পারে। তবে হাম্বলীগণের মতে, স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারীর ক্ষেত্রে এরূপ না করাই উত্তম। যাতে সে পালিয়ে শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।[২১৬]

ঙ. পাথরের আকার মাঝারি অর্থাৎ সহজে হাতে বহন যোগ্য হতে হবে। তার আকার খুব বড়ও হবে না,

২১১. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আর-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯৪; বায়হাকী, *আস-সুনাল আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৬৭৭৪

২১২. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল- মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯৫

২১৩. ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪০; আল-মরদাভী, *আল- ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৬১

২১৪. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮৪

২১৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪০; আস-সারাকসী, *আল-মাবসূত*, ক.৯, পৃ.৬৯-৭০

২১৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৫; আল-বহুতী কাশশাফ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

যাতে সে খুব দ্রুত মারা যায়। আর তাতে প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড দানের উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ন হবে। আবার এমন ছোটও হবে না, যাতে মৃত্যু খুবই বিলম্বিত হয় এবং পীড়ন দীর্ঘায়িত হবে।[২১৭]

চ. মালিকীগণের মতে, নাভী থেকে দেহের ওপর পর্যন্ত সহজে আক্রান্ত হয় এরূপ দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়। তবে চেহারা ও গুপ্তাঙ্গে নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, চেহারার একটি বিশেষ মর্যাদা থাকার কারণে প্রস্তরের আঘাত থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।[২১৮]

ছ. ব্যভিচারিণী গর্ভবর্তী হলে গর্ভ খালাসের পর শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি সন্তানকে দুগ্ধদান করার মতো কেউ না থাকে, তাহলে দুধ পানের মেয়াদ শেষ হবার পরেই শাস্তি কার্যকর করা হবে।[২১৯]

প্রস্তর নিক্ষেপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সাথে একজন মৃত মুসলিমের মত আচরণ করতে হবে। তাকে গোসল করাতে হবে, কাফন পরাতে হবে, তার জানাযা পড়তে হবে এবং যথারীতি মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে।[২২০] হযরত মা'ইযের মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের মৃত মুসলিমদের সাথে যে রূপ আচরণ করে থাকে, তার সাথেও সে একই রূপ আচরণ কর"।[২২১]তদুপরি তিনি নিজেই গামিদিয়্যার জানাযা পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২২২]তবে মালিকীগণের মতে, মুসলিম শাসক নিজে তার জানাযা পড়বে না। অন্যরা পড়বে।[২২৩]তাঁর কথার দলীল হল, হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মা'ইযের মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (স.) তার প্রশংসা করেছেন বটে, তবে তার জানাযা পড়েন নি।[২২৪]আর অবিবাহিত ও বিবাহিতদের যিনা বা ব্যভিচারের উল্লেখিত শাস্তি প্রয়োগের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী থাকতে হবে-

ক. যিনার অপরাধে লিপ্ত নর-নারীকে মুসলিম হতে হবে। যদি কাফির পুরুষ কাফির নারীর সাথে যিনা করে, তাহলে তাদের ওপর শরী'আতের হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয় শাস্তি কিংবা তাদের ধর্মীয় শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে, তাহলে মালিকীগণের মতে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে না; তবে মুসলিম মহিলার ওপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি সে মুসলিম নারীকে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে, মুসলিম হোক কিংবা যিম্মী

২১৭. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, ক. ৭, পৃ. ১৩৪; আর–আনসারী, , প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৩

২১৮. আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫০; ইবনু গুনায়ম, *আল-ফাওয়াকিহ আসনাল মাতালিব...*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫

২১৯. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৮ যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৫

২২০. আল-বহুতী, *কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯১; আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৫

২২১. اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, হা.নং. ১১০১৪

২২২. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯৬

২২৩. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০৯

২২৪. আল বায়হাকী, *আস-সুনাল আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৬৭৩২

Dhaka University Institutional Repository

(ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) সকলের ওপর হদ্দের বিধান কার্যকর করা হবে।[২২৫]

খ. যিনার অপরাধে লিপ্ত নর বা নারীকে মুকাল্লাফ (শরী'আতের নির্দেশাবলী পালনে আদিষ্ট) অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।[২২৬]সুতরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক নর বা নারী কিংবা পাগলরা যদি যিনা করে, তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"তিন ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ বালক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল থেকে হুশ ফিরে পাওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে রাখা হয়।" অর্থাৎ তাদের দোষত্রুটিগুলো আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে না।[২২৭]তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা'যীরের আওতায় আদালত তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে।

গ. পুরষাঙ্গ পুরোই কিংবা পুরুষাঙ্গের কর্তিত সম্পূর্ণ অগ্রভাগ যদি নারীর যৌনীতে প্রবেশ করে, তবেই হদ্দের বিধান কার্যকর করা হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, পুরুষাঙ্গ সম্প্রসারিত হোক বা না হোক- সর্বাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি পুরুষাঙ্গ মোটেই প্রবেশ করানো না হয় কিংবা মাথার সামান্য অংশই প্রবেশ করানো হয়, তাতে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ ধরনের অবস্থাকে যৌন সঙ্গম বলা হয় না।[২২৮]

ঘ. হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনাকারীর যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। হযরত 'উমার, উসমান ও 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন "হদ্দ কেবল সে ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে, যে তা জানে।"[২২৯]যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কিংবা মুসলিম সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী অথবা যিনার বৈধতায় বিশ্বাসী জনসমাজের সাথে বসবাসকারী কোন ব্যভিচারী যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করে এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণও মিলে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২৩০]হযরত সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানের জনৈক ব্যক্তি যিনা করেছিল। এ খবর হযরত 'উমার (রা.) এর কাছে পৌঁছার পর তিনি চিঠি লিখে জানালেন যে, "যদি সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলা যিনা হারাম করেছেন, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে না জানে, তাহলে তাকে বিধানটি জানিয়ে দাও। এর পর যদি সে ফের যিনা করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো।" অন্য একটি ঘটনায় যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করায় যিনা করার পর সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তিকেও হযরত 'উমার (রা.) ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২৩১]এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যিনাকারীর জ্ঞান থাকতে হবে। তবে মুসলিম সমাজে বসবাসী কনো মুসলিম যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।কেননা মুসলিম সমাজে বসবাসে করে যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অনবহিত থাকবে- তা অসম্ভব ব্যাপার।

---

২২৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫০; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪

২২৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭২, ১৮৭

২২৭. সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৩৯৯, ৪৪০১; ৪৪০২

২২৮. لاحد الامن علمه আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫-৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪৮

২২৯ ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৬

২৩০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৫; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৯

২৩১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. যদি নিজের স্ত্রী নয় এমন কোন নারীর সম্মুখভাগের জননেন্দ্রিয় দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তা হলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যদি পশ্চাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তাহলেও অধিকাংশ ইমামের মতে যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা পশ্চাদ্বারও সম্মুখভাগের মতোই যৌনলিপ্সা পূরণের একটি গুপ্তাঙ্গ। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে না; বরং তা'যীর করা হবে। শাফি'ঈগণের মতে, এমতাবস্থায় কেবল পুরুষের ওপরই হদ্দ কার্যকর করা হবে। নারীকে-বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে। যদি কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে, তাহলে তাদের ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে স্বামীকে এ অযাচিত কাজে লিপ্ত হবার দরুন তা'যীর করা হবে। শাফি'ঈগণের মতে, যদি সে বারংবার করে, তবেই তাকে তা'যীর করা যাবে।[২৩২]

চ. যদি নারী-পুরুষ দুজনেই সম্মত হয়ে সঙ্গম করে তাহলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যিনা অবস্থায় নারী যদি অনড় ও শান্ত থাকে, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে এ কাজে সম্মত রয়েছে। যদি কোন মেয়েকে বলাৎকার করা হয় কিংবা জোরপূর্বক ছিনতাই করে ধর্ষণ করা হয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আমার উম্মাত থেকে ভুল-ত্রুটি ও জোরপূর্বক যে সব কাজ করা হয় তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[২৩৩]হযরত ওয়া'ইল (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য বের হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে জোরপূর্বক তাঁর সতীত্ব হরণ করে। মহিলার চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন জড়ো হল এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (স.) ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২৩৪]অনুরূপভাবে কোন পুরুষকেও জোর জবরদস্তি করে যিনা করতে বাধ্য করা হলে তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না, সে বেকসুর খালাস পাবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হাম্বলী ও অধিকাংশ মালিকীর মতে, তার ওপরও হদ্দ কায়েম করতে হবে। তাদের কথা হল, যদিও তাকে যিনা করতে বাধ্য করা হচ্ছে; কিন্তু রতিক্রিয়াটি যেহেতু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা ছাড়া সুসম্পন্ন হতে পারে না, তাই শান্ত ভাবে যিনা করার অর্থ দাঁড়ায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই যিনা করেছে। ইমাম শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে সাহেবাইনের মতে, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার বা তার প্রতিনিধি কোন পুরুষকে জোরপূর্বক যিনা করতে বাধ্য করলে যিনাকারীর শাস্তি হবে না। তবে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র প্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ হলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী তা'যীর (সাধারণ দন্ড) ভোগ করবে। কোন কারণে শাস্তি মওকুফ হলে ধর্ষণকারী কর্তৃক ধর্ষিতাকে যথোপযুক্ত মোহর পরিমান অর্থ প্রদান করতে হবে।[২৩৫]

ছ. হানাফীগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনা ইসলামী রাষ্ট্রেই সম্পন্ন হতে হবে। কোন মুসলিম যদি দারুল হারবে (অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্র) যিনা করে দেশে ফিরে আসে এবং বিচারকের কাছে নিজের কথা স্বীকার করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দারুল হারবে চুরি কিংবা যিনা করে হদ্দের শাস্তি ভোগের উপযোগী হল। এরপর সে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে

---

২৩২. আল-আনসারী, *মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪

২৩৩. رفع عن امتي الخطاو النسيان وما استكرهوا عليه- আল-জসসাস, আহকামূল কুর'আন, খ. ১, পৃ. ৬; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, খ, ২, পৃ. ১৪৫

২৩৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত- তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:১৪৫৪

২৩৫. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৯, খ. ২৪, পৃ. ৮৯-৯০

Dhaka University Institutional Repository

আসল, তাহলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।"[২৩৬]তদুপরি হানাফীগণের মতে, কোন অভিযানের সময় শত্রু দেশে অবস্থান কালেও কারো ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না।[২৩৭] হযরত আবু দারদা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শত্রু দেশে কোন হদ্দের অপরাধীর ওপর হদ্দ কায়িম করতে নিষেধ করতেন।[২৩৮] শাফি'ঈগণের মতে, দারুল হারবে হদ্দ কায়েম করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি অপরাধী মুরতাদ হয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হবার কোন আশঙ্কা না থাকে। হাম্বলীগণের মতে, কোন মুসলিম যদি শত্রুদেশে কোন হদ্দের অপরাধ করে, তাহলে শত্রুদেশে তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না; বরং দেশে ফিরে আসার পরেই তার ওপর হদ্দ কায়িম করা হবে।[২৩৯]

জ. হানাফীগণের মতে হদ্দ কায়েমের জন্য যিনাকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাওয়ায় কোন বোবার ওপর কোনক্রমেই হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। এমন কি সে যদি চার চার বার লিখে কিংবা ইশারা করে বোঝায় যে, সে যিনা করেছে এবং সাক্ষীরাও যদি তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। তবে অপরাপর ইমামগণের মতে, যিনার হদ্দের শাস্তি প্রয়োগের জন্য ব্যভিচারীর বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে, বোবা যদি যিনা করে এবং সে যদি লিখে কিংবা ইশারা করে বোঝায় যে, সে যিনা করেছে অথবা সাক্ষীরা যদি তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা ওয়াজিব হবে।[২৪০]

ঝ. অধিকাংশ ইমামের মতে, অবৈধ যৌনকর্মকে হদ্দের উপযোগী যিনার আওতায় ফেলতে হলে নারী-পুরুষ দুজনকেই জীবিত হতে হবে। যদি কোন পুরুষ কোন মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করে, তা যিনা রূপে গণ্য হবে না এবং এ জন্য তাকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা হদ্দের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরী'আতের উদ্দেশ্য হল সমাজকে এ ধরনের গর্হিত অপরাধ থেকে সুরক্ষা করা। আর এ ধরনের কাজকে বিকৃত রুচির লোক ছাড়া সুস্থ স্বভাবের সকল লোকেই ঘৃণা করে থাকে। অতএব হদ্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার প্রয়োজন পড়ে না। তবে অপরাধী যা করেছে তা যেহেতু নিশ্চয়ই একটি জঘন্য অপরাধ, তাই তা'যীরের আওতায় আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী সে শাস্তিযোগ্য হবে।[২৪১]মালিকীগণের মতে, যে ব্যক্তি মৃতের সাথে যোনী কিংবা গুহ্যদ্বার যে কোন পথে সঙ্গম করবে, তার ওপর ও হদ্দ কায়িম করা ওয়াজিব হবে।[২৪২]কোন মহিলা যদি কোন মৃত পুরুষের পুরুষাঙ্গকে নিজের যোনীতে প্রবেশ করায়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, যেহেতু সে এতে কোন রূপ স্বাদ লাভ করতে পারে না, তাই তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২৪৩]

---

২৩৬. من زنى او سرق في دار الحرب واصاب بها حداثم هرب فخرج الينا فانه لا يقام عليه الحد- - ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ, ৫, পৃ. ২৬৬

২৩৭. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮২

২৩৮. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৭

২৩৯. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৬৯; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৬-৭

২৪০. আল-বহুতী, *কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৯; শায়খী যাদাহ, *মাজমা'..*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৩২-৩

২৪১. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৫; ইবনুল *ফাতহুল কাদীর*, হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৪

২৪২. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪

২৪৩. *আল-মাওসূ'আতুর ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ঞ. যিনার হদ্দ ওয়াজিব হবার জন্য যিনাকারীদের দুজনের একজনকে পুরুষ আর অপরজনকে নারী হতে হবে। যদি দুজনই সমজাতীয় হয় কিংবা একজন পশু হয়, তাহলে কারো ওপর হদ্দ কায়িম কার্যকর করা যাবে না।

ট. যিনার হদ্দ কার্যকর করার জন্য যৌন মিলনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারবে না। কেউ যদি কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো সাথে সঙ্গম করে, তাহলে একে যিনা হিসেবে বিবেচনা করে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না; তবে ক্ষেত্রবিশেষ সন্দেহের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে আদালত প্রয়োজন মনে করলে তাকে যথোপযুক্ত তা'যীরী শাস্তি দিতে পারবে।[২৪৪]এ সন্দেহ বিভিন্ন ধরণের হতে পাওে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

প্রথমত স্ত্রী মনে করে কারো সাথে সহবাস করা যেমন- কেউ যদি বাসর রাতে নিজের শয্যায় শায়িত কোন মেয়েকে দেখতে পেল এবং বাড়ির লোকজনও তাকে বলল যে, সে তার স্ত্রী। এমতাবস্থায় সে নিজের স্ত্রী মনে করে যদি তার সাথে সহবাস করে, তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে নিজের বিছানায় শায়িত কোন ঘুমন্ত মেয়ে দেখতে পেয়ে তাকে স্ত্রী মনে করেই সহবাস করে, তাহলে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে এরূপ অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় কেউ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার করে দাবী করে যে, সে তাকে স্ত্রী মনে করেই সঙ্গম করেছে, তা হলে তার কথা ধর্তব্য হবে না।[২৪৫]

দ্বিতীয়ত কোন মেয়েকে নিজের জন্য হালাল মনে করে সহবাস করা যেমন- কেউ যদি নিজের তিন তালাকপ্রাপ্তা কিংবা খুলা'আ তালাকাপ্রাপ্তা বা এক তালাকে বায়িন প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে সঙ্গম করে এবং বলে যে, এ অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম- তা তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবেনা: তবে আদালত বিবেচনা করলে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দিতে পারে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় কেউ সঙ্গম করা নিষিদ্ধ জেনে সঙ্গম করলে তা যিনা হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আইনসিদ্ধভাবে তিন তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষে আইনসিদ্ধ পন্থা ব্যতীত তাকে স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নিলে, অতঃপর তার সাথে সঙ্গম করলে উক্ত সঙ্গমক্রিয়া যিনা হিসেবে গণ্য হবে এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনের ওপরই যিনার হদ্দ কার্যকর হবে।[২৪৬]

তৃতীয়ত কোন মুহরামা আত্মীয়ার সাথে রীতিমত 'আকদ সম্পন্ন করে সহবাস করা । যে সব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, সে সব মহিলার সাথে যদি কেউ আকদ সুসম্পন্ন করে সহবাস করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে তাকে মোহর আদায় করতে হবে এবং তাকে কঠোরতম তা'যীর শাস্তি দেয়া হবে, যদি সে হারাম জেনেই এ কাজ করে থাকে। যদি সে না জেনেই এ কাজ করে, তাহলে না তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে, না তা'যীর। এটা ইমাম আবু হানিফা(রহ.) অভিমত। তবে সাহেবাইনের মতে, যদি সে হারাম জানার পরে এ কাজ করে থাকে, তাহলে তার ওপর হদ্দ জারি করা হবে। যদি না জেনেই করে থাকে, তবেই তার

---

২৪৪. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২

২৪৫. আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৭

২৪৬. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৬-৭; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪-৫। অন্যান্য ইমামগণের মতে- সর্বাবস্থায় এ ধরনের ব্যক্তির ওপর হদ্দ কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে। (ইবনু কুদামাহ, আল- মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪ -৫)

Dhaka University Institutional Repository

ওপর হদ্দ জারি করা হবে না।[২৪৭]

চতুর্থত অবৈধভাবে কিংবা বিতর্কিত বিয়ে করে সহবাস করা যেমন- সাক্ষ্য ছাড়া বিয়ে করা কিংবা যে বিয়ের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে বির্তক রয়েছে। (যেমন- অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা) কেউ যদি এ ধরণের বিয়ে করে সহবাস করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। এ বিষয়ে ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই।[২৪৮]

পঞ্চমত যে সব অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম (যেমন-হায়েয কিংবা রোযা বা ইহরামরত অবস্থা), কেউ যদি এ সব অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না।২৪৯যিনা বা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হয়-

১. যিনাকারী পুরুষ বা নারী যদি নিজেই মুখে স্বীকার করে যে, সে যিনা করেছে, তাহলে তা দ্বারা যিনা প্রমাণিত হবে। তবে এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে।এগুলো হল-

প্রথমত স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত সমূহ-

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেও হদ্দ কার্যকর হবে না।

খ. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। পাগল ও মাতাল ব্যক্তির স্বীকারোক্তি আমলে নেয়া হবে না।

গ. বাকসম্পন্ন হতে হবে। ইশারা ও লিখিত ভাবে স্বীকার মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার মতো। তবে বোবাদের স্বীকারোক্তি হানাফীগণের মতে আমলযোগ্য নয়। অন্য তিন ইমামের মতে বোবার লিখিত ও ইশারায় স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, যদি ইশারা দ্বারা যিনা বোঝায়।[২৪৯]

ঘ. পূর্ণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ার থাকতে হবে। জোর-জবরদস্তি করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত স্বীকারোক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ-

১. চার বার স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তাঁদের মতানুযায়ী চারবারের কম স্বীকারোক্তি করলে যিনার শাস্তি কার্যকর হবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইয (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে এসে যিনার স্বীকারোক্তি দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) তার দিক মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিনি চারবারই স্বীকারোক্তি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রথম তিন বারেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার তার কথা আমলে নিলেন।[২৫০]এ থেকে জানা যায় যে, যদি একবার স্বীকারোক্তি হদ্দের জন্য যথেষ্ট হত, তা হলেই রাসূলুল্লাহ (স.) কেনই বা চতুর্থবার স্বীকারোক্তি দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, চার চারবার স্বীকার করার প্রয়োজননেই;

---

২৪৭. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৯-১৮০

২৪৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৫

২৪৯. *আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৫

২৫০. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*,প্রাগুক্ত, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৬৯১, ১৬৯২; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

বরং একবার করাই শাস্তি কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট।[২৫১]

২. যে সব ইমামের দৃষ্টিতে, চার বার স্বীকৃতি দিতে হবে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হানাফীগণের মতে, এই চারবার ভিন্ন ভিন্ন চারটি এজলাসে সম্পন্ন হতে হবে। তবে অন্যদের মতে, এক মজলিসে চারবার স্বীকৃতি দানও যথেষ্ট হবে।[২৫২]

৩. বিচারকের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে।[২৫৩]

৪. স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনা সম্বলিত হতে হবে। অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কখন, কার সাথে, কোন স্থানে, কোন অবস্থায় ও কিভাবে সঙ্গম করা হল তার বিশদ বিবরণ স্বীকারোক্তিতে থাকা প্রয়োজন।[২৫৪]

৫. স্বীকারোক্তির উপর অটল থাকতে হবে। যদি স্বীকারোক্তি প্রদানকারী নারী-পুরুষ কোন পর্যায়ে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাছাড়া হদ্দ কার্যকর করার সময়েও যদি কেউ নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে, তাহলে বাকী হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইয (রা.) যখন পাথরের প্রচন্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে পালাতে শুরু করলেন, তখন লোকেরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরে ফেলে এবং প্রস্তরাঘাতে সে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করল। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘটনাটি জানতে পেরে বললেন, "তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? হয়ত সে তাওবা করত এবং আল্লাহও তার তাওবা কবুল করতেন।"[২৫৫]এ থেকে জানা যায় য়ে, স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এ রূপ অবস্থায় হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না।[২৫৬]

গ. অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পর স্বীকারোক্তি দান অধিকাংশ ইমামের মতে, অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পরেও যদি কেউ যিনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা আমলে নিয়ে হদ্দ কার্যকর করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যদি কেউ চল্লিশ বৎসর পরে এসেও স্বীকার করে, তাহলেও আমি তার ওপর হদ্দ কার্যকর করব।[২৫৭]

চতুর্থত স্বীকারোক্তি দানকারীকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। অধিকাংশ ইমামের মতে, যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিচারকের কাছে গিয়ে যিনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে বিচারক তাকে তারস্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। শাফি'ঈগণের মতে, এটা জায়িয। আর হানাফী ও

২৫১. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩২; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ,* প্রাগুক, খ. ৪, পৃ. ৪৭২

২৫২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬১; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৯-৯২

২৫৩. মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩২

২৫৪. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৩; যায়ল'ঈ, ***তাবয়ীন,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৬**

২৫৫. هلا تر كتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه **সুলাইমান আবূ দাউদ**, *আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪১৯

২৫৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২২-৩; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ, ৪, পৃ. ১০

২৫৭. *আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫১; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৯, পৃ.৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হাম্বলীগণের ইমামগণের মতে, এটা বিচারকের জন্য মুস্তাহাব। তাঁদের বক্তব্য হল, বর্ণিত রয়েছে, হযরত মা'ইজ (রা) যিনার স্বীকৃতি দেবার পর রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে বললেন, সম্ভবত তুমি তাকে চুমা দিয়েছ বা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছ কিংবা তার প্রতি নজর দিয়েছ।[২৫৮] এ থেকে জানা যায়, বিচারকের জন্য স্বীকৃতি দানকারীকে নিজের বক্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা সমীচীন।[২৫৯]আর একজন যিনার স্বীকারোক্তি করলে এবং অপরজন অস্বীকার করলে স্বীকারোক্তিকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর হবে এবং অস্বীকারকারী রেহাই পাবে। যেমন একজন পুরুষ একজন মেয়ের সাথে যিনা করল। পুরুষটি অপরাধ স্বীকার করল; কিন্তু মেয়েটি অপরাধ অস্বীকার করল। এ অবস্থায় যে অপরাধ স্বীকার করেছে, তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে এবং যে অপরাধ অস্বীকার করেছে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এটা সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামগণের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর মতে, এ রূপ অবস্থায় স্বীকারোক্তিকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মহিলাটি স্বীকারোক্তিকারী পুরুষের প্রতি যদি মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ করে এবং সে যদি চার জন সাক্ষী পেশ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে তার ওপর যিনার নয়, কাযাফের হদ্দ কার্যকর করা হবে।[২৬০]হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল এবং যে নারীর সাথে যিনা করেছে তার নামও বলল। রাসূলুল্লাহ (স.) সে নারীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে অপরাধ অস্বীকার করল। তিনি স্বীকারোক্তিকারী পুরুষটির ওপর হদ্দ কার্যকর করলেন এবং মেয়েটিকে রেহাই দিলেন।[২৬১]অনুরূপভাবে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া কেউ যিনার করে অস্বীকার করলে তার ওপর ও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনকি এ অপরাধ প্রকাশিত হয়ে না পড়লে তা গোপন করে রাখাই শ্রেয়।

২. যিনা প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সাক্ষ্য-প্রমাণ। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাবে। তবে এ জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন-

প্রথমত সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ-

১. সাক্ষীদেরকে মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে মুসলিম হতে হবে। যদি কোন একজন সাক্ষীও অমুসলিম হয়, তাহলে সাক্ষ্যের নিসাব পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও"।[২৬২]এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা منكم (তোমাদের মধ্য থেকে) বলে কেবল মুসলিমগণকে বুঝিয়েছেন।

২. সাক্ষীদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। যিনার ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও পাগলের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৫৮. সুলাইমান আবূদাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪১৯, ৪৪২৭

২৫৯. আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৩; যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৭

২৬০. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬১

২৬১. সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪৩৭

২৬২. فاستشهدوا عليهن اربعة منكم- (আল-কুরআন, ৪ : ১৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩. সাক্ষীদেরকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। যিনার ক্ষেত্রে ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদেরকেই সাক্ষী বানাবে।"[২৬৩]

৪. সাক্ষীদেরকে পুরুষ হতে হবে। চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, যিনার চারজন সাক্ষীর প্রত্যেককেই পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।[২৬৪]আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।[২৬৫]এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, যিনা প্রমাণের জন্য পুরুষদের সাক্ষ্যই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে।

৫. সাক্ষীদের সংখ্যা চার হতে হবে। যিনা প্রমাণের জন্য চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি সাক্ষীদের সংখ্যা একজনও কম হয়, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে যিনা প্রমাণিত হবে না। উপরন্তু, যারা সাক্ষ্য দেবে, তাদের ওপর অপবাদ রটানোর হদ্দ কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা অবিবাহিত সতী মহিলাদেরকে অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাহরে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর।"[২৬৬]

৬. সাক্ষীদেরকে বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। যিনা প্রমাণের জন্য বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া সরাসরি সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না।[২৬৭]

দ্বিতীয়ত সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ-

ক. চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য একই মজলিসে পেশ করতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য একই মজলিসে হতে হবে। যদি সাক্ষীরা বিচ্ছিন্নভাবে এক এক জন করে কিংবা দুজন দুজন করে বা তিন জন এক সাথে আর অপর একজন পৃথকভাবে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু, তাদের সকলের ওপর যিনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি কার্যকর করা হবে। তবে শাফি'ঈগণের মতে- এ শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন নয়। যদি তারা সম্মিলিত কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে সাক্ষ্য দেয়, একই মজলিসে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[২৬৮]

খ. সাক্ষীদের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও বিশদ হতে হবে। সাক্ষীদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, সুরমাদানীর মধ্যে সুরমা লাগানোর কাঠি যেমন ঢোকা অবস্থায় থাকে, তেমনি তারা পুরুষাঙ্গকে নারীর যোনীর মধ্যে ঢোকানো অবস্থায় দেখেছে। কেননা অনেক সময় সাক্ষীরা এমন অনেক আচরণকে যিনা মনে করে নিতে পারে যে, যা মূলত যিনা নয়। তাই এ ক্ষেত্রে যিনার বিবরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি এ কথাও

---

২৬৩. واشهدوا ذوي عدل منكم (আল-কুরআন, ৬৫ : ২)

২৬৪. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪; যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৪

২৬৫. فاستشهدوا عليهن اربعة منكم- (আল-কুর'আন, ৪ : ১৫)

২৬৬. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانين جلدة- (আল-কুর'আন ২৪ : ৪)

২৬৭. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৩০

২৬৮. আল-বাজী, আল-মুন্তাকা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্দিষ্ট ও বিশদভাবে বলতে হবে, কার সাথে, কি অবস্থায়, কখন ও কোথায় যিনা সংঘটিত হয়েছে।[২৬৯]এ থেকে বোঝা যায়, তারা দুজনে যিনা করেছে- সাক্ষীদের এমন কথার ওপর ভিত্তি করে কারো ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

গ. সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, যিনার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে। সাক্ষীদের থেকে শুনে কেউ সাক্ষ্য দিল তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৭০]

ঘ. সাক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। সাক্ষ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে। যদি তাতে কোন রূপ পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- যদি দুজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা জুম'আ বারে যিনা করেছে এবং অপর দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, তারা শনিবারে যিনা করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি তাদের দুজন দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যিনার সাক্ষ্য দেয় আর অপর দুজন যদি দিনের অন্য সময়ে যিনার সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না। তদুপরি সাক্ষীদের মধ্যে কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলেও যিনা প্রমাণিত হবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীগণের কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তা বিবেচ্য হবে না।[২৭১]

ঙ. সাক্ষ্য দানে বিলম্ব না করা। হানাফীগণের মতে, যিনার অপরাধ সংঘটিত হবার দীর্ঘ দিন পর যিনার সাক্ষ্য দেয়া হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা কাউকে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখার পর প্রত্যক্ষকারীর এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে সমাজের সার্বিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সাক্ষ্য পেশ করবে।[২৭২]অথবা অপরাধটি গোপন করে রাখবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে কোন মুসলিম দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করে রাখবে।"[২৭৩]অপরাধ দেখার পর দীর্ঘ দিন নীরব থাকার মানে হল সে দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিয়েছে। আর দীর্ঘ দিন পর সাক্ষ্য দেয়ার পর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এখন সাক্ষ্য প্রদান করছে। অধিকিন্তু, যে সাক্ষ্য সম্পর্কে জানা যাবে যে, সাক্ষীদাতা কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৭৪]হযরত 'উমার (রা.) বলেন, "যে সব লোক হদ্দের কোন অপরাধ সংঘটিত হবার সময় সাক্ষ্য না দিয়ে অন্য সময় সাক্ষ্য দেয়, তাহলে বোঝে নিতে হবে যে, তারা হিংসা-বিদ্বেষমূলক ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে

---

২৬৯. বাবরতী, *আল-ইনায়াহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৫-৭; মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬

২৭০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯১-২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৬

২৭১. আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৪-৬

২৭২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, واقيموا الشهادة لله, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা সত্য সাক্ষ্য দাও।" (আল-কুরআন, ৬৫ : ২)

২৭৩. من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة (আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ২৫৪৪; আবদুর রযযাক, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং. ১৮৯৩৬)

২৭৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯৭, ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

না।"[২৭৫]অন্যান্য ইমামগণের মতে, যিনার অপরাধ সংঘটিত হবার দীর্ঘ দিন পরেও যদি যিনার সাক্ষ্য দেয়া হয়, তাও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের কথা হল, যুক্তিসঙ্গত বিভিন্ন কারণেও[২৭৬]সাক্ষ্য প্রদানে বিলম্ব হতে পারে।[২৭৭]

তৃতীয়ত যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. যাদের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে এবং যিনার উপযোগী হতে হবে। অতএব যে মেয়ের সাথে যিনার সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে ছোট, সঙ্গমের উপযোগী নয়, তাহলে তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। মেয়েটি ছোট কি না তা প্রমাণের জন্য

হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। শাফি'ঈগণের মতে, এ জন্য চার জন মহিলা কিংবা দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্যের প্রয়োজন।[২৭৮]

ঘ. সাক্ষীরা যিনার সাক্ষ্য দেয়ার পর বিচারক তাদেরকে জেরা করবেন। তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন, যিনা বলতে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছে এবং কোন দিন, কোন সময়, কোন জায়গায় কারা যিনা করেছে। তাছাড়া যিনার অবস্থায় তারা কে কোন অবস্থায় ছিল তাও জানতে চাইবে। এ সব বিষয়ে যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না।[২৭৯]

তৃতীয়ত লক্ষণ ও প্রমাণ সমূহ নিম্নরূপ-

১. কুমারী বা স্বামীহীনা মেয়ের গর্ভবতী হওয়া যিনা প্রমাণ করে। তবে মেয়ে যদি যিনার কথা অস্বীকার করে, তাহলে এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা যাবে কিনা তা নিয়ে ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, হদ্দের উপযোগী শাস্তি প্রমাণের জন্য গর্ভধারণ যথেষ্ট নয়। যিনার হদ্দ কার্যকর করার জন্য এটা নিশ্চিত প্রমাণ অবশ্যই নয়; যিনার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সন্দেহ করা যেতে পারে মাত্র। হদ্দ কার্যকর করতে হলে তাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করত হবে কিংবা যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যেতে হবে। কেননা এ অবস্থায় এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মহিলাটি ধর্ষণের সম্মুখীন হয়েছে কিংবা কোন সন্দেহে পতিত হয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে।[২৮০] হযরত সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : স্বামীহীনা জনৈকা গর্ভবতী মহিলাকে হযরত 'উমার (রা.) এর দরবারে হাযির করা হল। মহিলাটি হযরত 'উমার (রা.) কে বলল, তার খুব গভীর ঘুম হত। একদিন এ অবস্থায় একজন লোক রাতে তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম শুরু করে। সে জেগে দেখতে পায় যে, লোকটি কাজ সেরে চলে গেছে। হযরত উমার (রা.) মহিলাটির

---

২৭৫. ايما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فانما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم- আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৬

২৭৬. যেমন অসুস্থ হয়ে যাওয়া বা জরুরী প্রয়োজনে দূরে কোথাও গমন করা প্রভৃতি।

২৭৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩২

২৭৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৯২-৩

২৭৯. আর-রমলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ২৮৬

২৮০. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৮১-২

Dhaka University Institutional Repository

কথা গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২৮১] এ থেকে জানা যায়, হদ্দের অপরাধ প্রমাণের জন্য শুধু গর্ভধারণ যথেষ্ট নয়। তবে মালিকীগণের মতে, স্বামীহীনা মহিলা গর্ভবতী হলে যিনা প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মহিলা যদি দাবী করে যে, তাকে জবরদস্তি করা হয়েছে বা ছিনতাই করা হয়েছে অথবা সে অবিবাহিতা বাকিরা ছিল, যিনার কারণে তার রক্তপাত ঘটেছে, তাহলে তাকে তার কথার আলামত স্বরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। যদি সে তার কথা প্রমাণ করতে সর্মথ হয়, তবেই তাকে হদ্দ থেকে মুক্তি দেয়া হবে। অন্যথায় তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[২৮২]

২. মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, লি'আনের দ্বারাও যিনা প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য স্ত্রীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে, যদি স্বামী লি'আন করার পর স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকার করে। যদি স্ত্রী লি'আন করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, যদি স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকারও করে, তাহলে ও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। তার লি'আনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কেবল লি'আন করতে অস্বীকার করলেই যিনা প্রমাণিত হয় না। এ জন্য দরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি। তবে বিচারক স্ত্রীকে আটকে রাখবে, যতক্ষণ না সে লি'আন করে কিংবা স্বামীর কথা স্বীকার করে নেবে।[২৮৩]

নাবালিগা, পাগল মেয়ে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যিনার বিধান :

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশু আইনে নারী ও শিশুর অধিকার সংরক্ষণ করেছে এবং আঠার বছর বয়সের কম সবাইকে শিশু হিসেবে অভিহিত করেছে। এজন্য যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ সঙ্গমের উপযোগী কোন ছোট মেয়ের সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি মেয়ে এতই ছোট হয় যে, সে স্বাভাবিকভাবে সঙ্গমের উপযোগী নয়, তাহলে যিনাকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তেমনিভাবে মেয়েটির ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২৮৪]যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ কোন পাগল মেয়ের সাথে সঙ্গম করে, তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মেয়েটির ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২৮৫]নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায় কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে সঙ্গম করলে তা যিনার আওতায় পড়বে এবং অপরাধীর ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[২৮৬]

ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে যিনার বিধানঃ

ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে কেউ যিনা করলে তাতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না।[২৮৭]হযরত সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : স্বামীহীনা জনৈকা গর্ভবর্তী মহিলাকে হযরত 'উমার (রা.) এর দরবারে হাযির করা

২৮১. ইবনু হাজর, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৫৪

২৮২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ.৭৩; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭২

২৮৩. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১০; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৩

২৮৪. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭২, ১৮৭;আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৪

২৮৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪৪

২৮৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৪, পৃ.২৮৯; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৮

২৮৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

হল। মহিলাটি হযরত 'উমার (রা.) কে বলল, তার খুব গভীর ঘুম হত। একদিন এ অবস্থায় একজন লোক রাতে তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম শুরু করে। সে জেগে দেখতে পায় যে, লোকটি কাজ সেরে চলে গেছে। হযরত 'উমার (রা.) মহিলাটির কথা গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২৮৮]

ভুলবশত সঙ্গমের শাস্তির বিধান :

ভুলবশত কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে যিনা করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না।[২৮৯] যেমন দুই ভাই দু সহোদরাকে বিয়ে করল। রাত্রিবেলা ভুলবশত বাসর ঘরে একের স্ত্রীকে অপরেরর সাথে দেয়া হল এবং সকাল বেলা এই ভুল ধরা পড়ল। এ ক্ষেত্রে সঙ্গমক্রিয়াকে যিনা রূপে গণ্য করা হবে না এবং সঙ্গমকারী দুজনেই কোনরূপ শাস্তির সম্মুখীন হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি অন্ধকারের মধ্যে নিজের শয্যায় ঘুমন্ত কোন বেগানা মেয়েকে নিজের স্ত্রী মনে করে সহবাস করে এবং পরে দেখতে পায় যে, যার সাথে সে সহবাস করেছে সে তার স্ত্রী নয়, তাহলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা তার মধ্যে হারাম কাজে লিপ্ত হবার বাসনা ছিল না।

পুরুষদের সমকামিতার শাস্তির বিধান :

যদি দু'জন পুরুষ পরস্পর সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে হানাফীগণের মতে, তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না; তবে তাদেরকে তা'যীর করা হবে এবং বন্দী করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ধারায় ফিরে আসে কিংবা মৃত্যুবরণ করে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, সমকামী দুজনকেই তা'যীর হিসেবে শাসক প্রয়োজন মনে করলে জ্বালিয়ে মেরে ফেলতে পারবে। ইবনুল কাইয়িমও এ মত পোষণ করেন এবং ইবনু হাবীব আল-মালিককীর মতে, তাদেরকে জ্বালিয়ে মারা ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, যেহেতু দুনিয়ায় কোন মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া জায়িয নেই, তাই সমকামীদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা জায়িয নয়।[২৯০] যদি কেউ সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। তবে যেহেতু এ সমকামিতা যিনার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, তাই এ প্রকার অপরাধীর জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[২৯১] ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ এবং হাম্বলীগণের মতে, সমকামী দুজনের ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি তারা অবিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।[২৯২] মালিকীগণের মতে, তারা বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত সর্বাবস্থায় তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। তাঁদের কথার দলীল হল, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যদি তোমরা কাউকে হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের গর্হিত

---

২৮৮. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৫৪

২৮৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২১

২৯০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২১

২৯১. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৭

২৯২. ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭০; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অপকর্ম করতে দেখ, তা হলে কর্তা ও যার সাথে এ কর্ম সম্পাদিত হয়-দুজনকেই হত্যা কর।”[২৯৩] শাফি’ঈগণের মতে, সমকামী কর্তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে আর অপরজনকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দন্ড দেয়া হবে, বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত।[২৯৪]

মহিলাদের সমকামিতার শাস্তির বিধান :

মহিলাদের সমকামিতাকে ইসলামী শরী’আতের পরিভাষায় ‘সিহাক’ বলা হয়। এর অর্থ হল, দু’জন নারী মিলে পরস্পর নারী-পুরুষের মিলনের মতো আচরণ করা। মহিলাদের সমকামিতাও একটি গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “মহিলাদের সমকামিতাও যিনাবিশেষ।”[২৯৫] ইবনু হাজর আল আসকালানী (রহ.) এ কাজকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেন। তবে এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, এ কাজ যেহেতু যিনা নয়, তাই এ কাজের জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে তা একটি গুনাহের কাজ হওয়ায় এর জন্য তা’যীর করা ওয়াজিব হবে।[২৯৬]

পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান :

যদি কেউ কোন পশুর সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে তার ওপর যিনার হদ্দ আরোপ করা যাবে না; তবে তা’যীর করা হবে। হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যে কেউ কোন জানোয়ারের সাথে সঙ্গম করবে, তার ওপর কোন হদ্দ নেই।”[২৯৭]তদুপরি রুচি বিকৃত লোক ছাড়া সুস্থ রুচিসম্পন্ন কেউ এ কাজ করতে পারে না। তাই হদ্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার প্রয়োজন পড়ে না।[২৯৮]তবে সঙ্গমকৃত পশুটিকে নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পশুটিকে মেরে ফেলার দরকার নেই। যদি জন্তুটি যবেহ করা হয়, তাহলে তার মাংস খেতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তা খাবারযোগ্য প্রাণি হয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও মালিকী ইমামগণের অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখ মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। তাঁদের মতে, জন্তুটিকে যবেহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, যাতে পরবর্তীতে কেউ এ জন্তু দেখে ঘটনাটিকে নতুনভাবে চাঙ্গা করতে না পারে।

---

২৯৩. আল-বাজী, আল-মুন্তকা, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৪১ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (সুলাইমান আবূ দাউদ,আস-সুনান (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪৬২; আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হা.নং. ৮০৪৭, ৮০৪৮, ৮০৪৯) উল্লেখ্য যে, হাদীসটি সনদ অত্যন্ত দুর্বল হবার কারণে অনেকেই তা গ্রহণ করেন নি। আবার অনেকেই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য মৃত্যুদন্ডের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অবশ্যই বিচারক অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান প্রয়োজনীয় মনে করলে তা করতে পারেন।

২৯৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি’ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৯৩

২৯৫. السحاق زنى النساء بينهن- *আল-মাওসূ’আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৫২

২৯৬. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪২; আল-আসনারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৬

২৯৭. من اتى البهيمة فلا حد عليه- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং : ৮০৫১

২৯৮. আল-কাসানী, *বদা’ইয়ুস সনা’ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৯। শাফি’ঈগণের এক মতানুযায়ী তার ওপর যিনা হদ্দ কার্যকর করা হবে। আর অন্য মতানুসারে তাকে হত্যা করা হবে। চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। (আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৬)

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করল, তাকে ও পশুটিকে হত্যা করো।"[২৯৯]শাফি'ঈগণের অন্য একটি মতানুসারে, যদি পশুটি খাবারযোগ্য প্রাণি হয়, তাহলে যবেহ করতে হবে, তবে তার গোস্ত খাওয়া হারাম। উল্লেখ্য যে, পশুর সাথে সঙ্গম যিনা না হলেও তা একটি ঘৃণিত অপরাধ। তাই আদালত তা'যীরের আওতায় তাকে যে কোন উপযোগী শাস্তি দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (স.) উপর্যুক্ত হাদীসটিতে কঠোরভাবে সর্তক করার জন্য হত্যার কথা বলেছেন।[৩০০]

কায্ফ বা যিনার অপবাদের শাস্তির বিধান :

কারো বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলা একটি জঘন্য অপরাধ। মুসলিম সমাজে কোন চরিত্রবান পুরুষ বা নারীকে যিনার অপবাদ দেয়া মারাত্মক দুঃখজনক ব্যাপার। অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর এবং সাথে সাথে গোটা সমাজের ওপর এর প্রচন্ড খারপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোন সীমা থাকে না। জনগণের আস্থা থেকে সে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। এই অবস্থা আরো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়ে হয়। এ কলঙ্ক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃ পুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকেও কালিমা লিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে খতম হয়ে যায়। তদুপরি এ ধরণের অভিযোগের ফলে জনসমাজে জঘন্য ও কুৎসিত চরিত্রের কালো ছায়াপাত ঘটে। সন্দেহ-সংশয়, অবিশ্বাস-অনাস্থার মারাত্মক স্রোত গোটা সমাজমানসকে পঙ্কিল ও বিষাক্ত করে তোলে। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমতা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ইসলাম এ ধরণের কান্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যিনার অভিযোগ আরোপ করা ওয়াজিবে পরিণত হয়। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে এমন তুহরের (মাসের পবিত্র অবস্থায়) মধ্যে যিনা করতে দেখে, যে সময় সে তার সাথে সঙ্গম করেনি। এর পর সে তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকল। যদি দেখা যায় যে, যিনার পর ছয়মাসের মধ্যে সন্তান প্রসব করেছে, তাহলে স্ত্রীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা এবং সন্তানকে অস্বীকার করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে ক্ষেত্র বিশেষ যিনার অভিযোগ আরোপ করা মুবাহে পরিণত হয়। যেমন কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে যিনা করতে দেখে কিংবা স্ত্রীর যিনার ব্যাপারটি তার নিকট সুপ্রমাণিত হয়, তবে বংশীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করার মতো কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি, তাহলে স্ত্রীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করতে কোন দোষ নেই।[৩০১] শুধু তাই নয়, যে তা করে, তার ওপর অভিশাপও বর্ষণ করা হয়েছে। তাকে চিরদিনের জন্য আস্থার-অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিনতম শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে সব লোক সচ্চরিত্রা ও অসতর্ক মহিলাদের ওপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি বড় আযাব।"[৩০২]

---

২৯৯. من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيم (আল বায়হাকী, আস- *সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং; ১৬৮১৪; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৪৩)

৩০০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৫-৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৯-৬০

৩০১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৮-৯

৩০২. -ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم (আল-কুরআন, ২৪ : ৩)

Dhaka University Institutional Repository

'কাযফ' এর আভিধানিক অর্থ হল নিক্ষেপ করা, সঞ্চার করা। কাউকে গালি দেয়া, দোষারোপ করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৩০৩]শরী'আতের পরিভাষায় কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদে আরোপ করাকে 'কাযফ' বলা হয়।[৩০৪]অনুরূপভাবে কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সমকামিতা বা পশুর সাথে সঙ্গম কিংবা কোন মহিলার সাথে পশ্চাদ্দার দিয়ে সঙ্গমক্রিয়ার অভিযোগ আরোপও 'কাযাফ' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩০৫]যিনার অপবাদ আরোপ করার ভাষাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল -

১. ছরীহ (সুস্পষ্ট অপবাদ) : 'ছরীহ' বলতে সে ভাষাকে বোঝানো হয়, যে ভাষা দ্বারা স্পষ্টরূপে যিনার কথা বোঝা যায়। (যেমন কেউ কোন পুরুষ বা নারীকে বলল, হে যিনাকার অথবা তুমি যিনা করেছ) অথবা যে ভাষা দ্বারা তার বংশ পরিচয়কে অস্বীকার করা হয় (যেমন কেউ কোন নারী বা পুরুষকে জারজ সন্তান বলে সম্বোধন করল অথবা বলল, তুমি তো তোমার পিতার সন্তান নও ইত্যাদি)।

সুস্পষ্ট অপবাদের ব্যাপারে ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, এতে হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে।[৩০৬]তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা পরে আলোচনা করা হবে।

২. কিনায়া (অস্পষ্ট ভাষায় অপবাদ) : 'কিনায়া' বলতে সে শব্দকে বোঝানো হয়, যা থেকে স্পষ্টরুপে যিনার কথা বোঝা যায় না; তবে তা ব্যুৎপত্তিগতভাবে যিনার অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা রাখে। যেমন কেউ কোন পুরুষকে পাপিষ্ঠ বা নষ্ট অথবা লম্পট বলে সম্বোধন করল অথবা বলল যে, তুমি তো কাউকে ফিরাওনা, তোমাকে তো নির্জনে খুব দেখা যায় ইত্যাদি।

এ প্রকারের ভাষা যেহেতু স্পষ্ট অপবাদ নয়; তাই এ প্রকারের অপবাদের হুকুম কি হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণের মতে, এ প্রকারের অপবাদ হদ্দ যোগ্য অপরাধ নয়। তাঁদের কথা হলো, যেহেতু এ ধরণের ভাষায় যিনার সুস্পষ্ট অপবাদ নেই; তদুপরি যিনা ছাড়া অন্য কাজের জন্যও এ সব ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাই এ সব কথা যিনার অপবাদ রূপে গণ্য হবে না। তবে এ সব কথা হদ্দযোগ্য অপরাধ না হলেও তা নিঃসন্দেহে একটি অশোভনীয় বাক্যবাণ। তাই তা'যীরের আওতায় আদালত অপরাধীর অবস্থা ও অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মর্যাদা বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৩০৭]শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে, এ প্রকারের কথার হুকুম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল হবে। যদি অভিযোগ আরোপকারী শপথ করে বলে যে, এ কথা দ্বারা তার উদ্দেশ্য যিনার অপবাদ দেয়া নয়; বরং গালি দেয়া কিংবা মান হানি করাই উদ্দেশ্য, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা

---

৩০৩. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭৭

৩০৪. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, ক. ৫, পৃ. ৩২; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, খ. ৫, পৃ. ৩১৭ । মালিকীগণের মতে 'কাযফ' হল- কোন বালিগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপর কোন বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া কিংবা কারো পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করা। (আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৬; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০১-২)

৩০৫. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৯৬, ৫৮১; ইমাম মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬, ৫০১

৩০৬. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪১; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৬

৩০৭. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২১৫-৭;আস-সারাখসী, *আল-মাবসুত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৮৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য হবে।[৩০৮]

৩. তা'রীদ (পরোক্ষ ভাষায় অপবাদ) : 'তারীদ' বলতে এমন শব্দ প্রয়োগকে বোঝানো হয়, যার মধ্যে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্টভাবে যিনার অর্থ নেই; কিন্তু পরোক্ষভাবে যিনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ঝগড়া-বিবাদের সময় কেউ অপরকে লক্ষ্য করে বলল যে, আমি তো আর ব্যভিচারী নই। এতে ইঙ্গিত থাকে, যাকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হচ্ছে, তাকে যিনার অপবাদ দেয়া হলো। অনুরূপভাবে কেউ বলল যে, আমার মা তো আর ব্যভিচারিণী নয়। এতে ইঙ্গিত থাকে যে, তোমার মা ব্যভিচারিণী।[৩০৯]এ প্রকারের ভাষা যেহেতু সরাসরি অপবাদ নয়; তাই এ ধরনের বাক্যবাণের হুকুম কি হবে- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকীগণের মতে, পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদের সময় এ ধরণের পরোক্ষ ভাষার ব্যবহার হদ্দযোগ্য অপবাদের আওতায় পড়বে।[৩১০]তাঁর দলীল হল, হযরত 'উমরাহ বিনতে 'আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 'উমার (রা.) এর আমলে দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে গিয়ে একজন অপরজনকে বললো, আল্লাহর শপথ! আমার পিতা তো আর যিনাকারী নয় এবং আমার মাতাও যিনাকারিণী নয়। এ ধরনের উক্তি অপবাদের পর্যায়ে পড়বে কিনা এ নিয়ে হযরত উমার (রা) কয়েকজন সাহাবীর নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের একজন বললেন, এ দ্বারা তো সে তার বাব-মার প্রশংসাই করেছে। অন্যরা বললো, এতে তার বাব-মার প্রশংসা থাকলেও তা দ্বারা উদ্দেশ্য অন্য একটা। তার পিতামাতা যিনাকারী নয়। এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তার প্রতিপক্ষের পিতামাতা যিনাকারী। হযরত 'উমার (রা.) তাঁদের বক্তব্য গ্রহণ করে তার ওপর অপবাদের হদ্দ কার্যকর করলেন।[৩১১]হানাফী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, এ প্রকারের কথা হদ্দ যোগ্য অপরাধ নয়। তাঁদের বক্তব্য হলো, এ ধরণের কথার মধ্যে যেমন অপবাদ আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অন্য অর্থ নেবার অবকাশও থাকে। আর এ অবকাশ সন্দেহের নামান্তর। আর হদ্দযোগ্য অপরাধে কোন রূপ সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা হয় না। তবে এ ধরণের পরোক্ষ বাক্যবাণ নিঃসন্দেহে অশোভনীয়। তাই তা'যীরের আওতায় আদালত অপরাধীর অবস্থা ও অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মর্যাদা বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৩১২]এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। একটি মত হল-পরোক্ষ ভাষায় অভিযোগ যেহেতু সরাসরি অপবাদ নয়; তাই এতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। অপর মত হল, পরোক্ষ ভাষায় অভিযোগ বিবাদ-বিসম্বাদের সময় অপবাদ; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে না।[৩১৩]যে কোন ব্যক্তি অপর কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে যিনা বা সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপন করে তা চারজন উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে না পারলে উক্ত অভিযোগ অপবাদ

---

৩০৮. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৯-১৫০

৩০৯. যারকশী, *আল-মানছুর,* খ. ১, পৃ. ৩৬১; ইবনু 'আরাফাহ, *আল-হুদূদ,* পৃ.৪৯৯

৩১০. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৯-১৫০ ; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯০. ৪৯৪

তবে কোন পিতা যদি তার ছেলের জন্য এ রূপ ভাষা ব্যবহার করে, তা অবশ্যই অপবাদের আওতায় পড়বে না। কারণ সাধারণত এ ধরনের কথা দ্বারা পিতার উদ্দেশ্য সন্তানকে অভিযুক্ত করা হয় না; তাকে শাসানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (আল-মাওয়াক, আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০১)

৩১১. বায়হাকী, আস-সুনাল আল-কুবরা, হা.নং. ১৬৯২৪

৩১২. ইমাম মুহাম্মদ ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭১-২

৩১৩. আর-রুহায়বানী, *মাতালিব,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৪-৫; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করে, পরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কোড়া মার। উপরন্তু, তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।"[৩১৪]এ আয়াতে যদিও মহিলাদের প্রতি যিনার অভিযোগের কথা বলা হয়েছে; তথাপি পুরুষদের প্রতি অভিযোগের বেলাও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এ আয়াত থেকে দুনিয়াতে 'কায্ফ' এর দু'প্রকারের শাস্তির কথা জানা যায়। একটি হল ৮০টি বেত্রাঘাত। অপর শাস্তি হল-সাক্ষ্য প্রত্যাখান। চিরদিনের জন্য অপবাদ দানকারীর কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যদি অপবাদ দানকারী তাওবা না করে, তবে তার কোন সাক্ষ্যই কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে এবং তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না- এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, যদি সে তাওবা করে, তাহলে তার থেকে ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে; তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩১৫]তাঁদের বক্তব্য হলো- কুরআনে ابدا (চিরদিনের জন্য) শব্দের ব্যবহার দ্বারা জানা যায় যে, তাদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে তাওবাহ করে। এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলে ফাসিকীর কলঙ্ক মুছে যাবে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "অপবাদের দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া মুসলিমরা একে অপরের জন্য ন্যায়পরায়ণ।"[৩১৬] এ হাদীস থেকেও স্পষ্ট জানা যায় যে, অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।অন্যান্য ইমামগণের মতে, তাওবার পর ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবার সাথে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহনযোগ্য হবে। তাদের দলীল হল, তাওবাহ করার কারণে যাবতীয় পাপ মুছে যায়।[৩১৭]রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "পাপকর্ম থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোন পাপ নেই।"[৩১৮]এ হাদীসের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কুফরী অপবাদ থেকেও বড় অপরাধ। কাফির তাওবা করে মুসলিম হলে যদি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে মুসলিম তাওবা করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণেও কোন আপত্তি থাকবে না। এ প্রসঙ্গে হানাফীগণের মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা খালিস তাওবার ব্যাপারটি আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। যদি তারা খালিস তাওবাই করে থাকে তাহলে তারা পরকালে অবশ্যই নাজাত পাবে।[৩১৯]

---

৩১৪. والذين يرمون المحصنت ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلد وهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفسقون- الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم- (আল-কুর'আন, ২৪ : ৪-৫)

৩১৫. জাসসাস, *আহকামূল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯-৪০১

৩১৬. بعضهم على بعض الا محدودا في قذف বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৬৯২৪; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, (কিতাবুল আকদিয়্যাহ), হা.নং. ১৫, ১৬

৩১৭. ইবনুল 'আরবী, *আহকামূল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫-৬

৩১৮. من الذنب كمن لا ذنب له আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস সুনান*, প্রাগুক্ত (বার: যিকরুত তাওবাহ), হা.নং. ৪২৫০; বায়হাকী, *আস-সুনাল আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ২০৩৪৮, ২০৩৪৯; আবুর কাশিম তাবারানী, *আল-মু'জামূল কাবীর*, হা.নং. ১০২৮১

১৯. ইবনুল 'আরবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

তবে দুনিয়ার কাজে-কর্মে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমতাবস্থায় কুরআনে ابدا (চিরদিনের জন্য) শব্দের অর্থও ঠিক থাকবে। তদুপরি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হবার ব্যাপারে যেখানে সরাসরি হাদীসের বক্তব্য রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কিয়াস করা সমীচীন নয়। আর এ ‘কাযফ’ এর কতিপয় শর্ত রয়েছে। হদ্দ কার্যকর করার জন্য এ সব শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ সব শর্তের কতিপয় অভিযোগ আরোপকারীর মধ্যে, আর কতিপয় অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে, আর কতিপয় অভিযোগের ভাষার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। কিছু শর্ত অভিযোগ আরোপকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নিম্নরূপ-

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে হবে না।

খ. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে, পাগল বা মতিভ্রম হলে হবে না।

গ. কাকেও যদি হত্যার হুমকি দিয়ে যিনার অভিযোগ আরোপ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয়, তার ওপর অপবাদের হদ্দ কার্যকর হবে না, যদি হত্যার হুমকি প্রমাণিত হয়। হত্যা ছাড়া কারাদন্ড কিংবা বেত্রাঘাত বা ইত্যাকার কোন শাস্তির হুমকির প্রেক্ষিতে যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হলে তাতে হদ্দের বিধান রহিত হবে না।[৩২০]

ঘ. হদ্দ কার্যকর করতে হলে অভিযোগ আরোপকারীকে মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর ‘কাযাফ’- এর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয় আইনে সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৩২১]

ঙ. হানাফীগণের মতে, অভিযোগ আরোপকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। কোন বোবা লোকের ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩২২]

চ. শাফি’ঈগণের মতে, অভিযোগ আরোপকারীর ‘কাযফ’-এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। নতুন মুসলিম হবার কারণে কিংবা মুসলিম সমাজ থেকে দূরে অবস্থানের কারণে কেউ যদি কাযাফের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞাতার দাবী করে এবং তার সত্যতাও মিলে, তাহলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩২৩]

ছ. শাফি’ঈগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার জন্য অভিযোগ আরোপের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না থাকা শর্ত। যদি কেউ অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি নিয়েই তার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে, তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩২৪]

জ. অধিকাংশ ইমামের মতে, অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির উর্ধ্বতন (যেমন পিতা, মাতা, দাদা) কিংবা

---

৩২০. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, ৪৬-৭; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২০-১

৩২১. হায়তমী *তুজফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২০-১; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩৫-৬

৩২২. ইবনু ‘আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬-৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসুত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৭

৩২৩. আল-আনাসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৫

৩২৪. হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২০-১

Dhaka University Institutional Repository

অধস্তন (ছেলে, মেয়ে বা নাতি-নাতনি) না হওয়াও শর্ত।[৩২৫]তবে মালিকীগণের এক মতানুযায়ী কোন পিতা যদি তার ছেলের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ দেয়, তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩২৬]

ঝ. অভিযোগ আরোপকারীকে চারজন সাক্ষী দ্বারা তার উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত করতে হবে। যদি সে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে, তবেই তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। চারজন সাক্ষীর অপরাধেরও অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করার পর হদ্দ কার্যকর করার আগেই যদি এক বা একাধিক সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে যিনা প্রমাণিত হবে না এবং সাক্ষীগণের সকলেই কাযাফের দন্ডে দন্ডিত হবে।[৩২৭]অনুরূপভাবে কোন সাক্ষী সাক্ষ্যদানের অযোগ্য সাব্যস্ত হলে[৩২৮]সকল সাক্ষীই কাযাফের দন্ডে দন্ডিত হবে, যদি যিনার শাস্তি কার্যকর করার আগেই এ অযোগ্যতা ধরা পড়ে। যদি অভিযুক্তের ওপর বেত্রাঘাতের দন্ড কার্যকর করার পরেই অযোগ্যতা ধরা পড়ে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, সাক্ষীরা কাযাফের দন্ড ভোগ করবে এবং সাহেবাইনের মতে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে বায়তুল মাল থেকে 'আরশ' (ক্ষতিপূরণ) প্রদান করতে হবে। যদি রজমের পর অযোগ্যতা ধরা পড়ে তা হলে সাক্ষীদের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না; তবে বায়তুল মাল থেকে দিয়াত প্রদান করতে হবে।

ঘটনার স্থান ও সময়ের ব্যাপারে সাক্ষীদের মতভেদ দেখা দিলে তাদের ওপর কাযাফের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। কারণ, সাক্ষীরা সংখ্যা চার তো পূর্ণ হয়েছে; তবে তাদের সাক্ষ্যের ক্রুটির কারণে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপভাবে অপরাধীকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রেও মতভেদ হলে সাক্ষীগণ শাস্তি ভোগ করবে না। অনুরূপভাবে দুজন সাক্ষ্য দিল যে, যিনা জোরপূর্বক সংঘটিত হয়েছে এবং অপর দুজন সাক্ষ্য দিল যে স্বেচ্ছায় ও সম্মতিতে যিনা সংঘটিত হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সাক্ষীরা দন্ড যোগ্য হবে না।[৩২৯]আবার অভিযোগ আরোপকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ শর্তগুলো হল নিম্নরূপ-

১. ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে। কোন কাফিরের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আরোপ করা হলে তা হদ্দের আওতায় আসবে না। তবে তা তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, সে পূত-পবিত্র নয়।"[৩৩০]

২. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বালিগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। নাবালিগের প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা হলে তাও কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে না। কেননা নাবালিগের যিনা যদি সুপ্রমাণিতও হয়, তাতে হদ্দ

৩২৫. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, খ.৭, পৃ.৪২; ইবনু কুদামাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৯

৩২৬. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৭ *আল-মুগনী*,

৩২৭. ইমাম মুহাম্মদের মতে, শুধু সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী কাযাফের দন্ডে দন্ডিত হবে; তবে বিচারকের রায় দেবার আগে প্রত্যাহার করা হলে সকলেকে কাযাফের দন্ড ভোগ করতে হবে। হদ্দ কার্যকর করার পর কোন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে সে কাযাফের দন্ডে দন্ডিত হবে এবং তাকে এক চতুর্থাংশ দিয়াত প্রদান করতে হবে।

৩২৮. যেমন কোন সাক্ষী সমাজে পাপাচারী বলে কুখ্যাত হলে কিংবা ইতিপূর্বে কাযফের দন্ড ভোগ করে থাকবে।

৩২৯. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৯-১৯০; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০

৩৩০. -من اشرك بالله فليس بمحصن বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং. ১৬৭১৩; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াজিব হয় না। তাই তার প্রতি অপবাদ দানাকারীর ওপরও হদ্দ কার্যকর না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তবে তা'যীরী শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম মালিকের মতে, যদি নাবালিগ মেয়ে সঙ্গমের উপযোগী হয়, বিশেষ করে যদি সাবালিকা হয়, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে তা কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। পাগল কিংবা মাতালের প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা হলে তাও কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না।

৪. অভিযোগ আরোপকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পবিত্র ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। কোন ব্যক্তি যিনা করেছে তা যদি তার স্বীকারোক্তি কিংবা সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ পরবর্তীকালে সুনির্দিষ্টভাবে কিংবা অনির্দিষ্টভাবে কোন যিনার অভিযোগ তুললে তা কাযাফের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান-সন্ততি বিশিষ্টা কোন মহিলার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি কোন পবিত্র চরিত্রের লোকের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলে এবং অপবাদকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করার পূর্বেই যদি প্রমাণিত হয় যে, সে পরে যিনা করেছে, তাহলেও অভিযোগকারীর ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।[৩৩১]

স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি :

কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার কথার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে অথবা সে যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তার ঔরসজাত নয় বলে দাবী করে, তাহলে প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান ও বক্তব্যের পক্ষে বিশেষ পন্থায় আদালতের সামনে শপথ করতে হবে। শরী'আতের পরিভাষায় এক লি'আন বলা হয়। আর এ লি'আনের নিয়ম হল প্রথমে স্বামী এই বলে চারবার শপথ করবে- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী।" পঞ্চমবারে অভিযুক্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলবে, 'আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যিনার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক"। অতঃপর স্ত্রী এ বলে চারবার শপথ করবে, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" পঞ্চমবারে বলবে, "এই ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে।"[৩৩২]যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করে

৩৩১. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৬-৭৭

৩৩২. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقين- والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكذبين- ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهدت بالله انه لمن الكذبين- و الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصدقين- (আল-কুরআন, ২৪ : ৬-৯)

Dhaka University Institutional Repository

তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করে অথবা তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে। অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তার ওপর কাযাফের হদ্দ কার্যকর করা হবে। স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে তাকেও কারাগারে আটক করে রাখা হবে, যে যাবত না সে শপথ করে অথবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে। অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করলে তাকে যিনার শাস্তি স্বরূপ রজমের শাস্তি দেয়া হবে, যদি সে 'মুহসান' হয় আর 'মুহসান' না হলে একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, লি'আন করতে অস্বীকার করলে অপরাধীকে বন্দী করার প্রয়োজন নেই। হদ্দ প্রয়োগের জন্য তাদের শপথ করতে অস্বীকার করাই যথেষ্ট।[৩৩৩]

প্রত্যেকে লি'আন করার পরে তাদের বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা আর কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে স্বামী তার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করলে শাস্তি ভোগের পর তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[৩৩৪]

লি'আনের সন্তান মাতার সাথে যুক্ত হবে এবং মাতা ও সন্তান পরস্পরের ওয়ারিছ হবে।[৩৩৫]

উল্লেখ্য যে, লি'আনকারী মহিলার প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলে অভিহিত করা জায়িয নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, যে এ রূপ করবে, তার ওপর কাযাফের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।[৩৩৬]কেননা লি'আনের ফলে তার যিনা সাব্যস্ত হয়নি এবং তার পবিত্রতায়ও কোন রূপ কলঙ্ক লিপ্ত হয়নি। এ কারণেই তাকে যিনার দণ্ডের সম্মুখীন ও হতে হয়নি। এ ধরণের মহিলা ও তার সন্তান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তার ও তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। যে ব্যক্তি তার প্রতি কিংবা তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ তুলবে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে।"[৩৩৭] তবে হানাফীগণের মতে, লি'আনের মহিলার যদি পিতৃপরিচয়হীন সন্তান না থাকে, তবেই এ হুকম প্রযোজ্য হবে। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান থাকলে এবং তা যিনার একটি প্রমাণ হবার কারণে অভিযোগ আরোপকারীর জন্য কাযাফের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে তা'যীরের আওতায় সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৩৩৮]আর এ 'কাযফ' নিম্নের যে কোন একটি উপায়ে যিনার অভিযোগ উত্থাপনকারীর অভিযোগ আরোপ প্রমাণ করা যাবে।

প্রথমত অভিযোগকারী যদি নিজেই স্বীকার করে নেয় যে, সে যিনার অভিযোগ আরোপ করেছে, তাহলে 'কাযফ' প্রমাণিত হবে। এ স্বীকারোক্তিতে চারবার স্বীকার করার শর্ত নেই; বরং বিচারকের এজলাসে একবার

---

৩৩৩. আল-জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, খ. ৫, পৃ. ১০৮; আল-বহুতী, *কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০১

৩৩৪. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৬; ইবনু কুদামাহ *আল-মুগনী*, , প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫২-৫৩

৩৩৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯-২৯০

৩৩৬. শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে, লি'আনকারী মহিলার প্রতি যদি স্বামী ও তার অভিযুক্ত যিনা ছাড়া অন্য কোন যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তার ওপরও কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। তবে অভিযুক্ত যিনার ক্ষেত্রে সে শাস্তি যোগ্য হবে না। তবে শাফি'ঈগণের মতে, লি'আনের পরে যদি সে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১৯-২০)

৩৩৭. لا ترمى ولا يرمى ولدها- ومن رماها او رمى ولدها فعليه الحد- সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (বাব: আল-লি'আন), হা.নং. ২২৫৬

৩৩৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১-৪২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। কেউ স্বীকার করার পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩৩৯] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সব ক্ষেত্রে বান্দাহর হক জড়িত রয়েছে, তাতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও কায্ফ প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সকলকেই পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।[৩৪০]

তৃতীয়ত যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি "অভিযোগ উত্থাপন করেনি" মর্মে শপথ করতে অস্বীকার করে, তাহলে এটা এ কথার প্রমাণ বহন করবে যে, সে অভিযোগ তুলেছে।[৩৪১]এটা শাফি'ঈ ইমামগণের অভিমত। আর এ 'কায্ফ'-এর হদ্দ রহিত হবার অবস্থান সমূহ নিম্নরূপ-

ক. অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগ উত্থাপনকারীকে আদালতে মামলা দায়েরের আগে হোক কিংবা পরে- ক্ষমা করে দেয়, তাহলে কাযাফের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা কাযাফের শাস্তি বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত, যা দাবী ছাড়া কার্যকর করা হয় না। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত শাস্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা দ্বারা রহিত হয়ে যায়। এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত।[৩৪২] মালিকীগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের আগে হলে ক্ষমা করে দেয়া জায়িয; কিন্তু মামলা দায়েরের পরে ক্ষমা করা জায়িয নয়।[৩৪৩]হানাফীগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের আগে কিংবা পরে-কোন অবস্থায় কাযাফের দন্ড ক্ষমা করে দেয়া জায়িজ নয়। তাঁদের বক্তব্য হল, কাযাফের শাস্তি নিরেট বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত নয়; এতে আল্লাহর অধিকারও রয়েছে। আর যে সব শাস্তিতে বান্দাহর অধিকারের সাথে আল্লাহর অধিকারও রয়েছে। আর যে সব শাস্তিতে বান্দাহর অধিকারের সাথে আল্লাহর অধিকার জড়িত রয়েছে, তাতে বান্দাহর ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার নেই।[৩৪৪]

খ. যদি অভিযোগকারী স্বামী হয় এবং তার এমন কোন সাক্ষী নেই, যারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এমতাবস্থায় সে লি'আন করলে কাযাফের হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

গ. যদি অভিযোগ উপযুক্ত সাক্ষপ্রমাণ কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

ঘ. হানাফী ও মালিকীগণের মতে, অভিযোগ ওঠার পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির 'মুহসান' চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ অভিযোগ আরোপিত হবার পর কেউ যিনা করল, কিংবা ধর্মত্যাগ করল বা পাগল হয়ে গেল তাহলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ হদ্দ প্রমাণের জন্য যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহসান

---

৩৩৯. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪-৪৫; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২

৩৪০. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৩২

৩৪১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪৪-৬

৩৪২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১৬; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯৫। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) থেকে এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৯)

৩৪৩. আস-সাভী, *বুলগাতুস সালিক,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৭; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৮

৩৪৪. যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৩; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া দরকার, তেমনি হদ্দ কার্যকর করার জন্য তার মুহসান হিসেবে নিজেকে ধরে রাখাও প্রয়োজন। শাফি'ঈগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যিনার লিপ্ত হলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে খালাস পেয়ে যাবে। তবে হাম্বলীগণের মতে, অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহসান চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেলেও হদ্দ রহিত হবে না। যেমন হদ্দ কার্যকর করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যিনার লিপ্ত হলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে অভিযোগকারী হদ্দ থেকে রেহাই পাবে না।[৩৪৫]

ঙ. মিথ্যা অভিযোগ আরোপের বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবার পর যদি হদ্দ কার্যকর করার আগেই সাক্ষীরা সকলেই কিংবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

চ. যিনার অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগটিকে সত্য হিসেবে মেনে নিলেও অভিযোগ আরোপের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

ছ. অধিকাংশ ইমামের মতে, যিনার অভিযোগ আরোপ যেহেতু বান্দাহর হকের সাথে জড়িত ব্যাপার, তাই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিয়ম মাফিক বিচারকের দাবী না করলে অভিযোগকারীর ওপর কাযফের শাস্তি বর্তাবে না। তবে হানাফীগণের মতে, এ ধরনের অভিযোগ আরোপে যেহেতু বান্দাহর হকের সাথে আল্লাহর হকও জড়িত রয়েছে, তাই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারকের দাবী না থাকলেও অভিযোগকারী কাযাফের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না; প্রশাসন রাষ্ট্রের জনস্বার্থে তাকে শাস্তি দেবে।[৩৪৬]আর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ বার বার যিনার অভিযোগ তুললে তার ওপর কাযফের একটি হদ্দই কার্যকর করা হবে। চাই সে প্রতি বারেই একটি যিনা সম্পর্কেই অভিযোগ আরোপ করুক কিংবা প্রতিবারে নতুন নতুন যিনার অভিযোগ আরোপ করুক। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এক জাতীয় দুটি হদ্দ কারো ওপর ওয়াজিব হলে সে ক্ষেত্রে একটি হদ্দই কার্যকর করার বিধান রয়েছে। যেমন কেউ যিনা করল, অতঃপর এর শাস্তি ভোগ করার আগেই যদি আর একবার যিনা করে, তাহলে তার ওপর একটি মাত্র হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[৩৪৭]কেউ কারো প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করল এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হল, অতঃপর ফিরেও যদি সে উক্ত যিনার অভিযোগ তোলে তাহলে হদ্দ পুনরাবৃত্তি করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি অন্য দ্বিতীয় যিনার অভিযোগ আরোপ করে, তাহলে দেখতে হবে, সে যদি এ অভিযেগ প্রথম অভিযোগ আরোপের দীর্ঘ দিন পরেই উত্থাপন করে থাকে, তাহলে তাকে দ্বিতীয় হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে। যদি প্রথম হদ্দ কার্যকর করার পরপরই দ্বিতীয় যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে তার শাস্তি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে দুটি মত দেখা যায়। একটি হল- দীর্ঘদিন পরে নতুন অভিযোগ তুললে যেমন অভিযোগকারীর ওপর দ্বিতীয় হদ্দ কার্যকর করা হয়, তেমনি প্রথম অভিযোগের শাস্তি ভোগের পর পর উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগের জন্যও দ্বিতীয়বার হদ্দ কার্যকর করা হবে। তদুপরি অন্যান্য হদ্দের অপরাধ একই অপরাধে লিপ্ত হলে দ্বিতীয় অপরাধের জন্যও পুনরায় হদ্দ কার্যকর করা হবে। অপর মতটি হল তাকে যেহেতু সবে মাত্র একই ধরণের অপরাধের জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই একই অপরাধের দ্বিতীয় বারের জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।

---

৩৪৫. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৮

৩৪৬. আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৮; ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০৫, খ. ৮, পৃ. ৩১২

৩৪৭. আল-আনসারী, *আসনুল মাতালিব,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮২; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

আর একটি দলকেই যিনার অপবাদ দেয়া হলে তার শাস্তি কি হবে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, অভিযোগকারীকে একটি বার শাস্তি দেয়া হবে। চাই সে এক বাক্যে সকলকে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে সকলকেই অভিযুক্ত করুক। চাই সকলে মিলে এক সাথে তার বিচার দাবী করুক কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে দাবী করুক। প্রথম জনের দাবীর প্রেক্ষিতে যদি তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হয়, তাহলে পরবর্তীদের দাবীর প্রেক্ষিতে আর তার ওপর দ্বিতীয় হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩৪৮]যেহেতু তার অপরাধ দলের বিরুদ্ধে, তাই দলের একজনের দাবী সকলের দাবী সকলের দাবী হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে দলের কারো বিরুদ্ধে নতুন কোন যিনার অভিযোগ তুললে, সে জন্য নতুন হদ্দ প্রযোজ্য হবে। তাঁদের বক্তব্য হল, হিলাল ইবন উমাইয়্যা (রা.), যিনি এক সাথে তার স্ত্রী ও শুরায়ক ইবনু সাহমাকে অপবাদ দিয়েছিলেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স.) কেবল একটি শাস্তিই দিয়েছিলেন। তদুপরি অন্যান্য হদ্দের অপরাধসমূহ যেমন- যিনা, চুরি, মদ্যপায়িতা যখন বারংবার করা হয়, তখন বারবার কৃত অপরাধের জন্য একাধিক শাস্তি না দিয়ে একবারই শাস্তি দেয়া হবে। তবে এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, একটি অপবাদের জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং শাস্তি দেয়া শেষ না হওয়ার আগেই যদি সে অন্য এক জনের প্রতি যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে হানাফীগণের মতে, তাকে নতুন করে দ্বিতীয় শাস্তি দেয়া যাবে না; তার ওপর একটি হদ্দই কার্যকর করা হবে। এমনকি, যদি প্রথম হদ্দের শাস্তি থেকে যদি কেবল একটি বেত্রাঘাত ও অবশিষ্ট থাকে, তাহেল দ্বিতীয় অপবাদের জন্য অবশিষ্ট একটি বেত্রাঘাই কার্যকর করা হবে। মালিকীগণের মতে, প্রথম অপবাদের জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করার সময় যদি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়, এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, বেত্রাঘাত যা কার্যকর করা হয়েছে তার পরিমাণ বেশি না অল্প। যদি পরিমাণ অল্পই হয়, তাহলে তা গণনা করা হবে না; নতুনভাবে বেত্রাঘাত গণনা শুরু করতে হবে। যদি দেখা যায়, অল্প পরিমাণ বেত্রাঘাত বাকী রয়েছে, তাহলে প্রথম হদ্দ পূর্ণভাবে কার্যকর করার পর দ্বিতীয় অপবাদের জন্য নতুনভাবে বেত্রাঘাত শুরু করতে হবে।[৩৪৯]

শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মতালম্বী ইমামগণের মতে, বিভিন্ন বাক্য দ্বারা (যেমন প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে বলল, যে ব্যভিচারী) যদি একটি দলের সবাইকে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে দলের প্রতিটি ব্যক্তির অপবাদের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে।[৩৫০]কেননা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মতে অপবাদের অপরাধ মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ধরনের অপরাধ সমূহের শাস্তি একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তাই উপর্যুক্ত অপবাদের সাথে বিভিন্ন মানুষের অধিকার জড়িত হবার কারণে তার হদ্দ সমূহ পরস্পর প্রবিষ্ট হবে না। তবে যদি একটি বাক্য দ্বারা দলের সকলকেই অভিযুক্ত করা হয় (যেমন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে ব্যভিচারীরা), তাহলে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর পুরাতন মতানুযায়ী তার ওপর একটি হদ্দ বর্তাবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এ ধরণের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম হাসান আল-বসরী ও ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর নতুন মতানুযায়ী এমতাবস্থায়ও দলের প্রতিটি ব্যক্তির অপবাদের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তিদেয়া হবে। কেননা তার এ অপবাদের ফলে দলের প্রত্যেককে মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই প্রত্যেকের জন্যই পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আরোপ করার জন্য পৃথক পৃথক হদ্দ কার্যকর করা হয়। উল্লেখ্য যে, শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, যদি কেউ এমন কোন বিরাট দলের প্রতি যিনার অভিযোদ উত্থাপন করে,

---

৩৪৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৯; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১১১

৩৪৯. আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল,* প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১১১

৩৫০. আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ,* প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ.২২৩; ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাদের প্রত্যেককে ব্যভিচারের লিপ্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার, তাহলে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। তাঁদের বক্তব্য হল, কাযাফের হদ্দ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আরোপিত কলঙ্ক মোচনের একটি প্রয়াস মাত্র। কিন্তু উপর্যুক্ত অবস্থায় যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কলঙ্কিত হবার আশঙ্কা নেই, তাই অভিযোগকারীরা মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারটি প্রচুর সম্ভাবনাময়। তবে তার মিথ্যাচারিতার জন্য তা'যীরের আওতায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে।[৩৫১]

মদ্যপানের শাস্তির বিধান :

মাদক ছোট-বড় বহু অপরাধের উৎস এবং নানা দৈহিক ও মানসিক মারাত্মক ক্ষতির কারণ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে এর ক্ষতিকর দিকগুলো বর্তমানে সকলের কাছে সুপরিচিত। মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব রয়েছে, মাদক সেবনের ফলে তা হারিয়ে যায়। এর সাথে সে হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিক চেতনা। ভাল-মন্দ জ্ঞান ও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। হারিয়ে ফেলে কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান। এ অবস্থায় আকৃতিতে মানুষ হলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। তখন সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। আপন-পরের পার্থক্য বোধও থাকে না। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই হযরত 'উছমান (রা.) বলেছিলেন, "তোমরা মদ পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সকল প্রকারের পাপকাজের উৎস।"[৩৫২]এ কারণেই ইসলাম পবিত্র ও সুন্দর মনের মানুষ তৈরি এবং সুস্থ সমাজ বির্নিমাণের মহৎ উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবন কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়; ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান ও মদ সেবন একত্রিত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন "কোন মদ্যপায়ী ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না।"[৩৫৩]অর্থাৎ কোন ঈমানদার মু'মিন অবস্থায় মদ্যপান করতে পারে না। হয় ঈমানদার হবে, না হয় শুধু মদ্যপায়ী হবে।

মাদককে আরবীতে খমর (خمر) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে ফেলা, সমাচ্ছন্ন করা, মিশে যাওয়া। মদ সেবনের ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে তাকে خمر বলা হয়।[৩৫৪]শরী'আতের পরিভাষায় যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে خمر (মাদক) বলা হয়। প্রখ্যাত ভাষাবিদ আসমা'ঈ বলেন, "যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে (অর্থাৎ নেশার উদ্রেককারী পানীয়) তাই হল خمر বা মাদক"[৩৫৫] ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরি মাদক পানীয়ই خمر (খামর)। তাঁর মতে, তিন প্রকারের পানীয় খামার বা মাদকের অন্তর্ভুক্ত। ক. তাজা আঙ্গুরের রস অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার পর তা গজিয়ে ফেনা ধারণ করলে। খ. আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর তার দু-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গেলে। গ. কিসমিস ও শুষ্ক খেজুরের রস জ্বালা দিয়ে সিদ্ধ না করা সত্ত্বেও তাতে মাদকতা সৃষ্টি হল। কিন্তু তাজা আঙ্গুরের রস

---

৩৫১. আর-রুহায়বানী, *মাতালিব,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৬; আল-বহুতী, *কাশশাফ,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১২-৩;

৩৫২. اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث আন্ নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা,* প্রাগুক্ত, হা.নং. ৫১৭৬, ৫১৭৭; আল বায়হাকী, *আস-সুনান, আল-কুবরা,* হা.নং. ১৭১১৬; আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং. ১৭০৬০

৩৫৩. لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن- (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী,* (কিতাবুল মাযালিম), হা.নং. ২৩৪৩; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল- কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম,* (কিতাবুল ঈমান), হা.নং. ৫৭

৩৫৪. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৪-৫

৩৫৫. الخمر ما خمر العقل- وهو المسكر من الشراب- (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৪-৫)

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা কিসমিস ও শুষ্ক খেজুরের রস আগুনে সিদ্ধ করার ফলে তার দু-তৃতীয়াংশ বাষ্প হয়ে ওড়ে না গেলে এবং বার্লি, গম, ভুট্টা ইত্যাদির রস তা আগুনে জ্বালা দেয়া হোক না হোক, নেশা উদ্রেককারী হলেও খামার বা মাদক নয়। এগুলো পান করে মাদকতা সৃষ্টি হলেই কেবল পানকারী শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যথায় নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি হবে।[৩৫৬] তিনি خمر (খামর) ও নেশা উদ্রেককারী বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, খামর সেবন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না হোক, কম হোক বা বেশি। কিন্তু নেশা উদ্রেককারী অন্যান্য বস্তুসমূহের ব্যবহার শাস্তিযোগ্য নয়, যে যাবত তা নেশা উদ্রেক না করে।[৩৫৭]কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে, আঙ্গুরের রস ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নেই; বরং যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে তা যে বস্তুই হোক তা 'খামার' (মাদক) রূপে গণ্য হবে এবং তা যে কোন পরিমাণে অল্প হোক বা বেশি গ্রহণ করা হারাম।[৩৫৮]

মুসলিম উম্মাতের ওপর আল্লাহ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি শরী'আতের সকল বিধান একযোগে নাযিল করেননি; বরং ক্রমাগতভাবে শরী'আতের বিধানগুলো জারি করেছেন। তদুপরি অনেক বিষয়ের চূড়ান্ত বিধি-নিষেধ এক দিনেও কার্যকর করেননি। ইসলামের আবির্ভাবের সময় মদ্যপান ছিল তৎকালীন আরবের তথা গোটা পৃথিবীর মানুষের সাধারণ অভ্যাস এবং তারা মদ্যপানকে কোনরূপ অপরাধযোগ্য কর্ম মনে করত না। কিন্তু ইসলামে মদ্যপান একটি মারাত্মক দন্ডনীয় অপরাধ। তবে মানুষের এই চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তন সাধনে ইসলাম ধীর পদক্ষেপ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়েছে। কেননা এ বস্তুটিকে যদি হঠাৎ করে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হতো তাহলে তা মেনে চলা তখনকার লোকদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ত। অনেকেই হয়ত তা গ্রাহ্যই করত না। এ প্রসঙ্গে হযরত 'আয়েশা (রা.) বলেছেন, "প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হতো যে, তোমরা মদ পান করো না, তা হলে তারা অবশ্যই বলতো যে, আমরা কখনোই মদ্যপান ত্যাগ করবো না।"[৩৫৯]মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা চার পর্যায়ে চারটি আয়াত নাযিল করেছেন। মক্কা শরীফে প্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তা হল : "এমনিভাবে খেজুরের গাছ ও আঙ্গুরের ছড়া থেকেও আমরা একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত কর এবং উত্তম পানীয়ও তাতে রয়েছে।"[৩৬০]এ আয়াতটিতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ফলের এই রসে উপাদেয় খাদ্যের উপকরণ যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে রয়েছে মাদকে পরিণত হবার যোগ্যতা। তাই এ হালাল ফল থেকে মানুষ উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করবে, না তাকে বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্টকারী মাদকে পরিণত করবে, তা লোকদের রুচির ব্যাপার। প্রসঙ্গত একথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মদ পবিত্র রিযকরূপে গণ্য হতে পারে না। তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মদের প্রতি ঘৃণার বীজ লোকদের মনে বপন করাই ছিল এই প্রথমবারে অবর্তীণ আয়াতটির মূল উদ্দেশ্য। এরপর মদীনা জীবনের প্রথম দিকে অবর্তীণ হয়েছে : "(হে রাসূল,) আপনাকে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দুটিতে রয়েছে বড় পাপ, লোকদের উপকারও

৩৫৬. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত,খ. ৫, পৃ. ১১২; বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯০-৪

৩৫৭. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৪, পৃ.২-৪; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই* খ.৫, পৃ.১১২

৩৫৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫৬, ১৯৩-৫; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২৪

৩৫৯. ولو نزل اول شيئ لا تشر بوا الخمر لقالوا لالدع الخمر ابدا- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবূল ফাদ'ইলিল কুরআন), হা.নং. ৪৭০৭; আহমদ নাসাঈ, *আস-সুনাল আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৭৯৮৭; আবদুর রযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৫৯৪৩

৩৬০. ومن ثمرات النخيل والا عذاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسن (আল-কুর'আন, ১৬ : ৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে বটে। তবে উপকারের চাইতে পাপ অনেক বড়।”[৩৬১]এ আয়াত মদে যে কিছু উপকার আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না; কিন্তু তাতে যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে, তা উপকারের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক। এ আয়াতের সাহায্যেইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা যে বস্তু বেশি মারাত্মক, তা অবশ্যই পরিহার যোগ্য, যদিও তা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ হারাম করা হচ্ছে না। এ আয়াত দুটি নাযিলের পর মুসলিমদের মধ্যে শুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। অনেক মদ্যপাগল লোক তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল; কিন্তু তখনো তা সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়নি। এ কারণে কেউ কেউ তা পান করে মাতাল অবস্থায় নামাযে ও দাঁড়িয়ে যেত। ফলে তারা ঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারত না। হয় ঢলে পড়ে যেত, না হয় নামাযে কুর'আনের আয়াত ও দু'আসমূহ ভুল পড়ত। এ সক কারণে তৃতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ হয় : “হে ঈমানদারগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটেও যাবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল বোঝতে পার।”[৩৬২] এ আয়াতে নামায আদায়ের সময় মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু নামাযের বাইরে অন্যান্য সময় লোকেরা মদ পান করতে থাকে। এভাবে কিছুদিন চলল। ইত্যবসরে হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) নিজের ঘরে একটি যিয়াফতের ব্যবস্থা করেন। তাতে কয়েকজন আনসারী সাহাবী যোগদান করেন। তাদের সামনে উটের মস্তক ভূণা করে পেশ করা হয়। তাঁরা খাওয়া সেরে মদ্যপানে রত হলেন। মদের মাদকাতায় মত্ত হয়ে তাঁদের কেউ কেউ হযরত সা'দ (রা.)কেই আঘাত করেন। ফলে তাঁর নাকটি ভেঙ্গে যায়। আর এ সময়ই নাযিল হয় মদ্যপান চিরতরে হারাম হবার ঘোষণা “হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য পরীক্ষার কাজ নিঃসন্দেহে শয়তানী কদর্য কর্মকান্ড। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ করা। তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করবে। মনে রেখো, শয়তান এই মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট। সে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরন ও নামায থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছুক। তাহলে তোমরা কি এ কাজ থেকে বিরত থাকবে?”[৩৬৩]এ আয়াতগুলোর শেষে (তোমরা কি বিরত থাকবে?) এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে জিজ্ঞাসা রয়েছে, তা নাযিল হবার সাথে সাথে সাহাবা কিরাম উত্তরে বলে ওঠলেন, ‘আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম।”[৩৬৪]এ আয়াত নাযিল হবার মাত্র কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, “মদ্যপান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। তা হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হওয়াও অসম্ভব নয়।” তিনি আরো বলেন, “প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই মদ। আর প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম।”[৩৬৫]উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু যে মদ্যপান হারাম করেছে, তা নয়; বরং মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন ও উপঢৌকন তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সবকিছুকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন “যে মহান সত্তা মদ্যপান নিষিদ্ধ

---

৩৬১. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما- (আল-কুরআন, ২ : ২১৯)

৩৬২. يايها الذين امنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون- (আল-কুরআন, ৪ : ৪৩)

৩৬৩. يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون- انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون (আল-কুর'আন, ৫ : ৯০-৯১)

৩৬৪. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজআর-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৭৪৮, ১৭৮৪

৩৬৫. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ২০০২, ২০০৩; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ৩৬৭৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, তিনিই তার ব্যবসা এবং তা থেকে প্রাপ্ত মূল্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।"[৩৬৬] তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, মদ্য পরিবেশনকারীর ওপর, তার ক্রয়-বিক্রয়কারীর ওপর, তার উৎপাদনকারী ও যে উৎপাদন করায় তাদের ওপর, তার বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর।"[৩৬৭]উপরন্তু, অধিকাংশ ইমামের মতে যে বস্তু অধিক পরিমাণ গ্রহণে নেশার উদ্রেক হয় তার সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম। চাই তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না হোক এবং তা সেবন করা হদ্দযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে, তার স্বল্প পরিমাণও হারাম।"[৩৬৮]অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম। আর যে জিনিস এক পাত্র পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।"[৩৬৯]

মাদক সেবন ইসলামী আইনে একটি ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এ জন্য শরী'আতের নির্দেশনানুযায়ী শাস্তি দেয়া একান্তই কর্তব্য। তবে পবিত্র কুরআনে এর কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) ও সুনির্দিষ্টভাবে এর শাস্তি দানের কথা বর্ণিত রয়েছে। এ কারণে ইমাম শাওকানী, ইবনু মুনযির ও আত্ তাবারী প্রমুখ ইমামগণ মনে করেন, মদ্যপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং তা'যীরী শাস্তির আওতাভুক্ত। আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। ইমাম যুরকানীর মতে, চল্লিশ বেত্রাঘাত সুনির্ধারিত শাস্তি অর্থাৎ হদ্দ। আর এর অতিরিক্ত আশিটি বেত্রাঘাত হল তা'যীরের আওতাভুক্ত, যা বিচারকের রায়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত। কেননা বহু বর্ণনায় বড় বড় অনেক সাহাবীকেই মদ্যপায়িতার শাস্তির জন্য হদ্দ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একসময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি লোকদেরকে তাকে মারপিট করতে নির্দেশ দিলেন। আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা আবার কেউ জুতা দ্বারা আবার কেউ পাকানো কাপড় দ্বারা তাকে প্রহার করেছিল।৩৭০সকল ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হল বেত্রাঘাত।[৩৭১] তবে বেত্রাঘাতের সংখ্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।[৩৭২]তাঁদের দলীল হল, সাহাবা কিরামের ইজমা। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

৩৬৬. ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها- মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল মুসাকাত), হা.নং. ১৫৭৯; মুহাম্মদ ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং. ৪৯৪২

৩৬৭. لعن الله الخمر وشاربه وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه- সুলাইমান আবূ দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ৩৬৭৪; আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং. ১০৫৫৯

৩৬৮. ما اسكر كثيره فقليله حرام মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং ১৮৬৫; আবু ইবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস- সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ৩৩৯১

৩৬৯. كل مسكر حرام- وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام- সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ৩৬৮৭; মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত- তিরমিযী, *আল- জামি'*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ১৮৬৬

৩৭০. সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান* প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪৭৭) কাতাদাহ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) লাঠি ও জুতা দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করেছেন।" (সুলাইমান আবূ দাউদ,*আস-সুনান* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৪৪৮৯) আনাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) দুটি লাঠি একত্র করে চল্লিশবার প্রহার করেছেন।" (মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৭০৬) হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) মদ্যপায়িতায় একজোড়া জুতা দ্বারা চল্লিশবার মারেন।"

৩৭১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৭

৩৭২. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪২-৪

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ (স.)) মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে খেজুরের দুটি ডালি দিয়ে চল্লিশটি আঘাত দিতেন। আবূ বকর (রা.) ও তাই করেছেন এবং উমার (রা.) মদ্যপায়ীদের শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাহাবীগণের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) বললেন, "তার শাস্তি হালকাতম হদ্দ- আশিটি বেত্রাঘাই নির্ধারণ করুন।" তখন হযরত উমর (রা.) এ দণ্ডই কার্যকর করতে নির্দেশ দিলেন এবং সিরিয়ায় হযরত খালিদ ও আবূ "উবায়দাহ (রা.) কে লিখে এ নির্দেশ দিলেন।[৩৭৩] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত 'আলী (রা.) পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের মত হল, আমরা তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করব। কেননা যখন সে মদ সেবন করে তখন মাতাল হয়ে যায়। আর যখন মাতাল হয়, তখন অপলাপ করে। আর যখন সে অপলাপ করে তখন সে অপবাদ দেয়। আর অপবাদ দানকারীর শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।"[৩৭৪]এ থেকে জানা যায় যে, আশিটি বেত্রাঘাতের ওপর সাহাবীগণের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলগণের মতে, মদ্যপানের নির্ধারিত শাস্তি হল চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তবে বিচারকের ইখতিয়ার রয়েছে, অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে ৮০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতে পারবেন। তবে চল্লিশের অতিরিক্ত বেত্রাঘাতসমূহ হদ্দ নয়; তা'যীরের আওতাভুক্ত। তদুপরি কাপড়, খেজুরের ডাল ও জুতা দ্বারাও যদি মারা হয়, তা হলে সেটাও শুদ্ধ হবে।[৩৭৫]তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (স.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাই কার্যকর করেছেন। হযরত সা'ইব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.), হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) এর খিলাফতের শুরুতে মদ্যপায়ীকে আমরা ধরে আনতাম। আমরা তাকে আমাদের হাত দিয়ে, আমাদের জুতা দিয়ে ও আমাদের চাঁদর দিয়ে মারতাম। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতের শেষ দিকেও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হত। তবে যদি সীমালঙ্ঘন বেড়ে যেত, তাহলে আশিটি বেত্রাঘাত করা হত।[৩৭৬]এ থেকে জানা যায়, হযরত 'উমর (রা.) সাধারণত চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। তবে অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখানো আশিটি বেত্রাঘাতও করেছেন। হযরত 'উসমান (রা.) এর খিলাফতের সময় জনৈক ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবন ওকবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে মদপান করতে দেখেছে এবং আরেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমন করতে দেছেছে। হযরত 'উসমান (রা.) আলী (রা.)কে নির্দেশ দিলেন, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। তাকে চল্লিশটা বেত্রাঘাত করার পর আলী (র.) প্রহারকারীকে থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) চল্লিশটি বেত্রঘাত করেছেন, আবূ বকর (রা.)ও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং 'উমর (রা.) আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। সবগুলোই সঠিক সুন্নাত এবং এটাই আমার পছন্দনীয়।[৩৭৭]হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মদ্যপানকারীদেরকে প্রথম থেকে তৃতীয়বার পর্যন্ত শুধু বেত্রাঘাই কর। চতুর্থবার পান করলে তাদের হত্যা কর।"[৩৭৮]

---

৩৭৩. اجعله كاخف الحدود ثمانين- মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হূদূদ), হা.নং. ১৭০৬; আল-বায়হাকী, *আস-সুনান, আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৭৩১০

৩৭৪. نرى ان نضربه ثمانين- فانه اذا شرب اسكر-واذا اسكر هذى- واذا هذى افترى- وعلى المفترين ثمانون- আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৩

৩৭৫. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২২৯-২৩০

৩৭৬. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ৬৩৯৩, ৬৩৯৭

৩৭৭. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৭০৭

৩৭৮. اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم اذا شربوا الرابعة فاقتلوهم- সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল আশরিবাহ), হা.নং. ৪৪৮২

Dhaka University Institutional Repository

আমি মনে করি, মদ্যপানের হদ্দ অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আদালতের সুবিবেচনায় শাস্তির পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। তবে ৪০ এর কম এবং ৮০ এর অধিক বর্ধিত করা যাবে না। চতুর্থবার মাদক সেবনের অপরাধের মৃত্যুদন্ডের যে কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তা নিরেট ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণের জন্য। বর্ণিত রয়েছে যে, মদ্যপানে অভ্যস্ত নয় এবং দৈহিকভাবে ক্ষীণ ব্যক্তিকে হযরত 'উমার (রা.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। আর হযরত 'উসমান (রা.) অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো ৪০, আবার কখনো ৮০টি বেত্রাঘাতের কার্যকর করতেন। মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন, উপঢৌকন এবং আমদানী-রপ্তানিও দন্ডনীয় অপরাধ। তা'যীরের আওতায় আদালত এ সব কাজের শাস্তি নির্ধারণ করবে।[৩৭৯]উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোনভাবে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় কোন অপরাধ কররে সে শাস্তিযোগ্য হবে, কাজটি চাই সে ইচ্ছায় করুক কিংবা ভুলবশতই করুক। কারণ সে নিজেই তার বিবেক নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ স্বয়ং একটি দন্ড যোগ্য অপরাধ। অতএব, সর্তক করার জন্য তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা একান্ত জরুরী। এরূপ অবস্থায় তাকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ কর্ম করতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠবে।[৩৮০]আর এ মদ্যপায়ীদের ওপর শাস্তি কার্যকর করার জন্য তাদের মধ্যে কতিপয় শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এগুলো নিম্নরূপ-

ক. মুসলমান হতে হবে। কোন অমুসলিমের ওপর মদ্যপানের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩৮১]তবে দেশীয় আইনে তাদের শাস্তি বিধান করা যাবে।

খ. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলকে মদ্যপানের জন্য হদ্দের আওতায় শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ককে তা'যীরের আওতায় আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী সংশোধনীমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

গ. বাকসম্পন্ন হতে হবে। হানাফীগণের মতে মদ্যপায়ীদের ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হলে তাকে বাকসম্পন্ন হতে হবে। বোবার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা মদ সেবনের পেছনে তার যথার্থ কারণ কি? সন্দেহাতীতভাবে তা জানাটা অসম্ভব। হতে পারে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মদ পান করেছে।[৩৮২]

ঘ. নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কোন সদ্য ইসলামী গ্রহণকারী কিংবা অমুসলিম দেশের কোন মুসলিম যদি দাবী করে যে, মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা তার জানা ছিল না, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তাকে মদ্যপানের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু মুসলিম দেশের কোন মুসলিমের এ রূপ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩৮৩]

---

৩৭৯. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (সংকলন), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩১

৩৮০. আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনা'ঈ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৫৮৩

৩৮১. ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ (রহ.) এর মতে অমুসলিমদের ওপর ও হদ্দ কার্যকর করা হবে, যদি তারা মাদক সেবন করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা নেশা করা প্রত্যেক ধর্মেই নিষিদ্ধ। (আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৩)

৩৮২. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮

৩৮৩. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মাদক জেনেই সেবন করা। যদি কেউ এমন মনে করে মাদক সেবন করে যে, তা মদ নয়; অন্য বস্তু, তা হলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তদুপরি কেউ মদের সাথে পানি মিশিয়ে সেবন করলে এবং সেখানে পানির অংশ বেশি হলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, যদি তাতে নেশার উদ্রেক না হয়। তবে মদের অংশ বেশি হলে হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩৮৪]

চ. ইচ্ছাকৃতভাবে মদ সেবন করতে হবে। যদি কেউ অনন্যোপায় হয়ে তৃষ্ণা বা ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে মদ সেবন করে, তার জন্য ও হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[৩৮৫]আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায়; কিন্তু বিদ্রোহী বা অবাধ্যাচারী নয় তার হারাম দ্রব্য গ্রহণে কোন পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"৩৮৬ অনুরূপভাবে যদি কেউ একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই মাদক সেবন করে, তার ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, তবে চাপ প্রয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিন্তু যাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করা হয় (সে শাস্তিযোগ্য নয়।)"[৩৮৭]আর নিম্নের যে কোন উপায়ে মদ সেবন প্রমাণিত হতে পারে-

প্রথমত দুজন ন্যায়-পরায়্যাণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা মদ সেবন প্রমাণিত হবে। নারীর সাক্ষ্য বা নারী-পুরুষের একত্র সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে মতভেদ হলে হদ্দ কার্যকর হবে না। মাতলামী অবস্থায় একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। মুখের গন্ধ থাকলে দুজন সাক্ষীই লাগবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে সাক্ষ্য প্রদানকালে মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যাওয়া শর্ত। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে, তা শর্ত নয়। উল্লেখ্য যে, অপরাধ সংঘটনের দীর্ঘ দিন পরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তদুপরি সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। কারো সাক্ষ্যের ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু 'আবিদীন বলেন, বিচারক সাক্ষীদেরকে জেরা করে জেনে নেবেন যে, অপরাধী কোথায়, কখন ও কোন অবস্থায় মদ সেবন করেছে? 'খামার' বলতে কি বোঝায়, তারা জানে কি না? কারণ এমনও তো হতে পারে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মদ সেবন করেছে। এ ও সম্ভাবনা রয়েছে, সাক্ষীরা দীর্ঘদিন পর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ ধরনের সম্ভাবনা ও রয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সিরকা পান করেছে, আর সাক্ষীরা মনে করেছে, মদ পান করেছে।[৩৮৮]

দ্বিতীয়ত অপরাধী আদালতের সামনে মাদক গ্রহণের একবার স্বীকারোক্তি করলেই অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে দুবার স্বীকারোক্তি আবশ্যক। অপরাধী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় যা কিছু বলে তা নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব ঐ অবস্থায় সে মাদক গ্রহণের স্বীকারোক্তি করলে ঐ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩৮৯] তৃতীয়ত মুখে মদের গন্ধ থাকা। হানীফা ও শাফি'ঈগণের মতে, কারো মুখ থেকে

৩৮৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত খ. ২৪, পৃ. ২৯

৩৮৫. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৮

৩৮৬. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم- (আল-কুরআন, ২ : ১৭৩; ১৬ : ১১৫)

৩৮৭. الا من اكره (আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬)

৩৮৮. আল-বারতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০২; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০

৩৮৯. আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

মাদকের ঘ্রাণ পাওয়া গেলে তা দ্বারা হদ্দযোগ্য মাদক গ্রহণ প্রমাণিত হবে না।[৩৯০]কেননা মুখের গন্ধ মদ্যপান ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণেও হতে পারে। যেমন ঢেকুর কিংবা হাঁচির কারণেও মুখ থেকে মাদকের মত দুর্গন্ধ বের হতে পারে। অথবা হতে পারে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মদ সেবন করেছে অথবা মদ ব্যতীত সে অন্য কোন পানীয় গ্রহণ করেছে; কিন্তু তা থেকে মদের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তাই শুধু গন্ধের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে মালিকীগণের মতে, শাস্তি প্রদানের জন্য গন্ধই যথেষ্ট। মদের মাদকতা চাই থাকুক বা না থাকুক।[৩৯১]তাঁদের বক্তব্য হল, মাদকের দুর্গন্ধই মদ্য পানের প্রমাণ বিশেষ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) প্রমুখ মুখে মাদকের গন্ধ পেয়েই বিভিন্ন মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।[৩৯২]এ থেকেও বোঝা যায়, মুখে মাদকের দুর্গন্ধই হদ্দ প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট।

চতুর্থত মাতলামি থাকা। কারো কারো মতে, মাতলামিও[৩৯৩]মদ্যপায়িতার একটি প্রমাণ। তবে অধিকাংশের মতে, তা দ্বারা হদ্দযোগ্য মাদক গ্রহণ প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ না সাক্ষ্যপ্রমাণ কিংবা অপরাধীর স্বীকারোক্তি দ্বারা তা সুপ্রমাণিত হবে। কেননা মাতলামি মাদক গ্রহণ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তাই শুধু মাতলামির কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৩৯৪]

পঞ্চমত বমি করা। মালিকীগণের নিকট মাদক বমিও মদ্যপায়িতার একটি প্রমাণ।[৩৯৫]তাঁদের দলীল হল, বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আলকামা (রা.) সাক্ষ্য দেন যে, তিনি হযরত মিকদাদ (রা.) কে মদ বমি করতে দেখেছেন। হযরত উমার (রা.) বলেন যে, ব্যক্তি মদ বমি করবে, সে মদ পান করেছে। আর তিনি এ ধরনের বমিকারীকে বেত্রাঘাত করেছেন।[৩৯৬] ইতঃপূর্বে ওয়ালীদ ইবন 'উকবা সম্পর্কে ও বর্ণিত হয়েছে যে, তার ব্যাপারে হুমরান সাক্ষ্য দেন যে, সে মদ পান করেছে। অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি মদ বমি করতে দেখেছেন। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেছেন, সে মদ না খেয়ে বমি করতে পারে না।[৩৯৭]এ বর্ণনাগুলো থেকে জানা যায় যে, বমিও মদ্যপায়িতার একটি প্রমাণ। তবে হানাফী ও শাফি'ঈগণের মতে, কেউ মাদক বমি করলে তার দ্বারা হদ্দযোগ্য মাদক গ্রহণ প্রমাণিত হবে না। কেননা তা কেবল মাদক গ্রহণের সন্দেহ সৃষ্টি করে মাত্র। আর সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই হদ্দ কার্যকর করার বিধান নেই। তাছাড়াও এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মাদক সেবন করেছে অথবা সে জানতো না যে, তা নেশার উদ্রেক করবে।[৩৯৮]

---

৩৯০. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯৪; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৩

৩৯১. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪১-২; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২৩

৩৯২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৮-৯; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪১-২

৩৯৩. মাতলামি বলতে ব্যক্তির কথাবার্তার বুঝবার এবং নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলাকে বোঝানো হয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অভিমত। তবে অন্যান্য ইমামের মতে, আবোল-তাবোল বকাবকি করা, পর-আপন ও ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে না পারাকেই মাতলামি বলা হয়। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪০-১)

৩৯৪. আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৩; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০৯-৩১০

৩৯৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৯; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪২

৩৯৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৯

৩৯৭. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং. ১৭০৭

৩৯৮. আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository

আর এ শাস্তি কার্যকর করতে হলে রুগ্ন ও মাতাল অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা বিধেয় নয়। মাদকের নেশা কেটে যাওয়ার পর এবং মাদক সেবনকারীর সুস্থ হবার পর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অন্যথায় শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তদুপরি মাতাল অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলার কারণে শাস্তির ব্যথাও তার কাছে কম অনুভূত হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, জ্ঞান ফিরে আসার আগে হদ্দ প্রয়োগ করা হলে জ্ঞান ফিরে আসার পর পুনরায় হদ্দ কার্যকর করতে হবে। তবে কারো কারো মতে, পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।[৩৯৯] তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হল, যদি মনে করা হয় যে, বেত্রাঘাতের ফলে সে যর্থাথ শিক্ষাই পেয়েছে, তাহলে পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।[৪০০]

ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তির বিধান :

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীন বিচার, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও চিন্তা শক্তি দান করেছেন, যাতে সে জেনে-বুঝে সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করতে পারে এবং মিথ্যা ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে পারে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে। মানুষ নিজ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলাম কারো স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে না। তবে একবার ইসলামকে নিজের জীবনের জন্য একমাত্র পবিত্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার পর তাকে কোন রূপ অমর্যাদা করার, এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কোন অবকাশ ইসালাম দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে তা জঘন্যতম অপরাধ। অনেক স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে কিংবা না জেনে-বুঝে সুনির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে পারে আর স্বার্থ সিদ্ধির পর কুফরীতে ফিরে যেতে পারে। অনুরূপভাবে কপট ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে নানা অধর্ম ইসলামে প্রবেশ করিয়ে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে, তার সৌন্দর্যগুলোকে ম্লান করে দিতে পারে। এ কারণে সত্যিকার দীনকে রক্ষা এবং তার গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মান্তরের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। ধর্মান্তর বা ধর্মত্যাগকে আরবীতে রিদ্দাহ বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ যে কোন অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলিমের স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে রিদ্দা বলা হয়।[৪০১]উল্লেখ্য যে, এ প্রত্যাবর্তন সুস্পষ্ট ঘোষণাও দিয়ে হতে পারে, কোন কুফরী বক্তব্য উচ্চারণ করেও হতে পারে এবং কোন কুফরী কাজ সম্পাদন করেও হতে পারে।আর এ ধর্মান্তরের কিছু শর্তাবলী রয়েছে তা নিম্নরূপ-

প্রথমত ধর্মান্তরকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক কিংবা পাগল[৪০২]কোন সুস্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে বা কাজ করলে তাকে ধর্মত্যাগী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন ও বেহুঁশ লোকদেরকে তাদের কোন কথা বা কাজের জন্যও ধর্মত্যাগী বলা যাবে না।[৪০৩]তবে মাতাল ও সাবালকের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, মাতালের কুফরী বাক্য বা কাজ ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য হবে না। এ জন্য তার ওপর ধর্মত্যাগের শাস্তি বর্তাবে না।

---

৩৯৯. এটা ইমাম শাফি'ঈ ও আহমদ (রহ.) প্রমুখের এক একটি মত হিসেবে বর্ণিত।

৪০০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬০

৪০১. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহারুর রাই'ক,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৬

৪০২. তবে যে ব্যক্তি কখনো পাগল হয়, আবার কখনো সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে হুঁশ অবস্থায় তার কুফরীকে ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করা হবে আর পাগল অবস্থায় কুফরীকে ধর্মত্যাগ রূপ গণ্য করা হবে না। (*আল-কাসানী*, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৪)

৪০৩. আর-রুহায়বানী, *মতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৯; আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

কেননা ধর্মত্যাগ মূলত বিশ্বাসের সাথে জড়িত। মাতাল ব্যক্তি অনেক সময় এমন কথা বলে থাকে যে, কথার ওপর তার বিশ্বাস নেই।[৪০৪]তবে অন্যান্য ইমামগণের মতে, মাতালের কুফরী বাক্য বা কাজ ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য হবে। কেননা ইসলামী আইনে মাতাল ব্যক্তিকেও শরী'আতের আদেশাবলী পালনে বাধ্য মনে করা হয়। এ কারণে সে কারো ওপর যিনার অপবাদ দিলে তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দানের হদ্দ কার্যকর করা হয় এবং সে স্ত্রীকে তালাক দিলে তাও গ্রহীত হয়। এ কারণেই তার কুফরীকেও ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করা হবে।[৪০৫] অধিকাংশ ইমামের মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান বালককেও তার কুফরীর জন্য ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়া যাবে। তাবে শাফি'ঈগণের মতে, যেহেতু তারা আজো শরী'আতের নির্দেশাবলী পালনে বাধ্য নয়, তাই কোন কুফরীর জন্য তাদেরকে ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়া সমীচীন নয়। তবে সকল ইমামই এ বিষয়ে এক মত যে, তাদের কুফরীর জন্য তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে না; বরং মারধর কিংবা ধমক বা বন্দী করে তাদেরকে ইসলামী জীবন ধারায় ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। হাম্বলীগণের মতে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এর পর তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা না করে কুফরীতে অটল থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[৪০৬]

দ্বিতীয়ত কারো প্রবল চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলেই তা ধর্মত্যাগ বলে ধর্তব্য হবে। অতএব কেউ প্রবল চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়ে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কুফরী কাজ করলেই ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে না, যে যাবত তার অন্তঃকরণে পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকবে।[৪০৭]আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে জোর প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে।"[৪০৮]

তৃতীয়ত ধর্মান্তরে জন্য সত্যিকার অর্থে ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে যাবার প্রমাণ পাওয়া যেতে হবে। অতএব ভয়ে বা একান্তে চাপে পড়ে কিংবা আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ মুসলিম হয়ে পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীতে চলে গেলে তাকে ধর্মত্যাগ করেছে বলে আখ্যা দেয়া যাবে না এবং এ জন্য শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না, যদি তার কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪০৯]অনুরূপভাবে যে বংশীয় কিংবা দেশীয় সূত্র ধরে মুসলিম নামে পরিচিতি লাভ করেছে, সে যদি বালিগ হওয়ার পর প্রকৃত অর্থেই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে নিয়েছে-তার প্রমাণ পাওয়া না যায়, তা হলেও তাকে কুফরীর জন্য হত্যা করা যাবে না; বরং বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসে।[৪১০]

---

৪০৪. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৩

৪০৫. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭২; খ. ৮, পৃ. ৩৬৭

৪০৬. আর-রুহায়বানী, *মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯০; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২০

৪০৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৩; খ. ২৪, পৃ. ৪৫-৬, ১২৯-৩০

৪০৮. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان- (আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬)

৪০৯. তবে মালিকী স্কুলের আশহাব ও ইবনু হাবীব (রহ.) প্রমুখ ইমামের দৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যক্তির জন্যও ধর্মত্যাগের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ইমাম আসবগ আল-মালিকীর মতে, তাকে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে বলা হবে। এজন্য তাকে একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত কয়েদ করে রাখা হবে এবং প্রহার করা হবে। যদি সে ফিরে আসে তা হলে ভাল। অন্যথায় তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। (আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৩)

৪১০. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

আর এ ধর্মান্তরের প্রধান রুকন হল ঈমান ও ইসলামের পর স্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা এমন কথা বলা বা কাজ করা যা স্পষ্টরূপে কুফরী বোঝায়।[৪১১]এ ধর্মান্তরকে দু'ভাবে প্রমাণ করা যাবে তা নিম্নরূপ-

প্রথমত ধর্মান্তরকারীর নিজের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ধর্মান্তর প্রমাণ করা যাবে। যদি সে স্বীকার করে যে, সে কুফরী করেছে, তা হলেই তার ওপর ধর্মান্তরের বিধান কার্যকর করা হবে।

দ্বিতীয়ত দুজন ন্যায়পরায়ণ[৪১২] ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ও ধর্মান্তর প্রমাণ করা যাবে। সাক্ষীদেরকে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা বা কাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে, যাতে সন্দেহজনক কোন কথা বা কাজের জন্য শাস্তি দেয়া না হয়। স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দ্বারা ধর্মান্তর প্রমাণিত হবার পর তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালই। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীদের বক্তব্য অস্বীকার করে, তা হলে তার এ অস্বীকার তাওবা হিসেবে এবং নিজের অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন রূপে গণ্য হবে। আর এ জন্য তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের অভিমত।[৪১৩] তবে অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। তার অস্বীকার আমলে নেয়া যাবে না; বরং তাওবা করে একজন সত্যিকার মুসলিমরূপে জীবনাচার শুরু করলেই সে মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পেতে পারে।[৪১৪]

আর এ ধর্মান্তর প্রমাণিত হবার পর যদি ধর্মান্তরকারী পুরুষ হোক বা নারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাওবাহ করে ঈমানের পথে ফিরে না আসে, তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড।[৪১৫]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[৪১৬]তবে হানাফীগণের মতে, কোন মহিলাকে ধর্মত্যাগ করার অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে না; বরং কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে ঈমানের পথে ফিরে আসে।[৪১৭]মুরতাদকে হত্যা করার পর তাকে গোসল দেওয়া যাবে না,তার নামাযে

---

৪১১. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯; আল-বুজায়রমী, *আত-তাজরীদ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৫-৬

৪১২. ইমাম হাসান ইবন যিয়াদের মতে, চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। (ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮)

৪১৩. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮; ইবনু নুজায়ম, *আর-বাহরুর রা'ইক,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৬

৪১৪. আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯৪-৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭-৮;

৪১৫. বর্তমানে অনেক অমুসলিম পন্ডিত ও তাদের ভাবশিষ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও ধর্মান্তরে এ শাস্তিকে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি মনে করে। তাদের মতে, বর্তমান সভ্য, সংস্কৃতিমনস্ক ও রুচিশীল সমাজে এ আইন চালু হতে পারে না। তাদের কথার উত্তরে সংক্ষেপে এতটুকু বলতে চাই যে, বর্তমানে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশেই তাদের নিজ নিজ ধর্মের সুরক্ষার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা রয়েছে। যদি ধর্মান্তরে কিংবা ধর্মকে কটাক্ষ করার শাস্তি সভ্যতা বিরোধী হত, তা হলে তারা কেনই বা তাদের সংবিধানে এ আইন রচনা করেছে। বর্তমান সভ্য জগতে তারাই হল সভ্যতার ধ্বজাধারী। অধিকন্তু, এ শাস্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়; বরং সভ্যতাকে মহিমান্বিত করণ, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ এবং সুস্থ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের জন্য এর প্রয়োজন অপরিসীম।

৪১৬. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী,* প্রাগুক্ত, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং. ২৪৫৪, (কিতাবুল ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন), হা.নং. ৬৫২৪

৪১৭. মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৪; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই,* প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

জানাযা পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে না।[৪১৮]বারংবার ধর্মত্যাগ করে পুনঃ পুনঃ তাওবা করলে ও শাফি'ঈ ও হানাফীগণের মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের দৃষ্টিতে তাওবা পাওয়া গেলে ধর্মত্যাগের জন্য যতবারই হোক মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কাফিরদেরকে বলুন, তারা যদি (শিরক থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদের অতীতের সকল পাপই মোচন করে দেয়া হবে।"[৪১৯]তাঁরা এ কথাও বলেছেন, দ্বিতীয়বার ধর্মত্যাগের পর তাওবা করলে তাকে তা'যীরের আওতায় প্রহার কিংবা কারাদন্ড দেয়া হবে, হত্যা করা হবে না।[৪২০]ইবনু আবিদীন বলেন, দ্বিতীয়বার ধর্মান্তর করার পর তাওবা করলে প্রহারের পর তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। যদি ফিরে তৃতীয়বারও ধর্মত্যাগ করে তা হলে এবারে তাকে ভীষণ বেদনাদায়ক প্রহার করা হবে এবং বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না তার খাঁটি তাওবার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এভাবে যতবারই সে ধর্মত্যাগ করবে, ততবারই এ রূপ আচরণ করা হবে।[৪২১] হাম্বলীগণের মতে, বারংবার ধর্মত্যাগকারীদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। হানাফীগণের এ ধরনের একটি মত বিরোধ রয়েছে। তাছাড়া ইমাম মালিক (রহ.) এর দিকেও এ মতের নিসবত করা হয়।[৪২২]তাঁদের দলীল হল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরী করেছে, অতঃপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরীর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না এবং তাদেরকে পথও দেখাবেন না।"[৪২৩]তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছে, অতঃপর কুফরী আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের তাওবা কখনোই গ্রহণ করা হবে না।"[৪২৪]বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) এর কাছে জনৈক মুরতাদকে আনার পর তিনি বললেন , তোমাকে আরো এক বার আনা হয়েছিল। আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি সত্যি সত্যিই তাওবা করেছিলে। এখন তো দেখি, তুমি ফিরে আবারো ধর্মত্যাগ করলে। এ বলে তিনি তাকে হত্যা করলেন।[৪২৫]তদুপরি বারংবার ধর্মত্যাগ থেকে বোঝা যায় যে, তার আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই। অতএব, তাকে হত্যাই করতে হবে। ধর্মান্তরের কারণে কিছু অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায় তা নিম্নরূপ-

প্রথমত তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ ধর্মান্তরিত হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা (কাফির মহিলারা) তাদের (মুসলিম পুরুষদের) জন্য হালাল নয় এবং তারা (মুসলিম পুরুষ) তাদের (কাফির মহিলাদের) জন্য হালাল নয়।"[৪২৬]হানাফী ও মালিকীগণের মতে, এ সম্পর্ক তাৎক্ষণিক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা মুসলিম বিবাহ আইনে ধর্মান্তর বিয়ে-আকদের পরিপন্থী।

---

৪১৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ১৯৫; আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৬

৪১৯. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (আল-কুর'আন, ৮ : ৩৮)

৪২০. আল-আনসারী, *আল-গুরার...*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৯-১০০

৪২১. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৫-৬

৪২২. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৮; যায়ল'ঈ, আত-তাবয়ীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৪

৪২৩. ان الذين امنوا ثم كفرو اثم امنوا ثم كفرو اثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا- (আল-কুর'আন, ৩ : ৩৭)

৪২৪. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم- (আল-কুর'আন, ৩ : ৯০)

৪২৫. আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-মুবদি*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৯

৪২৬. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن- (আল-কুর'আন, ৬০ : ১০)

Dhaka University Institutional Repository

তাই ধর্মত্যাগের সাথে সাথে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।[৪২৭]যদি মুরতাদ স্ত্রীর ‘ইদ্দত পালন অবস্থায় তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তাদের বৈবাহিক জীবন শুরু করতে হলে নতুন করে আকদ সম্পন্ন করা ও মোহর নির্ধারণ করা জরুরী।[৪২৮]পক্ষান্তরে শাফি‘ঈ ও হাম্বলীগণের ইমামগণের মতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিক ছিন্ন হবে না; বরং স্ত্রীর ‘ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক বহাল থাকবে। অতএব, তাঁদের দৃষ্টিতে যদি মুরতাদ তাওবা করে স্ত্রীর ‘ইদ্দত পালন অবস্থায় ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তাদের পূর্বের বৈবাহিক জীবনই বহাল থাকবে। যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে, তা হলেই বৈবাহিক সম্পর্ক ‘ইদ্দত শেষ হওয়ার পর থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে। ‘ইদ্দত গণনা ধর্মান্তরে পর থেকে শুরু হবে।[৪২৯]স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীর ধর্মত্যাগ করলে তাকে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ এবং আকদ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে, যদি স্বামী তা চায়। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে তা হলে স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্যকে বিয়ে করা তার জন্য জায়িয হবে না এবং কাযী যৎসামান্য মোহর নিধারণ করে নতুনভাবে আকদ করিয়ে দেবেন।[৪৩০]

দ্বিতীয়ত ইসলামী উত্তরাধিকারের নিয়ম মতে, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনরা একই ধর্মাবলম্বী হলে তারা তার ওয়ারিস হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হবে না এবং মুসলিমও কাফিরের ওয়ারিস হবে না।”[৪৩১]অতএব ধর্মত্যাগী যেহেতু মুসলিম নয়, তাই সে তার মুসলিম নিকটাত্মীয়ের ওয়ারিছ হতে পারবে না। অনুরূপভাবে তার নতুন ধর্মের কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী কোন আত্মীয়েরও সে ওয়ারিছ হবে না। কারণ মুরতাদের কোন ধর্ম নেই।[৪৩২]

তৃতীয়ত অধিকাংশ ইমামের মতে, ধর্মত্যাগের ফলে ধন-সম্পদের ওপর মুরতাদের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হবে না বটে; তবে যেহেতু সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য হয়েছে, তাই তার কোন অর্থনৈতিক চুক্তি ও লেনদেন বিশুদ্ধ হবে না। রাষ্ট্র তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে। যদি সে তাওবাহ করে ইসলামে ফিরে আসে, তা হলে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যদি সে মুরতাদ অবস্থায় কোন অর্থনৈতিক লেনদেন করে, তা হলে তা মূলতবী হয়ে থাকবে। যদি সে ইসলামে ফিরে আসে তাহলে তার কৃত লেনদেন কার্যকর করা হবে আর যদি হত্যা করা হয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার কৃত লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) এর মতে, ধর্মত্যাগের ফলে য়েহেতু ধন-সম্পদের ওপর মুরতাদের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হয় না, তাই মুরতাদ অবস্থায় তার অর্থনৈতিক লেনদেন বিশুদ্ধ হবে। আবূ বাকর আল-হাম্বলীল মতে, ধর্মত্যাগের ফলে ধন-সম্পদের ওপর মুরতাদের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব তার ধন-সম্পদের ওপর যেহেতু তার কোন মালিকানা স্বত্ব

---

৪২৭. এর জন্য না তালাকের প্রয়োজন হবে, না কাযীর ফায়সালার। এটা হানাফীগনের অভিমত। কতিপয় মালিকী ইমাম ধর্মান্তরের কারণে সংঘটিত বিচ্ছেদকে এক তালিকে বা’ইন রূপে গণ্য করেন। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদও এ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, ‘ইদ্দত অবস্থায় তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসবে নতুন করে আকদ করার প্রয়োজন নেই। (আল-কাসানী, *বদা’ইয়ুস সনা‘ই*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৭-৮; খ. ৭, পৃ. ১৩৬)

৪২৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৫, পৃ.৪৮-৫১; আল-কাসানী, *বদা’ইয়ূস সনা‘ই*, খ.২, পৃ.৩৩৭-৮; খ.৭, পৃ.১৩৬

৪২৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি‘ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭৩ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২৯, খ. ৭, পৃ. ১৩৩

৪৩০. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২৮-৩০

৪৩১. لايرث الكافر المسلم- ولا يرث المسلم الكافر ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ২১৮১৪; আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১২০০৪, ১২০০৫

৪৩২. *আল-মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

নেই, তাই তার সম্পদের ওপর তার কোন অধিকার চর্চা বৈধ হবে না।[৪৩৩]তাবে হানাফীগনের মতে, মহিলার ধর্মান্তরের শাস্তি যেহেতু মৃত্যুদন্ড নয়; তাই সম্পদের ওপর তার মালিকানা স্বত্বও অটুট থাকবে এবং তার যে কোন অর্থনৈতিক লেনদেনও বিশুদ্ধ হবে।[৪৩৪]মুরতাদের হত্যা বা মারা যাওয়ার পর তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের স্বত্বাধিকারী কে হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে তিন ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত তার পরিত্যক্ত সমস্ত ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে শত্রু সম্পদ হিসেবে জমা হবে। এটি মালিকী, শাফি'ঈ, হাম্বলীগণের অভিমত।[৪৩৫]

দ্বিতীয়ত তার যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পদ তার মুসলিম ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। এটি ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখের অভিমত। কেননা মীরাগাছের আইনে ধর্মত্যাগ করার পর থেকে তাকে মৃত ব্যক্তির ন্যায় গণ্য করা হয়।

তৃতীয়ত মুসলিম থাকা কালে তার উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ তার মুসলিম ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অভিমত।[৪৩৬]

চতুর্থত মুরতাদের অন্যের ওপর অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে না। সুতরাং সে তার কন্যাদের ও ছোট ছেলেদের বিবাহের 'আকদের অভিভাবক হতে পারবে না। যদি সে আকদ করায়, তা হলে 'আকদ বাতিল বলে গণ্য হবে।[৪৩৭]ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে।

ক. হানাফীগণের মতে, ধর্মান্তরের শাস্তি মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে পুরুষ হতে হবে। ধর্মান্তরের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে না; বরং তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, পুরুষদের মত ধর্মত্যাগী নারীদের জন্যও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[৪৩৮]তাঁদের দলীল হল : রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[৪৩৯]এ হাদীসে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অতএব, ধর্মত্যাগ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য যে বিধান প্রযোজ্য হবে, নারীদের সে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু রুমান (বা মারওয়ান) নাম্নী জনৈকা মহিলার ইসলাম ধর্মত্যাগ করার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) নির্দেশ দান করেন, প্রথমে তাকে ইসলামের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানাতে হবে। যদি সে

৪৩৩. আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪২০-১; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৬-৭

৪৩৪. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৭

৪৩৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫০

৪৩৪৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৫-৬; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৩০, পৃ. ৩৭

৪৩৭. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৯

৪৩৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০৯

৪৩৯. من بدل دينه فاقتلوه মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং. ২৮৫৪, (কিতাবুল ইসতিতাবাতিল মরতাদ্দীন), হা.নং. ৬৫২৪

Dhaka University Institutional Repository

তাওবা করে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালই। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।"[৪৪০]তবে মহিলা যদি যোদ্ধা কিংবা বুদ্ধিজীবী হয়, তা হলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে তাকে হত্যা করা যাবে। তবে হানাফীগণের মতে, এ হত্যা তার ধর্মত্যাগের কারণে নয়'; বিপর্যয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানোর কারণেই।[৪৪১]

খ. ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। যে সব ইমাম অপ্রাপ্ত বয়সের ধর্মান্তরকে হদ্দযোগ্য ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করেন, তাঁদের দৃষ্টিতেও এ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না, যে যাবত না সে বালিগ হবে।[৪৪২] ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, বালিগ হবার আগে কেউ ঈমান এনে আবার বালিগ হবার আগেই কিংবা বালিগ হবার পর ধর্মত্যাগ করল, অতঃপর বালিগ হবার পর তাওবাও করল না, তাকে হত্যা করা যাবে না। কারণ, সে বালিগ অবস্থায় ঈমানদার ছিল না। তবে তাকে পুনরায় ঈমানের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হবে।[৪৪৩]

গ. ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। মানষিক বিকারগ্রস্ত হলে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

ঘ. এ শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে কারো কোন জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করতে হবে। ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে তাওবার জন্য তিন দিন[৪৪৪]সুযোগ দিতে হবে। এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে ওয়াজিব। তাঁদের বক্তব্য হল : হয়ত তার কাছে ইসলামের কোন বিষয়ে সন্দেহ ছিল। তাই তা নিরসন করা প্রয়োজন। হানাফীগণের মতে, এটা মুস্তাহাব। কেননা ইসলামের দাওয়াত তো তার কাছে আগেই পৌঁছে গেছে এবং সে বুঝে শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা মেনে নিয়েছে।[৪৪৫]বর্ণিত আছে, জনৈক ধর্মত্যাগীকে তাওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করার খবর শুনে হযরত 'উমার (রা.) ভীষণ দুঃখিত হলেন এবং বললেন, "আমি অবশ্যই তাকে তাওবার জন্য তিন দিনের সুযোগ দিতাম। যদি সে তাওবা করত তা তো ভালই হত। তা না হলেই আমি তাকে হত্যা করতাম।"[৪৪৬]তাছাড়া ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত জাবির (রা.) এর হাদীস থেকেও জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মু রুমান নাম্নী জনৈকা ধর্মত্যাগকারিণী মহিলাকে তাওবার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাওবার সুযোগ না দিয়ে ধর্মত্যাগীকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এ জন্য হত্যাকারীকে তা'যীরের আওতায় সাধারণ শাস্তি দেয়া যাবে; কিসাস বা বড় ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না।[৪৪৭]

ঙ. ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীর বক্তব্য বা কাজ এমন হতে হবে, যা সুস্পষ্ট রূপে

---

৪৪০. আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং.১৬৬৪৩; আলী দারুকুতনী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল হুদুদ), হা.নং.১২২

৪৪১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০৯-১০

৪৪২. যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯২-৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪

৪৪৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭২

৪৪৪. শাফি'ঈগণের মতে, তাওবার জন্য তাৎক্ষণিক সুযোগ দেয়া হবে। তিন দিনের ফুরসত দেয়া যাবে না। (আর-রামালি, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৯)

৪৪৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭-৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৮-৯

৪৪৬. لاستتبته ثلثة ايام فان تاب والا قتلته আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৯

৪৪৭. যায়ল'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কুফরী বোঝায়। যদি তার বক্তব্যে কিংবা কাজে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে এবং সে নিজেও যদি তা বলে, তা হলে তাকে এ কথা বা কাজের জন্য ধর্মত্যাগ করেছে- বলা যাবে না এবং এর জন্য শাস্তিও দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে আবেগের আতিশয্যে কারো মুখ দিয়ে ভুলক্রমে বা অসতর্কতামূলভাবে হঠাৎ কোন কুফরী বাক্য উচ্চারিত হলে তাও ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য হবে না। যেমন-কেউ আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, "হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, আর আমি তোমার গোলাম", কিন্তু তার মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হয়ে গেল, "তুমি আমার গোলাম, আর আমি তোমার রব।"[৪৪৮]যে সব বিষয় ধর্মান্তর রূপে গণ্য তা নিম্নরূপ- একজন কাফির যে সব বিষয় স্বীকার করে নিলে মুসলিম হয়, কোন মুসলিম ঐ সব বিষয় অস্বীকার করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে কোন আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী ধ্যান-ধারণা পোষণ করবে, কুফরী বাক্য উচ্চারণ করবে ও কুফরী কাজ সম্পাদান করবে, সেও কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। কাফির ও মুরতাদ হবার বিষয় গুলোকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

প্রথমত ধর্মান্তরের ই'তিকাদী বিষয়সমূহ-

ক. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে অথবা তাঁকে অস্বীকার করবে অথবা তাঁর কোন সিফাতকে অস্বীকার করবে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে কিংবা কেউ এ জগতকে সনাতন ও স্থায়ী বলে বিশ্বাস করলে অথবা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে সেও কাফির ও মুরতাদ হবে।[৪৪৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রত্যেকেই ধ্বংসশীল।"[৪৫০]

খ. আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি আছে বলে কেউ বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ তাঁর শানের পরিপন্থী কোন বিষয়ে ওপর বিশ্বাস পোষণ করলে যেমন মনুষ্যাকৃতিতে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন বলে বিশ্বাস করলে অথবা প্রতিটি স্থানে প্রত্যেক বস্তুর সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্তা মিশে রয়েছে বলে বিশ্বাস করলে কিংবা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক বলে বিশ্বাস করলে এবং স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪৫১]

গ. পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষে আসমানী গ্রন্থ। এটি সবধরনের পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। অতএব, সম্পূর্ণ কুর'আনকে কিংবা তার অংশ বিশেষকে এমন কি কুর'আনের একটি শব্দ বা একটি অক্ষরকেও কেউ অবিশ্বাস করলে, মিথ্যা বলে ধারণা করলে, সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কুর'আনের কোন বক্তব্যকে বিশ্বাস না্ করলে বা প্রত্যাখ্যান করলে অথবা তার কোন বিধি-বিধানে সন্দেহ পোষণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। তদুপরি কেউ কুর'আনের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস না করলে, কুর'আনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভম মনে করলে এবং কুর'আনের সংযোজন-বিয়োজন যুক্তিযুক্ত মনে করলে সেও কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৪৫২]

---

৪৪৮. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৯-৩০

৪৪৯. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯-৩০

৪৫০. كل شيئ هالك الا وجهه (আল-কুর'আন, ২৮ : ৮৮)

৪৫১. আর-রু হায়বানী, *মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮২; আল-বহুতী, *আশ-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭০-১

৪৫২. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩১; শায়খী যাদ *আল-মাজমা*, াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯৩;

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. দীনের যে কোন অকাট্য ও সর্বজন পরিচিত বিধানকে (যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হ্জ্জ, জিহাদ প্রভৃতি) কেউ মেনে না নিলে অথবা অস্বীকার করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৪৫৩]

ঙ. রাসূলুল্লাহ (স.) কে কেউ ভন্ড, প্রতারক, সন্ত্রাসী, মূর্খ ও মিথ্যাবাদী মনে করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লহ (স.) এর শানের পরিপন্থী কোন দোষ বা গুণ (যেমন- রাসূলুল্লাহ (স.) কে আল্লাহর মনুষ্যরূপে মনে করা, তাঁকে ও আল্লাহ তা'আলার জন্য সুনির্দিষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারক মনে করা এবং গুণে ও বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষ মনে করা) বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪৫৪]

চ. সর্বজন বিদিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা : সর্বজন বিদিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারাম (যেমন-যিনা, মদ্যপান, যাদু, সুদ প্রভৃতি) কোন বিষয়কে কেউ হালাল বলে বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪৫৫]

ছ. কেউ রাসূলুল্লহ (স.) কিংবা তাঁর প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা বা কোন সর্বসম্মত বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪৫৬]

জ. সাহাবীগণের প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী। কেউ যদি দীনের কারণে (অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে দীনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, দীন বিজয় লাভ করেছিল) তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর নিছক ব্যক্তিগত কারণেও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা সমীচীন নয়। এর জন্য গুনাহগার হতে হবে।[৪৫৭]

ঝ. নিজের বা অপরেরর কুফরী অবস্থানের ওপর সন্তুষ্ট থাকাও ঈমানের পরিপন্থী। অতএব কেউ নিজের বা অপরের কুফরী ওপর সন্তুষ্ট থাকলে কিংবা কেউ অপর কারো কুফরীর ওপর অটল থাকা কামনা করলে সে কাফির হয়ে যাবে।[৪৫৮]

দ্বিতীয়ত বাচনিক বিষয়সমূহ :

১. কেউ নিজেকে কাফির রূপে ঘোষণা দিলে কিংবা জেনে বুঝে, এমন কি উপহাস কিংবা রসিকতা করে হলেও কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় না জেনে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, সেও সর্বসাধারণ আলিমের মতানুযায়ী কাফির হয়ে যাবে। তার জ্ঞান না থাকা ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু অনেকের মতে, এ ধরণের ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। তার জ্ঞান না থাকা ওযর রূপে গণ্য হবে। এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য।[৪৫৯]কেননা ইমামগণের

---

৪৫৩. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭; আল-মওয়াক, *আত-তাজ...*, খ.৮, পৃ.৩৭১

৪৫৪. আল-আনসারী, *আসনার মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৫

৪৫৫. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২১-২

৪৫৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৩৬

৪৫৭. আস-সুবকী, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৫-৬

৪৫৮. ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৭; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ২৫৭

৫৪৯. শায়খী যাদাহ, *আল-মাজমা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৮; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে, কুফরীর ফাতওয়া দেবার বেলায় যথা সম্ভব সর্তক হওয়া উচিত। যদি উচ্চারিত কুফরী বাক্যের অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায়, তা হলে সে ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি অজ্ঞতা যদি ওযর হিসেবে ধর্তব্য না হয়, তা হলে তো সকল মূর্খকেই কাফির বলতে হবে। তারা তো কোনটি কুফরী বাক্য, কোনটি কুফরী বাক্য নয়- তা জানে না। বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর সময়ে জনৈকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী খ্রিস্টানদেরকে শাস্তি দেবেন। এটা শুনে মহিলাটি বলল, আল্লাহ তা'আলা এই রূপ করবেন না। কারণ, তারা তো আল্লাহর বান্দাহ। পরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, "সে কাফির হবে না। কারণ সে তো একজন মূর্খ। তোমরা তাকে শিক্ষা দাও।"[৪৬০]

২. আল্লাহকে গালমন্দ বলা বা তাঁর কোন বা গুণ নিয়ে উপহাস করা চরম কুফরী। কেউ এ রূপ করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ তাঁর কোন নির্দেশ বা কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা কোন সর্তকবাণীকে নিয়ে উপহাস করলে ও কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহকে গালমন্দ বা উপহাসকারীর তাওবা কবুল হবে কিনা- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তার তাওবা কবুল হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহ.) এর মতে, তার তাওবা কবুল হবে না। তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে। কেননা সে আল্লাহকে গালি দিয়ে কিংবা উপহাস করে চরম মারাত্মক অপরাধ করেছে, যা অমার্জনীয়।[৪৬১]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করা, তাঁকে গালমন্দ বলা এবং তাঁর প্রদর্শিত দীন বা তাঁর কোন বাণী নিয়ে উপহাস করা প্রভৃতি কুফরী কাজ। রাসূলুল্লাহ (স.) কে গালমন্দ বা উপহাসকারীর তাওবা কবুল হবে কি না- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তার তাওবা কবুল হবে। ইমাম আবূ বাকর আল-ফারিসী (রহ.) এর মতে তাকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে; তাওবার কারণে হদ্দ রহিত হবে না। ইমাম সায়দলানীর মতে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। মালিকীগণের মতে, কোন নবীকে কেউ গালি দিলে তাকে হত্যা করা হবে। তার তাওবা কবুল হবে না। যদি সে তাওবা করে তাহলে হদ্দের আওতায় তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে।[৪৬২]আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি তোমরা তাদের জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশাই করছি। আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়েই উপহাস করছো? ছলনা কর না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ।"[৪৬৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতি যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বা কাজের নিসবত করে, যদিও সে তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করে-সে বড় ধরনের অপরাধে লিপ্ত।[৪৬৪]তাকে প্রকাশ্যে প্রহার করা হবে এবং বন্দী করে রাখা হবে, যে

৪৬০. আল-হামতী, হামযু *উয়ূনিল বছা'ইর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৪

৪৬১. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২; মুল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০

৪৬২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ১৯৩; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২

৪৬৩. وائن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قلا بالله وايته ورسوله كنتم تستهزئون- لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم (আল-কুর'আন, ৯ : ৬৫-৬)

৪৬৪. শায়খ আবূ মুহাম্মদ আল-জুয়াইনী (রহ.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ কুফরীর নামান্তর।" আল-হায়তমী বলেন, "অনেকের দৃষ্টিতে আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা চরম কুফরী, যার ফলে মিথ্যাচারী ব্যক্তি মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে।" (আল-হায়তমী, *আয-যাওয়াজির*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬২)

Dhaka University Institutional Repository

যাবত না সে তাওবা করে। কেননা তাঁর প্রতি মিথ্যা কোন কিছু নিসবত করা তাঁর শাসন ও মর্যাদাকে ঘায়েলকরার শামিল।[৪৬৫]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা গড়ে নেয়।"[৪৬৬]

৩. কেউ কোন নবীকে গালি দিলে কিংবা কোন খারাপ উপাধি (যেমন- যাদুকর, মিথ্যুক, প্রতারক, ভন্ড ও সন্ত্রাসী প্রভৃতি) দিয়ে অভিহিত করলে অথবা কোন কাজের জন্য দোষারোপ করলে বা ছোট করার মানসে তাঁর কোন রূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করলে অথবা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কোন তুলনা দিলে বা ছবি তৈরি করলে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ কোন নবীকে লা'নত করলে বা বদ দু'আ করলে অথবা তাঁর ক্ষতি কামনা করলে বা শানের পরিপন্থী কোন কছিু তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলে কিংবা কোন কথা বা কাজের সাহায্যে তাঁকে নিয়ে উপহাস করলে কাফির হয়ে যাবে।[৪৬৭]

নবীকে গালমন্দকারী মুসলিম হলে সে সর্বসম্মতভাবে মুরতাদ হবে এবং তাকে এ জন্য হত্যা করা হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে অমুসলিম হলে অধিকাংশ ইমামের মতে যেহেতু সে নাগরিক চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই তাকে হত্যা করা হবে। তবে হানাফীগণের মতে, তাকে হত্যা করা হবে না; তবে আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৪৬৮]

উল্লেখ্য যে, নবী-রাসূলুকে ইশারা-ইঙ্গিতে গালি দিলেও স্পষ্টভাষায় গালি দেয়ার মতই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। কাদী 'ইয়াদ (রহ.) বলেন, সাহাবা কিরাম থেকে আজ পর্যন্ত সকল ইমামই এ বিষয়ে এক মত যে, "ইশারা-ইঙ্গিত স্পষ্ট বক্তব্যের মতই।"[৪৬৯]

৪. হযরত 'আয়িশা (রা.) এর পবিত্রতা যেহেতু পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, তাই তাঁর প্রতি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে বা এ কারণে কেউ তাঁকে গালমন্দ করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, "যে আবূ বকর (রা.) কে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে হযরত 'আয়েশা (রা.)কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে।" এ কথা বলার পর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলে : "তাঁকে যে অপবাদ দেবে বস্তুত সে কুরআনের বক্তব্যকেই অস্বীকার করল"।[৪৭০]তদুপরি তাঁকে কেউ অন্য কোন কারণে গালি দিলে কিংবা তাঁকে ছোট বা হেয় করে কথা বললে তাকে দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড দিতে হবে এবং কঠোরভাবে প্রহার করতে হবে।[৪৭১]তবে অন্য নবী পত্নীদেরকে অপবাদ কিংবা গালি দেয়ার বেলাও হযরত 'আয়েশা (রা.)-এর অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের দুটি মত পাওয়া যায়।

---

৪৬৫. *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩০২

৪৬৬. من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, (কিতাবুল জানা'ইয), হা.নং.১২২৯; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (বাব: তাগলীযূল কিযর), হা.নং. ৩, ৪

৪৬৭. শায়খী যাদাহ, *আল-মাজমা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৮, ১২২

৪৬৮. মূল্লা খসরু, *দুরারুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬২-৩;

৪৬৯. التلويح كالتصريح *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২৪, পৃ. ১৩৭; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ. ৮, পৃ. ৭০

৪৭০. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৬

৪৭১. আর-রু'আয়নী, *মাওয়াহিবুল জলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৬; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

ক. তাঁদের কাউকে গালি দেয়ার জন্য অন্য সাধারণ সাহাবীকে গালি দেয়ার অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। এটা হানাফী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এ ধরণের একটি মত বর্ণিত রয়েছে।

খ. যে কোন নবী পত্নীকে অপবাদ বা গালি দেয়ার জন্য হযরত 'আয়িশা (রা.) এর অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ, যে কোন নবী পত্নীকে অপবাদ দেয়া কিংবা গালি দেয়া প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) এর শান ও ব্যক্তিত্বের প্রতি কলঙ্ক লেপনেরই নামান্তর। অধিকাংশ হাম্বলী ইমাম দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করেছেন।[৪৭২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা সতী ও গাফিল ঈমানদার মহিলাদেরকে অপবাদ দেবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।" হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, "উপর্যুক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত 'আয়িশা ও অন্যান্য নবী পত্নিদের জন্য প্রযোজ্য। যে কেউ তাদেরকে অপবাদ দিলে তাদের তাওবাও কবুল হবে না।"[৪৭৩] অধিকাংশ ইমামের মতে, নবী পত্নীদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীকে বন্দী করে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। যদি সে তাওবা করে ফিরে না আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[৪৭৪]কেউ রাসূলুল্লাহ (স.) পরিবারের অন্য কাউকে গালি দিলে সে কাফির হবে না; তবে তাকে তা'যীরের আওতায় প্রকাশ্যে জোরে প্রহার করা হবে এবং কারাদন্ড দিতে হবে। কেননা নবী পরিবারের কাউকে গালি দেয়া নবী (স.) এর শান ও মর্যাদার আঘাত করার শামিল।[৪৭৫]

৫. কেউ কুর'আনকে তুচ্ছ করে কথা বললে বা তাকে নিয়ে উপহাস করলে কাফির হয়ে যাবে।[৪৭৬]

৬. ফেরেশতাগণকে গালমন্দ বলা।ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ তা'আলার অতি সম্মানিত ও নিষ্পাপ একটি সৃষ্টি। তাই অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে কোন ফেরেশতাকে (যেমন হযরত জিব্রাইল, মালাকুল মাওত ও জাহান্নামের রক্ষী মালিক (আ.) প্রমুখ) কিংবা সামগ্রিকভাবে সকলকে কেউ লা'নত করলে, গালি কিংবা উপহাস করলে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে যাঁদের ফেরেশতা হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে (যেমন হারূত, মারূত), তাঁদেরকে কেউ গালি দিরে কাফির হবে না; তবে তাও শাস্তিযোগ্য। বিচারক সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারবেন। তবে ইমাম কারাফীর মতে, সেও কাফির হবে এবং তাকে এজন্য হত্যা করা হবে।[৪৭৭]

৭. কেউ দীন ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে গালি দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে কেউ ব্যক্তি বিশেষের দীনকে গালি দিলে হানাফীগণের মতে সেও কাফির রূপে গণ্য হবার উপযোগী। তবে তার গালির এ রূপ ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব যে, গালিদাতার উদ্দেশ্য প্রকৃত দীন ও মিল্লাত নয়; বরং ব্যক্তি বিশেষের খারাপ চরিত্র ও মন্দ আচার-আচারণ। যদি গালিদাতার উদ্দেশ্য তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তাকে তার গালির জন্য কাফির বলা যাবে না। আমাদের সমাজে অনেক মূর্খই এ ভাবে গালিগালাজ করে থাকে।

---

৪৭২. এটা হাম্বলীগণের অভিমত। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। (ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪

৪৭৩. ان اذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم- (আল-কুর'আন, ২৪ : ২৩)

৪৭৪. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৬

৪৭৫. আল-মওয়াক, *আত-তাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৮৫

৪৭৬. শায়খী, যাদাহ, *আল-মাজমা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯৩

৪৭৭. আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫; খ. ৮, পৃ. ৭০; আদ-দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু*, খ. ৪, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি দীন ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে গালি দেয়া অধিকাংশ ইমামের মতে যেহেতু সে নাগরিক চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই তাকে হত্যা করা হবে। তবে হানাফীগণের মতে, তাকে হত্যা করা হবে না; তবে আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৪৭৮]বর্ণিত আছে যে, 'আছমা' বিনত মারওয়ান নাম্নী জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা ইসলামের দুর্নাম করত, রাসুলুল্লাহ (স.) কে কষ্ট দিত এবং লোকদেরকেও তা করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাত। এ কারণে 'আমর ইবন 'আদী আল-খিতমী (রা.) তাঁকে হত্যা করেছিলেন।[৪৭৯]এ হাদীস প্রসঙ্গে হানাফীগণ বলেন, তাকে হত্যা করার কারণ কেবল ইসলামের দুর্নাম করা নয়; বরং কয়েকটি গুরুতর অপরাধ একত্রে পাওয়া যাবার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

৮. কোন ব্যক্তি সকল সাহাবীকে গালমন্দ করলে বা কাফির বললে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। কেননা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবা কিরামের সততা ও নিষ্ঠা কুর'আন ও হাদীসের বহু অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। তাঁরা হলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম অংশ। অতএব তাঁদের সকলকে কাফির বলা বা গালমন্দ করার মানে হল ইসলামের একটি অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা আমরা সাহাবীগণের ব্যাপারে সর্তক হও, আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমার পরে তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র পরিণত কর না।"[৪৮০]তবে সকলকে নয়; বিশেষ একজন কিংবা কয়েকজন সাহাবীকে কেউ গালমন্দ করলে বা কাফির বললে হানাফী ও মালিকীগণের মতে, তাকে কাফির ও মুরতাদ বলা যাবে না; তবে সে শাস্তিযোগ্য হবে। তাকে এ জন্য সশ্রম বা বিনা শ্রমে কঠোর কারাদন্ড দেয়া যাবে।[৪৮১]তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার জন্য মুরতাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আবার অনেকেই ব্যক্তিগত কারণে গালমন্দ করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদি গালমন্দের কারণ একান্ত ব্যক্তিগত হয়, তা হলে গালমন্দকারী কাফির হবে না। যদি সাহাবী হবার কারণেই গালি দেয়া হয়, তা হলেই কাফির হবে।[৪৮২]হযরত আবূ বকর (রা.) এর সুহবত যেহেতু কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত, তাই কেউ তা অস্বীকার করলে কিংবা তাকে কেউ গালি বা কাফির বললে সে কাফির হয়ে যাবে। হানাফীগণের মতে, হযরত আবূ বকর ও উমার (রা.) দুজনকেই বা তাঁদের কোন একজনকেও কেউ গালি দিলে কাফির হয়ে যাবে। আবার কারো মতে, খুলাফায়ে রাশিদূনের কাউকেও কাফির বললে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে ইমাম মালিক ও অন্য কতিপয় ইমামের মতানুযায়ী তাঁদেরকে গালি দিলে কাফির হবে না; তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে এ রূপ ব্যক্তির কাফির হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি এ রুপ ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার এবং আজীবন কারাদন্ড দেয়ার কথা বলেছেন, যদি সে তাওবা করে ফিরে না আসে।[৪৮৩]আরবদেরকে কিংবা বনূ হাশিমকে কেউ গালি দিলে কিংবা লা'নত করলে তাকেও কারাদন্ড দেয়া

৪৭৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ১৩৯

৪৭৯. আল-কদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, খ. ২, পৃ. ৪৮

৪৮০. الله الله في اصحابي- لاتتخذو هم غرضا من بعدي- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান* (আবওয়াবূল মানাকিব), হা.নং. ৩৮৬২; ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হা.নং. ২০৫৬৭, ২০৫৬৮, ২০৫৬৯

৪৮১. এটা ইমাম আহমাদ (রহ) এর ও একটি অভিমত।

৪৮২. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৯; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৩

৪৮৩. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহাতর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৬-৭; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

হবে এবং প্রহার করা হবে।[৪৮৪]

৯. আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম আদম (আ.) আর সর্বশেষ হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.) । তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তাই কেউ যদি তা বিশ্বাস না করে নিজেকে নবী বলে দাবী করে কিংবা তাঁর পরে অন্য কাউকে কেউ নবী বলে বিশ্বাস করে, সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৪৮৫]

১০. কোন মুসলিমকে কেউ কাফির বলে সম্বোধন করলে হানাফীগণের মতে সে ফাসিক হবে, যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়। এ জন্য বিচারক তাকে উপযুক্ত তা'যীরী শাস্তি দেবেন।[৪৮৬]হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে ডাকল, তাহলে তাদের যে কোন একজন তার উপযোগিতা অর্জন করবে। যাকে কাফির ডাকা হলে সে যদি বাস্তবিকই কাফির হয়, তাহলে তো অসুবিধা নেই। যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়, তা হলে কাফির সম্বোধনকারীর ওপর এর পরিণাম বর্তাবে।"[৪৮৭]শাফি'ঈগণের মতে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফির বলে অভিহিত করবে- চাই তা কোন পাপের কারণেও যদি হয়- সে নিজেই কাফির হয়ে যাবে, যদি সে নিয়ামতের কুফরী বা ইত্যাকার কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই তা বলে থাকে। তবে এ ধরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে এ জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না।৪৮৮ তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে কাফির কিংবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাকল, সে যদি বাস্তবিকই তা না হয়, তা হলে তার এ কথা উল্টো তার দিকে ফিরে আসবে।"[৪৮৯]

তৃতীয়ত কর্মজাতীয় বিষয়সমূহ :

১. আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বা অস্বীকার বোঝা যায়- এ ধরণের যে কোন কাজ কুফরী। যেমন- আল্লাহ তা'আলার কোন চিত্র আঁকা বা তাঁর মূর্তি তৈরি করা, চাঁদ-সুরুজের পূজা করা, তাচ্ছিল্যের সাথে ডাস্টবিন বা অন্য কোথাও পুরো মুসহাফ কিংবা অংশবিশেষ[৪৯০]ছুঁড়ে মারা। কোন ব্যক্তি এ রূপ কোন কাজ করবে সে কাফির হয়ে যাবে, যদিও সে আল্লাহ কিংবা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী বলে নিজেকে দাবী করে। কারণ, তার এ অযাচিত কাজ আল্লাহ ও তাঁর কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ রূপে বিবেচিত হবে। অধিকন্তু,

৪৮৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩০২

৪৮৫. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩

৪৮৬. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুর মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৯-৭০

৪৮৭. انما امرئ قا لاخيه ياكافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال- والا رجعت عليه- (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, হা.নং. ৫৭৫৩; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল ঈমান), হা.নং. ৬০)

৪৮৮. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৮

৪৮৯. من دعا رجلا بالكفر او قال: عدو الله- وليس كذلك الا حار عليه মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, সহীহ আল-মুসলিম, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং. ৬০

৪৯০. মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে হাদীসগ্রন্থ ছুড়ে মারার জন্যও বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ কিংবা কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশতার নাম লিখিত অথবা কোন শার'ঈ বক্তব্য সম্মলিত কোন কাগজ কেউ যদি অবমাননা করার মানসেও তাচ্ছিল্যের সাথে ডাস্টবিনে ছুড়ে মারে কিংবা ময়লার সাথে মিশিয়ে ফেলে সেও কাফির হয়ে যাবে। (আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৬-৭; আদ-দাসূকী, *আল-হাশিয়াতু*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০১)

তা তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, যা সুস্পষ্ট কুফরী।[৪৯১]

২. আল্লাহ ছাড়া কোন মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করা, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা তামাসাচ্ছলে হোক- চরম কুফরী। কেউ এ রূপ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন ‘আলিম বা বুজর্গ কিংবা কোন প্রতাপশালী রাজা বাদশাহের সামনে মাটিতে সিজদা করা বা নুইয়ে পড়াও হারাম। যে তা করবে এবং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে- দুজনেই বড় গুনাহগার হবে। কেননা মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ বলে এ রূপ অবস্থাকে ইসলাম চরমভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে এ রূপ ব্যক্তি কাফির হবে কি না তা কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। কেউ যদি কারো সামনে তার ইবাদাত এবং বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশের নিমিত্তে এ রূপ করে থাকে, তা হলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। যদি তা কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্যই করে থাকে, তা হলে সে কাফির হবে না বটে; তবে বড় গুনাহগার হবে।[৪৯২] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “একজন মানুষের অন্য মানুষকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করা উচিত নয়। যদি তা রীতি সিদ্ধই হত, তা হলে আমি অবশ্যই স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।”[৪৯৩]

তবে পরস্পর একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে সচরাচর লোকেরা যে সামান্য পরিমাণে ঝুঁকে মাথা নত করে থাকে, যা কোনভাবেই রুকু’র পর্যায়ে পৌঁছে না, তা কুফরীও নয় এবং হারাম ও নয়। তবে তা নিঃসন্দেহে মাকরূহ। এ রূপ অবস্থাও পরিহার করে চলা উচিত। বর্ণিত রয়েছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আমাদের কারো একভাইয়ের সাথে অপর ভাইয়ের বা বন্ধুর সাক্ষাত হয়, তখন কি একজন অপরের উদ্দেশ্য ঝুঁকে পড়বে? তিনি বললেন, না। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাকে ধরে চুমো খাবে? তিনি বললেন, না। লোকটি ফিরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি তার হাত ধরে মুসাফা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।”[৪৯৪]তবে ঝুঁকতে গিয়ে রুকু’র পর্যায়ে চলে গেলে অনেকের মতে- এ রূপ অবস্থায় যদি ব্যক্তি বিশেষকে আল্লাহর মত সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে তা কুফরী এবং হারাম হবে না। তবে এটিও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত আচরণ (মাকরূহ তাহরীমী)। আবার অনেক আলিমের মতে, ব্যক্তি বিশেষকে আল্লাহর মত সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য না থাকলেও এভাবে পরস্পর একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করা হারাম। কেননা রুকু’র আকৃতিতে সম্মান প্রদর্শনের নিয়মটি কেবল আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট; কোন বান্দাহর জন্য এটা প্রযোজ্য নয়।[৪৯৫] ইবনু ‘আল্লান সিদ্দীকী বলেন, “সাক্ষাতের সময় রুকুর মত করে ঝুঁকে যাওয়া একটি চরম ভ্রান্তিমূলক বিদ’আত। যদি কেউ আল্লাহকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেভাবে কাউকে সম্মান করার উদ্দেশ্য ঝুঁকে যায়, তাহলে সে

---

৪৯১. নববী, *আল-মাজমূ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ১১৭

৪৯২. এটা অধিকাংশ হানাফী ইমামে অভিমত। তবে হানাফীগণের মধ্যে শামসুল আইয়িম্মাহ আস-সারাখসী (রহ.) ও আরো অনেকের মতে, এ রূপ অবস্থায়ও সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সিজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কেবল আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট। কোন বান্দাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। (আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০; শায়খী যাদাহ, *আল-মাজমা*, খ. প্রাগুক্ত, ২, পৃ. ৫৪২)

৪৯৩. ما ينبغي لبشر ان يسجد لبشر- ولو صح- لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليه- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল নিকাহ), হা.নং. ২৭৬৮; আহমদ নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৯১৪৭; আল- বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৩২৬৩

৪৯৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিয়ী, *আল-জামি’* প্রাগুক্ত (কিতাবুল ইস্তি’যান), হা.নং. ২৭২৮

৪৯৫. আল-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৭; কালয়ূবী ও উমায়রাহ, *আল-হাশিয়াতু*, খ.১, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে।”[৪৯৬]

৩. কোন মুসলিম অমুসলিমদের পরিচয়সূচক কোন পোশাক বা বেশভূষা (যেমন- ব্রাহ্মণদের পৈতা, বৌদ্ধদের গেরুয়া বর্ণের কাপড় ও খ্রিস্টানদের ক্রস প্রভৃতি) ধারণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে, যদি সে তা কোন রূপ অনুরাগ বা আগ্রহ নিয়ে পরে থাকে। যদি সে তা খেলাচ্ছলে পরে থাকে, তা হলে এর জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না; তবে এ রূপ করাও হারাম।[৪৯৭]

৪. দীনের যে কোন অকাট্য ও সর্বজন পরিচিত বিধানকে (যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ প্রভৃতি) কেউ অস্বীকার করে কিংবা উপহাস করে আমল করা ছেড়ে দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে গাফলতি বা ইত্যাকার অন্য কোন কারণে তা কেউ আদায় না করলে সে কাফির হবে না বটে; তবে সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৪৯৮]

৫. ইসলামী শরী'আতের যাদু[৪৯৯]একটি মারাত্মক ঘৃণিত কাজ। এর শিক্ষা দান ও গ্রহণ দুটিই হারাম।[৫০১] রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভাষায়- এটি ইসলামের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সাতটি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম।[৫০২]

হানাফীগণের মতে, দু'অবস্থায় যাদুকরকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা যাবে।

ক. যদি যাদুতে কোন কুফরী বা শিরকী বাক্য বা কাজের আশ্রয় নেয়া হয়।

খ. অথবা কুফরীর আশ্রয় নেয়া ছাড়াই যাদুর সাহায্যে সচরাচর মানুষের ক্ষতি সাধন করার কাজে পরিচিতি লাভ করে। এ অবস্থায় তাকে হত্যার কারণ কুফরী নয়; মানুষের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় রত থাকাই হল এর মূল কারণ। ইসলামী শাস্তি আইনে কুফরী ছাড়া অন্য যে কোন মারাত্মক অপরাধের কারণেও কাউকে হত্যা করা যেতে পারে। অতএব যাদুকর যেহেতু তার কাজের মাধ্যমে গোপনে মানুষের ক্ষতি সাধন করে এবং তা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় অথবা সে নিজে স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে মানুষদের তার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে হত্যাই করতে হবে। উপরন্তু তাকে তাওবা করতে বলা যাবে না এবং সে তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[৫০৩]তবে মালিকী, হাম্বলী ও কতিপয় হানাফী ইমামের মতে, অমুসলিম যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না; বরং তা'যীরের

৪৯৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১৩৫

৪৯৭. এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের অভিমত। (ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮; ইবনু গুনায়ম, *আল-ফাওয়াকিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮১)

৪৯৮. নববী, *আল-মাজমু*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২২

৪৯৯. যাদু বলতে বিভিন্ন গোপন কৌশলের সাহায্যে নানা অদ্ভূত বা অস্বাভাবিক কর্মকান্ড ঘটানোর প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। যাদুতে প্রায়শ কুফরী ও শিরকী উক্তির সাহায্যে শয়তান ও জিনের সাহায্য চাওয়া হয়। বিভিন্ন খারাপ মতলব ও উদ্দেশ্য (যেমন কাউকে ক্ষতি করা, মেরে ফেলা বা দুর্বল করা, পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করা ও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রভৃতি) নিয়ে যাদু করা হয়।

৫০১. অধিকাংশ ইমামের মতে, যাদু শিক্ষা ও চর্চা কুফরী নয়, যদি তা মুবাহ হিসেবে বিশ্বাস করা না হয় কিংবা তাতে কোন কুফরী বাক্য বা কাজের আশ্রয় না নেয়া হয়। তবে মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, যাদু কেউ হারাম বলে বিশ্বাস করুক কিংবা মুবাহ বলে বিশ্বাস করুক-সর্বাবস্থায় যাদু শিক্ষা ও চর্চা দুটিই কুফরী। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬২)

৫০২. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ২৬১৫; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল ঈমান), হা.নং. ৮৯

৫০৩. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, পাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

আওতায় অন্য যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যাবে।[৫০৪] যাদুকরের তাওবা কবুল না হবার দলীল হল : রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যাদুকরের হদ্দ হল তরবারির আঘাতে হত্যা করা"[৫০৫] এ হাদীসে যাদুকরের শাস্তিকে হদ্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হদ্দ যোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তাওবার কারণে হদ্দ রহিত হবে না। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা যাদুকর কয়েকজন সাহাবীর নিকট জানতে চেয়েছিলেন, তার তাওবার কোন সুযোগ আছে কি (অর্থাৎ তাওবার মাধ্যমে দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় আছে কি)? তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে ফাতওয়া দেন নি।[৫০৬] তদুপরি যাদুকর যেহেতু গোপনে কর্মকান্ড চালায়, তাই সে খাটি তাওবা করছে কি না তাও জানা মুশকিল। শাফি'ঈগণের মতে, যাদুতে যদি কোন কুফরী বাক্য বা কাজের আশ্রয় না নেয়া হয়, তাহলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে না। আর এ জন্য যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না, যে যাবত সে কাউকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে বলে স্বীকার করবে না। তবে হাম্বলীগণের মতে, যাদুকর যাদুর সাহয্যে হত্যা করেছে- তা প্রমাণিত না হলেও যাদুকরকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে, যদি সে যাদুকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করে।[৫০৭]

মালিকীগণের মতে, যদি যাদুকর প্রকাশ্যেই কুফরী যাদুর কাজ করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তাহলে কুফরীর কারণে তাকে হত্যা করা হবে। তবে সে তাওবা করলে তার তাওবা কবুল করা হবে। যদি সে গোপনেই যাদুর কাজ করে, তাহলে তাকে যিন্দীকের মতই গণনা করা হবে এবং এ জন্য তাকে হত্যা করা হবে এবং তার তাওবাও গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫০৮] শাফি'ঈগণের মতে, যদি কেউ যাদুকে হারাম বিশ্বাস করেই শিক্ষা দেয় বা শিক্ষা নেয়, তা হলে তাকে কাফির বলা যাবে না। এ জন্য তা'যীরের আওতায় আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারবে। তবে কেউ হারাম জানার পরও যদি তাকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করে, তাহলে তাকে কাফির বলা হবে। কেননা হারাম জেনেও তাকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। এ কারণে তার ওপর মুরতাদের বিধান কার্যকর করা হবে। মুরতাদকে যেমন হত্যা করা হয়, তেমনি তাকেও হত্যা করা হবে। তাঁদের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, মুরতাদের তাওবার মত যাদুকর তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে হত্যা করা যাবে না।[৫০৯]যাদুতে কুফরীর আশ্রয় নেয়নি কিংবা যাদুর সাহায্যে কাউকে হত্যা করেনি- এ ধরণের যাদুকরকেও তা'যীরের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে সে আর কখনোই এবং তার মত আর কেউ এ পেশায় এগিয়ে আসতে সাহস না পায়।[৫১০] যাদুর মত হস্তরেখা গণনা এবং রাশির ওপর ভিত্তি করে বা জিনকে বশ করে অনুমানভিত্তিক গায়েবের কথা বলাও হারাম।

---

৫০৪. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১৭; আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮৭

৫০৫. - الساحر ضربة بالسيف আত- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা তিরমিযী, *আল- জামি'*, প্রাগুক্ত (আবওয়াবুল হুদুদ), হা.নং. ১৪৬০; আল-বায়হাকী, *আস-সুনান, আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৬২৭৭

৫০৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৬

৫০৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৩; আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮৬

৫০৮. ইবনু গুনায়ম, *আল-ফাওয়াকিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০০; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১৭

৫০৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৩। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও এ ধরণের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৫)

৫১০. এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। (ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৩; আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

কোন মুসলিম এগুলোকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করলে সে কাফির হবে এবং এ ধরণের পেশা অবলম্বনকারী মুসলিম হত্যার যোগ্য হবে। হযরত 'উমার (রা.) বলেছেন, "প্রত্যেক যাদুকর ও জ্যোতিষীকে হত্যা কর"।[৫১১] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে গণনা করে এবং যার জন্য গণনা করা হয় উভয়ে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[৫১২] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, বস্তুত পক্ষে সে আমার ওপর অবতীর্ণ বাণীকেই অস্বীকার করল।"[৫১৩]তবে যদি কেউ এগুলোকে মুবাহ কিংবা বাস্তবসম্মত ব্যাপার মনে না করে খেয়ালী বিষয় ধরে নিয়েই চর্চা করে, শিক্ষা দেয় বা শিক্ষা গ্রহণ করে, তা হলে তা অবশ্যই কুফরী হবে না বটে; তবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। এ পথে তার সমস্ত উপার্জন হারাম হবে। উপরন্তু তা'যীরের আওতায় তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।[৫১৪]

চতুর্থত বর্জন জাতীয় বিষয়সমূহ :

ইসলামের যে কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধান, যা 'আমল করা সর্বসম্মতভাবে ফরয (যেমন নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি) কেউ অস্বীকার করে তা আমল করা ছেড়ে দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলোকে চাই তা ফরয হোক বা সুন্নাত-জিইয়ে রাখা মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য। তাই কোন এলাকা কিংবা কোন জনপদ বা কোন দেশের লোকজন যদি সম্মিলিতভাবে ইসলামের কোন প্রকাশ্য নিদর্শনের (যেমন নামাযের জামা'আত, আযান, ইকামত ও ঈদের নামায প্রভৃতি) বিরোধিতা করে এবং তা বর্জন করে, তা হলে তাদেরকে তা পালন করতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কেননা সম্মিলিতভাবে ইসলামের কোন নিদর্শন ত্যাগ করা তাকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। এটা অধিকাংশ ইমামে অভিমত। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) এর মতে, তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না। তবে তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং প্রহার করা হবে।[৫১৫]

রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতার শাস্তির বিধান :

ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র। জনগণের কল্যাণ সাধনই এর প্রকৃত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে কার্যত পৌঁছতে হলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক গোলযোগ এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহ একটি কল্যাণকর উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় অন্তরায়। তাই ইসলাম এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারদ্রোহিতার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

---

৫১১. اقتلوا كل ساحر وكاهن সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল খারাজ), হা.নং. ৩০৪৩; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত. হা.নং. ৩২৬৫৪

৫১২. ليس منا من تكهن وتكهن له আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং. ৪২৬২, ৪৮৪৪, *আল-মু'জামুল কবীর*, হা.নং. ৩৫৫

৫১৩. ومن اتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد (ص) সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল তিব), হা.নং. ৩৯০৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস- সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল তাহারাত), হা.নং. ৬৩৯

৫১৪. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৭; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪২

৫১৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৯৮-৯; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতাকে আরবীতে বাগী (بغي) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ অন্যায় করা, সীমা লঙ্ঘন করা।[৫১৬] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সাধারণত بغي বলতে সরকারের আনুগত্য থেকে অন্যায়ভাবে বেরিয়ে পড়াকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কতিপয় মুসলিম দলবদ্ধভাবে কোন একটি খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার উৎখাতের জন্য অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করাকে بغي বলা হয়। আর যে মুসলিম এভাবে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে باغي (সরকারদ্রোহী) বলা হয়।[৫১৭]উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, সরকারদ্রোহীতার জন্য নিম্নের ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলেই সরকারের বিরোধিতাকে সরকারদ্রোহিতা রূপে গণ্য করা হবে।

ক. বিদ্রোহকারীদের মুসলিম হওয়া

খ. সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করা

গ. অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হওয়া

ঘ. সরকারের বিরোধিতার পক্ষে কোন যুক্তি থাকা, যদিও তা সঠিক নয়

ঙ. সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা

চ. সরকার পতনের জন্য প্রকাশ্যে হত্যা ও বিভিন্ন অপরাধ সৃষ্টি করা

অতএব, অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলে তারা সরকারদ্রোহী হবে না; তারা হবে হারাবী (রাষ্ট্রদ্রোহী)। তাদের জন্য হারাবীদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কোন দল যদি কোন যৌক্তিক কারণ প্রদর্শন করা ছাড়া এবং সরকারের ক্ষমতা দখল করার অভিপ্রায় ব্যতীত সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে পড়ে তারাও সরকারদ্রোহী হবে না। তারা হবে সন্ত্রাসী। তাদের জন্য সন্ত্রাসীদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ কোন অজুহাতে নিয়মানুগ সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করলে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে (যেমন- সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো) সে সরকারদ্রোহী রূপে গণ্য হবে না; যে যাবত না সে সরকার উৎখাতের জন্য দলীয় প্রচেষ্টায় কোন রূপ অপরাধ সংঘটিত করবে বা লড়াই করবে। কেননা ব্যক্তিগত কিংবা দলীয়ভাবে নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে কেউ বা কোন দল শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।[৫১৮] আল্লামা সানআনী বলেন, "কেউ যদি জমা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু সমাজে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়, তা হলে তার পথকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। কেননা নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সমীচীন নয়।"[৫১৯] শাফি'ঈগণের মতে, সরকারের বিরোধিতা করা অন্যায় কিছু নয়; কেননা

---

৫১৬. যেমন বলা হয় بغى عليه "সে অমুকের প্রতি অন্যায় করল কিংবা সীমালঙ্ঘন করল।" (আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪; ইবনু মানযুর বলেন, এক মুল অর্থ হল: হিংসা। তবে এটি অন্যায়-অবিচার অর্থেই বহুল ব্যবহৃত। কেননা হিংসুটে ব্যক্তি প্রায়শ হিংসাকৃত ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণ করে থাকে। তাছাড়া শব্দটি খোঁজ করা, অনুসন্ধান করা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৭৯)

৫১৭. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১১-২; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫১

৫১৮. আল-বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫১

৫১৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতাকারীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নিয়েই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, যদিও তারা তাদের ব্যাখ্যায় হয় তো সঠিক নয়। তাই তাদেরকে এ ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত মনে করতে হবে।”[৫২০]উপরন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারের অন্যায় কাজের সমালোচনা করা শুধু জায়িযই নয়; বরং সর্বোত্তম জিহাদ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য/ন্যায় কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।”[৫২১]উপরন্তু, যে সমাজে ইসলামী শরী‘আত প্রতিষ্ঠিত নেই এবং অত্যাচারী শাসকের স্বৈরশাসনে যেখানে জনজীবন বিপন্ন, সেখানে সুশৃঙ্খল উপায়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহদ্রোহী যালিমদের আনুগত্য অস্বীকার করে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা সরকারদ্রোহীতা তো নয়; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ, যা মুসলিমের জন্য একটি বড় ফরয। সকল মুসলিমের কর্তব্য হল, তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যদি তারা তাদের সাহায্য করা ছেড়ে দিয়ে যালিম ও আল্লাহদ্রোহী সরকারের আনুগত্য করে- তাহলে এটা হবে হারাম। কেননা আল্লাহর নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা হারাম। তবে জিহাদের নামে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, নিরীহ লোকদের হত্যা করা, পথে–ঘাটে লোকদের ভয়প্রদর্শন করা এবং জাতীয় ও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংস ও লুটপাত করা কেবল হারামই নয়; বরং ইসলামকে কলঙ্কিত করার শামিল। আর এ রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতা দমনের পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ-

প্রথমত রাষ্ট বা সরকারদ্রোহীকে প্রথমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা পরিহার করে সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার জন্য আহবান জানাতে হবে এবং তাদের বিদ্রোহের কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাদের বিদ্রোহের কারণ সরকারের পক্ষ থেকে কোন অন্যায়-অবিচারের শিকার হবার কারণে হয়ে থাকে, তা হলে তা নিরসন করতে হবে। যদি তারা এমন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করে, যা মেনে নেওয়া সম্ভব, তা হলে তা মেনে নিতে হবে। যদি কোন বিষয়ে তাদের কোন অস্পষ্টতা কিংবা সন্দেহ থাকে, তা দূরিভূত করতে হবে। উপরন্তু, তাদেরকে ভয়ভীতিও দেখাবে এবং প্রয়োজনীয় উপদেশও দেবে। কেননা পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ তা’আলা তাদের সাথে লড়াইয়ে অবর্তীণ হবার আগে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “যদি মু’মিনদের দুটি দল লড়াইয়ে অবর্তীণ হয়, তা হলে তোমরা তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও।”[৫২২]তদুপরি এ ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাদেরকে দমন করা এবং তাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা বন্ধ করা। যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। তাই কথার সাহায্যে যে ক্ষেত্রে তাদেরকে দমন করা সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে লড়াইয়ের অবর্তীণ হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ তাতে দু’দলেরই ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার আগে লড়াইয়ে অবর্তীণ হওয়া জায়িয হবে না, যদি না তাদের পক্ষ থেকে কোন অরাজকতার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। যদি তারা অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের জন্য কিছু দিন সময় কামনা করে আর যদি প্রকাশ্যে তা বোঝা যায় যে, তাদের এ আবেদনের উদ্দেশ্য সরকারের অনুগত্যে ফিরে আসা, তা হলে তাদেরকে একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুযোগ দিতে হবে। এর পরও যদি তারা হঠকারী ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে লড়াই করতে আহবান জানাবে। যদি সরকার জানতে পারে যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা হলে সরকারের উচিত তাদেরকে গ্রেফতার করা, যে যাবত না তাওবা করে তারা আনুগত্যের পথে ফিরে আসে। যদি সরকারের

---

৫২০. আর-রামালী, *নিহায়তুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০৬; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৬

৫২১. افضل الجهاد كلمه حق/عدل عند سلطان جئر সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (বারঃ আল-আমর ওয়ান নাহই), হা.নং. ৪৩৪৪; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত- তিরমিযী, *আল- জামি’* প্রাগুক্ত (কিতাবুল ফিতান), হা.নং. ২১৭৪; আবুল কাশিম তাবারানী, *আল-মু’জামূল কবীর*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৮০৮১

৫২২. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما (আল-কুরআন, ৪৯ : ৯)

Dhaka University Institutional Repository

অগোচরেই তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তা হলে প্রথমত সরকার তাদেরকে বিদ্রোহ ত্যাগ করে আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য দাওয়াত জানাতে পারে। বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) উষ্ট্র যুদ্ধের পূর্বে বসরাবাসীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা নিজেরা লড়াই শুরু না করে।[৫২৩]তবে এমতাবস্থায় লড়াইয়ের প্রতি আহবান জানানো ছাড়াই তাদের সাথে লড়াই করতে কোন অসুবিধা নেই।[৫২৪]অনুরূপভাবে হারুরাবাসীরা যখন হযরত আলী (রা.) এর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে বিদ্রোহের ঘোষণা দিল, তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) কে তাদের কাছে ইনসাফের বার্তা নিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যদি তোমাদের কথায় সায় দেয়, তাহলে তাদের ওপর তোমরা আক্রমণ করবে না। আর যদি তারা তোমাদের কথা মেনে না নেয়, তাহলে তোমরা তাদের সাথে লড়াই করবে।৫২৬হানাফীগণের মতে, বিদ্রোহীদেরকে আনুগত্যের প্রতি আহবান এবং তাদের সন্দেহ দূরিভূতকরণ ওয়াজিব নয়; তবে মুস্তাহাব। তদুপরি লড়াইয়ের প্রতি বিনা আহবানেও তাদের সাথে লড়াই করা যাবে।৫২৭ মালিকীগণের মতে, যদি তারা তাড়াহুড়া না করে, তা হলে তাদেরকে প্রথমে ভীতিপ্রদর্শন করতে হবে এবং তাদেরকে আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য আহবান জানাতে হবে।

দ্বিতীয়ত যদি বিদ্রোহীরা সরকারের শান্তি আহবানে সাড়া না দেয়, উপরন্তু তারা দলবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয হবে তবে সরকারই কি তাদের সাথে লড়াইয়ের সূত্রপাত করবে না কি সরকার তাদের প্রকাশ্যে সশস্ত্র মহড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তা নিয়ে দুটি মত রয়েছে।[৫২৮]

ক. সরকারের জন্য লড়াইয়েল সূত্রপাত করা জায়িয হবে। কেননা সরকার যদি তাদের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, তা হলে তারা শক্তি সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়ে যাবে। ফলে তাদের দমন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তদুপরি সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে লড়াইয়ের সূত্রপাত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি একদল অন্য দলের প্রতি বিদ্রোহ করে, তাহলে তোমরা বিদ্রোহকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যে যাবত সে আল্লাহর নিদের্শের দিকে ফিরে আসে।"[৫২৯] হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ (স.) বলেছেন, "শেষ যুগে এমন কিছু অল্পবয়স্ক নির্বোধ লোক বের হবে, যারা মুখে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির বাণী উচ্চারণ করবে এবং কুর'আন শরীফ পড়বে; কিন্তু তা তাদের গলদেশ পার হবে না। তারা দীন থেকে দূরে সরে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়। যখন তোমরা তাদের সাক্ষাৎ পাবে তাদেরকে হত্যা করবে। কেননা কিয়ামতের দিন তাদের হত্যাকারীর জন্য পুরস্কার

---

৫২৩. আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৪৫৭১; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৩৭৭৮৪

৫২৪. আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৪; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭০-১

৫২৫ ইবনু হাজর আল 'আসকালানী, *আদ-দিরায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৮

৫২৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতুহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০০১-১

৫২৭. 'উলায়স, *মিনহুল জলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০১

৫২৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫২; আর-রুহায়বানী, *মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৩

৫২৯. فان تغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر الله (আল-কুরআন, ৪৯ : ৯)

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে।”[৫৩০]তাদের লড়াইয়ের প্রস্তুতির পরও যদি তাদেরকে বন্দী করে তাদের অরাজকতা বন্ধ করা সম্ভবপর হয়, তাহলে লড়াই না করে তাদেরকে বন্দীই করতে হবে। কেননা লড়াইয়ের চাইতে সহজতর উপায়ে যেহেতু তাদেরকে দমন করা সম্ভব হচ্ছে, তাই এর চাইতে কঠোরতম পথ অবলম্বন করা সমীচীন নয়। এটা হানাফী ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমামে অভিমত।

২. বিদ্রোহীরা লড়াইয়ের সূচনা করার আগে সরকার তাদের লড়াই শুরু করবে না। কেননা তাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্য হল তাদের অরাজকতা বন্ধ করা। অতএব তাদের সাথে লড়াই করা জায়িয হবে না, যে যাবত তারা কোন অরাজকতা সৃষ্টি করবে না। কারণ, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কোন মুসলিমের সাথে লড়াইয়ের অবতীর্ণ হওয়া জায়িয নয়। এটা শাফি'ঈগণের এবং হানাফী ইমামগনের মধ্যে কুদূরীর অভিমত।[৫৩১]

বিদ্রোহীদেরকে দমনের জন্য সরকার যদি জনগণের সহযোগিতা কামনা করে, তাহলে রাষ্ট্রের প্রত্যেকে সামর্থ্যবান লোকদের ওপর সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়াবে, যদি সরকার অত্যাচারী ও আল্লাহদ্রোহী না হয়। কেননা অন্যায় নয়-এমন সকল কাজে সরকারের আনুগত্য করা সকলের জন্য ফরয।রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- “যে ব্যক্তি কোন ইমামের (সরকার প্রধান) হাতে বায়'আত করল এবং তাকে সমর্থন জানাল, তার উচিত যথাসাধ্য তার আনুগত্য করা। যদি অপর কোন ব্যক্তি তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে তোমরা তার গর্দান উড়িয়ে দাও।”[৫৩২]ইবনু কুদামাহ বলেন, মুসলিম উম্মাহ যে ব্যক্তির নেতৃত্ব ও রায'আতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করবে, তার নেতৃত্ব কার্যকর হবে এবং তাকে সহযোগিতা করা সকলের জন্য ওয়াজিব। উপরন্তু, তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া হারাম। কেননা তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রকারান্তরে গোটা উম্মাতের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার াল নামান্তর। এ রূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়িয হবে।[৫৩৩]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার সুসংহত উম্মাতের আনুগত্য ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবে, তোমরা তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দাও, সে যে কেউ হোক না কেন।”[৫৩৩]প্রায় সকল ইমামের মতে, বিদ্রোহী মহিলা হলে তাকে আটক করে রাখা হবে, যদি সে লড়াই করে। তাকে লড়াইরত অবস্থা ছাড়া অন্য সময় হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করে রাখা হবে তার অপরাধের কারণে এবং বিপর্যয় ও ফিতনার সৃষ্টির পাঁয়তারা করার কারণে।[৫৩৪]মালিকীগণের মতে, তাদের লড়াইয়ের প্রকৃতি যদি কেবল উৎসাহ যোগাতে কিংবা পাথর ও ঢিল নিক্ষেপ হয়ে থাকে, তা হলে যুদ্ধাবস্থায়ও তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।[৫৩৫]

---

৫৩০. يخرج فوم في اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يقراون القران لا يجاوزون مر اقيهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية- فاينما لقيتمو هو فاقتلو هم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন), হা.নং. ৬৫৩১; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (বার: আত-তাহরীদ আলা কাতলিল খাওয়ারিজ), হা.নং. ১০৬৬

৫৩১. আল-হাদ্দাদী, *জাওহারাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৯-২৮০; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৬

৫৩২. من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر- মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল ইমারত), হা.নং. ১৮৪৪; সুলাইমান আবু দাউদ, *আস সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ৪২৪৮

৫৩৩. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩-৫

৫৩৪. من خرج على امتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان- আবুল কাশেম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামূল কবীর*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৩৫৪; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ২০৭১৪; আবূ 'আওয়ানাহ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং. ৭১৪৫
ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩০

৫৩৫. আদ-দাসূকী, *হাশিয়াতুল 'আলাশ শারহিল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০০; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬১-২

Dhaka University Institutional Repository

হত্যার শাস্তির বিধান :

হত্যাকে মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। হত্যা বলতে কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্য, পাথর নিক্ষেপে; বিষ প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণনাশ করাকে বোঝানো হয়। মানব হত্যা বা খুন একটি মানবতা বিধবংসী জঘন্যতম অপরাধ। আরবী কাতল (قتل) শব্দের অর্থ হত্যা বা হত্যা কর। এখানে শব্দটি মানব হত্যার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেহ হতে প্রাণের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়ার কাজকে কতল বা হত্যা বলা হয়।[৫৩৬]

যে কাজের দ্বারা মানব দেহ হতে প্রাণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাকে হত্যা বলে।[৫৩৭]

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ বলেন, "কোন মানুষ দ্বারা এমন কাজ হওয়া যার ফলে কোন জীবন বিপন্ন হয়।"[৫৩৮]

কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, পাথর নিক্ষেপে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণ নাশকে হত্যা বলে।[৫৩৯]

হত্যা-মানুষের পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়া এমন একটি কর্ম যার মাধ্যমে জীবন শেষ হয়ে যায়।[৫৪০]

শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর ইসলামে মানব হত্যাই সর্বাধিক মারাত্মক অপরাধ। একজন মানুষের জীবন বাঁচানো যেমন গোটা মানব জাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য; তেমনি একজন মানুষের জীবন সংহার গোটা মানব জাতির জীবন সংহারের সমতুল্য। এজন্যই ইসলামী আইনে হত্যার মত জঘন্যতম অপরাধের জন্য ন্যায়বিচারভিত্তিক কঠিন বিধান রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন" ।[৫৪১]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোন মুমিনকে হত্যা করার চেয়ে দুনিয়াটা ধবংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিকতর সহজ।" ইসলামী আইনে শরী'আত সম্মত কোন কারণ ছাড়া হত্যা করা হারাম। শত্রুতাবশত কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা মহা অপরাধ। এটা এত বড় অপরাধ যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি অবধারিত। আর তা হলো কিসাস ও জান্নামের শাস্তি। কারণ এ ধরনের হত্যাকান্ড আল্লাহর সৃষ্টির সাথে শত্রুতা পোষণ ও সীমালংঘন। এর ফলে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং সুস্থ বিবেক হত্যার মত জঘন্য কাজকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে

---

৫৩৬. ড. মুহাম্মদ রাওয়ার ও ড. হামেদ সাদেক, *মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৫৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, খ. ১, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫) পৃ. ২৫৫

৫৩৮. (هو فعل من العباد تزول به الحياة-) মুহাম্মাদ আল-খতীব, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২; ইবনু হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩

৫৩৯. ইবনু মুনযির, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২৮

৫৪০. কমাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদিল ওয়াহিদ, *তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীর* (পাকিস্তান, কোয়েটা মাকতাবা রাশিদিয়্যাহ, তা.বি.) খ. ৮, পৃ. ২৪৪-২৪৫

৫৪১. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما- (আল-কুরআন ৪:৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা হত্যা করা হারাম ঘোষণা করে বলেন, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধীকারিকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।"[৫৪২]আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নর হত্যা অথবা দুনিয়ার ধবংসাত্মক কার্যহেতু ব্যতীত কেউ কাউকে ও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল"।[৫৪৩] রাসুলূল্লাহ (স.) হত্যা করাকে জঘন্য অপরাধ ও হারাম ঘোষণা করে বলেন, "তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমের রক্ত কারো জন্য হালাল নয়। বিবাহিত ব্যাভিচারী, হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি।"[৫৪৪]তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট একজন মুমিনকে হত্যা করা গোটা পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেয়েও ভয়াবহ।"[৫৪৫]

তিনি আরো বলেন,"নিশ্চয়ই তোমাদের জান ও মাল একে অন্যের জন্য এতটা সম্মানিত যেমনটি আজকের দিন, বর্তমান মাস আর এই শহর।"[৫৪৬]হত্যা করা হারাম কাজ এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত। ইচ্ছা করে হত্যাকারী ফাসিক। আল্লাহর তা'আলা তাকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতেও পারেন বা শাস্তি ও দিতে পারেন। অনেকেই মনে করেন হত্যাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ইবন আব্বাস (রা.) মনে করেন হত্যাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। যারা মনে করেন যে আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; তা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[৫৪৭] তওবা না করলে কিংবা তওবা গ্রহণযোগ্য না হলে হত্যাকারীর শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যা বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। পার্থিব জগতে তাদের শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ এ অধ্যায় আলোচনা হবে। আখিরাতে শাস্তির ব্যপারে আল্লাহ বলেন,"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[৫৪৮] হত্যা করা তখনই হারাম যখন এটি অন্যায়ভাবে করা হয়। আর হকভাবে হত্যা করা হলে তা হারাম নয়। এসব বিচারে হত্যা দু'ধরণের–

ক. অন্যায়ভাবে হত্যা করা;

খ. ন্যায়ভাবে হত্যা করা

---

৫৪২. ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا (আল-কুরআন, ১৭: ৩৩)

৫৪৩.-من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا (সূরা মায়িদা, ৫: ৩২)

৫৪৪.-لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث- الثيب الزائى النفس بالنفس والتارك لدينه المفرق للجماعة (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা,নং. ৬৮৭৮; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা,নং. ৪৩৬৮)

৫৪৫.-قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا (আন-নাসাঈ, আবূ আবদুল রহমান, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হা,নং. ৩৯৮৮)

৫৪৬. -ان دماءكم وامو الكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهر كم هذا وفى بلد كم هذا (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত,হা, নং ৬৭;, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত,হা,নং. ৩০০৯)

৫৪৭. -ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء (আল-কুরআন, ৪ : ১১৬)

৫৪৮. -ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعد له عذابا عظيما (আল-কুরআন, ৪ :৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

আর শাফিঈ মাযহাবের আইনজ্ঞগণ মনে করেন হত্যা পাঁচ প্রকার হতে পারে–

১. ওয়াজিব হত্যা : ধর্মত্যাগী যদি তওবা না করে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রে কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ না করে কিংবা জিযিয়া কর না দেয়, তবে তাকে বিচারের মাধ্যম হত্যা করা ওয়াজিব।

২. হারাম হত্যা : অন্যায়ভাবে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম।

৩. মাকরুহ হত্যা : মুজাহিদের তার ঐ কাফির আত্মীয়কে হত্যা করা যে আল্লাহ ও রাসূলকে গালি-গালাজ করেনি।

৪. মানদূব বা সুন্নাহ হত্যা : মুজাহিদের তার ঐ কাফির আত্মীয়কে হত্যা করা যে আল্লাহ ও রাসূলকে গালি-গালাজ করে।

৫. মুবাহ হত্যা : কিসাস গ্রহণের জন্য হত্যা করা। নিজের জীবন রক্ষার জন্য কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি।[৫৪৯]এমনিভাবে কোন পুরুষ যদি তার ঘরে ঢুকে তার স্ত্রী বা মুহরিম ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তার জন্য ঐ ব্যভিচারিকে হত্যা করা মুবাহ। এতে কোন কিসাস হবে না। যদি দু'জনের সম্মতিতে এ ব্যভিচার হয়ে থাকে,তবে দু'জনকে হত্যা করা মুবাহ। আর যদি জোর পূর্বক পুরুষটি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে শুধু পুরুষকে হত্যা করা মুবাহ। হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের আালিমগণ এ মত পোষণ করেন।[৫৫০]সংবাদ পত্রের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত ১৪,৯৫৫ জন লোক হত্যার শিকার হয়েছেন।[৫৫১]

মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে (আসক) উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩) র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন সদস্যের হাতে বিচারবহির্ভূত ভাবে ১৪৬ নিহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে এসব প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে মানুষের প্রাণহানির ঘটনাকে কখনও ক্রসফায়ার, কখনও বন্দুক যুদ্ধ কিংবা মুখোমুখি সংঘর্ষ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০১২ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হন প্রায় ৭০ জন। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারকে উদ্ধৃত করে মার্কিন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের (২০১৩) প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৮৯ জন এবং ১০ হাজার ৪৮ জন আহত হয়েছেন।[৫৫২]বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা (বামবাস) রিপোর্টি বিগত ২০১১, ২০১২ সালে ২ বছরে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন , ধর্ষণ এবং যৌতুকের কারণে ৯১৩ জন নারী ও শিশু নিহত হয়েছে। ২০১৩ জানুয়ারীতে নির্যাতনে ৫২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ জন নারী ও শিশু। ওই মাসে ৩৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।[৫৫৩] জানুয়ারী (২০১৪) থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১৬২জন গুম হয়েছেন। এদের মধ্যে

---

৫৪৯. মুহাম্মাদ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩

৫৫০. ইবনু আবেদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৭

৫৫১. দৈনিক দিনকাল , ১২ মার্চ ২০১৪, বুধবার, পৃ. ৮

৫৫২. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ১ মার্চ শনিবার ২০১৪, পৃ. ১৪

৫৫৩. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ৪ মে, ২০১৩, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

২০ জনের লাশ পাওয়া গেছে।[৫৫৪]

হত্যার প্রকারভেদ: উদ্দেশ্য ও ধরন বিচারে হত্যাকে নিম্নোক্ত পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়-

১ ইচ্ছাকৃত হত্যা
২ প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা
৩ ভুলবশত হত্যা
৪ প্রায় ভুলবশত হত্যা
৫ কারণবশত হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যা :

কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যখন এমন কাজ করে যার দ্বারা অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়, তখন তার সে কাজকে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' বলা হয় এবং এর জন্য কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) - এর মতে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' সাব্যস্ত করার জন্য লৌহাস্ত্র বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার প্রয়োজন। পক্ষান্তরে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) এবং অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, লৌহাস্ত্র বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহৃত শর্ত নয়। তাদের মতে অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' সংঘটিত হতে পারে। যেমন পানিতে ডুবিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ করে, বিষ পান করিয়ে বা উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলে তাও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' হিসেবে গণ্য হবে।[৫৫৫]ইচ্ছাকৃত হত্যা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে-

ক. ধারালো অস্ত্র বোঝানো হয় যা দেহ কাটে বা দেহে বিদ্ধ হয়। যেমন লোহার তৈরি তরবারি, ছুড়ি, বর্শা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে লৌহ সদৃশ তামা, দস্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁচ, পাথর, বাঁশ, লাকড়ি প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ধারালো বস্তু ও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেউ যদি এরূপ কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে অপর কাউকে আঘাতে করে এবং এ আঘাতের ফলে সে মারা যায়, তাহলে এরূপ হত্যাকান্ড 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' বলে সাব্যস্ত হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই।[৫৫৬]

খ. ধারালো নয় এ ধরনের যে কোন ভারী অস্ত্র বা উপকরণ যেমন বড় পাথর, হাতুড়ি, নেহাই ও বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে হত্যা করা হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসেবে গণ্য হবে। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ইয়াহূদী এক মহিলার মাথা পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছিল। এ অপরাধে রাসূলুল্লাহ (স.) ও ঐ ইয়াহূদীর মাথা দু' পাথরের মধ্যে গুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫৫৭]এ হাদীস থেকে জানা যায়, যে কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হলেও কিসাসের আওতায় হত্যাকারীর উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, যে কোন ভারী অস্ত্র বা উপকরণ দিয়ে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর উপর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাবে না তবে দিয়াত বাধ্যমূলক হবে। তাঁর দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "অসতর্কতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহত তথা বেত, লাঠি ও পাথরের আঘাতে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে

৫৫৪. দৈনিক যুগান্তর,ঢাকা, রোববার, ২ নভেম্বর, ২০১৪

৫৫৫. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৩৩; মুহাম্মদ আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২১০-২১৫

৫৫৬. *আল-আনসাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩; আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩৩

৫৫৭. মুহাম্মদ ইবনু ইসমঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং. ৬৪৮৩, ৬৪৮৫; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম* প্রাগুক্ত (কিতাবুল কাসামাহ) হা.নং. ১৬৭২

Dhaka University Institutional Repository

একশতটি উষ্ট্র দিতে হবে।[৫৫৮]এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বেত, লাঠি ও পাথর প্রভৃতি দ্বারা হত্যাকে অসতর্কতামূলক হবার কথাই বলেছেন। আমাদের বর্তমান সময়ে যেহেতু হত্যাকান্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হত্যার নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে; তাই এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার মতের চেয়ে জমহূরের মতই বেশি গ্রহণযোগ্য।

গ. বন্দুকের গুলির সাহায্যে বা বোমা মেরেও কাউকে হত্যা করা হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে। কেননা গুলি নিক্ষেপে বা বোমা মারার পেছনে উদ্দেশ্য হত্যাই হয়ে থাকে, শিক্ষাদান উদ্দেশ্য হয় না।[৫৫৯]

ঘ. গলায় ফাঁস লাগিয়ে কিংবা কোন কিছুর (যেমন হাত, রুমাল, বালিশ প্রভৃতি) সাহায্য মুখ ও নাক চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হলে তাও ইচ্ছাকৃত হত্যারূপে গণ্য হবে। এটাও অধিকাংশ ইমামের মতামত। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন।[৫৬০]

ঙ. ধবংসের পথে ফেলে কাউকে হত্যা করা হলে তাও 'ইচ্ছাকৃত হত্যা, রূপে গণ্য হবে। এটা অধিকাংশ ইমামের মতামত। এ ধরণের কয়েকটি হত্যার উদাহরণ নিম্নে বর্ণিত হল:

ক. কোন ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপে করে হত্যা করলে, যা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে নিক্ষেপকারীর মৃত্যুদন্ড হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আগুনে জ্বালিয়ে মারবে আমরা ও তাকে আগুনে জ্বালিয়ে মারব।[৫৬১]অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে উত্তপ্ত গরম পানিতে নিক্ষেপে করে হত্যা করা হলে ও হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হবে।[৬৬২]

খ. কোন ব্যাক্তিকে হাত-পা বেঁধে পুকুর বা সমুদ্রের গভীর পানিতে নিক্ষেপে করে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ডুবিয়ে মারবে আমরা তাকে ডুবিয়ে মারব।[৬৬৩] তবে যে পরিমাণ পানিতে পতিত হলে সাধারণত মৃত্যুর আশংকা থাকে না এবং সাঁতার কেটে উদ্ধার হওয়া সম্ভব (যদি সে সাঁতার জানে), সে পরিমাণ পানিতে কোন ব্যক্তিকে নিক্ষেপে করা হলে এবং তার মৃত্যু হলে নিক্ষেপেকারীর উপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে।[৬৬৪]

গ. উচ্চস্থান যেমন পাহাড় বা ছাদ বা উঁচু দেয়াল, যা থেকে নিক্ষেপ্ত হলে সচরাচর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সেখানে থেকে কেউ কাউকে নিক্ষেপ করে হত্যা করলে নিক্ষেপকারীর মৃত্যুদন্ড হবে।

---

৫৫৮. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হা.নং. ১৫৪২৫, ১৪৪২৬

৫৫৯. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬-৮

৫৬০. উছমান যায়লঈ, *তাবয়ীনুল হাকাইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০৯; ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭

৫৬১. আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৫৭৭১

৬৬২. আবু বকর আল-হাদ্দসী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৯

৬৬৩. আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৫৭৭১

৬৬৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. মাটিতে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হবে।[৬৬৫]

ঙ. কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে অনাহারে রাখা হল; কিংবা পানি পান করতে দিল না বা প্রচন্ড শীত ব তাপের মধ্যে ফেলে রাখায় মৃত্যু হল। এক্ষেত্রে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখের মতে অপরাধীর উপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে এবং মালিকী ইমামগণের মতে তার মৃত্যুদন্ড হবে। শাফিঈও হাম্বলী ইমামগণের মতে, যে পরিমাণ সময় অভুক্ত রাখলে বা পিপার্সাত থাকলে অথবা বিবস্ত্র অবস্থায় শীত বা সূর্যের তাপের মধ্যে ফেলে রাখলে সাধারণত মারা যাওয়ার আশংকা থাকে, সে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মারা গেলে অপরাধীর মৃত্যুদন্ড হবে।[৬৬৬]

চ. কোন ব্যক্তিকে শ্বাপদ বা সর্প সংকুল স্থানে নিক্ষেপ করায় যদি কোন হিংস্র প্রাণী বা সাপে দংশন করায় ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে অপরাধীর মৃত্যুদন্ড হবে।[৬৬৭]

ছ. বিষপান করিয়ে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হবে।[৬৬৮]বর্ণিত আছে, খায়বার অভিযানকালে এক ইয়াহূদী নারী মহানবী (স.) কে বিষ মিশ্রিত বকরী আহার করতে দিয়েছিল। বিষক্রিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) রক্ষা পেলেও সাহাবী বিশর ইবন বারা (রা.) নিহত হন। হত্যার অপরাধে উক্ত নারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান কর হয়।[৬৬৯]

জ. **যাদু করে হত্যা করা :** যাদু করে হত্যা করলেও হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হবে যদি উক্ত যাদুতে সচরাচর লোকজন মারা যায়। আর যে যাদুতে সচরাচর লোকজন মারা যায় না, এ ধরণের যাদুতে কেউ মারা গেলে হত্যাকারীর উপর দিয়াত বাধ্যমূলক হবে।[৬৭০]ইচ্ছাকৃত হত্যার তিন ধরণের শাস্তি ইসলামী আইনে নির্ধারিত :

ক. প্রকৃত বা মূল শাস্তি, তা হল কিসাস;

খ. মূল শাস্তির বিকল্প শাস্তি বা দিয়াত;

গ. অনুগামী শাস্তি।

কিসাসের শাস্তি প্রয়োগ হলে সমাজ থেকে হত্যাজনিত অপরাধ বন্ধ হবে। কেউ আর হত্যাজনিত অপরাধ করতে সাহস পাবে না।

প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা

যে ধরণের বস্তু দ্বারা সাধারণত হত্যা সংঘটিত হয় না, সে ধরনের কোন বস্তুদ্বারা ইচ্ছকৃতভাবে হত্যা করা হলে সে হত্যাকে 'প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা' বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, দেহ কাটে না বা দেহে বিদ্ধ হয় না এ ধরণের কোন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা

৬৬৫. *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬

৬৬৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফিঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭

৬৬৭. *আল-মাওসুআতুল ফিকইয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ৩৪১

৬৬৮. আবু বকর আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০

৬৬৯. সুলায়মান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং. ৪৫১২

৬৭০. ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২১২-৩

Dhaka University Institutional Repository

সংঘটিত হলে তাকে ‘প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা’ বলা হয়। অপরদিকে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, যে সব বস্তু দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায় না; এ ধরনের বস্তু যেমন ক্ষুদ্র পাথর, ক্ষুদ্র লাঠি, চাবুক, কলম ইত্যাদি দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা বলে। এ প্রকারের হত্যার ক্ষেত্রে যেহেতু হত্যাকারীর হত্যা করার ইচ্ছা ছিল কিনা, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ। রয়েছে, তাই এ ধরনের হত্যার বেলায় কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না; কিন্তু দিয়াতের কঠোর বিধান প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে কাফফারা বাধ্যতামূলক হবে কিনা-তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অগ্রগণ্য মত হল কাফফরা ওয়াজিব হবে।
ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার শাস্তি তিন প্রকার-

১. প্রকৃত শাস্তি
২. বিকল্প শাস্তি ও
৩. অনুগামী শাস্তি।

১. প্রকৃত শাস্তি : ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার প্রকৃত শাস্তি দুই ধরণের :

ক. দিয়াত মুগাল্লাযা,

খ. কাফফারা।

ক. দিয়াত মুগাল্লাযা : ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার শাস্তি হিসেবে কিসাস প্রযোজ্য নয়। হত্যাকারী প্রাপ্তবয়স্ক হলে এর মূল শাস্তি হল দিয়াত মুগাল্লাযা। এ দিয়াত তিন বছরে আদায় করতে হবে। প্রতি বছরের শেষভাগে এক-তৃতীয়াংশ আদায় করতে হবে। হানাফীদের মতে, বিচারের রায় ঘোষণার দিন থেকে বছর গণনা আরম্ভ করতে হবে। আর অন্যান্য ইমামদের মতে যেদিন দিয়াত ওয়াজিব হয় অর্থাৎ খুনের ঘটনা ঘটার দিন থেকেই দিয়াত আদায়ের দিন গণনা আরম্ভ করতে হবে।[৫৭১]

জমহূর উলামার মতে, (হানাফী, শাফি’ঈ ও হাম্বলী) ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার দিয়াত আদায়ের মূল ভিত্তি হল পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সহজকরণ। তাই এর দিয়াত এককভাবে হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে না; বরং তা আকেলার সম্পদে ওয়াজিব হবে। তাদের প্রমাণ হল, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন: “হুযায়ল গোত্রের দু’মহিলার মাঝে দ্বন্দ্ব হলে তাদের একজন অপরজনকে প্রস্তরখন্ড নিক্ষেপ করে তাকে এবং তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে। তখন সাহাবাদের মাঝে তার দিয়াতের ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়ায় তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট আসেন। তিনি বললেন, গর্ভস্থিত সন্তানের দিয়াত হলো গুররা (এক ধরনের সাদা ঘোড়া) তা পুরুষ জাতীয় হোক কিংবা স্ত্রী জাতীয়। আর মহিলার দিয়াত তার আকেলার উপর বর্তাবে।[৫৭২]তাদের যুক্তি হল, এটা এমন হত্যা যাতে কিসাস নেই। সেদিক বিবেচনায় এটি ভুলবশত হত্যার মত। ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে হত্যাকারীর হত্যা করার অভিপ্রায় থাকে, তাই তার মাল থেকে দিয়াত মুগাল্লাযা আদায় করতে হয় এবং তা নগদ প্রদান করতে হবে। ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার মধ্যে হত্যার নিয়্যত থাকে না, বরং কাজের নিয়্যত থাকে। তাই এর শাস্তি আকেলার উপর বর্তানো এবং তিন বছরে আদায় করার সুযোগ প্রদান করে দু দিক থেকে শাস্তি বিধানে সহজ করা হবে।[৫৭৩]

৫৭১. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯০; আল-কাসানী, *আল-বদা’য়উস সনা’ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৫৫

৫৭২. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৬-৩১৭

৫৭৩. আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৭ পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

খ. কাফফারা

মালিকী মাযহাব ছাড়া বাকী তিন মাযহাবের ফকীহরা বলেছেন, ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার তা এবং এর দিয়াত আকেলা তিন বছর সময় নিয়ে বহন করায় তা ভুলক্রমে হত্যার সাথে সম্পৃক্ত। তাই ভুলক্রমে হত্যার মত এতে কাফফারা ওয়াজিব হবে। এর কাফফারা হচ্ছে ১টি গোলাম আযাদ করা। যদি মালিকানায় গোলাম না থাকে কিংবা ক্রয় করে আযাদ করার মত আর্থিক সামর্থ্য না থাকে অথবা বাস্তবে কোন গোলাম পাওয়া না যায়, তবে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। মালিকী মাযহাবের অনুসারীরা ইচ্ছাসাদৃশ হত্যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসেবে গণ্য করেন বিধায় তাদের মতে এতে কাফফারা ওয়াজিব নয়।[৫৭৪]

২. বিকল্প শাস্তি : তা'যীর

ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি হল বিকল্প শাস্তি। আর তা হল তা'যীর। অর্থাৎ কোন কারণে যদি হত্যাকারীর দিয়াত রহিত হয়ে যায়, তবে তাকে সরকার তা'যীর হিসেবে শাস্তি দিতে পারবেন। মালিকীদের মতে, তা'যীর হিসেবে যতটুকু প্রয়োজন মনে করুন না কেন শাস্তি দিতেই হবে। আর অন্যান্য আলিমদের মতে, তা'যীর হিসেবে শাস্তি দেয়া না দেয়া সরকারের এখতিয়ারাধীন।

৩. অনুগামী শাস্তি-মীরাস ও অসীয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়া

ইচ্ছাসাদৃশ হত্যার তৃতীয় প্রকার শাস্তি হল অনুগামী শাস্তি। আর তা হল মীরাস ও অসীয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

ভুলবশত হত্যা :

নিষিদ্ধ নয় এমন কোন কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে ভুলবশত হত্যা সংঘটিত হলে তাকে ভুলবশত হত্যা বলা হয় এবং এর জন্য দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ ভুল কর্তার ধারণার মধ্যে হতে পারে, কাজের মধ্যেও হতে পারে এবং ধারণা ও কাজ উভয়ের মধ্যেও হতে পারে।[৫৭১]

১. কর্তার ধারণায় ভুল হওয়া। যেমন শিকারী কোন মানুষেকে শিকারের পশু মনে করে তার প্রতি তীর বা গুলি নিক্ষেপে করল, পরে দেখা গেল যে, সে মানুষ, শিকারের প্রাণী নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যাক্তিকে শত্রু সৈন্য মনে করে তীর নিক্ষেপে করল পরে দেখা গেল, সে শত্রু সৈন্য নয়। এক্ষেত্রে অপরাধীর কাজের মধ্যে ভুল হয়নি, কারণে সে যা মারতে চেয়েছে তাই মেরেছে, বরং ভুল হয়েছে তার ধারণা বা অনুমানের মধ্যে।

২. কর্তার কাজে ভুল হওয়া। যেমন এক শিকারী একটি হরিণের প্রতি গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা ঝোপের মধ্যে কাজেরত কোন মানুষের দেহে বিদ্ধ হল এবং এর ফলে সে মারা গেল। অনুরূপভাবে শত্রু সৈন্যকে টার্গেট করে তীর নিক্ষেপে করল বা গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু তীর বা গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অপর ব্যক্তির উপর আঘাতে করল এবং এর ফলে সে মারা গেল।

৩. ধারণা ও কাজ উভয়ের মধ্যে ভুল হতে পারে। যেমন- শিকারী কোন মানুষকে শিকারের পশু মনে করে তীর বা গুলি নিক্ষেপে করল তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অপর ব্যক্তির দেহে বিদ্ধ হল এবং এর ফলে সে মারা গেল।

---

৫৭৪. ওয়াহবাহ যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২৩-৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে সে মানুষকে শিকারের পশু মনে করে অনুমানে ভুল করেছে এবং যার প্রতি তীর গুলি নিক্ষেপে করেছে তা তার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির শরীর লাগায় সে কাজেও ভুল করেছে। কেউ ভুলক্রমে হত্যা করলে ইসলামী আইনে তার উপর দুই ধরণের শাস্তি বর্তাবে।

১. মূল শাস্তি হিসেবে দিয়াত ও কাফফারা;
২. অনুগামী শাস্তি হিসেবে মীরাস ও অসীয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

প্রথমত : দিয়াত ও কাফফারা

সকল ইসলামী চিন্তাবিদের ঐকমত্যে ভুলক্রমে হত্যার জন্য কিসাস ওয়াজিব হয় না। তাকে দিয়াত দিতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে। তার দিয়াত হবে দিয়াতে মুখাফফাফা। আর তা হল : হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মতে, বিশটি বিনতে মাখায, বিশটি ইবনে মাখায, বিশটি বনূ মাখাযের স্থলে বিশটি বনূ লাবূন।[৫৭৫]তবে তিনটি অবস্থায় তার দিয়াত মুগাল্লাযা হবে। যদি মক্কার হারাম এলাকায় হত্যা করা হয়ে থাকে, যদি চারটি নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করা হয়ে থাকে এবং যদি ভুলক্রমে অতি নিকটাত্মীয়কে হত্যা করা হয়। সকল আলিমের ঐকমত্যে, ভুলক্রমে হত্যার জন্য সরকার তা'যীর হিসেবে কোন শাস্তি দিতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত অনুগামী শাস্তি মীরাস ও অসীয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়া

প্রায় ভুলবশত হত্যা

কোন ব্যক্তির কোন কাজের দ্বারা হত্যা সংঘটিত হলে তাকে প্রায় ভুলবশত হত্যা বলা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীর কোন ধরনের সংকল্প ছাড়াই হত্যা সংঘটিত হয় বলে তাকে প্রায় ভুলবশত হত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় অপর কোন ব্যক্তির উপর উল্টে পড়ল এবং এর ফলে অপর ব্যক্তিটি মারা গেল। এ প্রকারের হত্যা একদিকে যেহেতু অপরাধীর অসতর্কতার দরুন সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা ভুলবশত হত্যার মধ্যে গণ্য হবে এবং এ জন্য দিয়াত ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যেহেতু অপরাধীর কর্ম ও হত্যার মধ্যে সরাসরি 'কারণ' এর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তাই এ জন্য কাফফারাও ওয়াজিব হবে।[৫৭৬]

কারণবশত হত্যা

কোন ব্যক্তির প্রয়োজীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হলে তাকে কারণবশত হত্যা বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত খনন করল এবং তাতে কোন পথচারী পড়ে গিয়ে মারা গেল। অথবা কেউ পথের পার্শ্বে প্রকান্ড এক পাথর রাখল এবং তার সাথে ধাক্কা খেয়ে পথচারী মারা গেল। এ প্রকারের হত্যায় অপরাধী সরাসরি হত্যাকান্ড সংঘটিত যে কাজটি করে, তা তার জন্য বৈধ; তবে সে কর্ম সম্পাদনে সীমা লংঘন করেছে, যার ফলে তার কর্মটি হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রকারের হত্যার মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে। এ প্রকারের হত্যা যদিও একদিক থেকে ভুলবশত হত্যার মতোই কিন্তু অন্যদিক থেকে তা ভুলবশত হত্যার

৫৭৫. মুহাম্মদ আল-খতীব, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৭; আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৫

৫৭৬. উছমান যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০০; আল-কাসানী *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, , প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আওতায় পড়ে না। যেমন অপরাধীর এমন কার্যের দ্বারা কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিল না, বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদিক থেকে তা ভুলবশত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে অপরাধীর কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে হত্যা সংঘটিত হয়, আর এক্ষেত্রে তার কোন সম্পাদিত কাজের কারণেই হত্যা সংঘটিত হয়।[৫৭৭]

আঘাতের শাস্তির বিধান :

যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রণা, ক্ষতি, অসুখ, বৈকল্য বা জখম ঘটায় অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিয়ে তার দেহের কোন অঙ্গ বা তার অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, ঐ ব্যক্তি আঘাত

করেছে বলে গণ্য হবে।

আঘাতকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়–

১. ইতলাফে উদবু (অঙ্গহানি);
২. ইতলাফে সালাহিয়াতি উদবু (অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া);
৩. শিজাজ (মুখমন্ডলে আঘাত করা বা মাথা ফাটানো);
৪. জুরহ (আহত করা)।

১. ইতলাফে উদবু (অঙ্গহানি) : যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দেহের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে, কর্তন করে বা বিভাজন করে, তখন তাকে ইতলাফে উদবু বা অঙ্গহানি বলা হয়। অঙ্গহানির উদাহরণ হল : হাত, পা, হাতের পায়ের আঙ্গুল, নখ, জিহবা, গুপ্তাঙ্গ, অন্ডকোষ, কান, ঠোঁট ইত্যাদি কেটে ফেলা, দাঁত উপড়িয়ে ফেলা, চোখের ভ্রু, দাড়ি, গোঁফ, মাথার চুল উপড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি।

২. ইতলাফে সালাহিয়াতে উদবু (অঙ্গের কর্মক্ষমতা রহিত করা) : যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দেহের কোন অঙ্গ ভেঙে ফেলে বা চিরতরে কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় বা তা বিকৃত করে ফেলে, তখন ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অঙ্গের কর্মক্ষমতা রহিত করেছে বলে গণ্য হবে। যেমন শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, যৌনশক্তি, চলৎশক্তি, ধারণ শক্তি, ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়া।

৩. শিজাজ (মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাত) : যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাথা বা মুখমণ্ডলে আঘাত করে যা অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা বা তার কার্যক্ষমতা রহিত করা বর্ণনায় আসে না, তখন উক্ত ব্যক্তি শিজাজ করেছে বলে গণ্য হবে। শিজাজ এগার শ্রেণীতে বিভক্ত তা নিম্নরূপ-

ক. হারিস : যে আঘাতে চামড়া আহত হয় কিন্তু রক্ত প্রবাহিত হয় না।

খ. দামিআহ : যে আঘাতে চোখের পানির মত রক্ত বের হলেও তা প্রবাহিত হয় না।

গ. দামিয়াহ : যে আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

ঘ. বাদিআহ্ : যে আঘাতে চামড়া কেটে যায়।

ঙ. মুতালাহিমা : যে আঘাতে গোশত কেটে যায় কিন্তু পরে জোড়া লেগে যায়।

---

৫৭৭. আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩৯; উছমান যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

চ. সিমহাক : যে আঘাত মাথার হাড়ের উপরিভাগের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে কিন্তু তা ছিন্ন হয় না।

ছ. মুদিআহঃ যে আঘাতে উপধারা (চ) এ উল্লেখিত ঝিল্লি কেটে হাড় প্রকাশ পায়।

জ. হাশিমা : যে আঘাতে হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

ঝ. মুনাক্কিলা : যে আঘাতে হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয় না।

ঞ. আম্মাহ : যে আঘাতে মাথার খুলি ফেটে যায় এবং ক্ষতি মগজের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

ট. দামিগ : যে আঘাতে মগজের ঝিল্লি ফেটে ক্ষত মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৪. জুরহ (আহত করা) : যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মাথা বা মুখমন্ডল ব্যতীত দেহের যে কোন স্থানে আঘাত করে যা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন প্রকৃতির ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করে, তখন ব্যক্তি জুরহ করেছে বলে গণ্য হবে। জুরহ দুই প্রকার যথা :

(ক) জাইফাহ : যে ব্যক্তি এমন জুরহ করে যার ফলে যখম দেহের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন তাকে জাইফাহ বলে।

(খ) গায়র জাইফাহ : যে ব্যক্তি এমন জুরহ করে যা প্রথম শ্রেণীর আওতায় আসে না; তখন তাকে গায়র জাইফাহ বলে। শিজাজ ও জাইফাহ বহির্ভূত দেহের অন্যান্য স্থানের জুরহ সাধারণত গায়র জাইফাহ-এর অন্তর্ভূক্ত।

গলার নিম্নাংশ হতে উরুসন্ধির মধ্যকার জুরহ জাইফার অন্তর্গত। যেমন বক্ষদেশ, পেট, পিঠ, পার্শ্বদ্বয় এবং অন্ডকোষ ও পাছার মধ্যবর্তী স্থান, দুই হাত, দুই পা, গলা ও ঘাড়ের যখম জাইফা হিসেবে গণ্য হবে না।

গায়ব জাইফাহ নিম্নোক্ত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত :

ক. দামিয়াহ : যে আঘাতে চামড়া কেটে রক্ত নির্গত হয় তাকে দামিয়াহ বলে।

খ. বাদিআহ : যে আঘাতে দেহের গোশত কেটে বা চিরে যায় কিন্তু হাড় অনাবৃত হয় না তাকে বাদিআহ বলে।

গ. মুতালাহিমাহ : যে আঘাতে দেহের গোশত ছিন্ন হয়ে যায়, তাকে মুতালাহিমাহ বলে।

ঘ. মুদিআহ : যে আঘাতে দেহের গোশত কেটে হাড় অনাবৃত হয়ে যায় তাকে মুদিআহ বলে।

ঙ. হাশিমাহ : যে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙে যায় কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না, তাকে হাশিমাহ বলে।

চ. মুনাক্কিলাহ : যে আঘাতে দেহের হাড় ভেঙে স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তাকে মুনাক্কিলাহ বলে। ইচ্ছাকৃত আঘাত হল শত্রুতাবশতঃ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রাণনাশ করা ব্যতীত কাউকে আঘাত করা বা আহত করা।[৭৭৮]উল্লেখিত চার ধরনের আঘাতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত আঘাত করা হলে প্রত্যেক প্রকারের জন্য ইসলামী

---

৭৭৮. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

আইনে আলাদা আলাদা শাস্তির ধারণা দেয়া হয়েছে। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

১. শরীরের কোন অঙ্গ ইচ্ছাকৃত আঘাতের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা। যেমন দু'হাত, দু'পা কিংবা তদসংশ্লিষ্ট অঙ্গ এবং নাক, চক্ষু, কান ঠোঁট, দাঁত, চুল এবং চোখের পাতা ইত্যাদি।

এর শাস্তি দু'ধরনের : (ক) কিসাস, এটাই প্রকৃত শাস্তি। মালিকীদের নিকট কিসাসের সাথে তা'যীর ও মূল শাস্তির অন্যতম একটি, (খ) দিয়াত, এটা কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে বিকল্প শাস্তি।

(ক) কিসাস : ইচ্ছাকৃতভাবে আহত করার মত কোন অপরাধ সংঘটিত হলে কিসাস কার্যকর করতে হবে। হত্যার কিসাস কার্যকর করার জন্য যেসব সাধারণত শর্ত প্রযোজ্য, তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অধিকন্তু আরো কিছু বিশেষ শর্তাবলী আঘাতের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে, কিসাস কার্যকর করার জন্য অপরাধীর জ্ঞানসম্পন্ন, পূর্ণবয়স্ক, ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতকারী হতে হবে। আঘাতকৃত ব্যক্তি মূল তথা পিতা/ মাতা/ দাদা/ নানা হবেন না। অপরাধটা কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি সংঘটিত হতে হবে এবং সমতা বিধানের যোগ্য হতে হবে।[৭৭৯]হানাফীদের বক্তব্যের সাথে অধিকাংশ ইমাম একমত পোষণ করেন। তাদের মতে এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত প্রযোজ্য। তা হল, আহত ব্যক্তি এবং অপরাধীর সমান মর্যাদার অধিকারী হতে হবে। আর ইচ্ছাকৃত আঘাত কোন মাধ্যমেও যদি করা হয় তবে কিসাস কার্যকর করতে কোন বাধা নেই।[৭৮০]এসব শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে নিম্নবর্ণিত অবস্থায় কিসাস রহিত হবে-

১. পিতামাতা বা তাদের পূর্বপুরুষের কেউ আহত করলে কিসাস রহিত হবে।
২. আঘাতকারী যদি মর্যাদার দিক থেকে আহত ব্যক্তির সমমর্যাদার না হয়ে উচ্চ মর্যাদার হয়, তবে কিসাস রহিত হবে। তাই স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসকে আহত করলে কিসাস হবে না। এমনিভাবে কোন মুসলিম কোন যিম্মীকে আহত করলে কিসাস রহিত হবে (এটা অধিকাংশের অভিমত)।

৩. শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের আলিমদের মতে, অপরাধটা ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাদৃশ্য হলে কিসাস রহিত হবে। যেমন কেউ কাউকে চড় মারল ফলে তার চক্ষু বিনষ্ট হয়ে গেল অথবা কোন পাথর দ্বারা কাউকে ঢিল মারার ফলে তার হাত অবশ হয়ে গেল অথবা ফুলে গেল অবশেষ ফেটে গেল। এ অবস্থায় তাদের থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। কিন্তু মালিকী ও হানাফীদের নিকট এ অবস্থায় কিসাস নেয়া হবে। কেননা আহত করার বেলায় ইচ্ছাসাদৃশ অপরাধও ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে অপরাধের ইচ্ছা থাকাই যথেষ্ট। আর হত্যা ছাড়া অন্যান্য অপরাধের কাজটি যে কোন অস্ত্র দ্বারাই সংঘটিত করা সম্ভব।

৪. হানাফী আলিমদের মতানুযায়ী, আহতকরণের কাজটি সরাসরি না করে যদি কোন মাধ্যমে গ্রহণ করে করা হয় তবে কিসাস রহিত হবে। অবশ্য এ মতের সাথে জমহূর আলিমগণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

৫. অপরাধটা দারুল হারব-এ সংঘটিত হলে কিসাস রহিত হবে। হানাফী আলিমদের মতানুযায়ী, আহতকরণের কাজটি দারুল হারব-এ সংঘটিত হলে কিসাস রহিত হবে। অবশ্য এ মতের সাথে জমহূর আলিমগণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

---

৭৭৯. আল-কাসানী, *আল-বদা'য়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৭

৭৮০. মুহাম্মদ আল-খতীব, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫; আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, প্রগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৬. কিসাস কার্যকরণে অপারগ হলে কিসাস রহিত হবে। যেমন, কোন এক অপরাধী এক ব্যক্তির একটি কব্জিবিশিষ্ট হাত কেটে দিল। তার কিসাস কার্যকর করতে গিয়ে দেখা গেল যে, তার হাতের কব্জি দুইটা। এমতাবস্থায় কিসাস রহিত হবে। কারণ তাদের মাঝে সমতা পাওয়া যায়নি। আহত করার বেলায় কিসাস কার্যকর করতে হলে আরো কিছু বিশেষ শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। অন্যথায় কিসাস রহিত হবে। তা হল তিনটি বিষয়ে সমতা থাকা-

ক. কিসাস কার্যকরণে সমতা সম্পন্ন হওয়া;

খ. আহতের স্থান ও নামের সমতা থাকা এবং

গ. সুস্থতা ও অসুস্থাতার সমতা থাকা।

সমতা বিধানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম।"[৫৮১]এ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিধৃত হলেও যেহেতু এ আয়তটি মানসূখ হবার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলীল নেই, সেহেতু এ আয়াতের বিধান মুসলমানদের জন্যও সমভাবে কার্যকর।[৫৮২]

তিনি আরো বলেন, "যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।"[৫৮৩]তিনি আরো বলেন,"যে কেউ তোমাদিগকে আক্রমণ করবে তোমরা ও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।"[৫৮৪]এ সব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, অপরাধী যতটুকু অপরাধ করেছে তাকে কিসাস হিসাবে ততটুকু শাস্তি দিতে হবে। তাই এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আহতকরণের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরণের বেলায় আরো বিশেষ কয়েকটি কারণে কিসাস রহিত হবে। তা হল-

১. কিসাস কার্যকরকরণে বাস্তবিকপক্ষে সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর না হলে কিসাস রহিত হবে। অর্থাৎ কিসাস কার্যকর করতে গেলে অপরাধীর উপর সমতা রক্ষা করতে না পারায় তার উপর যুলুম হবার সম্ভাবনা প্রবল থাকলে কিসাস রহিত হবে। তাই, হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, যদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া বা গিরা থেকে না কেটে (যেমন কবজির গিরা, কনুইয়ের গিরা, কাঁধের গিরা, টাকনু বা হাঁটু বা নিতম্বের গিরা অথবা যেসব অঙ্গের শেষ সীমা রয়েছে, যেমন নাকের বাশি অথবা বাহুর অর্ধাংশ বা পা ও উরুর অর্ধাংশ থেকে কর্তন করা। এসব ক্ষেত্রে কিসাস রহিত হবে এবং হাত বা পায়ের দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৫৮৫]

---

৫৮১. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص- فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون- (আল-কুরআন, ৫ : ৪৫)

৫৮২. আল-কাসানী, *আল-বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩৩

৫৮৩. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به- (আল-কুরআন, ১৬ : ১২৬)

৫৮৪. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ماعتدى عليكم- (আল-কুরআন, ২ : ১৯৪)

৫৮৫. আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৩৯; আল-কাসানী, *আল-বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিকের নিকট এই অবস্থায়ও সাধ্যমত কিসাস নেয়া ওয়াজিব।[৫৮৬] কারণ, কিসাস গ্রহণ আল্লাহর হক। তিনি বলেছেন, "যখমের বদলে অনুরূপ যখম।"[৫৮৭]আর ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) মতে, এ ক্ষেত্রে সাধ্যমত কিসাস গ্রহণ করতে হবে। কিসাস গ্রহণ করতে গিয়ে যেন সমতায় চেয়ে বেশি না হয় সেদিক অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। যদি সমতার চেয়ে কম হয় তবে তা বিচারক হুকুমাহ বা অর্থদণ্ডের মাধ্যমে সমতা বিধানের ব্যবস্থা করবেন।[৫৮৮]সকল ইমামের ঐকমত্যে হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না। যেমন বুকের হাড়, মেরু দন্ডের হাড়, গলার হাড় ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সমতা সম্ভব নয় বিধায় পরিপূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৫৮৯] অনুরূপভাবে মাথায় বা চেহরার হাড্ডি ফেটে গেলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা তাতে বাড়াবাড়ি ব্যতীত কিসাস কার্যকর করা সম্ভব নয়।

চাবুক, লাঠি, চড়, গুতা, ঘুষি ইত্যাদির দ্বারা যদি আঘাত করা হয় এবং তার কোন আলামত শরীরে না থাকে, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। তাই তাতে তা'যীর হিসেবে শাস্তি দিতে হবে। মালিকী মাযহাবের আলিমদের মতে, চাবুক দ্বারা আঘাত করলে তাতে কিসাস হবে। ইমাম ইবনুল কাইউম মনে করেন, চপটাঘাতের মত অপরাধেও কিসাস হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫৯০]

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংখ্যা ও উপরের ক্ষেত্রে সমতা পাওয়া না গেলে কিসাস রহিত হবে। তাই যদি অপরাধী কারো ডান হাত কর্তন করে আর কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য যদি তার ডান হাত না থাকে তবে সমতা পাওয়া যায়নি বিধায় কিসাস রহিত হবে।[৫৯১]

৩. সুস্থতা ও পরিপূর্ণভাবে সমতা না থাকলেও কিসাস রহিত হবে। সুতরাং কেউ যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত কর্তন করে, তবে তার বদলে কিসাস হিসেবে সুস্থ হাত কর্তন করা যাবে না। এমনিভাবে অবশ্য পায়ের পরিবর্তে ভাল পা, পরিপূর্ণ অঙ্গের পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গ অঙ্গ কাটা যাবে না। ইমাম মালিক (রহ.)এক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন।[৫৯২]

---

৫৮৬. আদ-দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ২৫১

৫৮৭. والجروح قصاص (আল-কুরআন, ৫: ৪৫)

৫৮৮. মুহাম্মদ আল-খতীব, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৯

৫৮৯. মুহাম্মদ আল-খতীব, মুগনী আল-মুহতাজ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮; আল-কাসানী, *আল-বদা'য়ূস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩০৮

৫৯০. ওয়াহবাহ যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৮

৫৯১. আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, খ. ৫, পৃ. ৬৪৬; আদ-দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ-4, পৃ. ২৫২-৫৪

৫৯২. আদ-দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫২-৫৪; আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনীতি, অর্থনৈতিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান

- ❖ অর্থনীতির পরিচয়
- ❖ ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি
- ❖ সুদের শাস্তির বিধান
- ❖ ঘুষের শাস্তির বিধান
- ❖ জুয়ার শাস্তির বিধান
- ❖ লটারির শাস্তির বিধান
- ❖ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণের বিধান
- ❖ অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসার বিধান
- ❖ অপসংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান
- ❖ মুদ্রা জাল করার বিধান
- ❖ মজুতদারীর শাস্তির বিধান
- ❖ চোরাচালানের শাস্তির বিধান
- ❖ সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার বিধান
- ❖ চাঁদাবাজীর শাস্তির বিধান
- ❖ লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের বিধান
- ❖ ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান
- ❖ প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়ার বিধান
- ❖ ভেজাল মিশানোর বিধান
- ❖ কর বা রাজস্ব ফাঁকির বিধান
- ❖ ইসরাফ বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান
- ❖ তাবজীর বা অপচয়ের বিধান
- ❖ অংশীদারের অংশ না দেওয়ার বিধান
- ❖ অসিয়ত পূর্ণ না করার বিধান
- ❖ কৃপণতার বিধান
- ❖ রেশনিং প্রথার বিধান
- ❖ মুনাফা ও শিল্পপণ্যে মজুরের অংশ পাওয়ার বিধান
- ❖ ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের বিধান
- ❖ পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষ প্রতিরোধের বিধান
- ❖ কারবারী ইন্সিওরেন্সের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা গঠনের বিধান
- ❖ শ্রমিকের অধিকারের বিধান

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনীতি, অর্থনৈতিক অপরাধ ও শাস্তির বিধান

সাম্প্রতিককালে মুসলিম সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত এ থেকে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহের প্রতি তাঁদের অসন্তুষ্টি এবং মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণ ও সমাধান উদ্ভাবনে এসব অর্থনৈতিক মতবাদের ব্যর্থতারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অনেকগুলো কারণে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান যুগে প্রচলিত ধারণা ও বাস্তব চর্চা অনুযায়ী যে শাস্ত্রকে ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়, তার জন্ম ও বিকাশ ঘটে এমন একটি সমাজ ও পরিবেশে যা মুসলমানদের নিকট অপরিচিতি ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে উৎসারিত পাশ্চাত্য সমাজের গর্ভে এ শাস্ত্র জন্ম লাভ করে। বর্তমান পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞান দীর্ঘ দুই শতাব্দীরও বেশিকালে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় বর্তমান রূপ লাভ করেছে।[১]এ শাস্ত্রের বেশির ভাগ বিশ্লেষণ ও দর্শনেরই মূল পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের গভীরে প্রোথিত। আর এগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বলে ধরে নেয়া হয়েছে। যদিও পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহের কথা কদাচিৎ সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়ে থাকে, তথাপি এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে যে, পাশ্চাত্য অর্থনীতি প্রধানত উপযোগবাদ, ভোগবাদ, অবাধ প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের কোলে লালিত হয়েছে। এমনকি এর বিপরীত অর্থনৈতিক মতাদর্শ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রও একই সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার প্রতিক্রিয়া ও ফসলমাত্র। বস্তুত এ সব ধ্যান-ধারণা ও তত্ত্ব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের 'অর্থনীতি বিষয়ক দার্শনিক ও বিশ্লেষকদের' অধিকাংশেরই অবচেতন মনে এবং তথাকথিত আধুনিক অর্থনৈতিক বিধি ও তত্ত্বসমূহের বেশির ভাগেই অদৃশ্য ভিত্তিরূপে বিরাজ করে আসছে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে এসব ধ্যান-ধারণাকে 'অন্যসব কিছু অভিন্ন থাকলে'- এই শব্দগুচ্ছের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[২]

অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহ সব সময়ই আরোহ ও অবরোহ-উভয় ধরনেরই ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অভিজ্ঞতাবাদ বা পরীক্ষাবাদ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। একটি পাশ্চাত্য সমাজের মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহের আওতায় অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণা উপস্থাপন এবং তা নিয়ে বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছেন। বস্তুত যেসব কাল্পনিক ধারণা 'অভিজ্ঞতাজাত বা পরীক্ষালবদ্ধ প্রমাণের দ্বারা' ঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়নি, তাই গৃহীত তত্ত্বের উপাদানে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদগণ পুরোপুরি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছেন। কারণ সেখানে একটি মূলনীতি হিসেবেই যেকোন ঐশী বা নৈতিক পথনির্দেশনাকেই বাদ দেয়া হয় এবং এভাবে তাকে স্বীকৃত জ্ঞান-উপাদানের বাইরে বের করে দেয়া হয়। আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থেকে উৎসারিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সম্পদসমূহের সম্ভাব্য বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা। পাশ্চাত্যে সব সময়ই অর্থনৈতিক গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গণ্য হয়ে আসছে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহের পর্যালোচনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার বস্তুগত জীবনের উন্নতির লক্ষে পন্থা ও প্রক্রিয়া নির্দেশ করা। অর্থনীতি বিজ্ঞান অত্যন্ত ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক

---

১. মুহাম্মদ আকরাম খান (সংকলন), নূর হোসেন মজিদী, *রাসূলুল্লাহ (স.) এর অর্থনৈতিক শিক্ষা* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৯), পৃ. ৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রপঞ্চকে অনুধাবন, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন সময় তাঁদের পর্যালোচনার ফলে নতুন নতুন প্রপঞ্চের উদ্ভব ঘটে যা পুনরায় গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানের বিকাশের এটাই 'স্বাভাবিক' প্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত ও কার্যকর হয়ে আসছে। অভাব বা প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনীতিবিদগণ অধিকতর 'অত্যাধুনিক' সমস্যাবলীতে জড়িয়ে পড়েছেন এবং তার সমাধানের লক্ষ্যে অধিকতর উন্নত তাত্ত্বিক 'হাতিয়ারপত্র' উদ্ভাবন করেছেন।[৩] সাম্প্রতিককালে ইসলামী অর্থনীতির প্রতি মুসলিম অর্থনীতিবিদদের যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্য অর্থনীতির ধারণা-কল্পনা, পদ্ধতিসমূহ, আওতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারণা, পদ্ধতি, আওতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে উদ্ভূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে এই পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা ও ভূমিকা এবং তার প্রত্যাবর্তন ও চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কতগুলো অপরিহার্য ধারণা থেকে ইসলামী অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এ বিশ্বজগতে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌম শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার খলিফা (প্রতিনিধি)।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফ প্রেরণ করতে চাই"।[৪] আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর বুকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওপর নাযিলকৃত শারী'আহ্ আকারে সর্বশেষবারের মত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীকে পুরোপুরিভাবে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওপর কুরআন মজীদরূপে নাযিল করেছেন এবং তাকে সমস্ত প্রকার ভূল-ত্রুটি, হ্রাস-বুদ্ধি ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়,তবে জেনে রাখ, এটি আল্লাহর এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে না?"[৫] হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তা যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর সময় যেরূপ ছিলে *ঠিক* সেরূপ অবস্থায়ই তা চলে এসেছে ও প্রচলিত রয়েছে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এ বাণীর ব্যাখ্যা করেন এবং তৎকালীন আরবের বুকে স্বীয় নেতৃত্বাধীনে যে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে তা বাস্তবায়ন করেন। মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং শারী'আহ্ অনুযায়ী বাস্তব জীবন যাপন করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই শারী'আত ও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা সম্বন্ধে জানা এবং তদানুযায়ী চলা ও তার বাস্তবায়ন করা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। মানুষ যাতে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষের এখতিয়ারে কতগুলো পার্থিব উপায়-উপকরণ ও সম্পদসমূহ ন্যস্ত করেছেন। তাই তাকে এসব উপায়-উপকরণ ও সম্পদসূত্র দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যেই ব্যবহার করতে হবে। বস্তুত মানুষের এখতিয়ারে যে পার্থিব সম্পদ ন্যস্ত করা হয়েছে, তা তার কাছে গচ্ছিত আমানতমাত্র এবং পুনরুত্থান দিবসে (আখিরাতে) তাকে এ আমানতের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ তা জানেন"।[৬] ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় ধারণা এই যে, পার্থিব ধনসম্পদ কোন ঘৃণ্য ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪. আল-কুরআন, ২:৩০

৫. আল-কুরআন, ১১:১৪

৬. আল-কুরআন, ৩.:৯২

Dhaka University Institutional Repository

বৈরাগ্যবাদের বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে ধনসম্পদকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত করা না হলে তা অর্জনে কোন পাপ নেই, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত শারী'আতের পথ থেকে বিচ্যুত না হলে বা শরী'আতের নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন না করলে অধিকতর সম্পদ আহরণের চেষ্টা-সাধনা একটি মহৎ কাজ বলে পরিগণিত। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামে মানুষের ভোগবাদী প্রবণতাকে ঐ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করা হয়েছে যাতে মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে গভীর চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়, মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা এবং সুবিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি মানুষকে শরী'আতের কাঠামোর আওতায় বিবেচনা করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন না করা সাপেক্ষে সে যেভাবে ইচ্ছা, আচরণ করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। তার ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক আচরণ শরী'আত কর্তৃক প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় অধ্যাদেশ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও পথপ্রদর্শিত। পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কাঠামোর আওতাধীনে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে যে সমাজে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত শারী'আত সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অবস্থানের অধিকারী, সেখানে এ ধরনের অর্থনীতি মোটেই উপযোগী নয়। ইসলামী অর্থনীতির পদ্ধতিসমূহও পাশ্চাত্য পদ্ধতিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। ইসলামী অর্থনীতিতে এর মৌলিক ধারণাসমূহ চারটি উৎস থেকে উৎসারিত। তা হচ্ছে কুরআন মাজীদ, সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও ক্বিয়াস। কুরআন মজীদ হচ্ছে আসমানী *গ্রন্থ*, আল্লাহ্ তা'আলা যা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি নাযিল করেন। কুরআন মজীদ অবিকৃতভাবে তার মূলরূপে বিদ্যমান রয়েছে।[৭] কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। এ গ্রন্থে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মানবজাতির জন্য তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত চূড়ান্ত, অলঙ্ঘনীয়, চিরন্তন ও অনন্য বিধান যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের, সকল কালের, সকল স্থানের, সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

সুন্নাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়োজিত কুরআন মজীদের ব্যাখ্যাকারী ও বাস্তবায়নকারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর আচরণ, উক্তি ও অন্যের কাজের সন্দেহাতীত অনুমোদন। তিনি ছিলেন কুরআন মাজীদের প্রথম ধারক-বাহক এবং এর অনুধাবনের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পথনির্দেশপ্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথা, কাজও অনুমোদনের বর্ণনা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিতে ও লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থসমূহ হাদীস গ্রন্থ নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামে যেসব হাদীস রয়েছে, সেগুলোকে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও বক্তব্য পরীক্ষা করে যেগুলো প্রকৃতই তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন বলে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে গ্রহণ করা যায়। ইসলামে হাদীস হচ্ছে হিদায়াত (পথনির্দেশ) এর দ্বিতীয় অলঙ্ঘনীয় উৎস এবং এ কারণে ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাই।[৮] ইজ্‌মা ইসলামী অর্থনীতির তৃতীয় উৎস। ইজ্‌মা মানে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মতৈক্য। মুজতাহিদগণের মতৈক্য ইসলামী আইন বা বিধি-বিধানের অংশ বলে পরিগণিত। ক্বিয়াস বা সদৃশ বিষয়ে ইসলামী শারী'আতের সদৃশ বিধান, অতএব ইহা ইসলামী অর্থনীতির চতুর্থ উৎস। যে বিষয়ে কুরআন মাজীদে ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ্ কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না এবং মুজতাহিদগণের মধ্যে 'ইজ্‌মা' ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে বিষয়ে একজন মুজতাহিদ যৌক্তিক উপসংহারে উপনীত হন।

---

৭. আল-কুরআন, ১১:১৪

৮. মুহাম্মদ আকরাম খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

এর মূলনীতি হচ্ছে, যে বিষয়ে উপরোক্ত তিন সূত্রে কোনটিতে বিধান রয়েছে, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে অনুরূপ বিধান কার্যকর হবে। অতএব অর্থনীতি সংক্রান্ত যেসব সমস্যার সমাধান উক্ত তিন সূত্রে নেই, সেসব সমস্যার সমাধান ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তবে ইজতিহাদের কাজ অবশ্যই শরী'আতের কাঠামোর আওতায় এবং 'এ কাজের জন্য যথাযথ যোগ্যতার অধিকারী' লোকদের দ্বারা করতে হবে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি পাশ্চাত্য অর্থনীতির অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু এক্ষেত্রেও উভয় অর্থনীতির মধ্যে মিলের বিষয়গুলোর চেয়ে অমিলের বিষয়গুলোর সংখ্যা অনেক বেশি। সে যা-ই হোক, অর্থনীতির সমস্যাবলীর সমাধানে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তথা অতীতের ইজতিহাদসমূহ, অন্যদের (এমনকি অমুসলিমদেরও) সমকালীন তত্ত্বসমূহ এবং আধুনিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়া থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে চারটি মৌলিক উৎস থেকে উৎসারিত ইসলামী অর্থনীতির পথনির্দেশসমূহ অর্থনীতির ওপর একটি স্বতন্ত্র আলোকসম্পাৎ করে। ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যাকে শারী'আতের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং এর ফলে এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। এভাবে সর্বসম্মত সূত্র অর্থাৎ শরী'আতের ওপর নির্ভরতার ফলে মতপার্থক্য সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ইসলামী অর্থনীতিতে গবেষণার আওতা পাশ্চাত্য অর্থনীতির গবেষণার আওতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য অর্থনীতি যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই তার গবেষণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, তার পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি মানুষের 'ফালাহ্' বা কল্যাণের জন্য গবেষণা করে এবং এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে কর্মপন্থা বলে দেয়। 'ফালাহ্' মানে হচ্ছে এ পৃথিবীতে বস্তুগতভাবে অগ্রসর বা উন্নত জীবন এবং পরকালেও সফল জীবন। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের জন্য 'ফালাহ্' নিশ্চিত করার লক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে। তাই নিঃসন্দেহে এর গবেষণাক্ষেত্র পাশ্চাত্য অর্থনীতির গবেষণাক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত।

অর্থনীতির পরিচয় :

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের গতিশীল জীবনধারার একটি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী বিভাগ। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ ব্যবস্থাপনা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অব্যর্থ সনদ, অনবদ্য আয়োজন। প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ.) এর পৃথিবীতে আগমণের সাথে সাথে যেমন ইসলামের আগমণ হয়েছে তেমনি ইসলামি অর্থনীতির ও পথচলা সেদিন থেকেই শুরু। প্রথম থেকেই মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা যেমন ইসলাম ছিল, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যও একমাত্র পন্থা ছিল ইসলামি অর্থনীতি। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলামের নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ কখনই বাস্তবরূপ লাভ করেনি। বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও দেশে যেমন আলাদা ধর্ম, সভ্যতা ও জীবনধারা গড়ে উঠেছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও সে ভিন্নতার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং পরিবর্তন প্রেক্ষাপট ও সমকালীন চাহিদা বিবেচনা করে অর্থনীতিবিদগণ নতুন নতুন অর্থনৈতিক চিন্তার জন্ম দিয়েছেন। আর এ সকল স্বতন্ত্র চিন্তাধারার নানা রকম বিকল্প অর্থব্যবস্থা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অর্থনীতির সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতিও বিবর্তিত হয়েছে। এ বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে পুরাতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বলেন, "জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণগত অনুসন্ধান পদ্ধতি হল অর্থনীতি।" (Economics is concerned with on enquiry into the

Dhaka University Institutional Repository

natural and causes of the wealth of nations) তার মতে, অর্থনীতি হল সম্পদ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।[৯]

অধ্যাপক এল, রবিন্স (Professor Lioned Robbins) বলেন, "অর্থনীতি হল একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানবীয় আচরণকে পর্যালোচনা করে।"[১০] (Economics is the science, which studies human behavior as a relationship between ends and some means, which have alternative, uses)

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল (Professor Alfred Marshall) বলেন, 'অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া বিষয়টি ব্যক্তি ও সমাজের সে সকল কার্যক্রমও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, যে সকল কাজের মাধ্যমে গুণ ও কলাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রি পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।' (Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social action, which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites well-being.)[১১]

ড. জে. এন. কেইনস এ জন্যই বলেছেন, সংজ্ঞার ভারে অর্থনীতি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সাধারণ অর্থে অর্থনীতি হল অর্থ-সম্পদ সম্পর্কীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান। অর্থ সংক্রান্ত কাজ করার জন্যে মানুষ যে নীতি উদ্ভাবন করে অথবা যে বিধি-বিধানের আলোকে আর্থিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করে তাকে অর্থনীতি বলে।[১২]

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, অর্থনীতি হল এমন একটি বিশেষ শাস্ত্র যা জাতীসমূহের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে ।

ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি :

আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত জীবন বিধানই ইসলাম। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু এর অনুসারীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তি জীবন, গোষ্ঠী জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও উপযুক্ত নীতিমালা । এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবার, সমাজ , রাজনীতি, অর্থনীতি , প্রশাসন ,আইন ও বিচার প্রভৃতি। অর্থনীতি যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারীদের জন্যেও একথা সত্য। তাই ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বোঝায় যার আর্দশ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং পরিনাম ইসলামী আকিদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়। এই অর্থনীতির মূলনীতি ও দিক-নির্দেশনা বিধৃত রয়েছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। মুসলমানদের জীবনের সেই দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তৌহিদ, রিসালত ও আখিরাত। পক্ষান্তরে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদ তথা ভোগবাদ। অধুনা ধবংসপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মুসলিম উম্মাহর আকীদা হচ্ছে এই বিশ্বচরাচরের একজন মহান

---

৯. Adam Smith, *An Enquiary into the Nature and causes of wealth of Nations* (London, 1890), P.IV

১০. Professor L. Robbins, *The Nature and significance of Economics science* (2nd Edition-1935), p.16

১১. Alfred Marshall, *Principles of Economics*, 1980

১২. J.M. Keyenss. *The General Theory of Employment, Interest and Money*, (London. 1936), p.4

Dhaka University Institutional Repository

স্রষ্টা আছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান। একমাত্র তাঁরই নির্দেশিত পথেই কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। এই নির্দেশিত পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা প্রদান করে তিনি বলেন, "আজ আমি তোমদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম"[১৩]আল্লাহর এই একত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিকানাকেই ইসলামে বলা হয় তৌহিদ এবং তার পাঠানো নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই রিসালত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । অধিকন্তু এই জীবনই শেষ নয়, এর পরে রয়েছে এক অনন্ত জীবন বা আখিরাত। সেই জীবনে ইহকালীন সুকৃতির জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং দুস্কৃতির জন্যে রয়েছে শাস্তি। তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের এই সামষ্টিক বিশ্বাস মুসলমানের ঈমানের পূর্ণতা দান করে। এর তিলমাত্র ব্যতিক্রম শুধু তার ঈমান নয়, তার সমগ্র কর্মজীবনেই এনে দেয় নানা সংশয়, সন্দেহ ও অপূর্ণতা। শয়তান সেই সন্দেহের মধ্যে দিয়ে তাকে টেনে নেয় ধ্বংসের দিকে। মুসলমানের সমগ্র জীবন ও কর্মকান্ড তাই তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অর্থনীতি যেহেতু সেই জীবন ও কর্মকান্ডেরই এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রেও তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাস ও তার দাবি সমভাবেই প্রযোজ্য, এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয়ে মুসলিমদের জীবনের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। গড়ে উঠে সমৃদ্ধ ও গতিশীল অর্থনীতি। এই দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতির একটি সুসংবদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

ড. এম. উমার চাপরার মতে, Islamic economics is that Branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creation continued macroeconomic and ecological imbalances."[১৪] (ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুস্প্রাপ্য সম্পদের বণ্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সমষ্টি অর্থনীতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।)

প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হামিদের মতে ইসলামী অর্থনীতি হলো "ইসলামী বিধানের সেই অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যায়ন করে" ।[১৫]

ড. এ. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মত হলো, æIslamic economics is the Muslim thinkers response to the economic challenbges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and

১৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩

14. M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics* (Islamic Research and Training Institution Islamic Development Bank, Jeddha, 1996), p. 33

১৫. এম. এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি* (একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, ঢাকা-২০০২), পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

experience."[১৬] (সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাবই ইসলামী অর্থনীতি। এই প্রয়াসে তারা কুরআন ও সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সহায়তা নিয়ে হচ্ছে থাকেন।)

ড. এস. এ. হাসাউজ্জামানের মতে, æIslamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquistition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society."[১৭] (ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরীয়াহর বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ বা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ যেন এর ফলে মানবমন্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।)

প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, Islamic economics represents a systematic eftort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective. (ইসলামী অর্থনীতি হলো অর্থনৈতিক সমস্যা ও এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে উপলব্ধি করার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস।)[১৮]

ড. এম.এ. মান্নান বলেন, æIslamic Economics is a social science which studies the economic problems of a people and imbued with the values of Islam."১৯ (ইসলামী অর্থনীতি হলে একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যা কুরআন ও সুন্নাহর শাশ্বত নির্দেশাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং সেই সাথে প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের অন্ধকারে রেখেছে। উপরন্তু এদেশে দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ইসলামী অর্থনীতির দর্শন, মূলনীতি, রূপরেখা বা বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধে ধারণা প্রসার লাভ করেনি।

---

১৬. M. Nejahullah Siddiqui, æ*History of Islamic Economics Thought*" (Lectures on Islamic Economics IRT/ IDB, Jeddah, 1992), p.69

১৭. S.M. Hasanuzzaman, æ*Definition of Islamic Economics*" (Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Wenter, 1984), p. 52

১৮. Khurshid Ahmed, *Nature and significnce of Islamic Economics* (Jeddha, IDB, 1992), p.19

১৯. M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and practice* (The Islamic Academy, Cambridge, 1936), p.18

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের হালাল-হারাম বিবেচনা করতে হয়। এ অর্থনীতিতে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ বা হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী শরী'য়াতের নিষিদ্ধ কোন কিছুর স্বত্বার্জনই অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বলে গণ্য হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা অবৈধ ও বেআইনী। অবৈধ বা হারাম উপার্জন মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা বাহ্যিক প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা হলেও এর দ্বারা প্রকৃত সুখ ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায় না। যারা হারাম বা অবৈধ অর্থ-সম্পদের মোহে জীবন ব্যয় করবে তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা, অপমান, আর পরকালীন জীবন ধ্বংশ ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন, "যে দেহ হারাম উপার্জনে কেনা খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিন্ড জাহান্নামেরই যোগ্য"। (আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী) তাছাড়াও অন্য যে কোন অসাধু উপায়ে নিজের অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ে তোলা যেহেতু অন্যদের ভাগ্যের বিনিময়ে ধনী হওয়ার নামান্তর, সে জন্য ইসলাম সাধারণভাবে তা নিষিদ্ধ করেছেএবং এ জন্য কঠোর হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। নিম্মে অর্থনৈতিক অপরাধ সমূহের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিদি-বিধান সমূহ আলোচনা করা হল-

সুদের শাস্তির বিধান :

সুদকে আরবী ভাষায় 'রিবা' বলা হয়। রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, স্ফীত বা বাড়তি। কুরআন মাজীদেও এ অর্থে 'রিবা'র ব্যবহার দেখা যায়। যথা: "তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[২০] পারিভাষিক অর্থে- সম্পদে একটা বিশেষ ধরণের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম হচ্ছে রিবা। প্রচলিত অর্থে 'রিবা' হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যা ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তারই বিনিময় হিসেবে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করে থাকে। "রিবা হচ্ছে এমন বাড়তির নাম যা কোন মালের বিনিময় নয়"।[২১] মালের ওপর যে অতিরিক্ত দাবি করা হয় তার নামই 'রিবা'।[২২] সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত আর্থিক অনাচারের মধ্যে সুদ সর্বাধিক ধবংশাত্মক। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ ফেরতের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময় মূল্য পরিমাণের জন্য যা-ই গ্রহণ করে, তাই রিবা বা সুদ।[২৩] আবার সময় বৃদ্ধিকরণে ঋণ পরিমাণ বৃদ্ধিটাই সুদ। তবে একটি মাত্র রূপ এবং এর এমন আরো অনেক রূপই রয়েছে।[২৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে, তাই রিবা।[২৫] তিনি আরো বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগত হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদ সংঘটনকারী সাব্যস্ত হবে।

২০. ইবনুল আরাবী, *আহকামূল কুরআন*, তা. বি, খন্ড. ১, পৃ. ১০৩

২১. ইমাম আল-ফাখর আর-রাযী, *আত-তাফসীর আল-কাবীর দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরাবী* (বৈরূত, তা.বি.), পৃ.২৬০

২২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল* (দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, আল-কাহেরা, তা.বি.), খ. ১, পৃ.১৫৪

২৩. আল্লামা সাবূনি, *তাফসীরে আয়াতুল আহকাম* (দারুল যিকর, বৈরুত, ১৯৯৭, খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৮৩

২৪. ইবনু জরীর, *তাফসীরে কবীর* (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত-১৯৯০), খ.৭, পৃ. ৮৭-৮৭

২৫. জামে সগীর, উদ্ধৃতি: মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.), *তাফসীরে মাআরফুল কোরআন* (ইফাবা, ঢাকা-১৯৯৩), খ. ১, পৃ. ৭৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ই সমান অপরাধী।[২৬] তাই সমজাতীয় দ্রব্য হোক বা টাকা হোক যদি ধার দেয়া হয় এবং ধার পরিশোধের সময় প্রদত্ত বস্তু বা টাকার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো বস্তু বা টাকা গ্রহণ করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হলো তা সুদ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে কিংবা সরল হার যে হিসেবেই নেওয়া হোক না কেন, অতিরিক্ত কিছু নিলে তা সুদের আওতাভূক্ত হবে। সুদ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কারণ এতে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র হয় এবং ধনীরা আরোও ধনী হয়। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে সুদের উপর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। সুদের টাকা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদ সহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলে দারিদ্র। রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবকালীণ আরবের কৃষক ও অন্যান্য নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোক ঋণের জালে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আল্লামা বায়দাভী লিখেছেন, তারা (ঋণদাতারা) একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে সুদ নিত। অতঃপর ঋণ পরিশোধের সময় এবং অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকতো। আর এভাবে ঋণগ্রহীতার সমস্ত সম্পত্তি একটি সামান্য পরিমাণের ঋণের দরুন ধবংশ হয়ে যেত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম"[২৭] ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ শুধুমাত্র মহাজনী কারবারের ক্ষেত্রেই নয় বরং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সমভাবে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবকালে আরবে বিভিন্ন ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে কিছু রীতি এমন ছিল যার দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। তবে কিছু রীতি-নীতি ছিল জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ধীরে ধীরে তাঁর বান্দাদেরকে সেগুলো থেকে মুক্ত করেন। এতে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে প্রচলিত মানবতার জন্য ক্ষতিকর রীতিনীতির বিলুপ্তি ঘটে, অন্যদিকে আল্লাহর দেয়া বিধানও ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। এ সত্য সামনে রেখে চিন্তা করলে অনায়াসে বোঝা যাবে, আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশ তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশকে বাতিল করতে আসে না বরং পরিপূর্ণ করতেই আসে। সুদের বেলায়ও এ নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। আরবে সুদখোরী ব্যবসা ছিল একটি সাধারণ পেশা। সুদখোর মহাজনরা দাবি করত, সুদ এক ধরনের লেনদেন ছাড়া কিছু নয়। তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত। তারা সুদ গ্রহন করত,অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং তারা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভোগ করতো। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি"[২৮]আরবের পুঁজিপতি ইয়াহূদীরা সাধারণত সুদী ব্যবসা করতো। হিজাযের খায়বার নামক বাজারটি ইয়াহূদী পুঁজিপতিদেরই অধিকারে ছিল। 'রাফি' নামক ইয়াহূদীকে 'তাজেরে হিজায' বা হিজাযের বণিক আখ্যা দেয়া হয়েছিল। এ পুঁজিপতি ইয়াহূদীরা মজবুত কেল্লা তৈরী করে তাতে বসবাস করতো এবং গরীব শ্রেণীর লোকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো। এ সুদ নিষিদ্ধ করতে গিয়ে কুরআনে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় যে, সুদ খাওয়াটা ইয়াহুদীদের কর্ম। তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করছে এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্যে,

২৬. আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ।

২৭. আল-কুরআন, ২:২৭৫

২৮. আল-কুরআন, ৪:১৬১

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।[২৯]আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সুদ প্রথা চালু রয়েছে। যেগুলো আমাদের ইসলামি আদর্শ ও রীতি-নীতিকে ধ্বংশের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে। তবে দুই ধরনের সুদপ্রথাই বেশী প্রচলিত তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

ক) মহাজনী সুদ : আরব দেশের লোকেরা ঋণের মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফাকে বৈধ মনে করতো। বর্তমানে এটাকেই মহাজনী সুদ বলা হয়। বর্তমান সময়ের ন্যায় আরবদের মধ্যে যে সকল লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলো হলো- এক. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গরীব লোকদের ঋণ দেয়া হতো এবং টাকা প্রতি সুদ ধার্য করা হতো; দুই. ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে সুদ ও মূল টাকা মিলিয়ে আসলে রূপান্তরিত করা হতো এবং পুরো টাকার উপর সুদ ধরা হতো। একেই বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ; তিন. অলংকার, অস্ত্র কিংবা এ জাতীয় জিনিস বন্ধক রেখে তার পরিবর্তে ঋণ দেয়া হতো। ঋণগ্রীহিতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধকী জিনিসের উপর সুদ ধরা হতো এবং সুদ বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে বন্ধকী জিনিসটি আত্মসাৎ করে ফেলা হতো।[৩০] ইসলামী ফিক্হর পরিভাষায় এটাকেই 'রিবা আন-নসিয়াহ্' বলা হয়। ইসলাম বিনাশ্রমে অর্জিত এ মুনাফাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। সর্বকালের জন্য সুদকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- "হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান হারে এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"।[৩১]এখানে দ্বিগুণ, চারগুণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রেখে সুদের সাধারণ নিয়ম-নীতির বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি বরং এখানে শুধু বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেকালে আরবের মাটিতে যা কিছু বাস্তবে ঘটত এটা তারই আলোচনা মাত্র।

বর্তমান যুগেও পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে সুদখোর মহাজনদের পৈশাচিকতা, নির্মমতা, অসহায় বনী আদমকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টার বহুমাত্রিক চিত্র দেখা যায়। গৃহকর্তার গৃহীত ঋণের জন্য তার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও ইয়াতীম সন্তানদের বাস্তুহারা হতে দেখা যায়। সামান্য ক'টি টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের জন্য ঋণ গ্রহীতার বাড়ি-ঘর নিলাম হওয়ার ঘটনা অহরহ পত্রিকার পাতায় পরিদৃষ্ট হয়। আবার কখনও কখনও তার বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়সহ সব মালামাল ক্রোক হতে দেখা যায়। এমনও খবর পত্রিকান্তরে জানা গেছে যে, সামান্য কটি টাকার জন্য ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার শবদেহ সৎকার বা দাফন করতে দেয়া হয়নি যতক্ষণ না মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। গরীব ও সর্বহারা মানবতাকে নিয়ে এ হল সুদখোর মহাজনদের কুকীর্তির চিত্র, যা বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশে হর-হামেশাই দেখা ও শোনা যায়। সুদ হারাম করার সাথে কুরআনে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত যা গ্রহণ করেছ তা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। সুদকে হারাম ঘোষণার পর ঋণগ্রহীতার নিকট যা পাবে তা মাফ করে দাও । মাফ না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। রাসূলুল্লাহ (স.) নবুয়তের শেষ বর্ষে সুদ সম্পর্কিত কুরআনের এ শেষ নির্দেশটি সকলকে শুনিয়ে দেন।"হে মুমিনগণ! তোমারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হয়। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমার অত্যচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে

২৯. মাওলানা হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.২১

৩০. আল-কুরআন, ৩ : ১৩০

৩১. আল-কুরআন, ২:২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে" ।[৩২]

খ) বাণিজ্যিক সুদ : মহাজনী সুদ ছাড়াও ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেনেও সুদের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক লেনদেনে নিম্নের দুটি নীতি লংঘিত হলে তা সুদ হিসেবে পরিণহিত হবে। নীতি দুটি হল-

প্রথমত সমজাতীয় পণ্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে খাঁটি-অখাঁটি, সজ্জিত-অসজ্জিত, কম দামী-বেশী দামী, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিবেচনা করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের পণ্য সমান ওজনের হতে হবে। কম-বেশী করা যাবে না। তাৎক্ষণিক বিনিময় করতে হবে। ধারে বা বাকীতে করা যাবে না। যেমন- সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ, কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস, মোনাক্কার বিনিময়ে মোনাক্কা প্রভৃতি সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ের সময় সমান সমান, হাতে হাতে লেনদেন করতে হবে। কম-বেশী করলে তা সুদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য সমজাতীয় না হলে, তাতে কম-বেশী করা যাবে। যেমন- সোনার বিনিময়ে রুপা, যবের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময়ে গম প্রভৃতি লেনদেনে কম-বেশী করা যাবে। তবে এ জাতীয় পণ্যেও বেচাকেনাও নগদ করতে হবে। ধারে বা বাকিতে করা যাবে না। এ দুটি নীতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিম্মোক্ত সহীহ হাদীসটিকে ফকীহগণ মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি 'উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণ এবং হাতে হাতে তথা তাৎক্ষণিক ও নগত হতে হবে। আর পণ্য সমজাতীয় না হলে যেভাবে খুশী কম-বেশী করা যাবে। তবে বাকীতে করা যাবে না এবং সংগে সংগে লেনদেন করতে হবে।[৩৩] ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ এটাকেই 'রিবা আল-ফদল' বলে আখ্যায়িত করেন।

মুসলিম ফকীহগণ উপরোক্ত হাদীসটিকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ হওয়া না হওয়া নির্ধারণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হাদীসে বর্ণিত শর্তাবলীর পরিপন্থী হলে তাঁরা তাকে সুদ হিসেবে অভিহিত করেন। আর ব্যবসা-বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ হাদীসে বর্ণিত শর্তানুযায়ী হলে তাঁরা তাকে বৈধ মনে করেন। বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এ নীতিটিই পার্থক্য নির্ণয় করে। সাধারণ ব্যাংকিং এ টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশী করা হয় বলে আলোচ্য হাদীসের আলোকে সুদে পরিণত হয়, আর ইসলামী ব্যাংকিং এ মালামালের বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশি করা হলেও তাতে সুদ হয়না। সুদেও পরিণাম ভয়াবহ। তা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে অপমান ও পরকালীন জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা সুদের টাকা বৈধ সম্পদের সাথে একত্রিত হয়ে মূল সম্পদকে ও হারামে পরিণত করে। সুদের অনিষ্টতা আর তা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইসলাম এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন ব্যক্তি যে কোন রূপে অংশীদার হোক না কেন; চাই তার দলীল ও চুক্তিপত্র লেখক হোক কিংবা তার সাক্ষী হোক তাদের সকলের প্রতিই অভিশাপ দিয়ে থাকে। জাবির (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) সুদগ্রহীতা,

৩২. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮-৮০

৩৩. ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সুদদাতা, সুদী ব্যবসার লেখক এবং ঐ সম্পর্কের সাক্ষ্যদানকারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সবাই সমান।”[৩৪] এ হাদিস দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যারা এ সুদের সাথে যে কোনভাবে জড়িত হলে দুনিয়ার জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর পরকালে জাহান্নামের অবধারিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে ঘোষণা করেছিলেন, সব রকমের সুদই অবৈধ, তবে মূল অর্থ তোমাদেরই, সেটা তোমাদের পাওয়াও উচিত যাতে তোমরা অত্যাচারী না হও এবং অত্যাচারিতও না হও। আল্লাহ্ তা'আলা শেষবারের মত ঘোষণা করেছেন, সুদী ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর আমি 'আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ ব্যবসার উপর সর্বপ্রথম এ নির্দেশ জারি করেছি। ভাল করে জেনে নাও, প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের ভাই। সমস্ত মুসলিমই পরস্পর ভাই ভাই। নিজের ভাইয়ের জিনিস জোর করে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়, হ্যাঁ যদি সে ইচ্ছা করে কিছু দেয়। তোমরা নিজেদের উপর অবিচার কর না। হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার পয়গাম পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছে।?”[৩৫]এ ভাষণ তথা মানবাধিকারের এ চার্টটি ঘোষিত হওয়ার পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা' এ আয়াতটি নাযিল হয়; “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”[৩৬]উপরোক্ত ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স.) সুদকে কেবল নীতিগতভাবেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং আপন চাচার সুদী কারবারের উপর এ নিষেধাজ্ঞা সর্বপ্রথম কার্যকরও করেছিলেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের অর্থ অসংখ্য লোকের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।[৩৭] তিনি রীতিমত লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে সুদী কারবার পরিচালনা করতেন।

সুদখোর টাকার নেশায় বেসামাল হয়ে যায়। সে অসৎ চরিত্রে অন্ধকার গহবরে হারিয়ে যায়। মানবতার আলোকশিখা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব, সমবেদনা, সহমর্মিতাকে সে অর্থহীণ মনে করে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা ও অন্যদের সমূলে ধবংশ করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। অভাবী ও অসহায়দের দুরবস্থা সে দেখেও দেখে না, সহায়-সম্বলহীনের আর্তনাদ তার কানে প্রবেশ করে না। সে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এজন্য কুরআন মাজীদ পরকালে সুদখোরের পরিণতি এভাবে চিত্রিত করেছে, “যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নিঅধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন পাপী কাফিরকে ভালবাসেন না।”[৩৮] ইসলামী আক্বীদা অনুযায়ী এটা হল শেষ সীমা যে সুদকে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সুদখোরকে কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে। অতপর ঘোষণা করা হয়, “মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৫

৩৫. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাত আন-নববীয়াহ* (ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত-১৯৮৫), খ.২ পৃ.১৪৬

৩৬. আল-কুরআন, ৫:৩

৩৭. ইবনে জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মূলুক*, ১৯৬৪, পৃ.১৭৫৩

৩৮. আল-কুরআন, ২:২৭৫-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।"[৩৯] অর্থাৎ সুদখোর পার্থিব জীবনে যে সখের সন্ধান লাভের জন্য সুদ খেয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করে, তাতে তার সুখ আসে না, বরং তার দুঃখ-দুর্দশা বহুগণে বেড়ে যায়। কারণ তার শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যায়, আরো অধিক সম্পদ লাভের আশায় সে পাগলেল মত হয়ে যায়। সম্পদের আধিক্যের দরুন মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নানারকম অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এতে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন মানুষদেরকে কবর থেকে উঠাবেন তখন সুদখোর ছাড়া সকলেই দৌড়াতে থাকবে। সুদখোররা দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাবে, যেমন মাতাল ব্যক্তি পড়ে যায়। কারণ তারা দুনিয়ায় যে সুদ খেয়েছে আল্লাহ আ'আলা তা তাদের পেটে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ভারী করে দিবেন। ফলে তারা দাঁড়তে গেলেই পড়ে যাবে। অন্যান্য মানুষের ন্যায় দ্রুত হাঁটতে চাইলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। কাতাদাহ্ (রা.) বলেছেন, "সুদখোর কিয়ামতের দিন পাগল হয়ে উঠবে। এটাই সুদখোরদের আলামত। হাশরের মাঠে লোকেরা তাদের চিনতে পারবে।"[৪০] আবদুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন "কোন জনপদে যিনা ও সুদ ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ সে জনপদকে ধবংশ করে দেয়ার অনুমতি দেন।"[৪১]

সামুরাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বপ্ন বিষয়ক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সুদখোরকে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোহিত নদীতে ফেলে সাতরানোর শাস্তি দেয়া হবে যা হবে রক্তের মতো এবং পাথর গিলানো হবে, তা হল সেই হারাম মাল যা সে দুনিয়ায় জমা করেছে, তাকে আগুনের পাথর ভক্ষণ করানো হবে যেমনিভাবে সে দুনিয়ায় হারাম জমা করে ভক্ষণ করেছে।" ইমাম আহমদ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ইসরা বা মিরাজের রজনীতে আমাকে এমন একদল লোকের কাছে নেয়া হল যাদের পেট ঘরের ন্যায় বিরাট, যেগুলোর ভেতর থেকে সাপ বের হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন-এরা সুদখোর।"[৪২]হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "চার ধরনের লোককে জান্নাতে প্রবেশ এবং তার নি'আমত আস্বাদন না করানো আল্লাহর হক। এরা হল-মদখোর, সুদখোর, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, তবে যদি তারা তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন।"[৪৩]বর্ণিত আছে, সুদখোররা সুদ খাওয়ার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে কিয়ামতের দিন তারা কুকুর ও শুকরের আকৃতিতে উঠবে। যেমনিভাবে শনিবার ওয়ালাদের আল্লাহ্ নিষিদ্ধ মাছ ধরার এবং সেদিন মাছ সেখানে পড়ত, পরে তারা রবিবারে সেগুলো শিকার করতো। তাদের এরূপ কৌশল অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সুদে রয়েছে সত্তরটি পাপ, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল কোন লোকের তার

---

৩৯. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

৪০. আহমদ ইবনু আবদুল আযীয, *আদ-দুররুল মানছুর*, (দা ইবনিল আছীর, রিয়াদ-২০০১), পৃ.২৭৮

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, (আল-কাহেরাঃ দারুত তাকওয়া, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩৭৬

৪৩. আদ দুররুল মানছুর,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মাকে বিয়ে করার সমতুল্য (নাউযুবিল্লাহ)।"[৪৪] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী"।[৪৫] অর্থাৎ পাপের দিক থেকে উভয়েই সমান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে দিও না"[৪৬] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করে তা থেকে মুমিনদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।আল্লাহ বলেছেন, "মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে"।[৪৭] তিনি অন্যত্র বলেন, "মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো তাহলে সুদের মধ্য থেকে যা এখনো অনাদায়ী আছে তা পরিহার করো"।[৪৮] সুদের হারাম হওয়ানিশ্চিত করে বলেছেন, "আর আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায় বা বেচাকেনাকে হালাল করেছেন, হারাম করেছেন সুদকে।"[৪৯]সুদের লেনদেনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে এই হারাম কাজ সম্পাদন করা হয়। আল্লাহর আদেশ লংঘন করে যারা সুদের লেনদেন করে তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। বলা হয়েছে, "এরপরও তোমরা যদি সুদ পরিহার না করো তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তোমরা নিজের মূলধন পাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না"।[৫০]

সুদ সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কঠোর আদেশ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর উম্মতদের তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা ক্ষতিকর ৭টি বিষয় থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদুবিদ্যা শেখা ও শেখানো, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ গ্রহণ করা, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং চরিত্রবর্তী নারীকে ব্যভিচারিতার অপবাদ দেওয়া।[৫১] আল্লাহ সুদের লেনদেনের জন্য আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি ও দুর্বিসহ পরিণতি প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। বলা হচ্ছে, "যারা সুদ খায়, কিয়ামতের দিন তারা সে ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে স্পর্শ দিয়ে শয়তান পাগল করে দিয়েছে। .... যারা আবারো সুদ গ্রহণ করবে তারা হবে আগুনের অধিকারী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে"।[৫২]রাসূলুল্লাহ (স.) আরো ইরশাদ করেন, "সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৫৩] সুদ নিজেই

৪৪. ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১৩

৪৫. আদ দুররুল মানছুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

৪৬. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮

৪৭. আল-কুরআন,৩:১৩০

৪৮. আল-কুরআন, ২:২৭৮

৪৯. আল-কুরআন, ২:২৭৫

৫০. আল-কুরআন, ২:২৭৯

৫১. আবূল হুসাইন ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

৫২. আল-কুরআন, ২:২৭৫

৫৩. আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, (আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বৈরুত-১৯৯০), পৃ.২১১

Dhaka University Institutional Repository

একটি মূর্তমান পাপ। এটি কোনো সাধারণ পাপ নয়। বরং সকল বড়ো ধরনের পাপের মধ্যে সুদ লেনদেনের পাপটি হচ্ছে সর্বাধিক জঘন্য, কুৎসিত ও বীভৎস। রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন বক্তব্যে এ বীভৎসতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সুদের গুণাহের তিয়াত্তরটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরটি হল নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমান"।[৫৪]জেনে-শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক পাপ।[৫৫]রাসূলুল্লাহ (স.) সুদী লেনদেনের সাথে জড়িতদের জন্য অভিশাপ ঘোষণা করেছেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদ লেনদেনের সাক্ষী দুজনের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী।[৫৬]আল্লাহর কঠোর নির্দেশ সংঘনের পাপ হিসেবে সুদ ব্যক্তির আখিরাতের জীবন পুরোপুরি ধবংশ করে দেয়। সে অন্য পূণ্য যাই করে থাকুক না কেন, সুদের কারণে তাকে অনন্তকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।সুদ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিনিময় বৈষম্য রয়েছে। ব্যবসায় পণ্য ও মূল্য বিনিময় শেষ হলেই কারবার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সুদ ব্যবস্থায় সুদ গ্রহীতা সুদখোর মহাজনকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। পাশাপাশি ফেরত দেয় মূলধনও। বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কোনো বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না।

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রধান কারণ হলো, সুদ একটি অত্যন্ত বড় ধরনের যুলুমমূলক ব্যবস্থা। সুদখোর মহাজন সুদদাতার সুবিধা-অসুবিধা, সক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনায় না এনে যে কোনো মূল্যে তার মূলধন ও সুদ উসূলের চেষ্টা করে। ফলে প্রায়শঃ অপ্রীতিকর নানা ঘটনা ঘটে। সুদ সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের শোষণের জন্য একটা শোষকগোষ্ঠী গড়ে তোলে। তারা অভাবগ্রস্ত লোকদের ব্যক্তিগত ব্যয় নিবার্হের জন্যে সুদে ঋণ দান করে। মহাজন অভাবগ্রস্ত জনগণের রক্ত শোষণ করে। সুদের কারণে এ ধরণের ঋণ পরিশোধ করা গরীবদের পক্ষে শুধু কঠিনই নয় বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা এক ঋণ শোধ করার জন্য দ্বিগুণ-তিনগুণ ঋণে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। মূল টাকার কয়েকগুণ বেশি টাকা শোধ করা সত্ত্বেও মূল ঋণ নিজ স্থানেই অপূরণীয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রমজীবিদের উপার্জিত অর্থের প্রধান অংশটাই মহাজনরা সুদ বাবদ শুষে নেয়।দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয় সুদ। সুদভিত্তিক ঋণভারগ্রস্ত লোকেরা সর্বদা গভীর চিন্তা ও উদ্বেগে অতিষ্ট হয়ে থাকে। সঠিক চিকিৎসা ও খাবার তাদের ভাগ্যে জোটে না বলে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বাস্থ্যও হারিয়ে ফেলে। সুদের কিস্তি আর মূলধন শোধের বিভীষিকা তাদেরকে অহোরাত্র তাড়া করে। দুঃচিন্তা, দুর্ভাবনা তাদের মনের শান্তি কেড়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ ঋণ রাতের দুঃশ্চিন্তা, দিনের অপমান।[৫৭] সুদ ঘৃণা সৃষ্টি করে। গরীব ও মধ্যবিত্তদের শোষণের পথ অবারিত রেখে সুদ শোষক জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের অপরিসীমা ঘৃণার জন্ম দেয়। শোষিতরা বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। শেষ পরিণতিতে শোষক দলও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায় না। কেননা তাদের এই অমানবিকস্বার্থপরতার দরুণ গরীব ও মধ্যবিত্তদের অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। এর ফলে তাদের মনে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার এক বিরাট ঝঞ্ঝা তৈরি হয়। প্রতিনিয়ত তা ক্ষুদ্ধ হতে ও বিক্ষোভে ফুলতে থাকে। এরপর কোনো বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে এই আগ্নেয়গিরি তখন অগ্ন্যুদগীরন করে তখন এই যালিম

৫৪. আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩

৫৫. আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ (দারুল মাআরিফ, বৈরুত-১৮০৯ হি.), কিতাবুল বুয়ূ

৫৬. আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, *সহীহ আল-মুসলিম* প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাহ

৫৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধনী সম্প্রদায় ধন-সম্পদের সাথে নিজেদের সম্মান এমনকি জীবনও হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।[৫৮]ব্যবসায় সাধারণভাবেই Production ও Profit বাড়ায়। কিন্তু সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে। হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। এমনিভাবে সুদের হার যদি শূন্যের কোটায় নেমে আসে তাহলে বিনিয়োগে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়। ধরা যাক পাঁচটি এমন প্রকল্প যার একটিতে লাভের হার শতকরা ২৫ ভাগ। সুদের হার যদি শতকরা ১০ ভাগ হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকল্পে কেউ সুদে ঋণ নিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করবে না। অর্থাৎ তাতে ৪০% ভাগ বিনিয়োগ সম্ভাবনাময় প্রকল্প কেবল সুদের কারণে কোন বিনিয়োগ পাবে না। কেননা ১০% হারে সুদ পরিশোধের শর্তে নেওয়া ঋণের টাকা কেউ ১০% বা ৫% ভাগ লাভের প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে না। কেননা তাতে করে ব্যবসায় লোকসান হবে। এমনকি সুদের কিস্তি শোধের মতো লাভও করা সম্ভব হবে না। তাতে করে একটি বিপুল এলাকা বিনিয়োগ সুবিধা বঞ্চিত থেকে যাবে। যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সুদ। এভাবে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধক কোনো রীতি মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

সুদ আর্থিক দিক দিয়ে অভাবনীয় বৈষম্য তৈরি করে। ধনীকে আরো ধনী বানায়। গরীবকে আরো গরবী। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও সম্প্রতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, "দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুদখোরের মুঠোর মধ্যে চলে গেছে।[৫৯] বাস্তবতাও তাই। সুদ কোটি মানুষের আয়ে কয়েকজন পুঁজিপতির ধন-ভান্ডারকে কেবল সমৃদ্ধ করে।

সুদভিত্তিক ঋণ পদ্ধতিতে দরিদ্রদের ধন সম্পদ নিশ্চিতভাবে ধনীদের হস্তগত হয়। ফলে সম্পদ বন্টনে শোষণমূলক অসাম্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং এ কারণে সমাজ হবে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। এটা ইসলামের সমাজদর্শণ ও সামষ্টিক স্বার্থপরিপন্থী। উপরন্তু বিষয়টি আল্লাহ তা'আলারও ইচ্ছা পরিপন্থী। তিনি তো মানুষের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সুদ চেষ্টাকে প্রভাবহীন করে দেয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্নতর অক্যালণ ধারা সৃষ্টি করে।

ঘুষের শাস্তির বিধান :

বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক অনাচার সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার মধ্যে সম্ভবত ঘুষ সবচেয়ে জঘন্য এবং সর্বাধিক ক্ষতিকর। এর শাব্দিক অর্থ উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ bribe. এর আরবি প্রতিশব্দ 'রিশওয়া'। হাদীসেও ঘুষকে 'রিশওয়া' বলা হয়েছে। যে বস্তু বা বিষয় লাভের অধিকার ব্যক্তির নেই সে ব্যক্তি যদি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে কোনো কিছু দেয়ার মাধ্যমে সে অধিকার লাভ করে তাহলে তা ঘুষেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন সরকারী বা বেসরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিচারক কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিজের পক্ষে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য বা নিজের পক্ষে বিচারে রায় পাবার জন্য কিংবা উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে নিজেকে অন্যায়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য যে মাল-সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, শরী'য়তের পরিভাষায় তাকেই রিশওয়াত বা ঘুষ বা উৎকোচ বলা হয়। ঘুষখোরার যে ঘুষ নেয় তার কোন বিনিময় দেয় না, তবে ফাইল আটকিয়ে নেয় বলে এর নাম হয়েছে ঘুষ। যেমন নগদ অর্থের বিনিময়ে চাকরি নেয়া, বিচারক বা পুলিশকে টাকা দিয়ে অপরাধী হওয়ার পরও মুক্তিলাভ, উপহারের নামে টিভি, ফ্রিজ বা এ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে অন্যান্য সুবিধা নেয়া প্রভৃতি। এমনিভাবে কারো বৈধ অধিকার বা কাজ

৫৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১১৮

৫৯. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে অর্থনীতি* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩) , খ. ১, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় টাকার চেয়ে বেশি টাকা নিয়ে করাও ঘুষ। যেমন ইচ্ছে করে টেলিফোন বিল উল্টোপাল্টা করে গ্রাহকদের কাছে থেকে টাকা আদায়, বিভিন্ন ফাইল আটকে রেখে টাকা আদায়। এমনকি অন্যায় কোনো সুবিধা দিয়ে তার বিনিময়ে অন্যায় সুবিধা নেয়াও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কারো ক্ষমতা আছে, সে তার দপ্তরে বা ক্ষমতাধীন ক্ষেত্রে কাউকে অন্যায়ভাবে চাকুরি দিল এই শর্তে যে, অন্য একজন আবার এর বিনিময়ে তার ক্ষমতাধীন এলাকায় বা দপ্তরে তার সুপারিশ থেকে একটি অন্যায় নিয়োগ প্রদান করবে।

বাংলাদেশের জীবন-যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুষের প্রচলন রয়েছে। সন্তান স্কুলে ভর্তি করতে হলে স্কুল কমিটি বা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়, সন্তানের ভালো ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে ঘুষ দিতে হয়, স্কুল-কলেজ থেকে সংশ্লিষ্ট লোককে ঘুষ না দিলে ফাইল নড়ে না। দেশের সকল বিভাগে শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের বিনিময়ে নিয়োগ করা হয় বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষক, হাসপাতালের চিকিৎসক, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য, ব্যাংকার, ড্রাইভার, আইনবিদ, বিচারক এমনকি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগেও এদেশে ঘুষের লেনদেন হয়। দলীয় পরিচয় বা ময়দানে ভূমিকা যা-ই থাক, বড় দলের নির্বাচনী মনোনয়ন পাওয়ার জন্যও এখন দলীয় ফান্ডে অনুদানের নামে বড় অংকের ঘুষ দিতে হয়। চিকিৎসকের চিকিৎসা পেতে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেবা পেতে, শিক্ষকের মনোযোগ পেতে, নিজের মালিকাধীন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দরকারি কাগজটি পেতে নামে-বেনামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘুষ আমাদের দিতেই হয়। অফিসে, আদালতে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে এমনকি খেলাধুলায় খেলোয়ার বাছাই ও নির্বাচনে বাংলাদেশে ঘুষ লেনদেনে ফিটনেস সার্টিফিকেট পাওয়া যায় আর না দিয়ে সদ্য আমদানী করা ব্রান্ড নিউ কার বা পরিবহণও সিস্টেমে ধরা খেতে হয়। ঘুষ না দিয়ে একটি ট্রাক নগরে ঢুকতে পারে না। ঘুষ দিতে না চাইলে কাগজে সমস্যা আছে বলে অযথাই হয়রানির শিকার হতে হয়। জনগণের অধিকার ফি দিয়ে পাসপোর্ট পাওয়া। বাংলাদেশে তদন্তকারী পুলিশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কাউকে ঘুষ না দিয়ে বৈধ কাজও উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ঘুষখোরদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

ঘুষের মাধ্যমে আয় হারাম। ঘুষ বা উৎকোচের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অবৈধ উপার্জন বলে চিহ্নিত। ঘুষকে বর্তমানে বখশিস, উপরি আয়, Invisible cost, (Speed money) ইত্যাদি যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন এ আয় দিয়ে খাবার কিনে খাওয়া, জীবিকা নির্বাহ করা ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কাজেই ঘুষের অর্থ ব্যয় করে খাবার খেয়ে, জামা কাপড় পরে ইবাদত করলে, দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহণকারী দুজনই জাহান্নামে যাবে।

কেউ ঘুষ গ্রহণ করেছে জানা গেলে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া গেলে, তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। ঘুষ যে নেয় তাকে ঘুষখোর বলা হয়। ঘুষ এমন এক জঘন্য প্রবণতা, যে সমাজে তা ব্যাপকতা লাভ করে, সে সমাজে প্রশাসনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে, ন্যায়-অন্যায়ের কোন পার্থক্য থাকে না, নিয়ম-নীতির কোন বালাই থাকে না, দুর্নীতি হুঁ হুঁ বাড়তে থাকে, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও জুলুমের প্রতিকার করার প্রবণতা সে সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে লোপ পয়। অপরাধী বুক ফুলিয়ে চলে, আর নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ চরম অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে যায়। নির্যাতিত নাগরিকগণ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ইনসাফ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা বোধ করে না। বিচারের বাণী নিরবে নির্ভতে কাঁদে। এ কারণেই ইসলাম ঘুষের মাধ্যমে জঘন্য পন্থায় ধন উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়-

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধভাবে আত্মসাৎ করোনা, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য এর একাংশ শাসকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করনা।"[৬০] রাসূলুল্লাহ (স.) ও এ প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই লানত করেছেন। এছাড়াও ঘুষ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে উম্মাতের ইজমা রয়েছে। ঘুষের যাবতীয় পন্থাই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে ঘুষ একটি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। লেনদেনের এমন কোনো পর্যায় নেই, সামাজিক আচরণের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ঘুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একান্তভাবে ঘুষ সম্পর্কিত ইসলামি বিধান বাস্তবায়ন আবশ্যক। এজন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি বিধান কার্যকর না থাকলেও অসুবিধা নেই। কারণ ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে তা নিষিদ্ধ না হওয়ার জন্য ইসলামি বিধান কাজে লাগিয়ে সুদ নির্মূল করা অনেকখনিই অসম্ভব। কিন্তু ঘুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তেমন নয়। কারণ ইসলামে যেমন ঘুষ নিষিদ্ধ বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও তেমনি ঘুষ নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে যদি যথাযথভাবে ইসলামি আবেগ তৈরি করা যায় এবং প্রচলিত আইনের সাথে সাথে ইসলামি বিধান কার্যকর করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই ঘুষ প্রতিরোধ সম্ভব। আর যদি পুরোপুরি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে ঘুষ প্রতিরোধের জন্য অন্য কোনো আইন-প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে না। বরং ইসলামে যে আইন রয়েছে সে আইনেই ঘুষ পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে।

অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ঘুষ একটি পন্থা। ইসলাম এ পন্থার উপার্জনকে হারাম করেছে। একজন মুমিনের জন্য ঘুষ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে ঘুষকে হারাম করার এই নির্দেশই যথেষ্ট। কারণ হারামভাবে উপার্জিত জীবিকায় যে দেহ পুষ্ট হয় তার স্থান জাহান্নাম এবং হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত কবুল হয় না।[৬১] তার উপর মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নবীল পক্ষ থেকে ঘুষের লেনদেন না করার জন্য মুমিনদেরকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘুষ দেয়া আর ঈমান আনাকে একত্রিত না করতে বলেছে। বিভিন্নভাবে মানুষকে ঘুষ না নেয়া ও না দেয়া এবং ঘুষের বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা একে-অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না এবং জেনেশুনে মানুষের সম্পদের অংশবিশেষ (বা পুরো সম্পদ) অন্যায়ভাবে আত্মসাতের জন্য বিচারকদের কাছে পেশ করো ন"া।[৬২]আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণার একটি অর্থ হলো, শাসকদের ঘুষ দিয়ে অবৈধ উপায়ে স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করো না। আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তোমরা নিজেরাই যখন জান যে, ইহা অপরের সম্পদ, তখন তার নিকট তার নিজ সমালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকার সুযোগে কিংবা কোনো কলা-কৌশলেল সাহায্যে তোমরা তা হস্তগত করতে পার; কেবল এ কারণে আদালতে উহার মোকদ্দমা নিয়ে যেয়ো না। কেননা মামলার ধারাবিবরণী অনুযাযী বিচারক এই সম্পদ তোমাকে দিয়েও দিতে পারে কিন্তু বিচারকের এই রায় ভুল বিবরণীর ভিত্তিতে প্রতারিত হওয়ারই ফল হবে। এজন্য আদালত হতে উহার মালিকানা অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তুমি উহার সঙ্গত মালিক হতে পার না। খোদার দরবারে উহা তোমর জন্য হারাম হয়ে রয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে নবী (স.) ঘোষণা করেছেন, "আমি একজন মানুষ বইতো কিছুই নই। তোমরা হয়তো কোনো মোকদ্দমা আমার সম্মুখে পেশ করবে, আর তোমাদের মধ্যে এই একটি পক্ষ অধিকতর চতুর ও বাকপটু এবং দার যুক্তিমূলক

৬০. আল-কুরআন,২:১৮৮

৬১. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব।

৬২. আল-কুরআন, ২:১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

কথাবার্তা শুনে হয়তো আমি তার পক্ষেই রায় দিতে পারে; কিন্তু এই কথা মনে রেখ যে, কোনো ভাইয়ের হক যদি এই ধরনের মোকদ্দমায় আমার ফয়সালার ভিত্তিতে হাসিল করে নাও, তবে তার ফলে দোযখের একটি খন্ডই তোমাদের হাসিল করা।[৬৩]ঘুষের সম্পদ হারাম ও অপবিত্র। পরিমাণে তা যতোই বেশি হেক এবং তার চাকচিক্য যতোই প্রবল হোক মুমিনদের দায়িত্ব হলো তাতে প্রভাবিত না হওয়া। তার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ না করা। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "বলুন মুহাম্মদ (স.) ! হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাদের বিস্মিত করে" ।[৬৪]কিয়ামতের দিন ঘুষ গ্রহীতার জন্যে লজ্জাজনক পরিণতি রয়েছে। তারা যে ঘুষ গ্রহণ করবে তা নিয়ে তাদেরকে কিয়ামতে দাঁড়াতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে। যদি গাধা গ্রহণ করে থাকে গাধা চিৎকার করতে থাকবে। যদি গাভী গ্রহণ করে থাকে গাভী চিৎকার করতে থাকবে।[৬৫]

আখিরাতে ঘুষখোর চিরকালীন ব্যর্থতা বরণ করে নিতে বাধ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার জন্যে জাহান্নামের অঙ্গীকার করেছেন। বলেছেন, "ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামী।[৬৬]এভাবে ঘুষ হারাম করে এবং ঘুষের জন্যে পৃথিবীতে অসম্মান ও পরকালের চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ঘুষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছে। তারপরও কেউ যদি ঘুষের লেনদেন করে তাহলে অপরাধের ধরন, প্রকৃতি ও ঘুষের পরিমাণ বিবেচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘুষখোরের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ করে, তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করেও ঘুষ বন্ধ করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ঘুষখোরের সাথে কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখবে না এবং নতুন করে কোনো আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধও হবে না; তাহলে সামাজিকভাবেই ঘুষ প্রতিহত হয়ে যাবে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে বরং এর উল্টো চিত্রই দেখা যায়। কন্যাপক্ষ বা কন্যা নিজে জানেন যে, একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা যে ক্যাডারগুলো বেশি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে যেখানে ঘুষের সুযোগ বেশি। ইসলাম ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা, শাস্তির ভয় এবং ধর্মীয় প্রকৃত আবেগ যথাযথভাবে জাগ্রত করা ছাড়া তাই এক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্ভব নয়।

ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে কিছু লোক আর্থিকভাবে লাভবান হয় সত্য। কিছু কিছু লোক আলাদীনের চেরাগ এই ঘুষের প্রভাবে হঠাৎ বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যায় এটাও সত্য। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত খবর সূত্রে জানা যায়, এই ঘুষের প্রভাবেই বাংলাদেশে গ্যাস-বিদ্যুতে-টেলিফোনের সাধারণ লাইনম্যান, মিটার রিটার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাজধানীতে প্রসাদসম একাধিক বাড়ির মালিক হয়েছেন। এসবই সত্য। কিন্তু এটি ঘুষের আর্থিক প্রভাবের একটি মাত্র দিক এবং অবশ্যই একটি প্রশংসার্হ বা গ্রহণীয় কোনো দিক নয়। অবশ্য ঘুষখোর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এটি ইতিবাচক দিকই বটে (!) ঘুষের ইতিবাচক (?) এই একটি দিক বাদ দিলে বাংলদেশে ঘুষের অসংখ্য নেতিবাচক ধ্বংশাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

প্রথমত মানুষ যে দায়িত্বে নিয়োজিত সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতা তার নিকট আল্লাহর আমানত। ঘুষ নিলে মানুষের

৬৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদদী, *তাফহীমূল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১৪৪

৬৪. আল-কুরআন, ৫:১০০

৬৫. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব।

৬৬. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল কোরআনে অর্থনীতি*, খ. ১, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। সে ঘুষ দেয়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেয়। এতে তাকে দায়িত্বশীলতার যে আমানত দেয়া হয়েছে তার খিয়ানত করা হয়। আবার যে ঘুষ দিয়ে চাকুরি বা অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব নেয় তারপক্ষেও ঠিকমতো কাজ করা সম্ভব হয় না। সে খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারীর মতো কাজ করে। ঘুষের দাপটে সবকিছুকে অধীনস্থ বা আওতাধীন ভেবে নিয়ে কাজ করে। তাছাড়া ঘুষ দিয়ে চাকুরি বা কাজ নেয়া হল বলে ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকে চাকুরি বা কাজটি থেকে প্রথমেই ঘুষের অর্থ তুলে নেয়া, তাপরা নিয়মতান্ত্রিক মুনাফা করা। ফলে সে যথাযথভাবে কাজটি করে না। আবার ঘুষদাতার এই অনিয়মের কথা জানার পরও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তিনি নিজে ঘুষ গ্রহণ করে কাজ দিয়েছেন বলে সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভম হয় না। ফলে দু' পক্ষই দায়িত্ব অবহেলা করে। তারা তাদের কাছে প্রদত্ত আমানত নিদারুণ অবহেলায় নষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত ঘুষ মানুষের অধিকার নষ্ট করে। ঘুষের মাধ্যমে মানুষ এমন কাজ করে বা এমন বিষয় লাভ করে স্বাভাবিকভাবে যা করার যোগ্যতা তার নেই বা যা পাওয়ার আরো বেশি যোগ্য লোক আছে। এর ফলে যোগ্য লোকদের অধিকার হরণ করা হয়। যেমন যে শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার মত মেধা রয়েছে ঘুষ না দেয়ার কারণে সে ভর্তি হতে পারছে না। যে লোকের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার ঘুষ না দেয়ার কারণে তাকে সেবা থেকে বঞ্চিত করা। যে লোকের দরকারি কাগজগুলো পাওয়া নিরাপত্তা লাভের অধিকার, ঘুষ না দেয়ার কারণে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। টেন্ডারে সবচেয়ে নিম্নতর দরদাতাকে কাজ না দেয়া অথবা পূর্বাহ্নেই সংশ্লিষ্ট ঘুষদাতাকে সর্বনিম্ন দর জানিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে যোগ্য দরদাতাকে বঞ্চিত করা। বস্তুত ঘুস লেনদেন একান্তভাবে যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ যে ব্যক্তি যোগ্য সে কখনো ঘুষ দিয়ে কোনোকিছু অর্জনের চেষ্টা করে না। সবসমসয় অযোগ্য লোকেই এ চেষ্টা করে। আর এভাবে তারা যখন সফল হয় তখন সাধারণভাবেই যোগ্য লোককে বঞ্চিত করা হয়।

তৃতীয়ত ঘুষের জন্যে কর্মকর্তা বা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ সাধারণ লোকদের অযথা হয়রানি করে। তারা ঘুষের জন্যে ফাইল আটকে রাখে। অসঙ্গত চাপ প্রয়োগ করে বা অন্যায় ভয় দেখায়। হয়রানি করা ছাড়া সাধাণত কেউ ঘুষের এই অন্যায় লেনদেন করে না। যে জন্য ঘুষখোর বক্তি সধারণ মানুষকে সবসময় হয়রানির মধ্যে রাখে। সহজ একটি কাজও সহজভাবে করে দেয় না। ঘুরিয়ে পেচিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করে যে, মানুষ ঘুষ দেয়াকেই বেশি নিরাপদ মনে করে। বাংলাদেশে ঘুষ দিয়ে কাজের বরাদ্দ নিতে হয় এমনকি বলি নিতেও ঘুষ দিতে হয়।

চতুর্থত ঘুষ বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি করে। ঘুষ নিয়ে ক্রুটিযুক্ত গাড়ি চলাচলের অনুমতি দিলে দুর্ঘটনা ঘটে। ভেজাল ও মানহীন পণ্য বাজারজাত করার অনুমতি দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। ঘুষ নিয়ে অযোগ্য লোককে চাকরি দিলে শিক্ষায়-প্রশাসনে অনিয়ম স্থায়ী রূপ পায়। সাধারণ বিবেক থেকেই বুঝা যায়, ভালো কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বা ভাো কোনো পণ্য বিপণনের জন্য ঘুষ দিতে হয় না। ঘুষ দিতে হয় খারাপ ও মানহীন পণ্য বা বিষয় প্রচলনের জন্য। তাই ঘুষ যখন এ সকল বিষয়ের প্রচলন অবাহত রাখবে তখন তা মানুষের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ না হয়ে পারবে না। সমুদ্র পরিবহণ অধিপ্তরের দেয়া তথ্যমতে প্রতিদিন নৌপথে সহস্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ চলাচল করছে।[৬৭] সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ লঞ্চগুলোকে সার্ভে সনদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে যা লাখ লাখ যাত্রীর জীবন সংহারের উন্মুক্ত ঘোষণাপত্র মাত্র।

---

৬৭. মোহাম্মদ আবু তালেব, নৌপথে সহস্রাধিক ঝুঁকিপূর্ণ লঞ্চ, ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত বাংলাদেশে ঘুষ সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঘুষ নিয়ে অপরাধী ও সন্ত্রাসীকে মুক্তি দিলে অপরাধ বেড়ে যায়। ঘুষ নিয়ে যা খুশি তা করতে দিলে বিত্তশালীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সমাজে মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করে অর্থ সম্পদের অন্যায় দাপট। ফলে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যাদের অর্থ আছে তারা আইন-শৃঙ্খলা, মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতাকে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতাপোষণ করে। কারণ ঘুষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কর্মকর্তাদের এমনকি রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের কিনে নেয়ার দৃষ্টান্তও বাংলাদেশে রয়েছে।

ষষ্ঠত ঘুষ নানা রকম সামাজিক অপরাধের মূল কারণ। ঘুষ গ্রহীতা প্রায় অনায়াসে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হয়। এ টাকা সে বেহিসেবী খরচ করে। মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অন্যান্য অশালীন কাজে লিপ্ত হয়। ঘুষ দিয়ে কোনো দায়িত্ব বা কাজ পেলে সেই কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করে না। তার প্রথম লক্ষ্য হয় ঘুষসহ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা। ফলে একদিকে যেমন বাড়ে অপচয় অন্যদিকে তেমনি অপরাধের মাত্রাও বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ঘুষ সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির মূল প্রেরণা। কষ্ট করে মানুষ যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে সে টাকা অন্যায় পথে ব্যয় করা যায় না। সে টাকায় মদ কিনে খাওয়া বা অশালীন কাজে ব্যয় করার মানসিকতা এখনো বাংলাদেশের মানুষের হয়নি। কেবল ঘুষ বা অন্যায় পথের টাকাই এ পথে ব্যয় হয়ে থাকে। এ পথের টাকাই ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো ধরনের হিসেবের ধার ধারে না। ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইচ্ছা মাফিক সম্পদ লেনদেন হয়। এতে ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা করা হয় না। যে বেশি ঘুষ দেয় তার অনুকূলে থাকে প্রশাসন। এভাবে মানুষ তার প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ঘুষের কারণে সাধারণ মানুষের সম্পদ অত্যন্ত অমানবিক ও অন্যায়ভাবে ঘুষখোর আত্মসাত করে। ঘুষে অন্যের অধিকার, সম্পদ আত্মসাতের দুটি ভয়ঙ্কর গুনাহ সংঘটিত হয়। তাছাড়া ঘুষের লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের জমি নিজের নামে, অন্যের শেয়ারে নিজের নামজারি করিয়ে নেয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ঘুষের মাধ্যমেই এসকল অপকর্ম হয়ে থাকে।[৬৮]

জুয়ার শাস্তির বিধান :

জুয়াকে আরবীতে 'মায়সির' ও 'কিমার' বলা হয়। বস্তুত মায়সির ও কিমার এমন খেলাকে বলা হয়, যা লাভ ও ক্ষতির মধ্য আবর্তিত থাকে। অর্থাৎ যার মধ্যে লাভ বা ক্ষতি কোনটাই স্পষ্ট নয়।'[৬৯]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয়েরই সম্ভবনা থাকে। ফলে এতে লাভ কিংবা লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকে।[৭০] যেমন দুই ব্যক্তি পরস্পর একে-অপরকে বাজি ধরে বলল, যদি তুমি দৌড়ে অগ্রগামী হতে পার, তাহলে তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। আর যদি আমি অগ্রগামী হই, তবে তুমি ্মাকে এক হাজার টাকা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে লাভ ও লোকসান অস্পষ্ট। জাহিলী আমলে নানা ধরনের জুয়ার প্রচলন ছিল।

বর্তমনকালে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার ক্ষেত্রে আরো বহু নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। যেমন হাউজী, টাকা বাজি রেখে ঘোড় দৌড় ও তাস খেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম। এক্ষেত্রে মনে

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৬৯. ফতুয়াতু শামী, খ. ৫, পৃ. ৩৩৫

৭০. আল-কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে হবে যে, শুধু নাম পরিবর্তনের কারণে বস্তুর হাকীকত (মূল প্রকৃতি) এবং হুকুম পরিবর্তণ হয় না। কাজেই প্রাচীনকালে প্রচলিত জুয়া সম্পর্কে যে হুকুম প্রযোজ্য ছিল, আধুনিককালের জুয়ার ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। জুয়া একটি বিশেষ ধরনের খেলা, যাতে অর্থ-সম্পদ বাজি রেখে খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহণ করেন। কুরআন মজীদে একে মায়সির বলা হয়েছে।[৭১] মায়সির অর্থ বণ্টন করা। জাহিলিয়া যুগে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে একপ্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বণ্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেতে ্বার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিদের উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো। তবে উটের গোশত কেউ ব্যবহার করতো না; গরিবের মধ্যে বণ্টন করা হতো। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দারিদ্রের উপকার ছিলো এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেতো, তাই এখেলাতে গর্ববোধ করা হতো। যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এ ধরনের জুয়া মায়সির নামে খ্যাত হয়।[৭২]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা.) এবং কাতাদাহ, মুআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রা.) বলেছেন: “সব রকমের জুয়াই মায়সির , এমনকি কাঠের গুটি ও আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।[৭৩] এ আলোকে দাবা, লুডু, তাস খেলাও মায়সিরের মধ্যে গণ্য যদি তাতে টাকা পয়সার বাজি ধরা হয়, এবং তখন এ খেলাগুলো হারাম বলে বিবেচেত হয়।[৭৪] ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, লটারিও জুয়ার অর্ন্তভূক্ত।[৭৫] যে কাজে লটারির ব্যবস্থা রয়েছে তাও মায়সিরের অর্ন্তভূক্ত।[৭৬] যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন শর্ত আরোপিত হয় যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে । এর ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় বজায় থাকবে।[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আর্বিভাব পূর্ব সময়ে আরবে জুয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল । ইসলাম গ্রহণের পর মুমিনগণ এ বিষয়ে ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানতে চান । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, মদ ও জুয়ার মধ্যে ভয়ানক পাপ আছে এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। তবে মদ ও জুয়ার উপকারের চেয়ে এগুলোর পাপ অধিকতর ভয়ানক।[৭৮] জুয়ায় একজন লাভবান হয়, বাকি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জুয়ার আয়োজকরা জয়ী জুয়াড়ির অর্থ ছিনিয়ে নিতে শক্তি প্রয়োগ করে। ভাড়া করা সন্ত্রাসী দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। জুয়াড়িদের কেউই যেনো জিততে না পারে সে জন্যে নানা রমক প্রতারণামূলক নীতি গ্রহণ করে। ফলে জুয়ার আয়োজক ও জুয়াড়িদের মধ্যে এবং জুয়াড়িদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, “শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা

৭১. আল-কুরআন, ৫:৯০, ২:২১৯

৭২. মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র.) , *পবিত্র কোরআনুল করীম*, পৃ.১১৭

৭৩. ইবনে কাছীর , *তাফসীর ইবনে কাছীর*, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, পবিত্র কোরআনুল করীম, পৃ.১১৭

৭৪. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) , *পবিত্র কোরআনুল করীম*, পৃ.১১৭

৭৫. আল-জাসসাস, *আহকামূল কুরআন*, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, *পবিত্র কোরআনুল করীম*, পৃ.১১৭

৭৬. রুহুল বয়ান, মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী উদ্ধৃত, *পবিত্র কোরআনুল করীম*, পৃ.১১৭

৭৭. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উদ্ধৃত, *পবিত্র কোরআনুল করীম*, পৃ.১১৭; শামী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫,

৭৮. আল-কুরআন, ২:২১৯

Dhaka University Institutional Repository

ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়।”[৭৯]

জুয়া খেলা জুয়াড়িকে দায়িত্বহীন করে তোলে। তার মধ্যে সবসময় জুয়ার নেশা সক্রিয় থাকে। নিজ পরিবার এবং পরিবারের লোকজন সম্পর্কে সে উদাসী থাকে। জুয়ার বিপুল অর্থ পাওয়ার লোভ ও লাভের অন্যায় বাসনা ব্যক্তিকে সকল বিষয় বিস্মৃত করে রাখে। ফলে সে ব্যক্তি ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব তার উপর দেয়া যায় না।[৮০] জুয়া জুয়াড়িদের মধ্যে তীব্র হাতাশা সৃষ্টি করে। জুয়াড়িরা বিশাল অংকের অর্থ লাভর জন্য জুয়ায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তারেদ বেশিরভাগের এ লক্ষ্য পূর্ণ হয় না। বারবার হেরে যায় তারা অর্থক দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি হয়। তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে, অনেকে তীব্র হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেকে নেশাগ্রস্থ হয়ে পরিবার ও সমাজের বোঝায় পরিণত হয়।[৮১] জুয়ায় লিপ্ত ব্যক্তিরা ইবাদতে অবহেলা প্রদর্শন করে। তারা নেশাগ্রস্থ মানুষের মতো জুয়া খেরে। কখন সালাতের ওয়াক্ত হয় তাদের খেয়াল থাকে না। জুয়ায় বিপুল ব্যয় করলেও হজের জন্য অর্থ ব্যয়ে তারা ভীষণ উদাসীন থাকে। দান-সদকাহ তারা করে না বললেই চলে। বরং যতো অর্থ সম্পদ লাভ করে তার অধিকাংশই জুয়ায় বিনিয়োগ করে। জুয়ার জন্য তারা আল্লাহর যিকর থেকে জুয়াড়িরা সম্পূর্ণ গাফিল থাকে। আল্লাহ বলেন, “শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা বিরত হবে?”[৮২]

দায়িত্বহীনতা ও নৈতিক স্খলনের জন্য জুয়াড়িদের কেউ পছন্দ করে না, ভালোবাসে না। পরিবারে ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। অলসতা, অপব্যয় ও হাতাশ মানসিকতার জন্য মানুষের চোখে তারা হেয় ও নিচ হয়ে পড়ে। সচেতন মানুষ জুয়াড়িদের সাথে কোনো রকমের আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক করতে চায় না। সমাজে সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, পির্যয় সৃষ্টির নেপথ্যে জুয়া ভূমিকা পালন করে। আয়োজকরা তাদের পরিকল্পনামতে অর্থ আত্মসাত করার জন্য সন্ত্রাসী লালন করে। আবার পরাজিত জুয়ারী মরিয়া হয়ে নানা রকমের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে। জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হলো, এতে জুয়াড়ি প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তার একমাত্র চিন্তা থাকে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। আধুনিক জুয়া অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ। এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েকজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুয়ে যায়।[৮৩] যা ইসলামে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। ইসলামী শরী’আতে জুয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। একাধিক আয়াত ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, “হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করে, তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা

৭৯. আল-কুরআন, ৫:৯১

৮০. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *জুয়া নৈতিকতা* (বিআইসি, ঢাকা-২০০১), পৃ.১৫

৮১. মওলানা শাখাওয়াতুল আম্বিয়া, *জুয়া ও সুদ প্রসঙ্গে আল-কুরআন : বিধান ও বাস্তবতা* (আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৮), পৃ.২৩

৮২. আল-কুরআন, ৫:৯১

৮৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *পবিত্র কুরআনুল কারীম*, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে ও নামায আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না" ।[৮৪]এ আয়াতে মদ ও জুয়াকে ঘৃণ্য বস্তু আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। মদ ও জুয়াকে একই পর্যায়ভুক্ত করে মূর্তিপূজার সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতে এগুলো থেকে দূরে থাকার হুকুম করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, এতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু এর দ্বারা শয়তান মানুষকে সালাত আদায় করা এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে। কাজেই মদের ন্যায় জুয়াও হারাম। এর হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন মাজীদের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যদি কেউ এ হুমুককে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।[৮৫]এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "কেউ যদি তার সাথীকে বলে, এসো, জুয়া খেলব। (এ কথার অপরাধের কারণে) সাদকাহ করা তার উপর অপরিহার্য।"[৮৬]অতএব, জুয়াকে অর্থ উপার্জনের উপয় হিসেবে গ্রহণ করা যেমন কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই, তেমনি একে কেলা, মনের সান্তনা, তৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়রূপে গ্রহণ করাও বৈধ হতে পারে না।

বাংলাদেশে সামাজিকভাবে এবং নৈতিক দিক থেকে জুয়াকে এখন পর্যন্ত ঘৃন্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও এখানে জুয়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। বিষয়টি অনেকটাই 'ওপেন সিক্রেট'। বাংলাদেশে পেশাদার জুয়াড়ির সংখ্যা কম হলেও আয়োজক পেশাদারের সংখ্যা কম নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন অভিজাত হোটেল ও বারে অনুমোদিত ও অননুমোদিত জুয়ার প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের প্রায় সর্বত্র জুয়া আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত অসংখ্য খবর দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৮৭] রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ঘাটের কুলি এবং এ জাতীয় নিম্নবিত্তের লোকদের মধ্যেও জুয়ার প্রচলন দেখা যায়। এদের পাশাপশি রয়েছে সৌখিন শ্রেণীর জুয়াড়ি। তারা বাজি ধরে তাস বা অন্যান্য খেলার মাধ্যমে জুয়া খেলে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেন। জুয়া প্রতিরোধে এ হারাম ঘোষণাই ইসলামের প্রধান ব্যবস্থা। জুয়াকে হারাম ঘোষণর পর কোনো মুসলিমের আর এ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না। কারণ এ নিয়ম মেনেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বিধান দিয়ে নৈতিক নীতিমালার আওতায় ইসলাম জুয়ার মতো একটি সামাজিক সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমাজে এমন লোকও থাকতে পারে ঈমানের এ দাবি উপেক্ষা করে যারা জুয়ায় লিপ্ত হতে পারে। তাদের জন্য ইসলাম হারাম ঘোষণাকেই এ সমস্যা নিসরনের উপায় হিসেবে যথেষ্ট মনে করেনি। এজন্য ইসলাম জুয়াকে শুধু হারাম ঘোষণা করেই তার দায়িত্ব শেষ করেনি, বরং জুয়া প্রতিরোধের জন্যে জুয়া সংশ্লিষ্ট সকল অন্যায় কাজও হারাম ঘোষণা করেছে। মানুষের সাথে ঝগড়া বিবাদ ও শত্রুতা পোষণকে নিষিদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে কারো অধিকার হরণ, অন্যায়ভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ, সমাজে অপরাধ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকে হারাম এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। এরপরও কেউ যদি জুয়ায় লিপ্ত হয় তাহলে ইসলাম তার জন্যে পার্থিব শাস্তি প্রয়োগের বিধান দিয়েছে। এমন ব্যক্তিকে জনসমক্ষে চল্লিশটি বেত্রাঘাত

৮৪. আল- করআন, ৫ : ৯

৮৫. আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাবী, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, পৃ. ২৯৫

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. যুগান্তর ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯; সংবাদ ৯ জানুয়ারী ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে। আর ইসলামি রাষ্ট্র কোনোভাবেই জুয়ার আসর চলতে দেবে না। এ আসর উচ্ছেদ করবে এবং আয়োজকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরভাবে জুয়ার শাস্তি প্রয়োগ করবে। কারণ জুয়া শুধু আর্থিক অনাচারই নয়, বরং চরিত্র বিনাশী আচরণও বটে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম এবং এখনো সামাজিকভাবে প্রায় সকলে এবং নৈতিকভাবে অধিকাংশই জুয়াকে সমর্থন করেন না বলেই ইসলামের এই রীতি ও বিধান কার্যকর এবং নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া সম্ভবন না হলে পারিবারিক বা সামাজিকভাবেও এ বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব, যাতে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নিশ্চিত হবে। জুয়া খেলায় বহু নেতিবাচক ও খারাপদিক রয়েছে তা নিম্মে আলোচনা করা হল-

প্রথমত জুয়ার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়বিধি সম্ভাবনা থাকে। এতে বিজয়ী ব্যক্তির কেবল লাভই লাভ। আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। এ খেলয় পরাজিত ব্যক্তির মাল বিজয়ীর হাতে চলে যায়। এতে যে ব্যক্তি লাভবান হয় সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে ক্রমেই রক্তপিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। জয়লাভকারী ব্যক্তি রাতারাতি টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। আর পরাজিত ব্যক্তি দিন দিন সম্পদ হারা হতে তাকে। জুয়ারী ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা না থাকলে সে সম্পদ বিক্রি করে প্রয়োজনে ঘরের মালপত্র এমনকি ঘর বিক্রি করেও এ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তাতেও সম্ভব না হলে চুরি, ডাকাতি করে হলেও খেলয় অংশগ্রহণের সবচেয়ে বেশি। মোটকথা, এই খেলায় যেমন অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, তেমনি এতে মানুষের চারিত্রিক ক্ষতিও রয়েছে চরমভাবে।

দ্বিতীয়ত জুয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে উপার্জনের ব্যাপারে অলস, উদাসীন ও নিস্পৃহ হয়ে যায়। তার একমাত্র চিন্তা থকে বসে বসে বাজির মাধ্যমে অন্যের মাল হাতিয়ে নেওয়া, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন না হয়। এমনি করে অলস হয়ে তার দেশ ও দশের উন্নয়নে আর কোন অবদান রাখতে পারে না।

তৃতীয়ত জুয়ার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে জুয়া ও মদের মত পরস্পরের মধ্যে ফাসাদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। কেননা পরাজিত ব্যক্তি স্বাভবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জুয়র জয়-পরাজয় এক পর্যায়ে মারামারি এমনকি হত্যাকান্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

চতুর্থত জুয়ারী ব্যক্তি জুয়ার নেশায় মদখোর ব্যক্তির ন্যায় মাতাল অবস্থায়ই থাকে সর্বদা। এ কারণে সে ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও আত্মীয় কারের খবর রাখতে পারে না। ফলে জুয়াড়ী ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সুন্দরভাবে গড়ে তোলতে পারে না, ছেলেমেয়েদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত বানাতে পারে না। বরং তারাও পিতার দেখাদেখি ঐ সর্বনাশা খেলায় অংশগ্রহণের প্রয়াস পায়। এমনি করেই জুয়াড়ী ব্যক্তির পরিবার ধবংস হয়ে যায়। জুয়াড়ী ব্যক্তির মেজাজে সর্বদা রুক্ষতা ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান থাকে। লাভবান ব্যক্তি আরে লাভের নেশায় মাতাল হয়ে উঠে। আর পরাজিত ব্যক্তি প্রতিশোধের নেশায় উম্মাদ হয়ে উঠে। তাই স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সাথে তার বিবদ, ঝগড়া ও অশান্তি সর্বদা লেগেই থাকে। সবর্তমানে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, এ জাতীয় লোমহর্ষক ঘটনার পেছনে জুয়ার প্রভাবকে খাটো করে দেখা যায় না।

পঞ্চমত জুয়ার সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতির দিকটি হলো, এ খেলায় মানুষ আল্লাহ্ বিমুখ এবং নামায, রোজা তথা ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন ও গাফিল হয়ে যায়। কেননা জুয়ারী ব্যক্তির একমাত্র ধ্যান-ধারণা, কেমন করে আরো টাকা হাসিল করা যায় অথবা কেমন করে পরাজয়েলর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কাজেই জুয়ার এ সর্বনাশ গ্রাস থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

লটারির শাস্তির বিধান :

লটারিও একপ্রকার জুয়া। কাজেই লটারিকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং একে জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে জায়িয মনে করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। যারা লটারি ব্যবস্থাপনা করে থাকে, তাদেরকে এ সম্বন্ধে শরী'আতের বিধান শুনানো হলে তারা বলে, এতে ক্ষতি কি? এতে তো মানুষের বহু উপকার রয়েছে। তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কোন বস্তুতে সাময়িক কিছু উপকার আছে বলেই তা হালাল হতে পারে না। কেননা, যে বস্তুতে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোন অবস্থতেই প্রকৃত উপকারী বস্তু স্বীকার করে নেওয়া যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সামগ্রিকতার বিচারে এগুলোকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় অপকার বেশি, শরীআত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা এমনকি জিনিস আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই। উপকার আছে বলেই এগুলোকে কেউ জায়িয মনে করে না। লটারির বিষয়টিও ঠিক তদ্রুপ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এতে কিছুটা উপকার আছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে জুয়া এবং ধোঁকা। কাজেই শরীআতের দৃষ্টিতে লটারিও হারাম। স্মর্তব্য, কোন মহৎ কাজের জন্য অবৈধ অবলম্বন করা কোনভাবেই বৈধ নয়। বস্তুত জনকল্যাণের ধোঁয়া তুলে যারা এসব লটারির ব্যবস্থা করে থাকে, মূলত জনসেবার পরিবর্তে আত্মসেবাই তাদের সামনে থাকে মুখ্য সুন্দর চাকচিক্যময় লেভেল লাগিয়ে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়াই তাদের লক্ষ্য। মুসলমান হিসেবে এসব প্রতারকদের থেকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত এবং যারা এসব ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির মুখামুখী করলে কেউ আর এ অপরাধে লিপ্ত হবে না।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণের বিধান :

প্রজাতন্ত্রের সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দেশের সেবক। তারা এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে চাকরি করে নির্ধারিত বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এসব পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারি অবৈধভাবে উপহারের নামে ঘুষ গ্রহন করে থাকেন। যা আজ একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অফিস-আদালতের এমন কোন স্থান নেই যে, উপহার নামের ঘুষ ছাড়া কোন কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দিতে হয় এ ধরনের উপহার। বেতনভোগী কর্মচারী নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ করা ইসলামি শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বস্তুত এ ধরনের উপহার গ্রহণের মধ্যে হককে বাতিল কিংবা কোন অসৎদুদ্দেশ্য হাসিলের আশংকা রয়েছে। আমাদের দেশে উপহার গ্রহনের নামে ঘুষ গ্রহনের জন্য ফাইল আটক করে রাখা হয়। এসব কাজের জন্য যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে চাকরিচ্যূতি সহ জেল-জরিমানা প্রদান করা হয়, তাহলে এ উপহার গ্রহন করা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। এটা বন্ধ না হওয়ার কারণ হল এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হয় না এবং যারা শাস্তি প্রদান করবেন তারাও অনেক ক্ষেত্রে উপহার গ্রহনের নামে ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন। আবূ হুমায়দ সাঈদা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) আযদ গোত্রের ইব্ন লাতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করে কোথাও পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া তথা উপহার হিসেবে দান করা হয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবা দিয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আম্মা বাদু' আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেসব বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করেছেন, এর কোন একটির ব্যাপারে আমি তোমাদের কাউকে কর্মকর্তা নিয়োগ করি।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর সে এসে বলল, এগুলো আপনাদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের। আর এগুলো আমাকে দেওয়া উপহার। সে তার বাপের ঘরে অথবা মায়ের ঘরে বসে দেখে না কেন, তাকে উপহার দেওয়া হয় কিনা? আল্লাহর শপথ! কেউ যদি অন্যায়ভাবে যাকাতের কোন মাল নিয়ে যায়, তবে সে তা কাঁদে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে।[৮৮]উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা বোঝা যায় যে, বেতনভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উপহার গ্রহণ করা জায়িয নেই। কেননা এর পেছনে কোন অসৎদুদ্দেশ্য থাকাটা স্বাভাবিক।[৮৮] কোন কর্মকর্তাকে উপহার প্রদান করা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি অন্যের অধিকার খর্ব করে অপরজনকে অবৈধ সুবিধা প্রদান করছেন। তা না হলে উপহার প্রদান করার প্রশ্নই আসতে পারে না। একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে তার টেবিলে যে কাজ আসবে তা সম্পাদন করা তার দায়িত্ব। তিনি যদি তা সম্পাদন না করেন উপহার নামের ঘুষের জন্য ফাইল আটক করে রাখেন তাহলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসার বিধান :

হালাল উপায়ে উপার্জন করা ফরয এবং হারাম ও অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা উপার্জন করা হারাম। অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে অর্থ সম্পদ হাসিল করা হয়, তা ভক্ষণ করে নামায-রোযা আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তার দু'আও কবুল হয় না। সর্বোপরি উপরোক্ত ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে, সাদাকা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। (অর্থাৎ হারাম মালের সাদাকা কারো পাপ মোচনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়না)। কিন্তু তিনি মন্দকে সৎ কর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে মেটাতে পারে না।"[৮৯]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।" আহারের ব্যাপারে তিনি নবী রাসূলগণকে যেরূপ হুকুম করেছেন, মু'মিনদেরকেও অনুরূপ হুকুম করেছেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।"[৯০] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দান করেছি তা থেকে আহার কর।"[৯১]একখানা হাদীসের শেষাংশে তিনি জনৈক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে উসকু-খুসকু অবস্থায় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিতপালিত। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবুল হবে।[৯২]

---

৮৮. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ১২৮

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৯০. আল-কুরআন, ২৩:৫১

৯১. আল-কুরআন, ২:১৭২

৯২. *মিশকাতুল মাসাবিহ*, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

অন্য হাদীসে আছে, "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত-পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না। বরং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা"।[৯৩]এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য জায়িয নেই। যারা অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হত তাহলে সে আর অবৈধ ব্যবসা করত না এবং তার দেখা অন্যান্যরাও নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে সঠিক পন্থায় ব্যবসা করত। আমাদের দেশে এ অবৈধ ব্যবসায়ীদের শাস্তি হয় না বিধায় অবৈধ ব্যবসার প্রসার লাভ করেছে।

অপসংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান :

সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ 'সাকাফাহ' এর অর্থ সফল হওয়া, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পাওয়া। আর ইংজেীতে 'কালচার' এর অর্থ কর্ষণ করা। পরিভাষায় বেমানান বিষয়াদি পরিহার করে মার্জিত ও রুচিসম্মত জীবন যাপন করার নাম ইসলামি সংস্কৃতি। অপরপক্ষে যা মানুষের ঈমান-আকিদা,বিশ্বাস,নিয়ম-নীতি,প্রথা ও নৈতিকতার সাথে বেমানান এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থি তাই অপসংস্কৃতি। যা অসভ্য, অভদ্র, অসজ্জিত, অনন্দিত জীবনকে বুঝায়। আর এ অপসংস্কৃতি যেমন গান-বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, নৃত্য, সার্কাস ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা ইসলামে জায়িয নেই। এ মাধ্যমে উপার্জন আসলেও তার আমল নামায় আসছে অসংখ্য গুনাহ, যা তার দুনিয়ার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরকালীন জীবনকে ধ্বংশ করছে। কেননা এ মাধ্যম ছাড়াও আরো অনেক মাধ্যম আছে যে মাধ্যমে হালাল ও বৈধ উপার্জন করা যায় এবং ঈমান ও আমল রক্ষা করা যায়।

হযরত সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আমর ইবন কুররা হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আশ্চর্য রকমের হতভাগা করে সৃষ্টি করেছেন। সকল দিক থেকেই আমার পথ বন্ধ। এমনটি মাত্র রাস্তাই আমার জন্য খোলা, যার মধ্যমে আমি জীবিকার্জন করে থাকি। আমি দফ বাজিয়ে গান করে থাকি। বিনিময়ে যা পাই এ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দয়া করে আমাকে গান-বাজনার অনুমতি দানে বাধিত করুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছো। আমি এর জন্য তোমাকে কখনো দিব না। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য জীবিকার্জনের বহু পথ খোলা রেখেছেন। যেমন খোলা রেখেছেন আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য জীবের জন্য। অবশ্য তুমি হালাল রুজির পরিবর্তে হারাম রুজির পথ বেছে নিয়েছো। আমার মজলিশ থেকে চলে যাও। আল্লাহর নিকট তোমার কৃতকর্মের জন্য তাওবা কর এবং ভবিষতের জন্য সতর্ক হও। তুমি যদি অনুরূপ কাজে লিপ্ত হও, তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। তোমাকে প্রহার করবো। তোমার মাথার চুল ন্যাড়া করে দিব, তোমাকে এ শহর থেকে বের করে দিব এবং তোমার ধন-সম্পদ মদীনার যুবকদের জন্য লুট করে নেওয়া হালাল করে দিব। এরপর আমর ইব্‌ন কুররা লজ্জিত ও ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্‌ জানেন তখন তার অবস্থা কি হয়েছিল? সে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এরা হচ্ছে নাফরমান। এদের থেকে কেউ যদি তাওবা ছাড়া মারা যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নৃপংসক ও উলঙ্গ অবস্থায় হাশর করবেন। যখন তারা দুনিয়াতে ছিল। এমনকি অন্যান্য লোকের থেকে পর্দা করার জন্য আচলটুকু পর্যন্ত তাদের থাকবে না। যখনই উঠে দাঁড়াবে, আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।"[২২৬]উপরোক্ত হাদীসে গান-বাজনাকে জীবিকার্জনের মাধ্যম বলে জ্ঞান

৯৩. প্রাগুক্ত

৯৪. ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, পৃ. ১০৭

করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ্ । কেননা এতে অর্থনৈতিক জীবন ধবংস হয় এবং সাধারণভাবে চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞাতবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। ওরা তখনই, যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি"।[৯৫]

মুদ্রা জাল করার বিধান :

মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অর্থ বা মুদ্রার। এ মুদ্রা না হলে স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত হয়। কেননা কারো কাছে মুদ্রা আছে খাদ্য নেই, আবার কারো কাছে খাদ্য আছে, মুদ্রা নেই। তাই উভয়ের মধ্যে বিনিময়ের জন্য দরকার হচ্ছে মুদ্রা। এ মুদ্রা বা অর্থের জন্য মানুষ কিনা করে। এ জন্য অনেকে খুন-খারাবি থেকে শুরু করে সকল অন্যায় অপরাধ করে থাকে। যে কোন উপায়ে তাকে এ মুদ্রা অর্জন করতে হবে। অনেকে বৈধ পন্থায় কষ্ট করে সম্পদ উপার্জন করে। আবার কেউ রাতারাতি বড় লোক হওয়ার নেশায় অবৈধ পথ অবলম্বন করে। তাই ঈদ ও পূজাকে সামনে রেখে মুদ্রা জালকারী চক্র কোটি কোটি টাকা বাজারে ছেড়ে দেয় আর হাতিয়ে নেয় আসল মুদ্রা। এ জন্য তারা ব্যবহার করে বিশাল নেট ওয়ার্ক। জাল মুদ্রা তৈরী কারকদের কাছ থেকে কম দামে জাল মুদ্রা ক্রয় করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছে। এতে একজন গরীব মানুষ একটি ছাগল বিক্রি করে খাদ্য ক্রয় করবে। ক্রয়কারীরা কৌশলে বিক্রেতাকে জালমুদ্রা প্রদান করে, বিক্রেতা তা বুঝতে পারেনি। বিক্রেতা সে জালমুদ্রায় নিয়ে খাদ্য ক্রয় করতে গিয়ে ক্রয় করতে পারবে না। ফলে তার পরিবার পরিজন ক্ষুধায় ধুকে ধুকে মরবে এটাই স্বাভাবিক। যদিও আমরা প্রায়ই বিভিন্ন প্রিন্টও ইলেট্রনিক মিডিয়ায় দেখতে পাই যে, বিভিন্ন মুদ্রা জালকারী চক্র তাদের কারখানার মেশিনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। ধরার কয়েকদিন পর তারা বের হয়ে এসে আবার তাদের পুরানো কাজ শুরু করে দেয়। এর প্রধান কারণ হল আমাদের দেশীয় আইনে যে শাস্তি প্রদান করা তা পর্যাপ্ত ও দৃষ্টান্তমূলক নয়। যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হত তাহলে কেহ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস পেত না। আর আমাদের দেশের দেশীয় আইনের দূর্বলতার সুযোগে এ প্রতারক চক্র কত অসহায় মানুষকে নিঃস্ব ও অসহায় করে দিচ্ছে তার কোন সীমা নেই।

ইসলামে মুদ্রা জাল করা কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এটা একটি সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সামাজিক অর্থনৈতিক বিনাশ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টার সমপর্যায়ভূক্ত অপরাধ। কেননা এজন্য দেশে অর্থনৈতিক মন্দা এবং সরকার বিরোধী মনোভাব ও আন্দোলন গড়ে উঠে। এ জন্য সরকারকে জাল মুদ্রা তৈরী করার বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে এবং এসব অপরাধীদেরকে কঠোর হস্তে দমন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। এই কারণে যে কোন প্রকার মুদ্রা চূর্ণ বা নষ্ট ও জাল করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) "মুসলমানদের জাতীয় মুদ্রা চূর্ণ (বা নষ্ট) করতে নিষেধ করেছেন"।[৯৬] এ হাদিস থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, মুদ্রা চূর্ণ করাও মুদ্রা জাল করা এক ধরনের সমাজ ও মানবতা বিরোধী অপরাধ। কেননা এতে মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত "জাল টাকার ৭০ গ্রুপ মাঠে" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এতে আশংকা করা হয়েছে, ঈদে ৫০ হাজার কোটি টাকা বাজারে আসতে পারে। এসব চক্রের সদস্যরা গোয়েন্দা নজরদারির বাইরে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। জালনোট সহ গ্রেফতার করা

৯৫. আল-কুরআন, ৩১ : ৬

৯৬. -نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين . (সুলাইমান আবু দাউদ, *আস-সুনান*)

Dhaka University Institutional Repository

চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ থাকলেও এ ক্ষেত্রে জোরালো কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে হতাশা প্রকাশ করেছেন অপরাধ বিশেষজ্ঞরা। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দাবি, গ্রেফতারের কিছু দিনের মধ্যেই জাল নোট প্রস্তুতকারী এবং বিপণনকারীরা জামিনে বেরিয়ে আসার কারণে তাদের মধ্যে ভীতি কাজ করছে না। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাল টাকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বাহিনীর কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিংয়ের বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে আইনের সংশোধন যেতে পারে। একই সঙ্গে এসব মামলা পরিচালনার জন্য পৃথক আদালতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আদালত সূত্র জানায়, বিচ্ছিন্নভাবে যেসব জাল নোট উদ্ধার করা হয় এবং ওই সব মামলায় যাদের সাক্ষী করা হয় তারা নিয়মিত সাক্ষী দিতে আসেন না। ফলে মামলাগুলো নিষ্পত্তি হয় না। আর যেগুলোর নিষ্পত্তি হয় সেগুলোর সাজা হয় না। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বরাবরের মতোই এবারও জাল টাকার ব্যবসায়ীদের মূল নজর হলো পশুর হাট এবং বিপণিবিতানগুলো। ৫০টি গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তারাও রয়েছেন। এসব ব্যাংক কর্মকর্তারা সময় সুযোগ বুঝেই তারা ৫শ' ও এক হাজার টাকার বান্ডিলে দুই থেকে চারটি জাল টাকা দিয়ে দেন। এসব ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানোর পর তা জাল নোট বলে সনাক্ত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর দায় না নিয়ে উল্টো গ্রাহককে হয়রানী করেন। এর ভয়ে অনেকে অভিযোগ দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখছেন। তবে ভয়ঙ্কর এসব প্রতারনামূলক কাজে জড়িয়ে গ্রেফতার হওয়ার পরও তারা জামিনে বেরিয়ে আসছে। সবচেয়ে আঁতকে ওঠার মত বিষয়টি হচ্ছে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরান টাকার ওপর ছাপ বসানো হয়, যা জাল টাকা শনাক্তকারী মেশিন ধরতে পারে না। অনেক গোয়েন্দা কর্মকর্তারাও জাল নিয়ে গোলক ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া তথ্যে দেখা গেছে, ব্যাংক কাউন্টার, নোট পরীক্ষণ হলভল্ট পরিদর্শনে এক হাজার টাকার নোটই জাল বলে ধরা পড়ছে বেশী। ২০১১ সালে ২১৩টি ১০০ টাকার নোট, ৪৭টি ৫০০ টাকার নোট ও ২৩২টি এক হাজার টাকার জাল নোট ধরা পড়ে। ২০১২ সালে ১০৩টি ১০০ টাকার নোট,৩৪টি ৫০০ টাকার নোট ও ৪০টি এক হাজার জাল নোট ধরা পড়ে। ২০১৩ সালে ৩টি ১০০ টাকার নোট, ৩৩টি ৫০০ টাকার নোট ও ৫১টি এক হাজার জাল নোট বলে ধরা পড়ে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জাল টাকা উদ্ধারের পর এ নিয়ে করা মামলার খুবই নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১১ সালে ৫৯১টি মামলা হলেও নিষ্পত্তি হয় মাত্র ৭৭টি। এ সময় ৬হাজার ৪৪২টি ১০০ টাকার নোট, ২ হাজার ৪৭৪টি ৫০০টাকার নোট ও ২ হাজার ৬৪০টিএক হাজার টাকার ধরা পড়ে। ২০১২ সালে ৪৪৬টি মামলা হলেও নিষ্পত্তি হয় ৮২টি। এ সময় ধরা পড়ে ১০০ টাকার নোট দুই হাজার ৪৭১টি, ৫০০ টাকার নোট এক হাজার ৬৬৬টি ও এক হাজার টাকার নোট ৭ হাজার ২৫৯টি। ২০১৩ সালে ৩১১টি মামলা হয় কিন্তু নিষ্পত্তি হয় ৯০টি। এ সময় এক হাজার ৪৫১টি ১০০ টাকার নোট, দুই হাজার ৪৬টি ৫০০ টাকার নোট ও ৪ হাজার ৭৪৮টি এক হাজার জাল নোট ধরা পড়ে।[৯৭]

মজুতদারীর শাস্তির বিধান :

অসাধু ব্যক্তিরা মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজীয় খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রেখে অস্বাভাবিকভাবে মুনাফা হাসিল করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'ইহতিকার' বা মুজতদারী বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর

৯৭. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, শনিবার , ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১১,১২

Dhaka University Institutional Repository

মতে, "যেসব জিনিস আটকিয়ে বা মজুত রাখলে সর্বসাধারণের কষ্ট ও ক্ষতি হয়, তাকে ইহতিকার বা মজুতদারী বলে।"[৯৮] অস্বাভাবিকভাবে অধিক মুনাফা লুটবার লোভে ব্যবসায়ীগণ সাধারণ সুলভ পণ্য বিপুল পরিমাণে খরিদ করে সঞ্চয় করে রাখে। ফলে বাজারে দুস্প্রাপ্যতার দরুন ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য তীব্র গতিতে ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। ইহার পরিণামে তা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার সীমার বাহিরে চলে যায় এবং দেশে হাহাকার পড়ে যায়। হয়তবা অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে মানুষের মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ার উপক্রম হয়। তখন মুনাফা শিকারীদল নিজেদের ইচ্ছামত দর নির্ধারণ করে এবং পশ্চাৎদ্বার হতে বিক্রয় করতে শুরু করে। আর কোন প্রকার ভয় না করে। আর কোন প্রকার ভয় না থাকিলে প্রকাশ্য ভাবেই এই অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। ফলে জনগণের পক্ষে এরূপ পণ্য সংগ্রহ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়। আর সংগ্রহ করা গেলেও সেজন্য অস্বাভাবিক মূল্য দিয়ে জনগণকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। ইসলামী অর্থনীতি এই ধরনের hoarding আদৌ সমর্থন করে না।

মজুতদারীর ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষুন্ন হয়, এজন্য ইসলামী শরী'আতে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) মজুতদারকে পাপী ও অভিশপ্ত বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।"[৯৯] অপর এক হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখে, সে ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট" ।[১০০]

তিনি আরো বলেন, "মজুতদার ব্যক্তি খুবই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। যদি জিনিসপত্রের দর হ্রাস পায়, তবে তারা চিন্হিত হয়ে পড়ে। আর যদি দর বেড়ে যায়, তবে আনন্দিত হয়।"[১০১]অতএব যে সব উপায়ে অবাধ ক্রয়- বিক্রয় ও ধন বিনিময় ব্যাহত হয়, ক্ষুণ্ন হয়, ইসলামী অর্থনীতিতে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্যবসায়ীগণ যদি পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মুনাফা লুটবার চেষ্টা করে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র সে ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য এবং তাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখার এবং আটককৃত খাদ্য পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার কর্তব্য।

তিনি আরো বলেন, কেউ যদি মুসলমানদের থেকে নিজেদের খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে (মজুতদারী করে), তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর মহামারী ও দারিদ্রতা চাপিয়ে দেন।[১০২] আল্লামা শামী (র.) বলেন, দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যদি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বিচারক বা আদালত মজুতদারকে খাদ্যশস্য বিক্রি করে দেওয়ার জন্য আদেশ জারী করেন। মজুতদার যদি হুকুম তামিল না করে, তবে বিচারক তার খোরাকী বাবদ খাদ্যশস্য রেখে বাকীগুলো বিক্রি করে দিবে। যদি সাধারণ মানুষের মধ্য খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার মত টাকা-পয়সা না থাকে, তবে বিচারক ক্রমশ তা বণ্টন করে দিবে। পরে তাদের হাতে খাদ্যশস্য আসলে আদালত তাদের নিকট থেকে তা উসূল করে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। নিজস্ব জমির খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অবশ্য কেউ যদি নিজের জমির ফসল হতে নিজের ও পরিবারের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে রাখে, তবে তাকে কোন দোষ

৯৮. *মিশকাতুল মাসাবিহ*, পৃ.২৫০

৯৯. প্রাগুক্ত

১০০. প্রাগুক্ত

১০১. প্রাগুক্ত

১০২. *আল-হিদায়া*, খ. ৪, পৃ. ৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নেই।"[১০৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী নিঃসন্দেহে অপরাধী"[১০৪] "অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্যপণ্য আটক করে রাখতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন"।[১০৫] হযযত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি অতিরিক্ত চড়া দামের আশায় চল্লিশ দিন যাবত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে আটক রাখবে, আল্লাহ্র সঙ্গে তার এবং তার সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে"।[১০৬]

হযরত আবূ আমামা রাসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,"যে লোক চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যপণ্য আটক করে রাখে অতঃপর যদি তা সম্পূর্ণ দানও করে দেয়, তবুও তার এই আটক করে রাখার গুনাহার প্রায়শ্চিত্ত হবে না"।[১০৭] অতএব অত্যধিক মুনাফা লুটবার আশায় খাদ্যপণ্য আটক করে রাখা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ হারাম। খাদ্যদ্রব্য আটক করে যারা অত্যধিক মুনাফা লুটতে চায় তাদের মনস্তত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স. ইরশাদ করেছেন, "খাদ্য শস্য আটককারী ব্যক্তির মনোবৃত্তি অত্যন্ত বীভৎস ও কুটিল। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে আর তা বৃদ্ধি পেলে তারা আনন্দে মেতে উঠে"।[১০৮]

অতএব যে সব উপায়ে অবাধ ক্রয়- বিক্রয় ও ধন বিনিময় ব্যাহত হয়, ক্ষুন্ন হয়, ইসলামি অর্থনীতিতে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্যবসায়ীগণ যদি পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে তখন ইসলামি রাষ্ট্র সে ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য এবং তাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখার এবং আটককৃত খাদ্যদ্রব্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার কর্তব্য।[১০৯]

পণ্য মওজুদকরণ পর্যায়ে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, যদি কোন লোক নিজের ও পরিবারবর্গের সম্বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য খাদ্য ফসল সঞ্চয় করে রাখে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না। ইমাম নববী লিখেছেন, আলোচ্য হাদীস হতে সম্বাৎসরিক খাদ্য এবং পরিবারের লোকজনের খোরাকী জমা করে রাখা সাধারণ অবস্থায় জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। বস্তুত মানুষ তার নিজের জমি-ক্ষেত হতে যে ফসল লাভ করে তা হতে প্রয়োজন পরিমাণ সঞ্চয় করে রাখা জায়েয-এ বিষয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ একমত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্য এভাবে সম্বাৎসরিক খাদ্য সংগ্রহ করে রাখা হত।

ইহার পর তিনি লিখেছেন, 'যদি কেহ বাজার হতে খাদ্য ক্রয় করে পরিবারবর্গের সম্বাৎসরিক খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে চায়, তবে ব্যাপারটি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। সেই সময় যদি দেশের খাদ্য সংকট অবস্থা বিরাজ করে, তবে তা জায়েয হবে না। এইরূপ অবস্থায় যদি কিছু দিন বা এক মাস কালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা হয়, আর তার দরুন যদি সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ার আশংকা না হয় তবে তা জায়েয হবে। আর প্রাচুর্যকালে এক বৎসর কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য খাদ্য খরিদ করে রাখা ও জায়েয

---

১০৩. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০৪. من احتكر فهو خاطى (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*)

১০৫. نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلعم) ان يحتكر الطعام - (বায়হাকী)

১০৬ من حتكر طعام اربعين ليلة فقد برى من الله وبرى منه (আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*)

১০৭. من احتكر طعاما اربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة (রাজিন)

১০৮. بئس العبد المحتكر ان ارخص الله الاسعا رحزن وان غغلها فرح - (মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ আল- মুসলিম*)

১০৯ আল্লামা ইমাম নববী, তাহফাতুল আহওয়াজী, খ. ৫, পৃ. ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

হবে।[১১০]পরন্তু ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ষড়যন্ত্র বা কোন প্রকার কুটিল কারসাজীর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার সীমা লংঘন করলে ইসলামী রাষ্ট্র দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিবে। কিন্তু সাধারণ কোন জরুরী কারণ ব্যতীত- দ্রব্য মূল্য নির্ধারণের অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের নেই। অতএব নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে ইহার দাম বেঁধে দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর- জীবদ্দশায় একবার অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে অনুরোধ করলে তিনি বলেছেন -

"খাদ্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনিই ইহার মূল্য হ্রাস করেন। কারণ জরুরী মালিক তিনিই, ইহার মূল্য তিনিই নির্ধারণ করেন এবং আমি আল্লাহর সাথে এভাবে সাক্ষাৎ করতে আশা পোষণ করি যে, তোমাদের কারো রক্তপাত বা মাল-সম্পদ হরণের জুলুম করেছি বলে সেদিন আমার প্রতি কেহ দাবি তুলবে না"।[১১১]ইহার কারণ এই যে, দ্রব্যমূল্যে নির্ধারণ মূলত ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার ব্যাপার। অতএব মূল্য নির্ধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকা উচিত। অন্যথায় তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ হয়ে পড়ে। তবে এই ব্যাপারে কারো উপর কোন প্রকার জুলুম হলে কিংবা প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনগণকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। কেননা তখন ব্যাপারটি আর ব্যক্তিগত না থেকে সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়।[১১২]

ইসলামী অর্থনীতি সমগ্র ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত ও নিছক পারিবারিক ব্যাপারের উপর সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়া থাকে। এই জন্যই, যে সব ব্যবসায়ে একদিকে ব্যক্তির বা গোষ্টীর বিপুল স্বার্থ লাভ হয় আর অপর দিকে তাতে সাধিত হয় সামগ্রিক বা সামাজিক ক্ষতি, নৈতিক চরিত্র হয় বিনষ্ট হয় ইসলামী অর্থনীতি তা আদৌ বরদাশত করে না।

ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতি অবাধ ও উদার নীতি পোষণ করে। এই ব্যাপারে কোনরূপ অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা ইসলাম সমর্থন করে না- তা ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্র- যার দিক হতেই হউক না কেন। এই কারণেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ উন্মুক্ত করে দেয়া; প্রয়োজন-অনুযায়ী খাল ও নদী খনন করা ও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা.) মিশরে যে খাল খনন করেছিলেন তার ফলে মিশর ও মদীনার মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছিল এবং উভয় দেশে দ্রব্যমূল্য একই স্তরে এসে পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় খলীফা এ জন্য অনেক পাকা সড়কও নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে,. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে রাষ্ট্র রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

পণ্যের সরবরাহ ও পরিবেশনের পরিমাণ এবং ইহার গতিধারার যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে ইহার মূল্যমান নির্ধারণের সাথে,তা অর্থনীতিবিদ মাত্রেরই জানা আছে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি পণ্যের সরবরাহ পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে ইহার মূল্য অনিবার্যরূপে হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে উক্ত পণ্যের সরবরাহ কম হলে ইহার

১১০. আল্লামা ইমাম নববী, *তাহফাতুল আহওয়াজী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮২

১১১.-ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولى لارجو ان القى ربى وليس الحدكم منكم يطلبنى بمظمله فى دم ولامال (আবু ঈসা তিরমিজী, *সুনান আত-তিরমিজী*)

১১২. এই পর্যায়ে যে কয়টি হাদীসই বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে, তার দৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ ও সচ্ছল অবস্থা এই দুইয়ের মাঝে সাধারণত কোন পার্থক্য করা যায় না। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দুর্ভিক্ষ বা স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি দেখা দিলে তখন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ (স.) উপরোক্ত হাদীস হতেও এ কথাই প্রমাণিত হয়। তা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জুলুম। কিন্তু কোন অবস্থায় তা না করার দরুন যদি জনসাধারণের উপর জুলুম হতে থাকে, তবে তখন তা না করাই বরং অতিবড় জুলুম।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য নিশ্চিতরূপে উর্ধ্বমুখী হবে। কিন্তু এই মূলনীতি অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। ইমাম আবূ ইউসূফের মত, একটি পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ কম হলেও ইহার সস্তা হওয়া এবং ইহার প্রাচুর্য সত্ত্বেও দাম চড়া হওয়া অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাজারে পণ্যমূল্যের সামঞ্জস্য বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। এখানে যেমন ইচ্ছামত অধিক মূল্য গ্রহণের অধিকার কাকেও দেওয়া হয় না; অনুরূপভাবে ইহার ন্যায্য মূল্যের অনেক কম করে ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) সৃষ্টি করার সুযোগ কাকেও দেওয়া যেতে পারে না। হযরত উমর (রা.) একজন লোককে সাধারণ বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে 'মুনাক্কা' বিক্রয় করতে দেখে বলেছিলেন- "হায়-প্রচলিত মূল্যে বিক্রয় কর; অন্যথায় আমাদের বাজার হতে চলে যাও"।[১১৩] কারণ, একজন ব্যবসায়ী পণ্য মুল্য অন্যায়ভাবে হ্রাস করে দিয়ে সকল খরিদ্দারকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নিতে চাইলে ব্যবসায়ের গোটা বাজারটাই নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে অন্যান্য ব্যবসায়ীর ভীষণ ক্ষতি হয়। ফলে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

চোরাচালানের শাস্তির বিধান :

১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনের ২(ঠ) ধারা মোতাবেক কেবল অবৈধ পথে আমদানী ও রফতানীকে চোরাচালান বলা হয়। একই সাথে বৈধ পথে কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বেআইনী আমদানী ও রফতানীকেও চোরাচালান বলা হয়। চোরাচালান স্থল, সমুদ্র ও আকাশ পথে হয়ে থাকে। চোরাচালান জাতীয় অর্থনীতি তথা দেশীয় শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। অধিকাংশ দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের উপর আবগারী শুল্ক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে এ শুল্ক তুলে নেয়া সম্ভব নয়। অথচ চোরাইকৃত দ্রব্যের উপর কোন আমদানী শুল্ক দিতে হয় না। এ সুযোগ বিদেশী পণ্য বাজার দখল করে নেয়। চোরাচালান পদ্ধতি অর্থনীতি ও শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন অন্তরায় তদ্রুপ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করে। এ জন্যই ইসলামে চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সম্পদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সে গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না"।[১১৪] বাংলাদেশের তিন দিকে ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদের দেশের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য আমদানী ও রপ্তানী হয়ে থাকে। কিন্তু চোরাকারবারীরা বিভিন্ন পয়েন্টে অবাধে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসছে। এতে দেশ হারাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এ দেশের অধিকাংশ কল-কারখানা, ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে সকল কারখানা। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড সীমান্ত প্রহরায় থাকা সত্ত্বেও বিনা শুল্কে কিভাবে এসব মালামাল এদেশে প্রবেশ করে তা কেউ বলতে পারেনা। অনেকে মনে করেন যে, সীমান্ত প্রহরীদের সাথে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে চোরাকারবারীরা তা করে থাকে। বিশেষ করে ঈদ, পূজা পার্বণ, নববর্ষ সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা বেশী সক্রিয় হয়ে উঠে। এসব চোরাকারবারীরা ধরা পড়লেও দেশীয় আইনে তেমন কোন সাজা হয় না। কেননা তাদেরকে এমন সব ধারায় মামলা দেওয়া হয়, সে সব ধারায় অনায়াসে জামিনে বের হয়ে আসা যায়। অপরপক্ষে তাদের বড় বড় গডফাদাররা রয়েছে, তারা তাদেরকে সকল বিপদ-আপদে আশ্রয় দিয়ে থাকে এবং তাদের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহন করে। প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তারা জামিনে বের হয়ে এসে আবার তাদের আগের পেশায় ফিরে যায়। যদি এসব চোরাকারবারী ও তাদের দোসরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান

১১৩. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*

১১৪. আল-কুরআন, ৩:১৬১

Dhaka University Institutional Repository

করা হত, মানুষ তা সরাসরি বা বিভিন্ন প্রিন্টও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তা অনুধাবন করত, তাহলে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহন করে এ পথ পরিহার করে সরল ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতো এবং চোরাচালান বন্ধ হয়ে যেত। পাশাপাশি সীমান্ত প্রহরীদেরকেও লোভ-লালসা, অনৈতিক মনোভাব, লিপ্সা পরিহার করে নৈতিক ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন করলে দেশ ও জাতি নিশ্চিত ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং বাণিজ্য ও শিল্প টিকে থাকতে সক্ষম হবে।

সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার বিধান :

সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা জঘন্য অপরাধ। ব্যক্তির অপরাধ ব্যক্তি ক্ষমা করে দিতে পারলেও সরকারী সম্পদ আত্মসাতের পাপ ক্ষমা করার অধিকার কারো নেই। কারণ সরকারী সম্পদের মালিক দেশের সকল মানুষ। কুরআন মাজীদে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, "কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলূম করা হবে না।"[১১৫]আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে খায়বর যুদ্ধে গমন করি। যুদ্ধে আমরা গণীমাত হিসেবে কোন স্বর্ণ-রৌপ্য লাভ করিনি, তবে খাদ্যবস্তু ও কাপড়-চোপড় লাভ করেছি। এরপর আমরা একটি মাঠে চলে যাই। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে তাঁর একটি গোলাম ছিল। জুযাম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে গোলামটি উপহার দিয়েছিল। আমরা মাঠে পৌঁছে যখন কাফেলা থেকে অবতরণ করলাম তখন গোলাম উষ্ট্র বহরের সাথে অবস্থান করছিল। একদিকে থেকে একটি তীর এসে তার দেহ বিদ্ধ হয় এবং তাতে সে মারা যায়। আমরা বলাবলি করলামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটির কতই না সৌভাগ্য সে শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কখনো নয়। আমি সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই সে লম্বা চাঁদরটি আগুন হয়ে তার দেহ দগ্ধ করবে, যা সে খায়বর দিবসে গণীমত বন্টনের পূর্বে গোপনে তুলে রেখেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ একথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং যার কাছে একটি কিংবা দুটি জুতার ফিতা ছিল তাও জমা দেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন; একটি জুতার ফিতা কিংবা দুটি জুতার ফিতা এগুলোও আগুনের অংশ।"[১১৬]

অপর এক হাদিসে আছে : ''নবী (স.) একবার বনী আসাদের ইবনে লুতবিয়্যাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ প্রধান করেন। সে দায়িত্বপালন শেষ করে এসে বলল : এগুলো যাকাতের মাল আর এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী (স.) মিম্বরে উঠে আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করে বলেন : আমি তোমাকে মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে যে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন ।অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে, এ হচ্ছে আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে । তবে সে কেন তার পিতা কিংবা মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না যে, তাকে উপহার দেয়া হয় কিনা ? আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি তার বিন্দুমাত্র কিছু খিয়ানত করবে সে নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে উপস্থিত হবে । যদি তা উট হয় তবে চিঁ চিঁ শব্দ করবে, গরু হলে হাম্বা করবে এবং ভেড়া হলে কিংবা বকরী হলে ম্যা ম্যা করতে থাকবে । অতঃপর তিনি তাঁর হাত দুটো এত উপরে ওঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলে শুভ্রতা দেখতে পেলাম এবং তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই তোমার নির্দেশ পৌঁছে দিলাম, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই তোমার নির্দেশ

১১৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২৩৪, পৃ.৩৪৭

১১৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং -২৫৯৭, পৃ.২০৪

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছে দিলাম।[১১৭]অপর এক হাদীসে আছে,"আমি তোমাদের মধ্যকার কাউকে যখন কোন কাজে নিযুক্ত করি আর সে আমাদের নিকট একটি সূঁই কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুও গোপন করে, তা নিশ্চয় আমানতের খিয়ানত হবে এবং নিয়ে সে কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে"।[১১৮]উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রমানিত হচ্ছে যে, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করে যে সম্পদ উপার্জন করা হয় তা কোনক্রমে বৈধ নয়। তাই তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা হলে এ অপরাধ অনেকাংশে নির্মূল হওয়া সম্ভব।

চাঁদাবাজীর শাস্তির বিধান :

সহজ আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে চাঁদাবাজি। তারা অস্ত্র-সস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মানুষকে চাঁদা দিতে বাধ্য করে। চাঁদা না দিলে ঘরে বাহিরে, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ ও ভাংচুর করে। চাঁদা না দিলে চুরিকাঘাত এতে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতির আশংকায় লোকেরা চাঁদা দিয়ে নিজেকে ও নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে। এসব চাঁদাবাজিসহ জবরদস্তিমূলক সব ধরনের সম্পদ উপার্জন ইসলামের নিষিদ্ধ। চাঁদাবাজরা যে চাঁদা উঠায় তা যেমন তাদের প্রাপ্য নয় তদ্রুপ যে পথে তা ব্যয় করে, তাও অনেক ক্ষেত্রে বৈধ পথ নয় । সম্পদের মালিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে চাঁদা প্রধান করে কেবল তাই হালাল । রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "সাবধান" তোমরা কেউ কারো প্রতি যুলুম করবে না । সাবধান ! কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ হালাল নয়।[১১৯]

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র-প্রশাসনের যে ব্যক্তি যে পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন কোন প্রকার অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা ইসলামে হালাল নয়। বিভিন্ন মিডিয়ায় দেখা যায় যে, জায়গা কিনলে, বাড়ি করতে, বাড়ি উঠাতে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগে, ঠিকাদারির কাজ করতে, বালু-সিমেন্ট পরিবহনে, ব্যবসা বা কারখানা চালু রাখতে, গাড়ি চালাতে, এমনকি কোন এলাকায় ভাড়া থাকতে গেলেও সেলামির চাঁদা দিতে হয়। বর্তমান সমাজে চাঁদাবাজির করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। চাঁদাবাজদের যদি জেল, জরিমানা বা দেশান্তর সহ সব ধরনের শাস্তি কঠোরভাবে প্রদান করা হয় তাহলে এ অপরাধ অনেকাংশে কমে আসা সম্ভব। কেননা অপরাধীর অপরাধের বিচার ও শাস্তি না হওয়ার কারণে অপরাধ প্রবণতা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী।

লেনদেনে অসততার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের বিধান :

ইসলামে ধোঁকা ও প্রতারণা কোনটাই হালাল নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল পর্যায়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে তার কুফল সম্পর্কে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে"একবার রাসূলুল্লাহ (স.) বিক্রয় করার জন্য স্তূপীকৃত খাদ্যবস্তুর একটি স্তূপের নিকট দিয়ে গমনকালে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তঁর হাত কিছুটা স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব অনুভূত হলো। তখন তিনি বিক্রেতাকে বললেন; হে খাদ্য বিক্রেতা! এ কি, ভেজা কেন? লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তুমি ভেঁজাগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকজন তা দেখে নিতে পারে। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত

---

১১৭. ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭৩৯, পৃ. ১০০৭

১১৮. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, *আল-মুসনাদ* (বায়তুল আফকার আদ- দাওলিয়া, রিয়াদ-১৪১৯/১৯৯৮), হাদীস নং-২০৯৭১,পৃ. ১৫১৮

১১৯. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮৩, পৃ. ৬৯৫

Dhaka University Institutional Repository

নয়।"[১২০]ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া এবং বেশি গ্রহণ করা উভয়ই অপরাধ। এর মাধ্যমে ক্রেতাকে ঠকানো হয় অথচ ক্রেতা মনে করে, সে তার প্রাপ্য অধিকার যথার্থই লাভ করেছে। এ অপরাধ সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে, যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লা। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।"[১২১]আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন: "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে ওজন করে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে আর যখন তাদের জন্য মেপে কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[১২২]

রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় আবু জুহায়লা নামক এক ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পান যার ব্যবসা কেন্দ্র সাধারণকে মেপে দিত। তার প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হয়। উল্লেখ্য যে সমাজে মাপে কম দেয়ার খিয়ানত চলে, সেখানে আল্লাহ দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন, এবং ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেন। ওজন ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: "তোমাদের ওপর এমন দুটি দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে যাতে (ত্রুটি করার অপরাধে) তোমাদের পূর্বেকার অনেক জাতি ধবংস হয়েছে।"[১২৩]উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি মাপে কম দেয় সে প্রকৃতপক্ষে লোক চক্ষুর অন্তরালে চুরি করে এবং হারাম উপার্জন করে। শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান না করাও একই ধরনের অপরাধ। হযরত শু'আইব (আ.) এর উম্মাত ওজনে কম দেয়ার তাদের উপর ভূমিকম্প নেমে আসে। ফলে তারা ধবংস হয়ে যায়।

ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিধান :

পাশ্চাত্যে ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তি এবং বেশ্যাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা ব্যভিচারীদেরকে Sex worker (যৌন কর্মী) বলে আখ্যায়িত করে। এ কর্ম তাদের অন্যান্য পেশার ন্যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। ইসলামে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা যিনার ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদও নিকৃষ্ট আচরণ।"[১২৪]রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জিত আয় অপবিত্র।"[১২৫]শুধু ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারামই নয় বরং অশ্লীলতা ও বেহায়না ছড়ায় এমন সব পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যও হারাম। যেমন- সিনেমার অশ্লীল পর্ণোগ্রাফী, বই-পুস্তক , উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ ছবি-পোষ্টার প্রচার, অশ্লীল নাচ-গান ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[১২৬] সুতরাং কোন অবস্থায় ব্যভিচারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হালাল নয়।

---

১২০. আল-কুরআন, ২৬:১৮১-১৮৩

১২১. আল-কুরআন, ৮৩:১-৩

১২২. ইমামআব ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২১৭, পৃ.১৭৭৩

১২৩. আল-কুরআন, ১৭:৩২

১২৪. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা. নং. ৪০০৯, পৃ. ৯৫০

১২৫. আল-কুরআন, ২৪ : ১৯

১২৬. আল-কুরআন, ৫ : ৯০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়ার বিধান :

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওযনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, “মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।”[১২৭]নিজে গ্রহণের সময় বেশি মাপা এবং দেয়ার সময় কম দেওয়ার অশুভ পরিণতি কেবল পারলৌকিক নয় বরং তা ইহলৌকিকও বটে। আর তা শুধু নৈতিকভাবেই নয় বরং অর্থনৈতিকও বটে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) ওযনে কম না দিয়ে বেশি দেওয়ার জন্য হুকুম করেছেন, তিনি বলেন, ওযন কর এবং কিছু বেশি দিয়ে দাও।”[১২৮]বেচাকেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতারণা করা, পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা কিংবা ভুল প্রচারণা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পণ্যদ্রব্য ক্রয়- বিক্রয়ের ব্যাপার সঠিক পরিমাপ না করা- ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা নিজ হাতে বেশী ওজন করে ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “যারা ওজনে কম দেয় পরের জিনিস ওজন করে নিলে তখন পুরাপুরিই গ্রহণ করে; কিন্তু অপরকে যখন ওজন করে দেয়। তখন ইহার পরিমাণ কম দেয় তারা নিশ্চিতরূপে ধবংশ হবে”। বলা বাহুল্য,এই ‘ধবংশ’ কেবল পারলৌকিকই নয়, ইহকালীনও বটে এবং কেবল নৈতিকই নয়, অর্থনীতির দিক দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইহা দ্বারা মারাত্মক ধ্বংস টেনে আনা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “পণ্যদ্রব্যের ওজন পূর্ণ কর, ওজনে কম দানকারী হইও না। সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন কর, লোকদিগকে পরিমাণে কম বা নিকৃষ্ট কিংবা দোষযুক্ত দ্রব্য দিও না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়কারী হয়ে বিপর্যয় করে বেড়াইও না”।[১২৯] পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা, ভুল প্রচারণা করা, অথবা পরিস্কার মিথ্যা কথা বলিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা ইহাতে জনগণ পারস্পরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কোন এক দোকানে শস্যস্তুপের উপরিভাগ শুষ্ক এবং নিম্নভাগ সিক্ত দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তুমি ভিজা শস্য উপরে রাখছ না কেন? .... তা রাখলে খরিদ্দারগণ ইহার প্রকৃত অবস্থা দেখেই ক্রয় করত- প্রতারিত হত না। বস্তুত যে লোক আমাদিগকে প্রতারিত করে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না”।[১৩০] অর্থাৎ সে আমার উপস্থাপিত হেদায়েত অনুযায়ী চলে না, আমার দেওয়া জ্ঞান ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে না এবং আমার উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে না

ইসলামী সমাজে ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি লংঘন করা একটি মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। যে লোক অপরাধে লিপ্ত বা অভ্যস্ত তাকে ব্যবসায় চালাবার অনুমতি দেওয়া যায় না। দেওয়া হয়ে থাকলে তা বাতিল করতে হবে, ইহাই ইসলামের বিধান।

---

১২৭. ويل للمطففين الذين اذا كتالوا على الناس يستوفون واذا كالوا هم اوو زنوهم يخسرون- (আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৩)

১২৮. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ২৫৩

১২৯. اوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين زنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا لناس اشياء هم ولاتعثوا فى الارض مفسدين- (আল-কুরআন)

১৩০. افلاجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غسنا فليس منى- (মুসলিম, তিরমিযী) এই হাদীস অনুযায়ী ব্যবসায়ে কোনরূপ প্রতারণা করা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেনঃ আবূ হুরাইয়া বর্ণিত এই হাদীসটি সহীহ। বিশেষজ্ঞগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাঁরা ব্যবসায়ে ধোঁকাবাজীকে ঘৃণা করেন এবং বলেছেনঃ ব্যবসায়ে ধোঁকার্বাজী সুস্পষ্ট হারাম। (*সুনান আত-তিরমিযী*)

Dhaka University Institutional Repository

ভেজাল মিশানোর বিধান :

ভেজাল মিশানো হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) কোন খাদ্যস্তুপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপে হাত ঢুকিয়ে ভিতরে খাদ্যবস্তু ভেজাল দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্য মালিক এ কি? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স.) বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, "যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্য গণ্য হবে না।"[১৩১]এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম। অধিক মূল্য লাভের নিমিত্তে পশুর স্তন্যে দুধ জমিয়ে রেখে তা বিক্রয় করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরাশাদ করেন, "বাজারে পৌঁছার পূর্বেই (স্বল্পমূল্যে) ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাক্ষাত করবে না। পশুর স্তন্যে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না।"[১৩২]ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং কেবলমাত্র মূল্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দর-দাম করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরাশাদ করেন, "তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।" [১৩৩]এরূপ করাও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শরী'আতে যেসব বস্তু হারাম, এর উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুই হারাম। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন: "যে বস্তু পান করা হারাম, তা বেচাকেনা করা এবং বেচাকেনার পর এর মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম"।[১৩৪]এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলা লানত করেন। মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, প্রস্তুতকারীর উপর, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর, বহনকারীর উপর এবং যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর।"[১৩৫] ফকীহ্গণের মতে, "মুসলিম দেশে হারাম বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা জায়িয নেই। এমনকি প্রকাশ্যে হলে অমুসলিমদের জন্যও নয়।"[১৩৬]

কর বা রাজস্ব ফাঁকির বিধান :

এক ব্যক্তির জীবনাযাত্রা সুষ্ঠুরূপে নির্বাহ করার জন্য যেমন ধন-সম্পদের প্রয়োজন অনুরূপভাবে একটি সরকারের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও দায়িত্ব পালনের জন্য ধন-সম্পদের আবশ্যকতাও অনস্বীকার্য। ব্যক্তি যেখানে নিজস্ব উপায়-পন্থার সাহায্যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ আহরণ করে, রাষ্ট্র-সরকার সেখানে দেশবাসীর নিকট হতে বিভিন্ন কর ও রাজস্বের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ইহাই গোড়ার কথা। অর্থনীতিবিদগণ কর বা রাজস্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক চেষ্টিবল রাজস্বের নিম্ন লিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন- 'রাজস্ব' বলতে কোন ব্যক্তি বা দলের সে অর্থ বুঝায়, যা সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্য তার নিকট হতে বাধ্যতামূলক আদায় করা হয়।[১৩৭]

---

১৩১. ইমাম তিরমিযী, সুনান আত-তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২৪১

১৩২. প্রাগুক্ত

১৩৩. আল-ফিকহ আলাল মাযাবিহিল আরবায়া, খ. ৫, পৃ.২৬

১৩৪. আবু দাউদ, পৃ.৫১৭

১৩৫. আল-ফিকহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৩৬. মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ.২৪২

১৩৭. অধ্যাপক ডালটন, *পাবলিক ফিনান্স*, খ.৩, অ. ১, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডালটন রাজস্বের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন- 'রাজস্ব' সরকার পক্ষ হতে অপহির্যরূপে ধার্যকৃত একটি দাবি বিশেষ।[১৩৮]রাজস্বের এ উভয় সংজ্ঞাই নির্ভুল বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ইহাতে কোন নৈতিক দায়িত্ব বা সীমা রক্ষা করার ভাবধারা আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইসলামী অর্থনীতিতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করার ব্যাপারে এই মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইহা ধার্য করার ব্যাপারে যেমন অন্যায় ও শোষণের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না; অনুরূপভাবে সংগ্রহীত রাজস্বের একটি ক্রান্তি পর্যন্তও অন্যায় পথে, যথেচ্ছভাবে ব্যয় করার কারো অধিকার নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ইহার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকেও ইসলামী রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয়কেও স্থায়ী নৈতিক নিয়মের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তা লংঘন করার অধিকার কারও থাকতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হয়, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারূকের ভাষায় তা নিম্নরূপ-আনুগত্যের যোগ্য কোন ব্যক্তির এ মর্যাদা হতে পারে না যে, আল্লাহর নাফরমানী করেও তার আনুগত্য করতে হবে। 'তিনটি হালাল পন্থা ভিন্ন অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আমার কোনই অধিকার নেই। প্রথম: সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা গ্রহণ করা হবে; দ্বিতীয়: ন্যায়পথেই ইহা ব্যয় করা হবে এবং তৃতীয়: এই যে, ইহাকে সকল প্রকার অন্যায় নীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে।

অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সরকারী ব্যয়-বহনের জন্যই রাজস্ব আদায় করবে না, দেশের গরবীব দুঃখী ও অভাবী মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যও পথিক, বেকার ও ঋণী লোকদের সাহায্য করার জন্যও রাজস্ব আদায় করবে। এ কর দু'ধরনের প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর। যে রাজস্ব নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা অবস্থায় লোকদের উপর আইনত ধার্য করা হয়, ইহাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলা হয়। আর যে কর ধার্য করা হয় একজনের উপর; কিন্তু মূলত উহার সমগ্রটি কিংবা আংশিক পরিমাণ আদায় করিতে হয় অপর একজনকে, ইহাকেই বলা হয় পরোক্ষ কর।[১৪০]

দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ রাজস্ব ধার্য হওয়া উচিৎ না অপ্রত্যক্ষ রাজস্ব- অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ রয়েছে। হেনরী জর্জ বলেন যে, একমাত্র ভূমি রাজস্বই দেশবাসীর উপর ধার্য হওয়া উচিত। তার একমাত্র কৃষি উৎপন্ন ফসলকেই প্রকৃত উৎপাদন বলা যেতে পারে। কৃষি উৎপন্ন ফলনই মূলত মানবজীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের পরিপূরক বলে প্রত্যেকেই তা ব্যবহপার করতে বাধ্য। ফলে দেশের সকল মানুষের উপরই এরূপ রাজস্বের প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে পড়ে থাকে। কিন্তু এ রাজস্ব নীতির মূলে একটি সুস্পষ্ট ভুল বিদ্যমান। রাজস্বের এ নীতি গ্রহীত হলে নগদ সম্পদশালী লোকদের ঐশ্বর্যের উপর ইহার কোন প্রভাবই পড়বে না। বরং কেবল গরীব-দুঃখীদের উপরই রাজস্বের দুর্বহ বোঝা চেপে দেওয়া হবে।[১৪১] অপ্রত্যক্ষ রাজস্ব নীতিতে মানুষের চক্ষে ধুলি দিয়ে রাজস্ব আদায় করা হয়। জনগণ জানতেও পারে না যে, তাদের উপর কর ধার্য করা হয়েছে এবং তাদিগকে তা যথারিতি আদায়ও করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজস্বনীতিতে জনগণের নিকট হতে সরাসরি কর আদায় করা হয় বলে তাতে কোনরূপ আতিশয্য দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই জনগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলে এ রাজস্ব ধার্য এবং ইহা আদায় করণের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম হওয়ার সম্ভাবনা ও অবকাশ থাকতে পারে না। আর অপর পক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের প্রতি জাগ্রত জনগণের আন্তরিক সমর্থন থাকে বলে প্রকৃত প্রয়োজন-পরিমাণ

১৩৯. *প্রিন্সিপালস অব পাবলিক ফিনান্স*, অ.৩ পৃ. ২৬

১৪০. অধ্যাপক ডালটন, *পাবলিক ফিনান্স*, অ. ৫, পৃ. ৩৩

১৪১. *প্রিন্সিপাল এন্ড মেথড অব টেকসেশন*, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব আদায় কার্য ব্যাহত হয় না। ফলে জনমতের গুরুত্ব, গণঅধিকারের মৌলিক ভাবধারাও সামগ্রিক প্রয়োজন পূর্ণকরণ প্রভৃতি সুষ্ঠুরুপে সম্পন্ন হতেও বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু বর্তমান কুটনৈতিক ও ষড়যন্ত্রকারী দুনিয়ার রাষ্ট্র-সরকারের অর্থ মন্ত্রীগণ সাধারণত সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে ও জনগণের অজ্ঞাতে কর আদায় করারই অধিক চেষ্টা করে থাকে। কোলবিয়ার নামক একজন ফরাসী মন্ত্রী বলেছেন- 'হাঁসের পালক এমনভাবে উৎপাটন কর, যেন ইহা চিৎকার করারও অবসর না পায়।' বস্তুত বর্তমান দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রেই রাজস্ব আদায় ও অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এ নীতিতে অণুসৃত হচ্ছে। উপরন্তু রাজস্ব আদায়ের এসব নীতিও পদ্ধতিতেই নৈতিক ভুল ও অন্তর্নিহিত মারাত্মক ক্রটি রয়েছে। এ জন্য বর্তমান দুনিয়ার প্রায় সব অর্থনীতিবিদগণ উভয় পদ্ধতিতেই রাজস্ব আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন- যেন উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তদুদ্ভুত দোষ-ক্রুটির ক্ষতিপূরণ করতে পারে। এই দিক দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতির বৈশিষ্ট্য ও নির্ভুলতা অনস্বীকার্য। কারণ তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় দিক দিয়েই রাজস্ব ধার্য হয়। এই রাজস্ব আয়ের উপর ধার্য হয়, যথা যাকাত, ওশর (ফসলের একদশমাংশ কিংবা একবিংশাংশ) এবং খারাজ ইত্যাদি 'প্রত্যক্ষ কর'। অথবা তা ধার্য হয় মূলধনের উপর, যেমন চতুস্পদ পালিত জন্তুর যাকাত, স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত, ব্যবসায়ে পণ্যের যাকাত। ইহা সবই প্রত্যক্ষ কক্ষ- এর অন্তুর্ভক্ত। আর অপ্রতক্ষ কর, যেমন উত্তোলিত খনিজ ও নদী-সমুদ্র সম্পদ এবং শুল্ক ইত্যাদি। এ সবের সমন্বয়ে একটি পূর্নাঙ্গ কর ধার্যকরণ

ইসরাফ বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান :

ইসরাফ অর্থ অপচয়, অপরিমিত ব্যয়, অতিরিক্ত পানাহার করা, বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু ব্যয় করা, নষ্ট করা (Wastage) । অন্য কথায় ইসরাফ হলো হালাল খাতে এমন ব্যয় যা প্রয়োজনতিরিক্ত। হালাল সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা। যদি কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত করা হয়; তখন সেটা ইসরাফ হয়। অন্যকথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই সেটা ইসরাফে পরিণত হয়। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় 'ইসরাফ' অর্থ সীমা অতিক্রম করা বা অপচয় করা। মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই অপচয় করছে। কাজ না করে সময়ের অপচয় করছে, জিনিসপত্রের সটিক ব্যবহার না করে অপচয় করছে। পানাহারে বা ভোগবিলাসে অতিরিক্ত ব্যয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদী ভোগবাদী জীবনধারার অনুসরণ ফুটে উঠে। ইসরাফ না করার নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। অত্যন্ত স্বভাবিকভাবেই ভোক্তাগণ তাদের নিজ নিজ মাসয়ালা অনুসরণ করার অজুহাতে ইসরাফের কবলে পড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ নিজেদের উদর পূর্তি করতে গিয়ে গরীব ও অসহায় প্রতিবেশীর কথা ভুলে যেতে পারে। সামাজিক পর্যায়ে ইসরাফ সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রফতানী, উৎপাদন ,বণ্টননীতি এমনভাবে তৈরী হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইসরাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তিপর্যায়ে ইসরাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকারও নিজেও ইসরাফ পরিহার করবে। ব্যয়ের ইসলামী নীতিতেই তাই আদর্শ ও কাম্য।

তাবজীর বা অপচয়ের বিধান :

হালাল সম্পদ হারাম কাজে ব্যয় করা, অশ্লীল কাজে ব্যয় করা, ইসলামের ক্ষতিসাধনে ব্যয় করা। কোন বস্তুকে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যয় না করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করলে, হারাম খাতে ব্যয় করলে, অপব্যবহার করলে, সেটাকে বলা হয় তাবজীর। ইসরাফের তুলনায় তাবজীরের ক্ষতি ব্যাপক। এজন্যই তাবজীরকারীদের শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ উপার্জন হলে অবৈধ খাতে ব্যয়ই শুধু নিষিদ্ধ নয়, হালাল উপার্জন হতেও অবৈধ খাতে ব্যয় নিষিদ্ধ। এজন্যই ইসলামে তাবজীরকারী বা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করা হয় না। অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব-অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। এজন অপব্যয় বা তাবজীর ইসলামে অপরাধ।

অংশীদারের অংশ না দেওয়ার বিধান :

ইসলামী সমাজে মীরাসী আইন এক অনস্বীকার্য বিধান। ইহাকে কার্যকর করলে ইহকাল ও পরকালে সর্বত্রই পরিপূর্ণ সাফল্য ও অর্থনৈতিক প্রগতি লাভ করা সম্ভব। আর এ আইনকে জারী না করলে- ইহার ভিত্তিতে সম্পত্তি বন্টন না করলে, ইহকাল পরকাল সকল ক্ষেত্রে চরম দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ঘটবে, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এগুলি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা, এ সীমা রক্ষা করে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন বেহেস্তে স্থান দেবেন, যার পাদদেশ হতে প্রতিনিয়ত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তাতে সে চিরদিন বসবাস করবে। বস্তুত ইহাই হচ্ছে চরম সাফল্য। পক্ষান্তরে এ সীমা রক্ষার ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের নাফারমানী করবে এবং আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করবে, আল্লাহ্ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন- ইহাতে সে চিরদিন অবস্থান করবে। সেখানে তাকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে"[১৪২]মীরাসী আইনের মূলনীতি বর্ণনা করতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "পিতা-মাতা এবং নিকটতম আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকদের জন্যও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। প্রত্যেকের জন্যই এই অংশ সুনির্দিষ্ট, পরিমাণে তা কমই হোক বা বেশীই হেক"।[১৪৩]

এ আয়াত হতে তিনটি মূলনীতি প্রমাণিত হচ্ছে

প্রথম এই যে, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়গণ যে সম্পদ ও সম্পত্তিই রেখে যাবে- তা স্থাবর হোক কি অস্থাবর, তাতে উত্তরাধিকারীদের অংশ রয়েছে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তা অবশ্যই বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয়, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তির অংশ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই লাভ করতে পারবে। স্ত্রীলোক বলে কাকে ও অংশীদার হওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত করা যেতে পারে না কিংবা এমন কোন বাহ্যিক ব্যবস্থাও চালু করা যেতে পারে না, যার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার হতে কাহাকেও বঞ্চিত করা যেতে পারে।

তৃতীয় 'সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি মীরাস লাভের অধিকারে সর্বাগণ্য।' উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির পিতা এবং পিতামহ বর্তমান থাকলে মীরাস লাভের ব্যাপারে পিতাই অগ্রগণ্য হবে। কারণ, উভয়ের মধ্যে পিতাই মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। অনুরূপভাবে পুত্র এবং পৌত্র বর্তমান থাকলে পুত্রই মীরাস লাভ করবে, পৌত্র তা পাবে না। যেহেতু পৌত্র অপেক্ষা পুত্রই মৃত ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত বেশী নিকটবর্তী।এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত তিনজন লোক মীরাস হতে বঞ্চিত হবে-

ক. হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস লাভ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস লাভ করবে না"।

---

১৪২. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها- وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خائدا فيها وله عذاب مهين- (আল-কুরআন,৪:১৩-১৪)

১৪৩. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون وللنساء. نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا- (আল-কুরআন, ৪:৭)

Dhaka University Institutional Repository

খ. ধর্মের বিভিন্নতার দরুন একজন অপরজনের মীরাস হইতে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, "মুসলামান ব্যক্তি কাফিরের এবং কাফির ব্যক্তি মুসলিমের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে না"।[১৪৪]

গ. দেশ বা রাজ্যের বিভিন্নতার দরুন ও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মীরাস লাভ হতে বঞ্চিত হতে পারে। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের সাথে ইহার সামঞ্জস্য রয়েছে। ইসলামী রাজ্যের ধন-সম্পত্তি যাতে কাফিরী রাজ্যে স্থানান্তরিত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কেহ অস্থায়ীভাবে পর্যটন কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য রাজ্যের বাহিরে চলে গেলে, তার ওপর মীরাস হতে বঞ্চিত হওয়ার এ আইন প্রযোজ্য হবে না।

প্রসংগতঃ পৌত্র ও পৌত্রী, পিতা কি মাতার মাধ্যমেই পিতামহের কি মাতামহের সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে- সরাসরিভাবে নয়; ইহাই হচ্ছে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন। কিন্তু পিতা কিংবা মাতা যদি পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে মাঝখানের সূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুন মীরাস হতে এদের বঞ্চিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা যেমন যুক্তিসংগত কথা, অনুরূপভাবে ইসলাম অভিজ্ঞ সকল লোকের নিকট শুরু হতেই ইহা সমর্থিত হয় এসেছে। একটি ছেলে কিংবা মেয়ে পিতার বর্তমানেই যদি মারা যায়, তবে পিতার সম্পত্তিতে তার যেমন কোন অংশ স্বীকৃত হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও তাই হবে। অবশ্য উক্ত ইয়াতীমের জন্য অসিয়ত করা পিতামহের কিংবা মাতামহের কর্তব্য এবং ইসলামী অর্থনীতিতে ইহার পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। আর সম্পত্তির মালিক কোন কারণে তাদের জন্য অসিয়ত না করলেও সম্পত্তি বন্টনের সময় অবশ্যই তাদিগকে ইহা হতে দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মীরাস বন্টনের সময় নিকটাত্মীয় ইয়াতীম ও মিসকীন যারা মীরাসের নিয়মে অংশ পায়নি, তাদিগকে ইহা হতে জীবিকা দাও এবং তাদিগকে ভাল কথা বল"।[১৪৫]আর কোনরূপ সহায়সম্বল না থাকলে ও ভয়ের কোন কারণ নেই। যেহেতু এ ধরণের অসহায় শিশুদের জন্য স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রই দায়ী হবে, যেখানে এ আইনটি যথাযথভাবে ও পুরামাত্রায় কার্যকর হবে।

অসিয়ত পূর্ণ না করার বিধান :

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবকাশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতি সম্পত্তির উপর ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা-বাসনা কার্যকর করার সীমাবদ্ধ অধিকার দান করেছে। মৃত্যুর পূর্বে ব্যক্তির অসিয়ত অধিকার তন্মধ্যে অন্যতম। এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

> "তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হওয়া কালে ধন-মাল রেখে যেতে থাকলে অসিয়ত করা তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে"।১৪৬

এ আয়াত অনুযায়ী ইসলামী সমাজে অসিয়ত চালু হয়ে যায়। কেননা তখন পর্যন্ত মীরাসের আয়াত নাযিল হয়নি। অতএব প্রত্যেক সম্পত্তির-মালিক মৃত্যুর পূর্বে নিজ ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কোন অসিয়ত করে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার অসিয়ত পূরণ করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ধন- বন্টনের দিক দিয়ে ইসলামী অর্থনীতিতে এ অসিয়তের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এমন অনেক নিকটাত্মীয় থাকতে পারে যারা বাহ্যিক বা আইনগত কোন কারণবশত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে মীরাস লাভ করতে পারে না- বরং বঞ্চিত হয় এবং তা হতে বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে। তখন সম্পত্তি-মালিকের কর্তব্য আল্লাহ্‌র দেওয়া এ সুযোগকে ব্যবহার করা এবং বঞ্চিত নিকটাত্মীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যুর

১৪৪. -لايرث المسلم الكاقر ولاالكافر المسلم (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*)

১৪৫.-واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتمى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (আল-কুরআন, ৪ : ৮)

১৪৬. -كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيران الوصية (আল-কুরআন, ২: ১৮০)

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই অসিয়ত করে যাওয়া।

মূলত নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের জন্য এ অসিয়তই ছিল সর্ব প্রাথমিক ব্যবস্থা। মীরাসী আইন নাযিল হওয়ার পূর্বে এই অসিয়তের প্রচলন করা হয়। কিন্তু মীরাসী আইন জারী হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) অসিয়ত ও মীরাস সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা করে দু'টি মূল নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন-

প্রথমত মীরাসী আইন জারী হওয়ার পর কেহ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীর জন্য কোন অসিয়ত করতে পারে না। অর্থাৎ মীরাসী আইনের মাধ্যমে যে সব নিকটাত্মীয়ের অংশ কুরআন মজীদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাদের জন্য অসিয়ত করে উক্ত অংশে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। কোন ওয়ারিসকে মীরাস হতে অসিয়তের সাহায্যে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ; আর কোন অংশীদারকে তার বিধিসম্মত অংশ ব্যতীত অসিয়তের সাহায্যে অতিরিক্ত জিনিস দেওয়া বিধেয় নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"নিশ্চয়ই মীরাসী আইনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। যে লোক উত্তরাধিকারী তার জন্য কোন অসিয়ত নেই"।[১৪৭]

দ্বিতীয়ত অসিয়ত মোট সম্পত্তির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের উপরই কার্যকর হবে, তার বেশী অংশ সম্পর্কে অসিয়ত করলেও তা কার্যকর হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত সায়াদ বিন আবী আব্বাস (রা.) এর এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেছেন

"হ্যাঁ, এক- তৃতীয়াংশ মাত্র এবং এই এক-তৃতীয়াংশই অনেক"।[১৪৮]অর্থাৎ প্রত্যেক সম্পত্তির মালিক তার মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ নিজ আইন-সম্মত উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অসিয়ত করতে পারবে।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতিতে অসিয়ত একটি সুপারিস মাত্র নয়, ইহা অনিবার্যরূপে কার্যকর করতেই হবে। কুরআন মাজীদ এই অসিয়ত সম্পর্কে বলেছেন, ইহা মুত্তাক্বীন ও আল্লাহভীরু লোকদের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে ধার্য করা একটি অনিবার্য অধিকার বিশেষ। এ অধিকার যথাযথরূপে আদায় করা হলে পিতামহ কিংবা মাতমহের বর্তমানে যাদের পিতা কিংবা মাতার মৃত্যু হয়, তাদের মীরাস হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে কোনরূপ অসুবিধায় পড়বার কথা নয় এবং তা নিয়ে কোনরূপ অভিযোগও করা চলে না।

উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদের সমধিক বণ্টন এবং অবোধ, অজস্র ও অবিশ্রান্ত আবর্তন সৃষ্টি করাই ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। ইহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বপূর্ণ সাংসারিক জীবন শুরু করার জন্য এ সংঘাত-সংকূল জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুকূলে কিছু না কিছু কাজ-কারবার ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্প-কার্য শুরু করার সুযোগ পায়। নিজের প্রাপ্ত অংশকে অধিকতর বর্ধিত করতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। উপরন্তু ইহারই পরিণামে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবার বিরাট সুযোগও ঘটে।

কৃপণতার বিধান :

কৃপনতা বলতে সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার না করা। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বন করা অত্যন্ত দূষণীয়। কৃপণতা মানুষের একটি মন্দ স্বভাব। ইসলামী জীবন-বিধানে কৃপণতার কোন স্থান নেই। কৃপণতা ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। বরং তা সময়ের ক্ষতিই করে থাকে। ইমাম গাজ্জালী

---

১৪৭. ان الله تداعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث- (আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী*)

১৪৮. الثلث والثلث كثير প্রাগুক্ত, রাসূলুল্লাহ (স.) এ কথাটির প্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন, লোকেরা যদি অসিয়তে এক-তৃতীয়াংশ হতে এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে, তবে তা আল্লাহ্ও অ-উত্তরাধিকারীদের জন্য নিজ ঘরের বা বাহিরের অভাবী নিকটাত্মীদের জন্য, কিংবা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বা কাজের জন্য- অসিয়ত করে যেতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

(রহ.) বুখল বা কৃপণতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন-
প্রথমত লালসা ও প্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ স্পৃহাই কৃপণতার প্রধান কারণ;
দ্বিতীয়ত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কামনা ও কৃপণতার আরেকটি কারণ;

তৃতীয়ত সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনও কৃপণতার অন্যতম কারণ; সন্তান-সন্ততির জন্য ধন-সম্পদ রেখে যাওয়াকে অনেকে নিজের স্থায়িত্ব মনে করে; এ কারণে কৃপণতা দোষ তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠে।

চতুর্থত ধনাসক্তিও কোন কোন সময় কৃপণতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃপণ ব্যক্তি হয় অত্যধিক লোভী। তারা ধন-সম্পদ কেবল জমা করতে থাকে। এ সম্পদ না তাদের নিজের কাজে লাগে, না অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় হবে। তারা কেবল প্রাচুর্যের হিসেব করে জীবন অতিবাহিত করে। ইসলামে কৃপণতাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলাম কৃপণকে পছন্দ করে না। কৃপণতা বড় ধরনের অপরাধ। ইসলামী অর্থনীতিতে বুখল নীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, অতিরিক্ত খরচ যেমন পছন্দনীয় নয়, তেমনি কৃপণতাও গ্রহণযোগ্য নয়। সম্পদ জমিয়ে রাখলে তার উৎপাদনশীলতা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার আবর্তন হয় না। এজন্য ইসলামে বুখল পরিহার করে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রেশনিং প্রথার বিধান

ইসলামী অর্থনীতি দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের স্বাধীন ও অবাধ ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার দিয়েছে। বিশেষ কোন কারণ- কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ইসলামী অর্থনীতির আদর্শসম্মত নয়। কিন্তু বাস্তবিকই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এবং অবাধ ক্রয়-বিক্রয় করা অপরিহার্য বোধ হলে তা নিশ্চয়ই করতে হবে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ, সর্বাত্মক প্লাবন ও যুদ্ধবিগ্রহই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইহার কোন একটির দরুন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কিছুমাত্র পশ্চাদপদ হবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তখন গোটা অর্থনীতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য ও মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহের পক্ষে অপিরহার্য অন্যান্য দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু করবে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময় তাঁর প্রেরিত এক সৈন্যবাহিনীতে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় সেনাধ্যক্ষ হযরত আবূ উবাইদাহ (রা.) সৈনিকের জন্য রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। অনুরূপ একটি বাহিনী সমুদ্রোপকূলে প্রেরিত হয়েছিল হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) এর নেতৃত্বে। পথিমধ্যে ইহাদের খাদ্য দ্রব্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন সৈনিকদের প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্রভাবে যে খাদ্য দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল, তা একস্থানে স্তুপীকৃত করার জন্য সেনাপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং তা দৈনিক নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ অনুযায়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। (সহীহ আর-বুখারী)

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনি ও চৌদ্দশত লোকের নিকট অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করে ইহা সকলের মধ্যে নিয়মিতরূপে বণ্টন করেছিলেন। (সহীহ আল-মুসলিম)

হযরত উমর ফারূক (রা.) এর খিলাফতের সময় (১৮হিঃ) মদীনায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন বহু পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনার পর চর্তুদিকে হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করার জন্য রেশনকার্ড ইস্যু করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকের অধিকারের বিধান :

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এর জন্য সুনির্দিষ্ট মৌল আঙ্গিক থারা নিরূপণ করেছে এবং এর বুনিয়াদী সমাধান পেশ করেছে। যার সাহায্যে আমরা অতি সহজেই একটি ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি নির্ধারণ করতে পারি। যা আজকের এই সংঘাতমুখর পৃথিবীকে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিশাপ কে চিরন্তন মুক্তি দিতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হলো, সে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্মানজনক চুক্তিকে স্বীকার করে, একে সমর্থন জানায়। আজকাল দেখা যায় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকরা যে চুক্তি করে তা পূরণ করতে গিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রিতায় ছত্রছায়া গ্রহণ করার অপকৌশলে তারা মেতে ওঠে বিরক্তিকর টালবাহানা করতে শুরু করে দেয়। ইসলাম একে অসহ্য রকমের এক জুলুম বলে ঘোষণা করে। রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমান, "সঙ্গতিসম্পন্নদের টালবাহানা করা (মারাত্মক) জুলুম।"[১৪৯]

আল্লাহ্পাক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো অবশ্যই পূরণ কর।"[১৫০] তিনি আরো বলেন, "আর নিশ্চয়ই চুক্তি সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।"৫৩ আবার অনেক সময় শিল্প-মালিকগণ শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, তাদেরকে নিকৃষ্টতম ও নিম্নতম শর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। আর বেচারা শ্রমিক যখন নিজের ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত , হাড্ডি-জিরজিরে রোগগ্রস্ত পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়েদের অন্ন সংস্থানের এবং নিজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে আর ভাবে এ ছাড়া তার কোন উপায় নেই, তখন সে যে কোন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পিছপা হয় না। আর মালিকরা তার জিগরের খুন এমনি করেই বিষাক্ত লোলুপতা নিয়ে চেটে খায়। কিন্তু ইসলাম বলে, কারো অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার বিপর্যস্ততার ছত্রছায়ায় যে চুক্তি করা হয়, এর শর্তাবলি কোন মূল্য নেই। এই জুলুমের চুক্তি অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলতে হয়। একে ইসলাম কোন সময়ই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্মানিত ও অনুমোদিত চুক্তিপত্র বলে স্বীকার করে না। এ সম্পর্কে বলতে যেয়ে প্রাচ্যের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, অনন্তর আর্থিক লাভ যদি এইভাবে হাসিল করা হয়, যার মধ্যে চুক্তিকারীদের পারস্পরিক সাহায্য এবং কার্যকরী মেহনতর সম্পর্ক না থাকে যেমন জুয়া বা দল নিজেদের সঙ্গতিহীনতার দরুণ (বর্তমান অভাব মেটানোর নিমিত্ত) এমন অনেক শর্তের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তৈরি হয়ে যায়, যেগুলো আদায় করা তার শক্তির বাইরে। তখন তার ঐ সম্মতি সত্যিকারের সম্মতি হয় না। তাই এমনি সমস্ত প্রকারের চুক্তি ও লেনদেন সম্মতিক্রমে অনুমোদত বলে ধরা যায় না। আর এইগুলোর আমদানির পবিত্র ও ন্যায়নুগ উপকরণ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ সমস্ত চুক্তি একটি সংস্কৃতিবান দেশের জন্য নিকৃষ্টতম, বীভৎস বা বাতিল চুক্তি।[১৫১]ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মামূলী ধরনের অধ্যয়ন ও এর প্রমাণ ব্যক্ত করে যে, ইসলামে উভয়পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতিই কোন বিষয়ের গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি নয়। অন্যের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে দিলেই খুনী তার অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তেমনি অবস্থার চাপে কেউ কোন ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে দিলেও তার উপর জুলুম জালানোর এখতিয়ার কোন পুঁজিপতির হতে পারে না। তাই দেখা যায়, যেসকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত অন্যায় এবং যা দিয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে পারস্পরিক সম্মতিকেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয় না।

---

১৪৯. উদ্ধৃত: ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মানুষ তাদের চুক্তিবদ্ধ শর্তানুযায়ী দায়িত্বশীল হবে, যদি তা হক ও ন্যায়ানুগ হয়।"[১৫২]ইসলাম সর্বস্তরে ন্যায়নীতি প্রচলন করতে চায়। ন্যায়কে সে অগ্রে স্থান দেয়। যেখানেই তা আহত হয় সেখানেই সে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইসলামের মূল কথা হলেঅ নবী করীম (স.) বলেন, "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনা।"[১৫৩]

আজকের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘাত হল মজুরী নির্ধারণ সমস্যা। কি করে মজুরি নির্ধারণ করা হবে, এ সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ নানা মত পোষণ করে থাকেন। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থানুসারে মজুরী নির্ধারণের সূত্র হলো যেমনভাবে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগানোর অনুপাতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের দামও তেমনি ও যোগানোর অনুপাতে নির্ণীত হবে। অর্থাৎ চাহিদা বেশি হলে মজুরী বেশি হবে কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ অধিক হলে মজুরী কমে যাবে। তারা বলেন, দ্রব্যের দাম যেমন প্রান্তিকে উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি শ্রমিকের মজুরীও তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরী নিরূপণের প্রধান সূত্র হলো দক্ষতানুসারে কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরী। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই দক্ষতা অনুযায়ী তার থেকে কাজ নেওয়া হবে কিন্তু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেকে তাকে মজুরী দেওয়া হবে।

সমাজবাদী দেশগুলোর বর্তমান কার্যক্রম সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজকাল সেখানেও কাজের দক্ষতানুসারেই মজুরী দেওয়া হয়ে থাকে, শ্রমিকদের প্রয়োজনানুযায়ী নয়।

মননশীলতার সাথে যাঁচাই করলে দেখা যায়, উপরোক্ত একটি মতও মজুরী নির্ধারণের সুষ্ঠু ও সুসংহত ধারা হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে দ্রব্যবস্তুর মতোই প্রাণহীন ও অসহায় করে তুলেছে। দ্রব্য যেভাবে চাহিদা ও যোগানোর অধীন, তার কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, তেমনি শ্রমিককেও চাহিদা ও যোগানের অধীন করে ফেলা হয়েছে। এতে পুঁজিপতিদের খামখেয়ালীর উপর শ্রমিকদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে ক্রেতার মর্জির উপর দ্রব্যের অবস্থা নির্ণীত হয়, ঠিক তেমনি এখানে শ্রমের ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজিপতির মর্জির উপর শ্রমিকদের অবস্থা নির্ভর করে।

এটি সর্বজনবিদিত কথা যে, আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য দেশের অধিকাংশ অর্থ এবং কর্মবিনিয়োগ স্থল পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। পরিণামে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এতে শ্রমিকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমের যোগান বেড়ে যায়। এতে শিল্প-মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার যথেষ্ট সুযোগ পায়, বিশেষ করে অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের জন্য এ এক চরম অভিশাপ। আর এই জন্যই বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ একে একতরফা সূত্র বলে অভিহিত করেছেন। এ সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা কখনই সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকটি উৎপাদনই কয়েকটি উৎপাদন-উপাদানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়, সম্পূর্ণ দ্রব্য হতে প্রত্যেকটি উপাদানের ব্যক্তিগত অংশ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকদের দক্ষতার কোন বিবেচনাই করা হয়নি। এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। মজুরী নির্ধারণের বেলায় শুধু শ্রমিকদের প্রয়োজনের প্রতিই লক্ষ রাখা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটি কানে মধু বর্ষণ করলেও এ দ্বারা কোনদিন কার্যোপযোগী কোন

---

১৫২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩১৪১

১৫৩. উদ্ধৃত: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯

Dhaka University Institutional Repository

অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হতে পারে না। কারণ শ্রমিক যদি তার দক্ষতার দাম না পায়, এর প্রতিদানে সে যদি কিছুই লাভ করতে না পারে, তবে সে দক্ষতা অর্জনের জন্য কখনই আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না। প্রয়োজন কখনও সমান হতে পারে না। এর মধ্যে তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। একজন ইট বহনকারী শ্রমিক যদি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা মজুরী পায়, আর একজন দক্ষ মিস্ত্রী যদি তার প্রয়োজন অনুসারে দু'শত টাকা মজুরী পায়, তবে কেন সে দক্ষ মিস্ত্রী হতে যাবে? কিসে তাকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। তাই ক্ষ ফলে উৎাদনের কার্যধারার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে যাবে, সু-কঠিন আইনের শাসনও একে রোধ করতে পারবে না। এই সূত্রানুযায়ী ও মজুরী নির্ধারণ সমসার সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায় না। আর এটিই সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটিয়েছেন এবং সমাজতন্ত্রকে জাদুঘরে নিক্ষেপ করেছে। এর সামঞ্জস্য সমাধান করেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই একমাত্র জীবন-বিধান যা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সকল চরম প্রানিতকতা হতে মুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হলো-নূন্যতম মজুরী প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে যেন সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। কারণ, শ্রমিক একান্তভাবে অসহায় না হয়ে পড়লে কোনদিন সে তার পয়োজনের চেয়েও কম মজুরী লাভের চুক্তিতে আসতে পারে না। আর যে চুক্তি শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগ করা হয়, ইসলামের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। আল্লাহ্ পাকের কালাম এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমান, "অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।"[১৫৪]

তিনি আরও বলেন, "এদেরকে (অধীনস্থদেরকে) পরিতৃপ্ত করে দেবে।" আল্লাহ্পাক তা'য়ালা বলেন, "যে সমস্ত মাকে সন্তানের পিতা ত্যাগ করেছে, তাদেরকে দুধ খাওয়ানোর নিমিত্তে নিয়ে আসলে সন্তানের পিতা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে জীবিকা ও কাপড়-চোপড় দেবে।"[১৫৫]

উপরোক্ত আয়াত ও আল-হাদীস পর্যালোচনা করলে নিম্মোক্ত দু'টি সিদ্ধান্তে আনায়াসেই পৌঁছা যায়। যথা- ক. মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে।

খ. এমন মজুরী দেবে, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়।

কারণ ইসলামের মজুরী নির্ধারণ নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এখানে শ্রমিক চাহিদা ও যোগানের, বাজারের সব রকম ওঠা-নামার অধীন নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, নিম্নতম মজুরী কি করে নির্ধারণ করা যাবে? এর উত্তরও আমরা সাহাবা-ই-কিরামের কার্যক্রমের মধ্যে পাই। হযরত উমর (রা.) এভাবে খোরাকী নির্ধারণ করতেন যে, সুস্থ-সবল ভাল খেতে পারে এমন কয়েকজনকে ডেকে এনে খেতে দিতেন এবং তাদের খাওয়ার অনুপাতে তা নির্ধারণ করে দিতেন।[১৫৬] তিনি তাঁর খিলাফতের আমলে কর্মচারীদেরকে তাদের প্রয়োজন এবং যে শহরে বাস করবে তার পারিশার্শ্বিক

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী ভাতা দিতেন। আমরাও আজকাল আমাদের পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করতে পারি। কারণ মানুষের প্রয়োজন, স্থান, কাল ইত্যাদি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে সমসাময়িক সরকার মধ্যস্থতা করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কাজের দক্ষতারও মূল্য দেয়। অর্থাৎ কাজের দক্ষতা হিসেবে মানুষের উপার্জনের তারতম্য ইসলাম স্বীকার করে। কারণ, এ না হলে কোনদিন কার্যোপযোগী ও সহজাত শ্রমনীতির বাস্তবায়ন সম্ভপর হয় না। আর এর দ্বারা ইসলাম সমাজতন্ত্র হতে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পেরেছে। এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "আমি মানুষের জাগতিক জিন্দিগীতে তাদের জীবিকা উপকরণসমূহ বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কতকজনকে কতকজনের উপর মর্যাদার প্রাধান্য দিয়েছি-যাতে একে অন্য থেকে কাজ নিতে পারে।" কিন্তু এ তারতম্য ও স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও এমন কতিপয় বিধি-নিষেধ দ্বারা একে আবদ্ধ রাখা হয়েছে যাতে উক্ত তারতম্য মাত্র ততটুকুই থাকে যতটুকু একটি সুসংহত ও কার্যকরী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবশ্যক, এর বেশি নয়।

এমন অনেক পুঁজিপতিকে দেখতে পাওয়া, যারা শ্রমিকের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মজুরী নির্ধারণ না করেই তার কাছ থেকে কাজ নেয় এবং নিজে যা মন চায় তাই মজুরী দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চায়। শ্রমিক তার আর্থিক দুর্বলতার কারণে এর কিছুই করতে পারে না, সবকিছু তার নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। ইসলাম এই সমস্ত ব্যাপারকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন-রাসূলুল্লাহ (স.) পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে মজুর থেকে কাজ নেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের বিধান

ব্যয়ের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে 'ইনফাক'। প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় করা, যে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলে। কুরআনে 'ইনফাক' সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"লোকেরা আপনাকে কী ব্যয় করবে (ইনফাক) সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; আপনি বলূন, যা ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথচারী মুসাফিরদের জন্য"।[১৫৭]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত তা।"[১৫৮]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা থাকে। আল্লাহ্ যাকে চান এরূপ বহুগণ বৃদ্ধি করে দেন। আলাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১৫৯]

তিনি আরো বলেন, "যারা আল্লাহ্র পথে ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশ ও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও

১৫৭. আল-কুরআন, ২:২১৫

১৫৮. আল-কুরআন, ২:২১৯

১৫৯. আল-কুরআন, ২:২৬১

Dhaka University Institutional Repository

হবে না।[১৬০] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "শোন হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের অর্জিত উত্তম বস্তু থেকে এবং তা থেকে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই; কিন্তু তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার মনস্থ করবে না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। জেনে রেখো, আ্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[১৬১]

তিনি আরো বলেন, "যারা নিজেদের ধন-দৌলত রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্য ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১৬২]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যারা লোক দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না, শয়তান কারো সাথী হলে সে সাথী কতনা মন্দ।"[১৬৩]

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করে না। তারা ছোট কিংবা বড় যাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ্ তার চাইতে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদের দিতে পারে।"[১৬৪]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।"[১৬৫]

উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ তিনটি পন্থায় ব্যবহার করে। যেমন-

ক. মওজুদ বা সঞ্চয় করে; খ. বিনিয়োগ (Investment) করে; গ. ব্যয় বা খরচ করে।

অর্থ-সম্পদ নিশ্চয়ই সঞ্চয় বা জমা করে রাখাকে ইসলাম পছন্দ করেনি। হালাল পন্থায় লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষ প্রতিরোধের বিধান :

নিজের যাবতীয় অর্থ-সম্পদকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করাকেই সে মূলধনের সার্থক প্রয়োগ বলে মনে করে। দেশের শ্রমিক মজুরদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করবে। একক করখানার প্রচুর উৎপাদন কত মানুষকে বেকার সমস্যার সম্মুখীন করছে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন দেশের রাষ্ট্র-সরকার

১৬০. আল-কুরআন, ২: ২৬২

১৬১. আল-কুরআন, ২:২৬৫

১৬২. আল-কুরআন, ২:২৭৪

১৬৩. আল-কুরআন, ৪:৩৮

১৬৪. আল-কুরআন, ৯:১২১

১৬৫. আল-কুরআন, ৯:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

কি কি জটিলতা বিব্রত হয়ে পড়ছে, এবং সমষ্টিগত শান্তি ও সমৃদ্ধি কতখানি ব্যহত হচ্ছে ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই এই দিকে গভীর দৃষ্টি রেখে এবং ইহার প্রতিবিধানমূলক পন্থা অবলম্বন করেই তার পুঁজি বিনিয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামগ্রিক স্থৈর্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে শ্রমিক-মজুর রাষ্ট্র সরকার ও দেশবাসীর সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে।

বস্তুত এ পটভূমিকার ভিত্তিতে ইসলামী সমাজের প্রত্যেক শিল্প এলাকায় পারস্পরিক সাহায্যের এমন একটি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কারখানা মালিক, শ্রমিক ও রাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি সকলেই শরীক থাকবে। অর্থনীতিতে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ কয়েকজন লোককেও পরামর্শদাতা হিসেবে এই সংস্থার নিযুক্ত করা হবে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হবে-

প্রথমত শ্রমিক মজুরের যাবতী অভাব-অনটন, সমস্যা ও জটিলতা দূর কার, তাদের প্রয়োজন ও দাবি পূরণ করা

দ্বিতীয়ত দেশে বেকার-সমস্যাও ব্যবসায়ে মন্দভাব সূচিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করা।

তৃতীয়ত ব্যবসায় সংক্রান্ত বিপর্যয় (Trade cycles) প্রতিরোধের জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

চতুর্থত স্বয়ং কারখানা-মালিককে পণ্য রপ্তানি বা কাঁচামালের আমদানীর ব্যাপারে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তা দূরীভূত করতে চেষ্টা করা।

পঞ্চমত সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য রাষ্ট্র সরকারের উপর যেসব দায়িত্ব চেপে বসে, তা দূর করার ব্যবস্থা করা।

শিল্প প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণকারী কোন লোকের কোনরূপ অসবিধার বা সমস্যার সৃষ্টি হলে তা নিয়ে হৈ চৈ করা, ধর্মঘট করা বা অন্য কোনরূপ অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার পূর্বেই প্রতিষ্ঠান ইহার অভিযোগ দূর করার জন্য অগ্রসর হবে। মজুর-শ্রমিকের বেতন ও কাজের সময় সংক্রান্ত অসুবিধা, কারখানা মালিকের কারবারি অসুবিধা ও ট্যাক্সের বোঝা, বৈদেশিক পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা সমস্যা, রাষ্ট্র-সরকার ও শিল্পসংক্রান্ত কোন প্রতিকূলতা প্রভৃতি পারস্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে দূর করার চেষ্টা করবে। এই প্রতিষ্ঠান শুধু অন্তঃসারশূণ্য নিয়মতান্ত্রিক শক্তিরই ধারক হবে না, নৈতিক আবেদনের শক্তিও ইহার অর্জিত থাকবে। এই প্রতিষ্ঠান পরিপূর্ণ সহনুভূতি ও সহৃদয়ভাবে সাথে সমগ্র ব্যাপারের তদন্ত করবে, অশান্তির মূল কারণ নির্ধারণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। বিশ্বাসঘাতকতা, সকল প্রকার দুর্নীতি ও শোষণ-পীড়নের তত্ত্বানুসন্ধান করবে এবং এভাবে যাবতীয় অশান্তি, বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক সমস্যার পথ রুদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা ও পথ-নির্দেশ করবে।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতাকে স্থায়ী ও সার্বজনীন কল্যাণকর করে গড়ে তুলার জন্য নিম্নলিখিতরূপ কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে-

১. এই সংস্থা ব্যবসায়ের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং যুক্ত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার করবে। এই কারবারে শ্রমজীবগণও যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার অবাধ সুযোগ করে দেবে। মিলিত অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে চালু ব্যবসায়ে শ্রমিকদিগকে বাৎসরিক হিসেবে এক একটি শেয়ার অর্ধমূল্যে ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হবে। আর বাকি অর্ধেক মূল্য কোম্পানী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বোনাস হিসেবে শ্রমিকের নামে আদায় করবে। অথবা প্রত্যেক শ্রমিকের মাসিক বেতন হতে সামান্য পরিমাণ অর্থ জমা করা হবে। এভাবে বৎসরের শেষে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হবে, তত পরিমাণ টাকা স্বয়ং কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান নিজের তরফ

Dhaka University Institutional Repository

হতে দিয়া ইহার সাথে যোগ করবে। এবং এই মোট টাকা দ্বারা শ্রমিকের জন্য মূল্য ব্যবসায়ের একটি অংশ ক্রয় করা হবে। এই পন্থানুসারে একজন শ্রমিক একাধারে দশ বৎসরকালে কাজ করে ২৫টি স্থায়ী শেয়ার লাভ করতে পারে। এ শেয়ারসমূহ তাকে এবং তার উত্তরাধিকারীদেরকে বহুদিন পর্যন্ত মুনাফার অংশ দিতে পারবে। এ কাজে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইহার যাকাত ফান্ড হতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে শ্রমিকদিগকে স্বাবলম্বী হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দিতে পারে।

এই পন্থায় কাজ করলে ধীরে ধীরে একটি প্রতিষ্ঠানে পুঁজিদার ও শ্রমিকের স্বার্থ সমান ও সংযুক্ত করে তোলা খুবই সহজ হয়ে পড়বে। ফলে অসহায় মজুরদের শোষণ-নিষ্পেষণ করার, ছাটাই করার কিংবা বেতন হ্রাস করার মত কোন বিপদে তাদিগকে নিক্ষেপ করার কোন সুযোগই কেহ পাবে না।

২. এমন কারখানা ও এই সংস্থার পক্ষ হতে স্থাপিত করা যেতে পারে, যার বিভিন্ন কর্মচারীই হবে ইহার আসল অংশীদার। ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যদি প্রত্যেক বৎসরই এই পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার নিযুক্ত করার জন্য দান করে, তবে তাতে আরো অধিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

৩. দেশের সমগ্র শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবীদিগকে সকল প্রকার আকস্মিক বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যবস্থাধীন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে এবং তাতে নিম্মলিখিত উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করা যেতে পারবে।

ক. মজুর ও চাকুরীজীবীদের বেতন হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাসিক চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

খ. কারখানা মালিকম, ব্যবসায়ী কিংবা সরকার যে মজুরদিগকে খাটাচ্ছে, সে উল্লেখিত পরিমাণ বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ কিছু অর্থ মজুরের উক্ত ফান্ড প্রতি মাসে জমা করে দেবে।

গ. কারখানা মালিক, ব্যবসায়ী কি রাষ্ট্র-সরকার কোন কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করলে একমাসের বেতন পরিমাণ অর্থ তার নামে এই ফান্ড জমা করার জন্য তাকে বাধ্য করা যেতে পারে। ইহার ফলে মজুর ছাঁটাইর বর্তমান হার অনেকটা হ্রাস পাবে।

ঘ. যাকাত ফান্ডের বাৎসরিক বাজেট হতে একটি বিরাট অংশ এই ফান্ডে জমা করতে হবে।

ঙ. শিল্পোৎপাদনের জন্য যে করাখানাই স্থাপন করা হবে, উহার উৎপাদন শক্তির হার অনুযায়ী মালিকের প্রতি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাঁদা ধার্য করা যেতে পারে। তা সরাসরি বেকার সমস্যা দূরীকরণ ফান্ডে জমা হতে থাকবে। অবশ্য এই চাঁদা ধার্যকরণ সরকারী বাধ্যবাধকতা ব্যতীত নিছক নৈতিক ও মানবিক আবেদনের মারফতেই করতে হবে।

এই ফান্ড হতে বেকার শ্রমজীবীদিগকে দুরাবস্থা ও বিপদকালে কেবল বৃত্তিই দেওয়া যাবে না, ইহা হতে দেশে গাহস্থ্য-শিল্পের একটি ব্যাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বেকার লোকদিগকে উপর্জনশীল করে তোলাও অনেক সহজ হবে।

এ সংস্থার পক্ষ হতে বিভিন্ন এলাকায় কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারবে। সেখানে সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট ও সরকারী অফিসাদী সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত থাকবে।

৪. এ সংস্থার অধীন এমন একটা সাধারণ ফান্ড সংগ্রহ করা যেতে পারবে, যাতে দেশের শিল্পপতিগণ নিজ নিজ মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ জমা করবে এবং সরকার ও যাকাত ফান্ড হইত তাতে সাহায্য দান করবে। এই ফান্ড একান্তভাবে নিযুক্ত হবে দেশের শ্রমিক-মজুর ও সাধারণ মেহনতী জনতার জীবন-মান (খাদ্য, বসবাস, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) উন্নত করার জন্য। সকলের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ীই এই কাজ সম্পাদন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কারবারী ইন্সিওরেন্সের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা গঠনের বিধান :

ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পপতিকে আকস্মিক বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্য পুঁজিবাদী সমাজে ইন্সিওরেন্স বা বীমা কোম্পানী স্থাপন করা হয়; কিন্তু ইহাতে সুদ ও জুয়ার প্রাধান্য থাকায় ইহার মূল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ইসলামী সমাজে 'পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার' মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু সুদ ও জুয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ তাদের থাকবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ প্রত্যেক শহরেই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য এক একটি সংস্থা গঠন করবে। ইহার একটি ফান্ড থাকবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের মোট মূলধন হিসেবে কিংবা আমদানীর হার অনুযায়ী মাসিক কি ত্রৈমাসিক নিয়মে টাকার একটি পরিমাণ আকস্মিক বিপদ হতে আত্মরক্ষা করার জন্য এ ফান্ডে জমা করবে এবং মূলত ইহা তার দান হিসেবেই গণ্য হবে। অতঃপর এই সংস্থার কোন সদস্যের আমদানীর উপর Source of income যদি আকস্মিক বিপদে পতিত হয়ে যায়, তবে পুনরায় ব্যবসায় শুরু করার জন্য এ ফান্ড হতে তাকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এককালীন দান হিসেবে মূলধন দেওয়া হবে। এক বৎসর কালের মধ্যে এ ফান্ডকে উক্ত রূপ যত সাহায্য দানই করতে হবে কার্যত তাতে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা সঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এ ফান্ড ক্রমশ উন্নতি লাভ করে বিপদগ্রস্ত লোকদের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারবে। এ ফান্ডের অর্থ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যেতে পারবে। তাতে ইহার পরিমাণ উত্তরোক্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

উল্লেখিত উদ্দেশ্য অন্য এক উপায়ে লাভ করা যেতে পারে। তা এই যে, এ সংস্থার প্রত্যেক সদস্য ইহার ফান্ডে যে টাকাই জমা করবে, সে নিজেই ইহার মালিক হবে এবং আকস্মিক বিপদকালে নিয়ম অনুযায়ী তা হতে বিনাসুদে ঋণ গ্রহণ করবে। এই ঋণ তাকে সুযোগ সুবিধা মত এক দিন আদায় করতে হবে।

পারস্পরিক সাহায্যের এ স্থানীয় সংস্থা সমূহকে মিলায়ে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা যেতে পারে। একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে এ কাজ সমগ্র দেশব্যাপী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে পারে।[১৬৬]

মুনাফা ও শিল্পপণ্যে মজুরের অংশ পাওয়ার বিধান :

ইসলামী অর্থনীতি মজুর শ্রমিককে শিল্পোৎপাদনে, উৎপন্ন শিল্পপণ্যে এবং ইহার মুনাফার অংশীদারী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বস্তুত মালিক-মজুর সমস্যা সমাধানের ইহা একটি অন্যতম প্রধান উপায়। সম্ভবত মালিক-মজুরের দ্বন্দ্ব সমাধানে ইহাপেক্ষা অধিক সাফল্যপূর্ণ ও কার্যকর পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। শিল্পোৎপাদনে যে বাড়তি মূল্য লাভ হয়, পুঁজিবাদী-সমাজে একমাত্র মালিকই তা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রই কেড়ে নেয় কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির এই পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাড়তি মূল্যকে মজুর ও মালিক উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উভয়কেই শিল্পপণ্য হতে ইনসাফের ভিত্তিতে লাভবান হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক মজুরকে মূল ব্যবসায়ের মুনাফা এবং শিল্পপণ্যে অংশীদারস্বরূপে স্বীকার করে নেয়ার অবকাশ রয়েছে তাই নয়, রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি হাদীস স্পষ্টভাবে ইহারই নির্দেশ পাওয়া যায়।

"তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সঙ্গে বসাও, সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দুই-এক মুঠু খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খেতে দেবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে"।[১৬৭]

১৬৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*,(খায়রুন প্রকাশনী, সংস্ক. ৬, ২০০৭), পৃ. ৩১৮

১৬৭. اذا كفا احد كم خادمه طعامه حره ودخانه- فليه خذ بيده فليقعده معه فان ابى فليا خذلقمة فليطعمه اياها- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী*

Dhaka University Institutional Repository

অন্য হাদীসের শেষাংশে ইহার কারণ বলা হয়েছে, "সে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য আন্তরিক যত্ন গ্রহণ করেছে।"[১৬৮]

একটি হাদীস খাদেমকে তার রান্না করা খাবার খাওয়ায় শরীক করার জন্য রাসুলুল্লাহ (স.) নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পার না"।

বস্তুত শ্রমিক-মজুরদিগকে লভ্যাংশ দান করা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ দেওয়ার নীতি যদি কার্যকর করা যায় তা হলে বর্তমান কালের সর্ব প্রকারের জটিল শ্রমিক-সমস্যার অতি সহজেই সমাধান হতে পার। ইহার ফলে মজুরদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মশীলতা এবং শ্রম ও পণ্যোৎপাদনের ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহ উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক লাভ ছাড়াও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির দিক দিয়ে ইহার মূল্য কোন অংশেই কম নয়। শ্রমিক ও মজুর যখন নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, মূল ব্যবসায়ও শিল্পের মুনাফা হতেও তাকে অংশ দেওয়া হবে, তখন তার কর্মপ্রেরণা শ্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিশেষ সর্তকতার সাথে ব্যবহার করবে। ফলে মূল লাভ হতে মজুরকে যে পরিমাণ অংশ দেওয়া হবে তার এ অভ্যন্তরীণ পরিবর্তিত ভাবধারার দরুণ মূল শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ ততোধিক বর্ধিত হবে। পক্ষান্তরে শিল্প-মালিকও এ ব্যবস্থায় নিজের সমূহ ক্ষতি মনে করবে না। শ্রমিকদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ কায়িক ও মানসিক সহযোগিতা লাভ করায় তারও মনোবল বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে শিল্প ও শ্রম-ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক নির্মল পবিত্র ফল্গুধারার সৃষ্টি হবে।

ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক-মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত হয়েছে এবং মূল শিল্পে এ উভয় পক্ষের স্বার্থ ও লক্ষ্যকে যেভাবে একীভূত করে দেওয়া হয়েছে তাতে এখানে শ্রমিক ও মালিকের মনে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের অবকাশ থাকতে পারে না। বরং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভই স্বাভাবিক। এখানে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার এবং মালিক পক্ষের লক-আউট ঘোষণা করার কোন প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না।

---

১৬৮. এ হাদীসমূহের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ইমাম নবী লিখছেন, এই হাদীসে শ্রমিকদের প্রতি উত্তম ও সহানূভূতিপূর্ণ ব্যবহারের বিশেষ করে তার ব্যাপারে, যে লোক ইহা প্রস্তুত করেছে কিংবা ইহা বহন করে এনছে। তার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা সে এ জন্য আগুনের উত্তাপ ও ধুয়া-জ্বালা সহ্য করেছে, ইহার সাথে তার মন সম্পর্কিত হয়েছে সে ইহার গন্ধ নিয়েছে। (আল্লামা ইমাম নববী; *তাহফাতুল আহওয়াযী শরহু তিরমিযী)*

১৬৯. *তাহফাতুল আহওয়াযী শরহু তিরমিযী*, প্রাগুক্ত

১৭০. اعطوا العمل من عمله فان عامل الله لايخيب- আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায় এর প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা :

আমাদের সার্বিক জীবনের বর্তমান বিপর্যের কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিকার অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের প্রস্তাব ও সুপারিশমালা এবং অপরিহার্য পদক্ষেপগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের জন্যে সমাজের সুধী ও সরকারী দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

- ❖ সমাজে অপরাধ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান চালু ও কার্যকর করা হলে অবাধ অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা হবে। কোন সমাজে এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যথার্থ প্রয়োগ না থাকলে সমাজ অস্থিতিশীলত হয়। ফলে অপরাধ ও দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়ে যায়।

- ❖ অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কেউ আর তা করার সাহস পায় না। সে সাথে আইনের ফাঁকে শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার সকল পথ রোধ করতে হবে।

- ❖ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে প্রকৃত অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদেরকে সনাক্ত করে সঠিক তথ্য দিয়ে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে হবে। আর নিরপরাধ ও নিরীহ লোকদেরকে মিথ্যা মামলায় না ফাঁসিয়ে সত্যের অনুসন্ধানী হতে হবে।
- ❖ সাধারণভাবে মুসলিম নারী পুরুষ, যুবক-যুবতীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাদের পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পরিবার, সমাজ ও জীবন পদ্ধতি পরিহার করে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে হবে।
- ❖ আমাদের আদর্শ হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর গড়া ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। ইউরোপীয় ও আমেরিকান পরিবার ও সমাজের রীতিনীতি শুধু পারিবারিক বিপর্যয়েরই সৃষ্টি করে না, বরং মানুষকে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট চরিত্রের বানিয়ে দেয়। অতএব তাদের দেখাদেখি অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করে আমরা যেন কিছুতেই পশুত্বের স্তরে নেমে না যাই সে দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।
- ❖ ইসলামে নারী ও পুরুষের দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার একটা নির্দিষ্ট রীতিনীতি ও সীমারেখা রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে এক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ বা কোনো সীমারেখা নেই। তাই আমাদের পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুসরণ না করে ইসলামের আদর্শকেই অনুসরণ করতে হবে।
- ❖ মুহার্‌রম নারী পুরুষ ছাড়া অন্যান্যদের অবাধ দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় অবাধ মেলামেশার ফলে পরকীয়া প্রেম, দাম্পত্য জীবনে কলহ, যিনা ও হত্যা বেড়ে যাবে।
- ❖ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তাদের কর্মক্ষেত্রও আলাদা। সমাজের নিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্র চালু করতে হবে।
- ❖ বিশেষ প্রয়োজনেই মেয়েরা ঘর থেকে বের হবে। অকারণে ঘোরাফেরা করা, পথে-ঘাটে, পার্কে-লেকে, বাগানে-রেস্তোরাঁয় 'হাওয়া খেয়ে' বেড়ানো, দোকানে-বাজারে শপিং করা এবং হোটেল-ক্লাব, পার্টির নিমন্ত্রণে মেয়েদের অবাধ যাতায়াত ও বিচরণ বন্ধ করতে হবে এবং নিতান্ত অপরিহার্য কাজগুলোকে বিধিবন্ধ ও নিয়মানুগ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- একই ক্লাস-কক্ষে পাশাপাশি ও কাছাকাছি বসে পড়াশুনা, একই অফিসে-কক্ষে সামনা-সামনি বা মুখোমুখী ও পাশাপাশি বসে কাজ করা যত শ্রীঘ্র সম্ভব বন্ধ করতে হবে। কেননা এখান থেকে অন্যায় ও পাপের দিকে পরিচালিত হওয়ার সূচনা হয়ে থাকে।
- সমাজে বেশি বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ের অবিবাহিত থাকার বর্তমান রেওয়াজ পরিবর্তিত না হলে অনেক প্রকারের অন্যায়-অনাচারই বন্ধ করা যাবে না। তাই বিয়েকে শুধু সহজসাধ্যই নয়, উপযুক্ত বয়স হলে অবিলম্বে বিয়ে অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে, সে জন্যে সামাজিক তাগিদ এবং চাপও সৃষ্টি করতে হবে।
- বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের প্রচলন সাধারণ পর্যায়ে হলেও সমাজের উচ্চ পর্যায়ে পরিত্যক্ত হতে যাচ্ছে। আর এর দরুন নৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়ে দেখা দিচ্ছে অনেক বিপর্যয়। অথচ বিধবা বিয়ের বিধান ছিল বিশ্ব-নারী জাতির প্রতি ইসলামের এক বিশেষ অবদান। আজ তাকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। এক বা দুই সন্তানের যুবতী মা বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হলে পরে পুনরায় বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার প্রবণতা বর্তমানে উচ্চ সমাজে প্রবল বরং এ কাজকে ঘৃণ্য মনে করা হচ্ছে। এ ভাবধারার আমূল পরিবর্তন জরুরী।

- ইসলামী মূল্যবোধ ও মূল্যমানের ভিত্তিতে অপরিহার্য প্রয়োজনে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অবস্থা যদি এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, স্ত্রী-স্বামীর সাথে আর থাকতেই পারছে না, তখন হয় স্বামীকে আপনা থেকেই তাকে তালাক দিতে রাজি হতে হবে, না হয় স্ত্রী তার নিকট থেকে ‘খুলা’ তালাক গ্রহণ করবে অথবা আদালত বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তার স্ত্রী তো ‘হারাম’ হয়ে যাবেই, সেই সঙ্গে ইসলামী পদ্ধতির বিপরীত পন্থায় তালাক দেয়ার কারণে তাকে কঠিন শাস্তিও দিতে হবে।

- নাচ ও গানের বর্তমান ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। যুবতী সুন্দরী মেয়েরা কামোন্মক্ত ভিন পুরষদের সামনে নিজেদের রূপ ও যৌবন সমৃদ্ধ যৌন আকর্ষণমূলকভাবে অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে নাচবে ও গাইবে এ ব্যাপারটি কোনো পিতামাতা, সরকার ও শাসক কর্তৃপক্ষের বরদাশত হওয়া উচিত নয়। এ ধরনের সব কাজ আইনত বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় পরিবার হবে অশ্লীলতার কালিমায় পঙ্কিল, পারিবারিক জীবন হয়ে উঠবে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত।

- জ্বেনা-ব্যভিচারের আড্ডাগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। এজন্যে শরী‘আতের শাস্তি পুরাপুরি কার্যকর করতে হবে। কোড়া ও প্রস্তর নিক্ষেপণে মৃত্যুদণ্ড দানের যে শরী‘আতের বিধান রয়েছে তা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে হবে। শরী‘আতের এ গুরু দায়িত্ব ব্যক্তির একা নয়, বরং তা গোটা সমাজ, দেশ ও সরকারের।

- রাজনীতি যার যার কিন্তু দেশ সকলের। দেশ একটি মৌলিক ভিত্তির উপর পরিচালিত হবে, কোন দল বা গোষ্ঠীর নিয়ম-নীতি বা ভাবাদর্শে নয়। কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নষ্ট করলে তাকে অবশ্যই আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। অন্যথায় অন্যরাও একনায়কতান্ত্রিক হয়ে উঠবে এবং দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করবে।

- বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় উদ্দেশ্য অর্জনের মনোভাব পরিহার করে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে। উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রথা পরিহার করে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবীন ও অভিজ্ঞ বিচারকদের মধ্য থেকে বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে। তাহলে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারবে। যে কোন রাজনৈতিক দল সরকারে থাকুক আর না থাকুক অযথা হয়বানির শিকার হবেনা।

❖ ক্ষমতাসীনরা বিরোধীদের উপর প্রশাসনকে দলীয় ক্যাডার বাহিনী হিসেবে ব্যবহার না করে তাদেরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। দলীয় মনোভাবের ভিত্তিতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রদান করা হলে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠবে এবং প্রজাতন্ত্রের সেবক না হয়ে অপরাধ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে।

❖ সুদী লেনদেন সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সুদ বিহীন লেনদেন চালু করার জন্য ইসলামি শরী'আত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হরে। সাধারণ ব্যাংকগুলোকে ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর করতে হবে। সরকারিভাবে সুদের কুপ্রভাব জনগণকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

❖ সমাজে অনেক পুঁজিপতি আছেন যারা ভাট্রা বা দাদনের ব্যবসা করেন। এ খারাপ পেশা করার ব্যাপারে তাদেরকে বারণ করতে হবে। সরকার দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অর্থের তারল্য সৃষ্টি করবে। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে গিয়ে ভাট্রা গ্রহণ করার জন্য ধরনা দিতে না হয়।

❖ ঘুষ একটি সমাজের মারাত্মক ব্যাধি এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করার উত্তম হাতিয়ার। ইহা সমাজকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই ঘুষের মন্দ দিকগুলো জনগণকে অবহিত করতে হবে। ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। পাশাপাশি সরকারিভাবে ঘুষের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করলে অনেকাংশে তা প্রতিহত করা সম্ভব।

❖ যিনার শাস্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে যিনা হ্রাস পাবে। এজন্য যিনার সকল ক্ষেত্র, কেন্দ্র ও স্থান ধ্বংশ করতে হবে এবং যিনার সঙ্গে জড়িতদেরও আইনের আওতায় এনে তাদেরকেও দৃষ্টানন্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ আইন প্রয়োগকারি সংস্থাকে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাই তাদের দায়-দায়িত্ব হল প্রকৃত অপরাধীদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা এবং ঘুষের মাধ্যমে লঘু অপরাধীকে গুরু অপরাধী ও গুরু অপরাধীকে লঘু অপরাধী বানিয়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত করা সমীচীন হবে না। কেননা এতে দুর্নীতিবাজরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে।

❖ অপরাধ ও দুর্নীতির সঠিক শাস্তি পক্ষপাতহীনভাবে জনসম্মুখে প্রদান করতে হবে। যাতে মানুষের মনে এ ভয় সৃষ্টি হয় যে, এ ধরনের অপরাধ ও দুর্নীতি করলে তাকেও এমন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

❖ অভাবের তাড়নায় চুরি করলে তার অভাব মোচনের মাধ্যমে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। আর পেশাদারী চোর হলে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে চোরের হাত কেটে দিতে হবে। কেননা তা না হলে দেশ ও জনপদ চোরের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ প্রশাসনকে স্বজন-প্রীতি,দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। সকলের জন্য আইন সমান এই নীতিতে বিশ্বাসী হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। মানুষ অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকবে।

- ❖ জনগণকে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। সামাজিক দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে সকল অপশক্তি নিধনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। গণআন্দোলনের মুখে সকল অপরাধ ও দুর্নীতি বিতাড়িত হবেই।

- ❖ মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে। মালিকরা শ্রমিকদেরকে প্রতিপক্ষ না ভেবে আপন ভাবতে হবে। তাদের ন্যায্য মজুরী সময় মত প্রদান করতে হবে। তাদের প্রতি জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়নের পথ পরিহার করে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অপরপক্ষে শ্রমিকদেরকেও তাদের কর্তব্যের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কোন বিধ্বংশী কার্যক্রমে জড়াবে না। যে কোন অজুহাত দেখিয়ে কারখানায় অবরোধ করা, ভাংচুর করা, অগ্নি সংযোগ করা সমীচীন হবেনা।

- ❖ জীবিকার উৎস হিসেবে প্রত্যেকে নিজ কর্মকে সম্মান এবং মর্যাদা দেখিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং কল-কারখানা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রমিকদেরকে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মালিক বা কারখানা বাঁচলে শ্রমিক বাঁচবে, তার পরিবার পরিজন বাঁচবে এবং তারা সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবে।

- ❖ জীবন বিমা শ্রমিকদের জন্য অপরিহার্য অঙ্গ। মালিকদের উচিত শ্রমিকদেরকে গ্রুপ বিমার অন্তর্ভূক্ত করা যাতে কোন শ্রমিকের সমস্যা হলে বিমা কোম্পানী তার ঝুঁকি গ্রহন করতে পারে এবং কারখানার মালিককে নিদারুন কষ্ট থেকে রক্ষা করে।

- ❖ ব্যবসায়ীদেরকে উদার মন মানসিতার অধিকারী হতে হবে। খাদ্র পণ্য গুডাউনে মওজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। এ জন্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কেউ এমন অবস্থা তৈরী করতে নাা পারে।

- ❖ খাদ্যে ভেজাল মিশানো মারাত্মক অপরাধ। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। ভেজাল খাদ্য সনাক্ত করে তা বর্জন করতে হবে এবং ভেজালকারীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। ফরমালিন আমদানী ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। এ বিষয়ে আইন প্রয়াগকারী সংস্থাকে কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।

- ❖ নারী-পুরুষ সবাইকে নিজেদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি দানের পরিণতিতেই ব্যাধিগ্রস্থদের অন্তরে অপরাধ সৃষ্টি হয়। আর এ অপরাধ মানুষকে দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্চিত করে আর পরকালের জন্য জাহান্নামী হিসেবে তৈরী করে।

- ❖ মজুর-শ্রমিকদেরকে এমন পরিমাণ মজুরী দিতে হবে, যা তাদের কেবল জীবন রক্ষা করার পক্ষেই যথেষ্ট হবে না, তাদের স্বাস্থ্য ও দেহের শক্তি এবং সজীবতাও তা দ্বারা যথাথরূপে রক্ষিত হবে। এ জন্যে তাদের নিম্নতম ব্যয়-হিসেবে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। বসবাসের জন্য তাদের ঘরবাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্যকর ও প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন একটি পরিবার সংশ্লিষ্ট সকল লোকজনসহ তাদের পর্যাপ্ত সুবিধাসহ তথায় বসবাস করতে পারে।

- ❖ মজুরদের স্বাস্থ্য-ভগ্নকারী কোন কাজ তাদের দ্বারা করানো যাবে না। একাধারে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্তও কাজ করানো যাবে না, যার ফলে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে, তাদের কর্মদক্ষতা বিলুপ্ত হতে পারে। উপরন্তু মানবিকতার দৃষ্টিতে কাজের সময় নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং তাতে বিশ্রামের যথেষ্ট অবকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ❖ শ্রমিক-মজুরদের কাজে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার ও পাশবিক নির্যাতন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। বরং যথাসম্ভব সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করাই কর্তব্য হবে।
- ❖ কোন অবস্থাতেই তাদেরকে অসহায় করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তারা বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের জন্য 'পেনশন' এর ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ কর্মচ্যুত করার প্রয়োজন হলেও এমনভাবে তাদেরকে বেকার করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, যার ফলে তাদেরকে অনশনের সম্মুখীন হতে হয় বা ভিক্ষাবৃত্তির অবলম্বন করতে হয়। অতএব অকারণে ছাঁটাই করাও চলবে না।
- ❖ মজুর-শ্রমিকদিগকে বিশেষ কোন কাজে বা মজুরীর বিশেষ কোন পরিমাণের বিনিময়ে কাজ করতে জবরদস্তি ভাবে বাধ্য করা যাবে না। বরং তাদের কাজ বাছাই করার এবং মজুরীর পরিমাণ নিয়ে দরকষাকষি (Bargaining) করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার থাকতে হবে। আর মজুরীও পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।
- ❖ কাজ সম্পন্ন হলেই কিংবা নির্দিষ্ট মাস-পক্ষ সপ্তাহ অতীত হলেই অনতিবিলম্বে মজুরী বা বেতন আদায় করতে হবে। এই ব্যাপারে কোন রূপ উপেক্ষা বা গাফিলতি; কিংবা টালবাহানা করা চলবে না। মজুর শ্রমিকদের এবং তাদের সন্তানাদির শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করা কারখানা-মালিকের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য হবে।

অতএব, উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করে প্রকৃত অপরাধীকে ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করলে সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি বহুলাংশেই কমে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার :

আল কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এর শিক্ষা ও আদর্শ চিরন্তন ও শ্বাশ্বত। মানব জীবনকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী এতে রয়েছে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণীও মানব জীবন পরিচালনার জন্য এক মহান আদর্শ। রাসূলুলাহ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন: "আমি তোমাদের নিকট এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সেগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ" (বুখারী ও মুসলিম)। এ আইনের মৌলিকত্ব পরিবর্তনযোগ্য নয়। তবে সময় ও অবস্থার প্রয়োজনে এবং নতুন প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদের মাধ্যমে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে অপরাধ ও দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। মানুষ তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ন্যায়-নীতির পথ পরিহার করে অবাধে অপরাধ ও দুর্নীতি করে বেড়ায়। একদিকে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধের অভাবে অপরাধ ও দুর্নীতির ন্যায়বিচার হয় না, অপরদিকে মানুষ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে বেপরোয়াভাবে এসবে জড়িয়ে পড়ছে। এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উপযোগিতা ও প্রয়োগনীতি আজ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতিসহ সকল ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। যার কারণে আমাদের সার্বিক জীবনে হানাহানি, খুন, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠনসহ সকল অপকর্ম বেড়েই চলছে। অথচ এ আইনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং বান্দাদের সকল প্রকার অপরাধ ও দুর্নীতি দমন করা। রাসূলুলাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল যা গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য আদর্শ ও উদাহরণ, যা আজও মানুষকে সে সব অনুশাসনের দিকে আহবান করে। এখনো সৌদি আরব তথা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কানুনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হওয়ার ফলে অপরাধ ও দুর্নীতি অবাধে সংঘঠিত হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে অপরাধ ও দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আজ আমাদের দেশে সামাজিক অনুশাসনে ইসলামী মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে অপরাধীরা আইনের ফাঁকে বেঁচে যায়। আর এ বেঁচে যাওয়ার প্রবণতা মানুষদেরকে আরো বেশী আগ্রাসী করে তোলে। তাই তারা আরো বেশী অপরাধ ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে। মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত আধুনিক শাসন ব্যবস্থা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে সফল হলেও অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে, তা আজ প্রমাণিত। এ আইন দ্বারা পরিচালিত গোটা সমাজে ব্যাপক বিপর্যয়, অশান্তি ও চরম দুর্যোগ চলছে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগমনের সময় গোটা দুনিয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। ধর্ম, নীতিবোধ, ন্যায় বিচার বলতে কিছুই ছিল না। 'জোর যার মুলুক তার' ও 'খুনের বদলা খুন' সেই সমাজে রাসূলুল্লাহ (স.) অপরাধ ও দুর্নীতিপ্রবণ গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করেন। এ আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি মদীনায় সর্বপ্রকারের অপরাধ ও দুর্নীতি মূলোৎপাটন করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন করেন তা গোটা পৃথিবী খ্যাত। এ প্রসঙ্গে টমাস কার্লাইলের ভাষায়, "হযরত মুহাম্মদ (স.) সংঘঠিত বিপ্লব ছিল প্রচন্ড এক অগ্নি স্ফূলিঙ্গ, যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত যে অসত্য অমানবিকতার আবর্জনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা চোখের পলকে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলল।" সুতরাং আজকের চরম অশান্ত মানবতা ও মূল্যবোধ বিবর্জিত সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োগ ও যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে অপরাধ ও দুর্নীতি অনেকাংশেই লাঘব হবে। অতএব, ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১. আল-কুরআনুল কারীম

২. আল-জাস্সাস, আবু বকর : আহকামুল কুরআন, দারুল ফিকর ।তা. বি.

৩. আবু দাউদ, সুলাইমান : আস-সুনান, বৈরুত, দারুল ফিকর, তা. বি.

৪. আহমদ, ইমাম ইবনু হাম্বল : আল-মুসনাদ, মিশরঃ মুআসসাতু কুরতুবা, তা. বি.

৫. আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ : আল-জামি' বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, তা.বি.

৬. আবদুর রায্যাক : আল-মুছান্নাফ, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪১৩ হি.

৭. আল-বায়হাকী : আস-সুনান আল-কুবরা, মক্কাঃ মাকতাবাতু দারুল বায, ১৯৯৪

৮. আল-মু'জামুল সগীর, বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫

৯. আদ-দারিমী : আবদুল্লাহ, আস-সুনান, বৈরুতঃ দারুর কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.

১০. আল-কাদা'ঈ, মুহাম্মদ : মুসনাদুশ শিহাব, বৈরুতঃ মুআ'সসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬

১১. আসকালানী, ইবনু হাজর : ফাতহুল বারী সহিহীল বুখারী, বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি. ।

১২. আসকালানী, ইবনু হাজর : তাখলীছুল হাবীর, আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা, ১৯৬৫

১৩. আসকালানী, ইবনু হাজর : আদ-দিরায়াহ তাখরিযী আহাদীছিল হিদায়াহ, বৈরুত : দারুল মাআরিফাহ,তা. বি.

১৪. আস-সান'আনী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল : সুবুলস সালাম শারহু বুলুগিল মুরাম, দারুল হাদীস ।

১৫. আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনু আলী : নায়লুল আওতার, দারুত তুরাছ ।

১৬. আল-মাওসু'য়াতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত :ওয়াযারাতুল আওকাফওয়া আল-শুয়ূনআল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫

১৭. আয-যুহায়লী, ড. ওয়াহবা : আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৯

১৮. আস-সারাখসী, আবু বকর মুহাম্মদ : আল-মাবসূত, বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ ।

১৯. আল-কাসানী : আলা উদ্দীন, বদাইয়ূস সনাই, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলয়্যিাহ ।

২০. আল- কারযাবী, আল্লামা ইউচুপ : ইসলামে হালাল হারামের বিধান (অনু. মাওঃআবদুর রহীম), খায়রুন প্রকাশনী,১৯৯৭

২১. আল-মারগীনানী, বুরহানুদ্দীন আলী : আল-হিদায়াহ, দেওবন্দ, দারুল ফিকর ।

২২. আর-বাবরতী, মুহাম্মদ : আল-আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, দারুল ফিকর ।

২৩. আল-হাদ্দাসী,আবু বকর : আল-জাওহারাতুন নাইরিয়াহ, আল-মাতবাতুল খাইরিয়্যাহ ।

২৪. আল-আনসারী, যাকারিয়া : আসনাল মাতালিব, দারুল কিতাবিল ইসলামী ।

২৫. আল-হায়তমী, ইবনু হাজর : তুহফাতুল মুহতাজ, বৈরুতঃদারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী ।

২৬. আর- রামালী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ : নিহায়াতুল মুহতাজ, বৈরুতঃ দারুল ফিকর ।

২৭. আল-জুমাল,সুলায়মান : ফুতুহাতুল ওয়াহ্হাব, বৈরুতঃ দারুল ফিকর ।

২৮. আল-বুজায়রমী, সুলাইমান : তুহফাতুল হাবীব, বৈরুতঃ দারুল ফিকর ।

২৯. আল-আনসারী, যাকারিয়া : আল-গুরার আল-বহিয়্যাহ,আল-মাতবাআতুল ইয়ামানিয়্যাহ ।

৩০.আল-বাজী, সুলায়মান : আল- মুন্তকা শারহুল মুয়াত্তা, দারুল কিতাবিল ইসলামী ।

৩১. আল- বুজায়মী, সুলাইমান : আত-তাজরীদ, দারুল ফিকরিল আরবী ।

৩২. আল-আনসারী, যাকারিয়া : ফাতহুল ওয়াহ্হাব, বৈরুতঃদারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি.

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. আল- মাওয়াক, আব আবদুল্লাহ মুহাম্মদ : আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
৩৪. আল-মাওয়াক, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ : আত-তাজওয়াল ইকলীল, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
৩৫. আল-খারাশী, মুহাম্মদ : শারহু মুখতাছারুল খলীল, দারুল ফিকর।
৩৬. আলী, ড. আহমদ : ইসলামের শাস্তি আইন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর, ২০০৯
৩৭. আর-রুআয়নী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ : মাওয়াহিবুল জলীল, দারুল ফিকর।
৩৮. আদ-দাসূকী, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ : আল-হাশিয়াতু আলাশ শারহিল কবীর, দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ।
৩৯. আশ-শাভী, আহমদ : বুলগাতুল সালিক রি আকরাবির মাসালিক, মিশর: দারুল মা'আরিফ।
৪০. আল-মরদাভী, আলাউদ্দীন : আল-ইনসাফ ফী মা'আরিফাতির রাজিহ--, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী।
৪১. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ : ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী, ২০০৭
৪২. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ : অপরাধ প্রতিরোধ ইসলাম, খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী, ২০১০
৪৩. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০০৮
৪৪. আল-বহুতী, মানছুর : কাশশাফুল কিনা, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
৪৫. আর-রুহায়বানী, মোস্তফা : মাতালিবু উলিন নুহা, আল-মাকতাবুল ইসলামী।
৪৬. আর-রাযী, মুহাম্মদ : মুখতারুস সিহাহ, বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৫
৪৭. আল-মু'জামল ওয়াসিত, ইউ, পি. : কুতুবখানা হুসায়নিয়্যাহ, দেওবন্দ।
৪৮. আল-বহুতী, মানছুর : দকা'ইক উলিন নুহা, আলামুল কুতুব।
৪৯. আস-সুবকী,আবুল হাসান আলী : আল-ফাতওয়া, দারুল মা'আরিফ।
৫০. আল-মাওয়াদী, আবুল হাসান আলী : আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
৫১. আল-হায়তমী, ইবনু হাজর : আয-যাওয়াজির, আন ইকতিরাফিল কাবাইর, দারুল ফিকর।
৫২. আল-ফাওয়ান, ড,.সালিহ : আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী, রিয়াদ : ইদারাতুল বহুছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ১৪১৩ হি.
৫৩. আমীমুল ইহসান, মুফতী মুহাম্মদ : কাওয়াইদুল ফিকহ, ঢাকা: ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬১
৫৪. আওদাহ, আবদুল কাদের : আত-তাশরী'ইল জিনাই আল-ইসলামী, বৈরুত, ১৯৮৩
৫৫. আবদুর রহীম, মুহাম্মদ : অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ই.ফা.বা. ২০০৭
৫৬.আবদুল আজিজ, াহিমদ ইবনু : আদ-দুরুল মানছুর, দা ইবনিল আছীর, রিয়াদ ২০০১
৫৭. আল-রুকবান, আবদুল্লাহ : আল-কিসাস ফিন নাফস, বৈরুত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪০০হি.
৫৮. আত্-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনু জরীর : জামিউল বয়ান আত্-তাভীলিল কুরআন, বৈরুত:দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.
৫৯. আল-বায্যার, আবুবকর আহমদ : আল-মুসনাদ, আল-মুআস্সাতু উলুমিল কুরআন, ১৪০৯ হি.
৬০. আল-মুজামল আওসাত, কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.
৬১. আবু ইয়ালা, আহমদ : আল-মুসনাদ, দামেশক:দারুল মামুন লিত-তুরাছ, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৬২. আবু আওয়ানা, ইয়াকুব : আল-মুসনাদ, বৈরুতঃ দারুল মাআরিফাহ. তা.বি. ।

৬৩. আসকালানী, ইবনু হাজর : আদ-দিরাইয়া ফী তারিখীযি আহাদীছিল হিদায়াহ, বৈরুত : দারুল মাআরিফাহ, তা,বি. ।

৬৪. আল-জাযীরী : কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবুল আরবাআহ্, বৈরুত।

৬৫. আল-বুজায়রমী, সুলআইমান : আত-তাজরীদ, দারুল ফিকরিল আরবী।

৬৬. আশ-মারবিনী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ : মুগনিউল মুহতাজ, বৈরুতঃ দারুল ফিকর।

৬৭. আল-আনসারী, যাকারিয়া : আল-গুরার আল-বহিয়্যাহ, আল-মাতবাআতুল ইয়ামানিয়্যাহ।

৬৮. আল-হামভী, আহমদ : গাময়ু উয়ূলিন বছাইর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৬৯. আল-রুকবান, আবদুল্লাহ : আল-কিসাস ফিন নাফস, বৈরত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪০০হি.

৭০. আল-ফাসী, মুহাম্মদ : আল-ইতকান ওয়াল ইহকাম, দারুল মাআরিফাহ

৭১. ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল : তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০১ হি. ।

৭২. ইবনুল আরাবী, মুহাম্মদ : আহকামুল কুরআন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৭৩. সংকলন, ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৭৪. ইবনু মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ : আস-সুনান, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.

৭৫. ইবনু আবী শায়বা, আবদুল্লাহ : আল-মুছান্নাফ, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি. ।

৭৬. ইবনু হুমায়দ, আবদ : আল-মুসনাদ, কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮

৭৭. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মদ : আস-সহীহ, বৈরুতঃ মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩

৭৮.ইবনু খুযায়মাহ, আবু বকর : আল মুসনাদ, বৈরুতঃ আল-মাকতাতুল ইসলামী, ১৯৮৫

৭৯. ইবনু আবদিল বার্র : আত-তামহীদ, আল-মাগরিবঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ১৩২৭

৮০. ইবনু কুদামা : মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন, আল-মুগনী, বৈরুত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী।

৮১. ইবনুল হুমাম, কমাল উদ্দীন : ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ, দারুল ফিকর।

৮২. ইবনু নুজায়ম, যায়নুদ্দীন : আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযিল দাকাইক, দারুল কিতাবিল ইসলামী।

৮৩. ইবনু আবেদীন, মুদাম্মদ আমীন : রাদ্দুল মুহতার, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৮৪. ইবনু গুনায়ম,আহমদ আন-নাফরাভী : আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী, দারুল ফিকর।

৮৫. ইবনু মুফলিহ, শামসুদ্দীন আল-মাকসিদী : আল-ফুরূ, আলমুল কুতুব।

৮৬. ইবনু কুদামা আল-মাকসিদী, আল- কাফী ফী ফিকহে ইবনু হাম্বল, বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী।

৮৭. ইবনু হাযম, আলী আয-যাহিরী : আল-মহল্লা, দারুল ফিকর।

৮৮. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ : আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৮৯. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন : আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতাওয়া আল- হামিদিয়্যাহ, দারুল মাআরিফাহ।

৯০. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ : আল-ফাতাওয়া আল- হিন্দিয়্যাহ (সংকলন), দারুল ফিকর।

৯১. ইবনু মানযুর, আবুল ফদল মুহাম্মদ : লিসানুল আরব, বৈরুতঃদারু সাদির।

৯২. ইবনুল কাইয়িম, আলজাওযিয়্যা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ : ইলামুল মুআক্কিঈন--দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৩. ইলিয়াস : মডার্ণ ডিকশনারী, বৈরুত, ১৯৮৬

৯৪. ইবনু রুশদ, আবুল ওয়ালীদ : বিদায়াতুল মুজতাহিদ, বৈরুত, ১৯৮১

৯৫. ইবনু ফারহুন : তাবছিরাতুল হুক্কাম, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ।

৯৬. ইবনুল খলীল, আলাউদ্দীন আলী : মুঈনুল হুক্কাম, দারুল ফিকর।

৯৭. উলায়েশ, মুহাম্মদ : মিনহুল জলীল, দারুল ফিকর।

৯৮. কুতুব শহীদ, সাইয়্যেদ : ইসলামে সামাজিক সুবিচার, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৬৬, প্যারীদাস রোড, আগষ্ট, ২০০২

৯৯. কুরতুবী,আবু আবদুল্লাহ : আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, কায়রো : দারশ মাআবতা.বি.।

১০০. কুশায়রী, মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ : আস-সহীহ, বৈরুত; দারু ইহ্য়াইত তুরাছির আরবী, তা. বি.

১০১. কালয়ূবী ও উমায়রাহ : আল-হাশিয়াতু আলা শারহিল মুহাল্লা, বৈরুতঃ দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ।

১০২. কালয়াযী, ড. মুহাম্মদ রাওয়াছ; কায়নবী, ড. হামেদ সাদেক : মু'জামো লুগাতুল ফুকাহা, ইরাদাতুল ফিরাক ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান।

১০৩. খান,মুহাম্মদ আকরাম (সংকলন)নূর হোসন মজীদি : রাসূলুল্লঅহ (স.) অর্থনৈতিক শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৯

১০৪. গানিম, আবু মুহাম্মদ : মাজমাউদ দিমানাত, দারুল কিতাবিল ইসলামী।

১০৫. জলি, জাকিয়া সুলতানা; মোঃ শাহিনুর রহমান : জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী (সম্পাদনাঃ এম জগলুল কবির,পাইভ জুয়েলপাবলিকেশন্স, জানয়ারী ২০১৩

১০৬. তাবারানী, আবুল কাসিম : আল-মুজামুল কবীর, মাওসূলঃ মাকতাবাতয যাহরা, ১৯৮৩

১০৭. দারাকুতনী, আলী : আস- সুনান, বৈরুতঃ দারুল মাআরিফাহ, ১৯৬৬

১০৮. বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল : আল-জামি', বৈরুতঃ দারু ইবনি কাছীর ১৯৮৭

১০৯. নববী, ইয়াহইয়া : শারহু সহীহ মুসলিম, বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, ১৩৯২ হি.

১১০. নববী, ইয়াহইয়া : আল-মাজমু' শারহুল মুহায্যাব, আল-মাতবাআতুল মুনীরিয়্যাহ।

১১১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (সংকলন) ই.ফা.বা.২০০৭

১১২. মুল্লা খসরু, কাযী মুহাম্মাদ : দুরারুল হুক্কাম, দারু ইহয়াইল কুতুাবল আরাবিয়্যাহ।

১১৩. মালিক, ইমাম : আল-মুদাওয়ানাহ, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

১১৪. মনিরুজ্জামান, অধ্যক্ষ এ এম;মোহাম্মদ হায়দার আলী : জুরিস্প্রুডেন্স এন্ড লিগ্যাল থিওরী, ন্যাশনাল ল' পাবকিশেন্স, কলেজ এরিয়া, নিউ মার্কেট, জানয়ারী, ২০১২

১১৫. জালালাবাদী সম্পাদিত : খুতবাতে বাহওয়ালপুর, মহানবী স্মরনিকা ২০০৮

১১৬. যায়ল'ঈ, আবদুল্লাহ : নাসবুর রায়াহ, মিশরঃ দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.

১১৭. যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী : তারহুত তাছরীব, দারুল ফিকর আল-আরবী।

১১৮. যায়ল'ঈ, উসমান : তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক, দারুল কিতাবিল ইসলামী।

১১৯. শফী, মুফতী মুহাম্মদ : মা'আরিফুল কুরআন, (অনু. ও সম্পা. : মাওলানা মহী উদ্দীন খান), মদীন মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প,১৪১৩ হি.

Dhaka University Institutional Repository

১২০. শায়খী যাদাহ, আবদুর রহমান দামাদ আফন্দী, মাজমাউল আনহুর, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী।

১২১. শাফি'ঈ, মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস : আল-উম্ম, বৈরুতঃ দারুল মাআরিফাহ।

১২২. সাবূনী, মুহাম্মদ আলী : রাওয়াইয়ুল বয়ান তাফসিরু আয়াতিল আহকাম, বৈরুত : মুআস্‌সাতুল মানাহিলিল ইরফান, ১৯৮১

১২৩. সালাহুদ্দীন, মুহাম্মদ : ইসলামে মানবাধিকার, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা,এপ্রিল, ২০০৫

১২৪. সিংহ, রামকান্ত : রোমান আইন, সুজনী প্রকাশনী ২০০৪ নীলক্ষেত, ঢাকা।

১২৫. সিদ্দীকী, মুহাম্মাদ ইসলাম : The penal law of Islam, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮

১২৬. হোসেন, অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ : জুরিস্প্রুডেন্স, হিরা পাবলিকেশন্স, জুলাই, ২০১১

১২৭. রহমান, গাজী শামসুর (অনুবাদ) : ইসলামী আইন তত্ত্ব, ই.ফা.বা. ১৯৮৪

১২৮. রহমান মোঃ আতিকুর : সমাজ কল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা, ১৯৯০

১২৯. হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ (প্যারিস) : ইর্মাজেন্স অব ইসলাম, ইসলামিক রিসার্স ইনিষ্টিটিউট, ইসলামাবাদ, ১৯১৩; বাংলা ভাষ্য- ইসলামী আইন ও তার মূলনীতিসমূহ, অনুবাদ-সম্পাদনা; আবদুল্লাহ বিন জালালাবাদী, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.; স্যার আবদুর রহীম : ইসলামী আইনতত্ত্ব।

১৩০. দৈনিক আমাদের সময়, ঢাকা, ১৯ মার্চ বুধবার, ২০১৪

১৩১. দৈনিক ইত্তিফাক, ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯

১৩২. দৈনিক দিনকাল, ১২ মার্চ, বুধবার, ২০১৪

১৩৩. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, ২৭সেপ্টেম্বও, ২০১৪

১৩৪. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১২ নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০১৩

১৩৫. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ২৩ এপ্রিল, সোমবার, ২০১২

১৩৬. দৈনিক যুগান্তর, ১ মার্চ, শনিবার, ২০১৪

১৩৭. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩০ এপ্রিল, ২০১৪

১৩৮. Adam Smith : An Enquiary into the nature and causes of Wealth of Nations, London,1890

১৩৯. Alfred Marshall : Principles of Economics, 1980

১৪০. F.H Giddings : Principles of Sociology 3rd ed.

১৪১. J.M Keyeness : The General Theory of Employment, Interest and Money, London, 1936

১৪২. Khurshed Ahmed : nature and significance of Islamic Economics, Jeddha, IDB, 1992

১৪৩. M. Umer Chapra : What is Islamic Economics, Islamic Research and Training Institution Islamic Develoment Bank, Jeddha, 1996

১৪৪. M. Nejahullah Siddiqui : History of Islamic Thought (Lectures on Islamic Economics, IRT/IDB, Jeddha, 1992

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫. M.A. Mannan : Islamic Economics : Theory and practice, The Islamic Academy, Cambridge, 1936

১৪৬. Morris Ginsberg : Sociology, London: Oxford University Press, 1987

১৪৭. Pearson : Family- Socialization and interaction Process, London, 1965

১৪৮. P. Gisbert : Fundamentals of Sociology, Orient Longman Ltd. Third edition,1973

১৪৯. Professor L. Robbins : The Nature and significance of economices science 2nd Edition,1935

১৫০. R.M Maclver and C.H. page : Society, 1967

১৫১. S.M. Hasanuzzaman : Definition of Islamic Economics, (Journal Research in Islamic Economics, Jeddah,wener, 1984

১৫২. Samuel Koeting, ph.D : Sociology an Introduction to the science of Society, Barnes and Nobel inc. New York, 1965

১৫৩. Siddiqi, Mohammad Iqbal : Penal of Islam, Dellhi 1988.

Dhaka University Institutional Repository